বঙ্গদর্শন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রবর্ত্তিত
বঙ্গদর্শন
44662
THE NATIONAL LITERATURE CO.
CALCUTTA

নিবেদন

নবম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে "বঙ্গদর্শন" সেট্ সম্পূর্ণ হইল। পাশ্চাত্য দেশে অকস্মাৎ যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমূহ বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলাম তাহারই জন্য নবম খণ্ড প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। আমাদের ভরসা আছে, সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকারা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এই খণ্ডের সঙ্গে সমগ্র নয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী সন্নিবিষ্ট হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা সকল রচনার লেখকদিগের নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত এবং বহু প্রবীণ সাহিত্যিকের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছি। অনেকগুলি লেখার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু সবগুলির নয়। এবং যাঁহাদের নাম পাওয়া যায় তাহাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও কেহই একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ নহেন। এরূপ সন্দেহস্থলে নাম সংযোজনা নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারিলাম না।

এই সূত্রে, যাঁহারা বঙ্গদর্শনের পুনর্মুদ্রণ কার্য্যে আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন, যাঁহাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে, যাঁহাদের শুভেচ্ছা আমাদের প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিবার সাহস দিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আশা করি, জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের অমূল্য জাতীয় সম্পদ বঙ্গদর্শন সকল বাঙালীর নিকট সমাদর লাভ করিবে। ইতি ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৬।

নবম খণ্ড

বিষয় | | পৃষ্ঠা

মাসিকপত্র ও সমালোচনা

১ম খণ্ড | বৈশাখ ১২৮১ | ১ম সংখ্যা

গোমেদমণি

এই মণি স্বনামখ্যাত। ইহাকে পীতমণিও বলে। সংস্কৃত রত্নশাস্ত্রে ইহার ৫টী নাম দেখা যায়। যথা—গোমেদ, রাহুরত্ন, তমোমণি, স্বর্ভানব, পিঙ্গস্ফটিক। পিঙ্গস্ফটিক ও পীতমণি এই দুইটী নাম গুণ ও দৃশ্য অনুসারী। ইহা এক প্রকার স্ফটিক বলিলেও বলা যায়। কেবল রঙের ও রাসায়নিক গুণের প্রভেদ থাকাতেই স্বতন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্ফটিক শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহা পিঙ্গলবর্ণ বা পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতমণি ও পিঙ্গলস্ফটিক বলা যায়। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশে এই রত্ন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রাজনির্ঘণ্ট নামক বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যথা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, বিকারনাশক, উত্তেজক, অগ্নিশুদ্ধিকারক।

জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে ইহা ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়। শুক্রনীতি নামক প্রাচীন গ্রন্থের রত্নপ্রকরণে গোমেদমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"বজ্রং মুক্তা প্রবালঞ্চ গোমেদশ্চেন্দ্রনীলকঃ।
বৈদূর্য্যঃ পুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেব চ।
মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তানি সূরিভিঃ।"

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল মহারত্নের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্তা, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ ও মাণিক্য রত্নের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি। এই প্রস্তাবে গোমেদ রত্ন এবং বিক্রমের বিষয়ও থাকিবেক।

শুক্রনীতিপ্রণেতা গোমেদ মণিকে মহারত্ন বলিলেন অথচ ইহার মূল্য অতি অল্প, ইহাও বলিয়াছেন। যথা—

"রত্নশ্রেষ্ঠতরং বজ্রং নীচং গোমেদ বিক্রমম্।"

রত্নের মধ্যে বজ্র অর্থাৎ হীরকই শ্রেষ্ঠ আর গোমেদ ও বিক্রমই অধম। রত্নরাজ হীরকের বিষয় আগামী মাসে বহু বিস্তারিত লিখিত হইবেক।

শুক্রনীতিকার গোমেদ মণির পরীক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা লিখেন নাই, কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে,—

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ।
পাষাণোচাপিচ প্রায় ইতি রত্নবিদো বিদুঃ।"

রত্নতত্ত্ববেত্তারা জানেন যে, মুক্তা ও বিক্রম ভিন্ন কোন রত্নই লৌহশলাকার দ্বারা উল্লিখিত (গাত্রে আঁচোড় দেওয়া) করা যায় না। সুতরাং গোমেদও লৌহের দ্বারা আঙ্কোড়িত ও পাষাণে ঘৃষ্ট করা যায় না।

মূল্য সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে—

"অত্যল্প মূল্যো গোমেদো নোম্মানন্তু যতোঽর্হতি।"
"সংখ্যাতঃ স্বল্পরত্নানাং মূল্যংস্যাৎ—"
[শুক্রনীতি।

অর্থাৎ গোমেদ মণির মূল্য অতি অল্প; সেই হেতু উহা উম্মান অর্থাৎ ওজন করিবার যোগ্য নহে। গোমেদ ও অন্যান্য স্বল্প রত্ন সকলের সংখ্যা অর্থাৎ গণ্তি অনুসারে মূল্য অবধারিত করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,—

"অত্যন্ত রমণীয়ানাং দুর্লভানাঞ্চ কামতঃ।
ভবেন্মূল্যং ন মানেন তথাপি গুণশালিনাম্।"
[শুক্রনীতি।

স্বল্পরত্ন হইলেও যদি দেখিতে সুন্দর হয় বা দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অত্যন্ত গুণান্বিত মহারত্নের পক্ষেও এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। পরন্তু রাজার দোষে কখন কখন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

"রজতং ষোড়শগুণং ভবেৎ স্বর্ণস্য মূল্যকম্।"

স্বর্ণের মূল্য রজতের ১৬ গুণ। এই নিয়ম এখন রাজার দুরভিসন্ধিক্রমে ব্যতিক্রান্ত হইয়া ১৬ গুণের পরিবর্ত্তে ২০ গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রৌপ্যের মূল্য কম ও সুবর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষে ক্ষতি ও বিলাতের বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। এরূপ ঘটনা পুরাতন কালেও কখন কখন হইত বলিয়া শুক্রনীতিকার স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে—

"রাজদৌষ্ট্যাচ্চ রত্নানাং মূল্যং হীনাধিকং ভবেৎ।"

সে যাহা হউক, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। গোমেদ মণির উৎপত্তি স্থান, বর্ণ, কান্তি, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিষয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা যুক্তিকল্পতরু ও গরুড় পুরাণে কিছু বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গরুড় পুরাণের পাঠ এবং শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থের পাঠ প্রায় একরূপ। হিমালয় ও সিন্ধুপ্রদেশেই গোমেদ মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

"হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা গোমেদমণিসম্ভবঃ।"

পরীক্ষা

"পরীক্ষা বহ্নি তঃ কার্য্যা শাণে বা রত্নকোবিদৈঃ।"

রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্নিতে অথবা শাণযন্ত্রে ইহার পরীক্ষা করিবেন।

"স্ফটিকেনৈব কুর্ব্বন্তি গোমেদ প্রতিরূপিণম্।"

চতুর শিল্পীরা স্ফটিকের দ্বারা কৃত্রিম গোমেদ মণি প্রস্তুত করিয়া থাকে এজন্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

বর্ণাদি

স্বচ্ছকান্তিগু'রুঃ স্নিগ্ধো বর্ণাঢ্যো দীপ্তিমানপি।
বলক্ষঃ পিঞ্জরো ধন্যো গোমেদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।

গোমেদ মণির কান্তি অতি স্বচ্ছ এবং স্নিগ্ধ। ওজনে ভারি এবং বর্ণও গাঢ়। দীপ্তি অর্থাৎ তেজও আছে। কিঞ্চিৎ শ্বেত ও পিঞ্জর বর্ণও হয় এবং ইহা ধন বলিয়া গণ্য।

জাতি

রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বৈদূর্য্যাদি মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন যথা—

"চতুর্দ্ধা জাতিভেদস্তু গোমেদোপি প্রকাশ্যতে।"
"ব্রাহ্মণঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত উচ্যতে।
আপীতো বৈশ্যজাতিস্তু শূদ্রস্ত্বানীল উচ্যতে।"

যাহা শ্বেতাভ তাহা ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তের আভা থাকিলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতি, কিঞ্চিৎ পীত থাকিলে বৈশ্যজাতি এবং নীলভাগ থাকিলে তাহা শূদ্র জাতি।

ছায়া

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহারও চারি প্রকার ছায়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"ছায়া চতুর্ব্বিধা শ্বেতা রক্তা পীতাঽসিতা তথা।"

শ্বেত ছায়া, রক্ত ছায়া, পীত ছায়া ও নীল ছায়া। এই চারি প্রকার ছায়া হয়। পরন্তু পীতের ভাগ প্রত্যেক ছায়ায় থাকে এবং পীতই অধিক বলিয়া ইহার "পীত মণি" নাম দেওয়া হয়।

দোষ

"যে দোষা হীরকে জ্ঞেয়া স্তে গোমেদমণাবপি।"

হীরক প্রকরণে হীরকের সম্বন্ধে যে সকল দোষ আছে, গোমেদ মণিতেও সেই সকল দোষ গৃহীতব্য। হীরক প্রস্তাবে সে সকল বিশেষরূপে বিবৃত হইবেক। এক্ষণে স্থূলতর দোষের উল্লেখ করিতেছি।

"লঘুর্ব্বিরূপোঽতি খরোজ্জ্বলানঃ স্নেহোপলিপ্তো মলিনঃ খরোঽপি।
করোতি গোমেদ মণির্বিনাশং সম্পত্তি ভোগা বলবীর্য্যরাশেঃ।"

লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, বিরূপ, দেখিতে বিবর্ণ, অত্যন্ত খর অর্থাৎ কর্কশ, স্নিগ্ধতা সত্বেও মলিন, এরূপ গোমেদ মণি ধারণ করিলে সম্পত্তি, ভোগ, বল ও বীর্য্য বিনাশ হয়।

গুণ

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গুণ হীরক প্রবন্ধ হইতে জ্ঞাতব্য ; পরন্তু স্থূলতর গুণ এই যে—

"গুরুঃ প্রভাঢ্যঃ সিতবর্ণরূপঃ স্নিগ্ধো মৃদুর্বাতি মহাপুরাণঃ।
স্বচ্ছস্ত গোমেদ মণির্ধৃতোহয়ং করোতি লক্ষ্মীং ধনধান্য বৃদ্ধিম্।"

গুরু অর্থাৎ ওজনে ভারি, প্রভাপরিপূর্ণ, শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, মৃদু অর্থাৎ কর্কশতা বর্জ্জিত ও পুরাতন অর্থাৎ উৎপত্তির পর দীর্ঘকালে উদ্ধৃত (পাকা) ; এরূপ গোমেদ মণি ধারণ করিলে লক্ষ্মীর কৃপা হয় ও ধন ধান্য বৃদ্ধি হয়।

মূল্য

ইহার মূল্য অতি স্বল্প। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মূল্য কল্পিত আছে যথা—

"শুদ্ধস্য গোমেদমণেস্তু মূল্যং স্ববর্ণতো দ্বৈগুণ মাহুরেকঃ।
অন্যে তথা বিক্রম তুল্য মূল্যম্ তথাঽপরে চামরতুল্য মাহুঃ।"

শুদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দোষ গোমেদ মণির মূল্য এক শত সুবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ; কেহ বলেন, তাহা বিক্রমের সহিত সমান মূল্য ; অপরে বলেন যে তাহাও নহে ; উৎকৃষ্ট চামরের যে মূল্য, একখণ্ড গোমেদ মণিরও সেই মূল্য।

বিক্রম বা প্রবাল

বিক্রম ও প্রবাল একই বস্তু। ইহার ভাষা নাম "পলা" এবং হিন্দি নাম "মুঙ্গা।" সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার আর ৬টী নাম আছে। যথা—অঙ্গারকমণি, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাঙ্গ, রক্তাকার ও লতামণি।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলেন যে এই রত্ন মঙ্গলগ্রহের অতিপ্রিয়, তজ্জন্য উহার নাম ভৌমরত্ন। ভৌমরত্ন ধারণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, অলক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকে না।

রাজনির্ঘণ্টকার বলেন, প্রবাল দ্বারা অশেষবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়, যেহেতু উহার নিম্নলিখিত গুণসমূহ আছে। মধুর, অম্লরস, কফপিত্তাদি দোষের নাশক, স্ত্রীলোকের বীর্য্য ও কান্তিপ্রদ।

রাজবল্লভ বলেন, তদ্ভিন্ন উহার আরও কয়েকটী গুণ আছে, তাহা এই— সারক, শীত বীর্য্য, কষায়যুক্ত, স্বাদুপাকী, বমিকারক, চক্ষুর হিতজনক।

গরুড়পুরাণেও এই রত্নের বিশেষ উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রধান রত্ন সনীসক, দেবক ও রোমক প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য স্থানেও উৎপন্ন হয় কিন্তু সে সকল উৎকৃষ্ট নহে। যথা—

"সনীসকং দেবক রোমকঞ্চ স্থানানি তেষু প্রভবঃ স্বয়াগম্।
অন্যত্র জাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং মূল্যং ভবেৎ শিল্পিবিশেষযোগাৎ।"
[গরুড় পুরাণ।

শুক্রনীতিগ্রন্থেও ইহা রত্ন বলিয়া গণ্য বটে কিন্তু মহারত্ন নহে। পরন্তু উপরত্ন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তি

"শ্বেত সাগর মধ্যে তু জায়তে বল্লরী তু যা।
বিক্রমানাম রত্নাখ্যা দুর্লভা বজ্ররূপিণী।"
"পাষাণং প্রভজত্যেষা প্রযত্নাৎ কথিতা সতী।
বিক্রমং নাম যদ্রত্ন মামনন্তি মনীষিণঃ।"

শ্বেত সমুদ্রের মধ্যে বিক্রমা নামে এক প্রকার লতা জন্মে, তাহাই বিক্রমরত্ন নামে খ্যাত। এই লতারত্ন অতি দুর্লভ ও বজ্রের সদৃশ গুণবিশিষ্ট। রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা যে প্রস্তরের মত কঠিন হয় তাহা তাহার স্বাভাবিক গুণ নহে; যত্নপূর্ব্বক জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে পর তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়। প্রথমে ইহা ঘনীভূত মাংস নির্য্যাস অর্থাৎ আঠার মত থাকে। ইউরোপীয় পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবাল এক প্রকার কীট। তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরীক্ষা

শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—

"নায়সোল্লিখ্যতে রত্নং বিনা মৌক্তিক বিক্রমাৎ।"

মুক্তা ও বিক্রম ব্যতীত অন্যান্য কোন রত্নে লৌহ শলাকার দ্বারা আঁচোড় পাড়া যায় না। অতএব উল্লেখন বা ঘর্ষণাদি পরীক্ষা নাই। না থাকাই সুসঙ্গত; যেহেতু বিক্রমে কৃত্রিম অকৃত্রিম সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার ভাল মন্দ পরীক্ষা আছে বটে তাহা বর্ণাদি গুণের দ্বারাই হইয়া থাকে।

বর্ণ

প্রবালের বর্ণ পরীক্ষা বিষয়ে গরুড় পুরাণ ও যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এই—

> "তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জা জবা পুষ্পনিভং প্রদিষ্টম্।"
> "জবা বন্ধুক সিন্দুর দাড়িমী কুসুম প্রভম্।"
> পলাশ কুসুমাভাসং তথা পাটলসন্নিভম্।
> রক্তোৎপলদলাকারং—"

যে সকল প্রবালের বর্ণ শশকের রক্তের স্থায়, সে সকল প্রবাল প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ প্রধান। যাহা গুঞ্জা অর্থাৎ কুচ, বাঁধুলিফুল, সিন্দুর, অথবা দাড়িম্ব ফুলের বর্ণের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ২য় শ্রেণীর প্রবাল। যাহা পলাশ পুষ্প, কি পাটলা পুষ্পের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারা ৩য় শ্রেণীর বিক্রম। যে সকল প্রবাল কোকনদ-দলের রঙ্ ধারণ করে তাহা ৪র্থ শ্রেণীর প্রবাল অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হীন।

গুণ

> "প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিক্রমং হি যৎ।"

প্রসন্ন অর্থাৎ পরিষ্কার কান্তিযুক্ত, কোমল অর্থাৎ সুখবেধ্য স্নিগ্ধ ঘৃত তৈলাদি ম্রক্ষিতের স্থায়, সুরাগ—মনোজ্ঞ রঙ্। এইরূপ গুণবিশিষ্ট বিক্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রবাল ব্রাহ্মণ জাতি বলা যায়। ব্রাহ্মণজাতীয় বিক্রমই সুন্দর, সুখবেধ্য ও ধারণে শুভপ্রদ।

২য় শ্রেণীর প্রবাল ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণ্য, তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন সুতরাং দুর্ব্বেধ্য ও অস্নিগ্ধ। ৩য় শ্রেণীর বিক্রম বৈশ্য জাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতীয় বিক্রম স্নিগ্ধ বটে, ইহার বর্ণও উত্তম বটে কিন্তু ইহার লাবণ্য অল্প। ৪র্থ শ্রেণীর বিক্রম শূদ্র জাতীয় বলিয়া পরিগণিত। শূদ্র জাতীয় বিক্রম অতি কঠিন এবং তাহার দ্যুতি অল্প কালেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

> "রক্ততা স্নিগ্ধতা দার্ঢ্যং চিরদ্যুতি সুবর্ণতা।
> প্রবালানাং গুণাঃ প্রোক্তাঃ ধনধান্যকরাঃ পরা।"

সুরাগ, স্নিগ্ধতা, সুখবেধ্য, বহুকাল স্থায়ী লাবণ্য, সুন্দরবর্ণ, এই কয়েকটী প্রবালের প্রধান গুণ। গুণবান্ প্রবাল ধারণেই ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে।

"হিমাদ্রৌ বস্তু সংঘাতং তত্ররক্ত মতি নিষ্ঠুরং।
তস্ত ধারণ মাত্রেণ বিষবেগঃ প্রশাম্যতি ॥"

হিমালয় সর্ব্বরত্নের আকর, সেখানে না জন্মায় এমন রত্নই নাই। এতাদৃশ হিমালয়ে যে একপ্রকার প্রবাল জন্মে তাহা রক্তবর্ণ ও অতি কঠিন, তাহা ধারণ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

দোষ

"বিবর্ণতা তু খরতা প্রবালে দূষণদ্বয়ম্।
রেখা কাকপদৌ বিন্দুর্যথা বজ্রেষু দোষকৃৎ।
তথা প্রবালে সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।"

বিবর্ণ ও খর অর্থাৎ খস্‌খসে, এই দুইটী প্রধান দোষ। তদ্ভিন্ন রেখা প্রভৃতি আরও কয়েকটী দোষ আছে, তাহাও পরিত্যজ্য।

"রেখা হন্যাৎ যশোলক্ষ্মীমাবর্ত্তঃ কুলনাশনঃ।
পট্টলো রোগকৃৎ খ্যাতো বিন্দুর্ধনবিনাশকৃৎ।
ত্রাসঃ সঞ্জনয়েৎ ত্রাসং নীলিকা মৃত্যুকারিণী।"

রেখা থাকিলে সে প্রবাল ধারণে যশ ও লক্ষ্মী ভাগ্য ধ্বংস করে। আবর্ত্ত থাকিলে তাহা বংশনাশক হয়। পট্টল নামক দোষ (ইহা হীরক পরীক্ষায় বিবৃত হইবেক) রোগ আনয়ন করে। বিন্দু থাকিলে তাহা ধন বিনাশ করে। ত্রাস নামক দোষ (ইহাও হীরকোক্ত দোষ) ভয় উৎপাদন করে। নীলিকা দোষে মৃত্যু হয়।

"বিরূপ জাতিং বিষমং বিবর্ণং খরং প্রবালং প্রবহন্তি যে যে।
তে মৃত্যুমেবাত্মনি বৈ বহন্তি সত্যং বদন্ত্যেষ যতো মুনীন্দ্রঃ।"

অন্যান্য রত্নের ন্যায় প্রবাল রত্ন ধারণেও জাত্যাদি নিয়ম আছে। যথা—বিবর্ণ, বিজাতি, বিষম (উচ্চ নীচ), খর,—যে যে ব্যক্তি এরূপ প্রবাল ধারণ করে সেই সেই ব্যক্তিই আপনার মৃত্যু বহন করে। মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যে ইহা সত্য।

নীতিশাস্ত্রকার ভগবান্ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেবল মুক্তা ও প্রবাল এই প্রকার রত্নই কালে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যান্য রত্ন জীর্ণ হয় না।

"ন জরাং যান্তি রত্নানি বিদ্রুমঃ মৌক্তিকং বিনা।"

মূল্য

শুক্রনীতির মতে ১ তোলা উৎকৃষ্ট প্রবাল সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য হইবার যোগ্য। যথা—

"প্রবালং তোলকমিতং স্বর্ণার্দ্ধং মূল্যমর্হতি।"

কিন্তু যুক্তিকল্পতরুর মতে—

"মূল্যং শুদ্ধ প্রবালস্য রৌপ্য দ্বিগুণ মুচ্যতে।"

নির্দ্দোষ ও পরীক্ষিত প্রবাল রূপার দ্বিগুণ মূল্য অর্থাৎ দুই তোলা শুদ্ধ রৌপ্যের যে মূল্য এক তোলা প্রবালের সেই মূল্য।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর সকল সভ্য জনপদে রক্তবর্ণ প্রবাল অলঙ্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। থিওফ্রাসটস তাঁহার গ্রন্থে প্রবালের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাচীন সুসভ্য গলজাতি ইহার অলঙ্কার ব্যবহার করিত। এক্ষণে উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ প্রবাল যাহা অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগর প্রভৃতি জলমধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীরামদাস সেন।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়প্রণীত

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে ঘেরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিলেন। কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্য।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের একটীও রণবাদ্য ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়ানাগরা ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সানাই, তুরী, ভেরী, রামসিঙ্গা, দামামা আসিয়া জুটিল। জয়সূচক বাদ্যে কানন প্রান্তর নদীসকল শব্দ ও প্রতি-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, "জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তান-ধর্ম্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকী আছে। যাহারা আমাদিগের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহা-দিগকে ভুলিলে চলিবে না। যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি, বিশেষ যে মহাত্মা আমাদিগের জন্য এই রণজয় করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি।" তখন সন্তানদল বন্দে মাতরং বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল।* বহুলোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবানন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নি জ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া হরে মুরারে গাইতে লাগিল। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কানন মধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এতদিন যে জন্য আমরা সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল

হইয়াছে, এপ্রদেশে ইংরেজের সেনা আর নাই, মুসলমানের যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদিগের নিকট টেঁকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও।"

জীবানন্দ বলিল, "চলুন এই সময়ে গিয়া নগর অধিকার করি।"

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্য কোথা?

জীব। কেন এই সৈন্য?

ধীর। এই সৈন্য কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। একজনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুটিতে বাহির হইয়াছে। গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুটিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, "যাই হোক নগর ভিন্ন সমস্ত বীরভূমি আমাদের অধিকৃত হইল। নগরের বাহিরে আর এমন কেহ নাই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বীরভূমিতে তোমরা সন্তানরাজ্য প্রচার কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্য সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা, সন্তানের নিশান উড়াইবে।"

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।"

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

তখন চারিজনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিল। সত্যানন্দ তখন অন্যের অলক্ষিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেল, মহেন্দ্র রহিল। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুইজনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্ব্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইল। প্রতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন না সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয় ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না, এক্ষণে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।"

মহেন্দ্রের চক্ষে দরবিদরিত ধারা বহিল। মহেন্দ্র বলিল, "ঠাকুর, সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আর কন্যা কোথায় যে তা তো জানি না। কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন জীবিত আছে। ইহাই জানি, আর কিছু জানি না।"

মাথার উপর গাছের ডালে বসিয়া কে বলিল, "আমি জানি কন্যা কোথায় আছে।" মহেন্দ্র উন্মুখ হইয়া বলিলেন "তুমি কে?"

সত্যানন্দ একটু রুষ্টভাবে উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "নবীনানন্দ! আমি তোমাকে বিদায় দিয়াছিলাম! তুমি এখনও এখানে কেন?"

শান্তি গাছের উপর হইতে বলিল, "প্রভু, স্বর্গে মর্ত্তে আপনার অধিকার আছে; গাছের ডালে কি?" এই বলিয়া ঝুপ করিয়া শান্তি নামিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য। ইনি তোমার কন্যার সন্ধান দিবেন।" এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন। শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?" শান্তি বলিল, "আমার আশ্রমে আসুন।" এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে। তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সকলে চলিয়া গেলে, ব্রহ্মচারী একা ভূমে প্রণত হইয়া, মাটীতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমি আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন? কেন?" যে আসিয়াছিল সে বলিল, "দিন পূর্ণ হইয়াছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে বীরভূমি পরিপূর্ণা হইল। সন্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ "বন্দে মাতরং" কেহ "জগদীশ হরে" বলিয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ শত্রুসেনার অস্ত্র, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল। কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ তদুপরি পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ গ্রামাভিমুখে, নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে "বল বন্দে মাতরং নহিলে মারিয়া ফেলিব।" কেহ ময়রার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি, গোপিনী কই?" সেই এক রাত্রের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, "ইংরেজ মুসলমান একত্রে পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।"

দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। যেখানে মহারাজ বীরভূমাধিপতি আসাদ-উজ্‌জমান বাহাদুর রাজসিংহাসনে সুখে আসীন, সেই খানেই দারুণ রাজ্যধ্বংসসূচক বার্ত্তা পৌঁছিল। তখন অতি ব্যস্তে চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, রাজার অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। রাজনগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠে সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে

অতি সাবধানে, দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। রাজধানী মধ্যে সমস্ত লোক সমস্ত-রাত্রি জাগরণ করিয়া, কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল, "আসুক সন্ন্যাসীরা আসুক, মা দুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।" মুসলমানেরা বলিতে লাগিল, "আল্লা আকবর! এতনা রোজের পর কোরাণসরিফ বেবাক কি ঝুটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁদুর দল ফতে করতে নারলাম। দুনিয়া সব ফাঁকি।" এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবণিতা কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, "জয় জগদীশ্বর! আজ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হইও!"

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, একা খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৌরী দেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, "দেখো ঠাকুর আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।"

কল্যাণী নগরের ঘাঁটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারাওয়ালা বলিল, "কে যায়?" কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল, "আমি স্ত্রীলোক।" পাহারাওয়ালা বলিল, "যাবার হুকুম নাই।" কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল, "বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ।" শুনিয়া পাহারাওয়ালা কল্যাণীকে বলিল, "যাও মায়ি, যাবার মানা নাই, লেকেন আজ কা রাতমে বড় আফত, কেয়া জানে মায়ি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গিরবে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়া যাবে, সো তো হাম কিছু জানে না, আজকা রাত মায়ি, তুমি বাহার না যাবে।"

কল্যাণী বলিল, "বাবা আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দ্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।"

পাহারাওয়ালা বলিল, "বয়স আছে মায়ি, বয়স আছে, দুনিয়ামে অহি তো জেওরাত হায়। বল্‌কে হামি ডাকাত হতে পারি।" কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাঁটি এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা দেখিল মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের দুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঘাঁটি খাম্বাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে-রাত্রে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পলাও পলাও শব্দ করিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িলেন। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে তিনি পড়িয়া গেলেন। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, রলিল, "তবে চাঁদ!" সেই সময়ে আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয়া পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে বক্ষাবৃত—বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?"

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল, "সে কি, পদচিহ্নে?" এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ক্ষুব্ধ, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে বলিল, "হরে মুরারে! চিনেছি যে, তুমি পোড়ার মুখী কল্যাণী।"

কল্যাণী ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

আগন্তুক বলিল, "আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই অপমান করিবার জন্যই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম্ম? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি লাথি মারিতাম।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "অয়ি স্মিতবদনে! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ও বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া

হাসিল, বলিল, "ও পোড়া কপাল! আগে বলতে হয় তাই যে, আমারও ঐ দশা।" শান্তি বলিল, "ভাই মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ?"

কল্যাণী বলিল। "তুমি কে, তুমি যে সব জান দেখিতেছি।"

শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—ঘোরতর বীর পুরুষ। আমি সব জানি। আজ পথে সিপাহী আর সন্তানের যে দৌরাত্ম্য তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে পারিবে না।"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ভয় কি? আমরা নয়নবাণে সহস্র শত্রু বধ করি। চল পদচিহ্নে যাই।"

কল্যাণী এরূপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল, "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানে যাইব।"

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্যপথে লইয়া চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরাভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। শান্তি জীবানন্দকে বলিল, "আমি নগরে চলিলাম। মহেন্দ্রের স্ত্রীকে লইয়া আসিব। তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে উহার স্ত্রী আছে।"

জীবানন্দ ভবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবন-রক্ষা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়াছিল—এবং তাহার বর্ত্তমান বাসস্থানও সর্ব্বস্থানবিচারিণী শান্তির কাছে শুনিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কানন মধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীল গগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রনিচয়, আর সেই নিবাত নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুর কল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত ঊষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শান্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিল। কল্যাণী শান্তিকে বলিল—"আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কন্যাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।"

শান্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—দুই রাত্র ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!"

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কন্যাকে পাইবেন।"

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না।

তখন নিমাই প্রথমে একবার ঢোঁক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল। তারপর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল। তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল। তার পর বলিল "আমি মেয়ে দিব না।"

নিমাই, গোল হাতখানির উল্টাপিট চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পর জীবানন্দ বলিলেন, "তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও ত নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে।"

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও না কেন? আমার কি?" নিমাই এই বলিয়া সুকুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া ছুম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না। নিমাই উঠিয়া গিয়া সুকুমারীর কাপড়ের বোঁচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল ঝুপঝাপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল। সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হাঁ মা—কোথায় যাব মা?" নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না। নিমাই তখন সুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সুখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, সুকুমারী। সকলে সুখে সম্মিলিত। শান্তি

নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিলেন। কল্যাণীকে যে রাত্রে তিনি আপন কুটীরে আনেন, সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিলেন যে, নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক একথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন। নবীনানন্দবেশে শান্তি, পদচিহ্নে বাস করিতেছিলেন। একদিন কল্যাণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নবীনানন্দ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিলেন না।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাকিয়াছ কেন ?"

ক। পুরুষ সাজিয়া আর কতদিন থাকিবে ? দেখা হয় না,—কথা কহিতে পাই না। আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। শেষে বলিলেন, "তাহাতে অনেক বিঘ্ন কল্যাণি !"

দুইজনে সেই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না। কৌতূহলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে ; কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছে। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি গোঁসাই ! সন্তানে সন্তানেও অবিশ্বাস ?"

মহেন্দ্র বলিলেন, "ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন ?"

নবীনানন্দ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত ?" বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তা'তে কি ?

নবী। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে ?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম ?"

নবী। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত কেন ?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্ব্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্ত্তার মত নহে। কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র। সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না বরং মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে অনায়াসে বিষভোজন করিয়াছিল সে কি অপরাধিনী হইতে পারে? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন এমত সময়ে অভাগিনী শান্তি, মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া, কল্যাণীর প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সহসা তখন অন্ধকার ঘুচিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ। সাহসে ভর করিয়া, যা থাকে কপালে বলিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন—কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল। সেই সময়ে অবসর পাইয়া, কল্যাণী বাঘ ছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও খসিয়া পড়িল। ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শা। শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী।

ম। সে ত জুয়াচুরি; তুমি স্ত্রীলোক?

শা। এখন কাজে কাজেই।

ম। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক হইয়া সর্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহ বাস কর কেন?

শা। সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম।

ম। তুমি যে স্ত্রীলোক জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন?

শা। জানেন।

শুনিয়া, বিশুদ্ধাত্মা মহেন্দ্র অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। দেখিয়া, কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না, বলিল, "ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্ম্মপত্নী শান্তিদেবী।"

মুহূর্ত্তের জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, "ইনি ব্রহ্মচারিণী।"

মহেন্দ্র বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "হউক—তথাপি প্রায়শ্চিত্ত আছে।" পরে শান্তির মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "কি প্রায়শ্চিত্ত আপনি জানেন?"

শান্তি বলিল, "মৃত্যু। কোন্ সন্তানে না জানে? আগামী মাঘী পূর্ণিমায় সে প্রায়শ্চিত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এই বলিয়া শান্তি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র আর কল্যাণী বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।
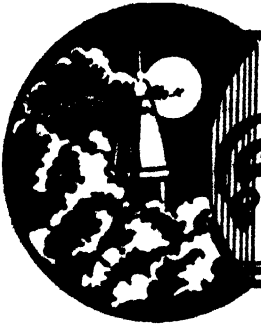
ওহে শশী এত সাজ
আজ কেন বল বল ?
কে তোমারে পরাইল
শুভ্রবাস নিরমল ?
হাসাতে কুসুমকুলে,
মাতাতে প্রেমিকদলে,
ভুলাতে অখিল নরে
কে তোমারে নিরমিল ?
নক্ষত্র মুকুতামালা
কে তোমার গলে দিল ?
ফুটিতকুসুমকরে,
বল বল কার তরে,
কাহারে পূজিতে আসি
তুমি ওহে শশধর,
মনোহর নীলাম্বর
আসনে বসিয়া সাজি
সুধারাশি চন্দনরাশি
বরষিছ সুশীতল।
জ্যোৎস্না পট্টবাসে শশী
মরি কি শোভা হইল।
যে তোমার স্রষ্টা ওহে
তাঁরে কি দেখেছ তুমি,
দেখে থাক যদি ওহে
বল হে আমারে বল,
কত রূপ ধরেন সে
জ্যোতির্ম্ময় সুবিমল।
সেই নিরমল ছবি,
হৃদে ভাবি নিরবধি,
পাপতপ্ত হৃদি জুড়াই
হেরে কান্তি সুশীতল।

ঐ কবিতা *

(১)

আজি কেন এত হাসি হে নিশিরমণ,
ভুলাইতে কার মন, কৌমুদীর প্রাণধন,
ধরেছ মোহন বেশ রমণীরঞ্জন,
আজি কেন এত হাসি হে নিশিরমণ !

(২)

অথবা কাহার আজি ভুলাইতে মন
শরৎ গগনে বসি, প্রণয় আমোদে ভাসি,
শুভ্র বাস পরি শশী আহ্লাদে মগন,
কারে হেরে এত হাসি যামিনীশোভন !

---

* এই পদ্য কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের লেখা। আমরা ইহার কেবল দুই এক স্থানে যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। —সম্পাদক।

(৩)

পার্শ্বে শত তারা নারী, তারা নয় মনোহারী,
তাই তাহাদের বিভা মলিন এমন।
জানি আমি, অভাগিনী মলিন যেমন !
ওই তারা সব তার মলিন কিরণ !

(৪)

জানি জানি সেই রমা, নহে পতিপ্রিয়তমা,
তাই হে মলিন সদা তাহার বদন,
তুমি ত হাসিছ খুব তারকারমণ,
পেয়েছ কি নব বধূ মনের মতন।

(৫)

ছিছি শশী পায় হাসি, নিশি কি এত রূপসী,
বল কিসে ভামাঙ্গিনী, ভুলাইল মন,
কিম্বা যে প্রবাদ আছে যার যাতে মন,
রজনী সজনী, সে তো চির পুরাতন !
(পুরাতনে পুরুষের এত কি যতন ?)

(৬)

পড়েছ পড়েছ ধরা, ওহে শশধর,
যাহার কারণে আজি বেশ মনোহর,
যে দেখি ধরার ধারা, সাজিয়াছে মনোহারা,
হেসে চলে দেখাইছে শুভ্র কলেবর ;
(শরম থাকিলে পর ভুলান দুষ্কর)

(৭)

হেরিয়া ধরার হাসি, প্রমোদে মাতিয়া শশী,
হাসিতেছ সুধারাশি বিকাশি বদন,
ও হাসি হেরিয়া হাসে অখিল ভুবন,
নব অনুরাগ বটে অমনি এমন ?

(৮)

পড়ে বটে পড়ে মনে, দেখেছি কবে কে জানে,
ওই মত হাসিভরা দুখানি বদন,
মিছামিছি কত হাসি কে জানে কারণ,
কোথা সেই হাসিমাখা তরুণ যৌবন ?

(৯)

কোথা হ'তে চিন্তা এবে ঢেকেছে বদন,
যেন হে কালের করে সব পুরাতন।
পক্ষান্তরে তোমারও রবে না এমন,
ঢাকিবে অমা-রজনী ও বিধুবদন।

(১০)

হেরি তোমাদের ধারা, কত হাসি হাসি যোরা
এত শোভা আর নাহি দেখেছি কখন ;
পরপতি ভুলাইতে বেশ প্রয়োজন
সুগন্ধ কুসুম লতা কবরী বেষ্টন।
(পরেছ ধরণী তাই কৌমুদীবসন ?)

(১১)

আহা এ পূর্ণিমা নিশি মরি কিবা মনোহর,
মোহিত না হয় মরি হেরে কাহার অন্তর,
কোমল অঙ্গুলি তুলি, বোলে আধ আধ স্বর,
হেসে দেখাইছে শিশু চাঁদ পর-শশধর।
(মরি মরি কি সুন্দর জননীর অঙ্কোপর)

(১২)

বালক যুবক ভোলে, দেখে বৃদ্ধ চিন্তা ফেলে,
মরি কি সুন্দর নিশি মনোহর কোজাগর
যে সৃজিল হেন নিশি তব জন্যে ওহে নর
বারেক কৃতজ্ঞ হয়ে ভাব সে জগদীশ্বর।

কোন বিষয়ে লিখিতে গেলে যতই বিনীত থাকিতে চেষ্টা করি দুটী কথার অন্যতর অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। হয় বলিতে হইবে আমি এমন কথা বলিব যে তাহাতে পাঠকের জ্ঞানোদয় হইবে। নতুবা মানিতে হইবে যে প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখক পাঠক উভয়ে সমান কিন্তু অবস্থানুসারে পরস্পরের মতভেদ আছে এবং পাঠকের মত খণ্ডন করাই লেখকের অভিপ্রেত। ইদানীন্তন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কোন কথা ব্যক্ত করিতে হইলে কয়েকটী বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। এতাদৃশ স্থলে আমাদিগের মনের ভাব ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে নিতান্ত জড়ীভূত। যে সকল কথা স্পষ্টতঃ মনে উদয় হয় তাহার অধিকাংশ বিষয়ের বাদানুবাদ ইংরাজি পুস্তক অবলম্বন করিয়াই করিতে হয়। বাঙ্গালাতে ইংরাজি পুস্তক লইয়া বাদানুবাদ করিতে হইলে একটু লজ্জা বোধ হয়। কেন না এরূপ বিষয়ে ইংরাজেরাই প্রধান শ্রোতা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন ইংরাজিতে ঐ সকল কথা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা যায় তখন অনেক স্থলে সাহেবেরা দেখাইয়া দেন, "অমুক অমুক কথা ত আমরা তোমাকে শিখাই নাই। এগুলি ভ্রান্তিমূলক।" তথাচ ইহাতে সকল সময়ে আমাদিগের মত পরিবর্ত্তন হয় না। কারণ উল্লিখিত ইংরাজবিদ্বিষ্ট কথার অনেকাংশ আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমূলক। সেগুলি স্পষ্টতঃ মনে উদয় না হইতে পারে; আমরা অনেক কথা নিজের অগোচররূপে মনে ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং ইংরাজের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম না হইয়াও কেবল প্রাচীন হিন্দুসংস্কারবশতঃ অনেক ইংরাজবিদ্বিষ্ট কথা আমাদিগের মুখে ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। এগুলি সংস্কৃত পুঁথি খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি সংস্কৃত জানি না তবে এরূপ কথা কোথায় পাইব? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি? কতক বটে। কিন্তু এগুলির উপরেই বা আমাদিগের ঐকান্তিক বিশ্বাস হয় কি প্রকারে? ইংরাজি, আমাদিগের পুঁজি, শিখাবিশিষ্ট অধ্যাপক দেখিলেই প্রায় মনে করিয়া থাকি

ইনি হস্তিমূর্খ। [বিলাত ফেরতেরাও আমাদিগের সহিত আলাপ কালে সেইরূপ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন অতএব প্রাগুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে পাইতেছি] তবে সংস্কৃতপণ্ডিতের কথাতে আমাদের এত দৃঢ় সংস্কার হইবার সম্ভাবনা কি যে সাহেবের মুখে আপত্তি শুনিলেও তাহা ত্যাগ করি না? ইহার হেতু এই যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এতদিন পুরুষানুক্রমে যে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন তাহা হিন্দুসমাজে প্রোথিত হইয়া আছে। স্পষ্টতঃ মনে উদয় হয় না অথচ সকল চিন্তাতে মিশিয়া থাকে; সুতরাং তাহার দোষ গুণ বিচার না করিয়াও তাহা অবলম্বন করিয়া থাকি।

বালিকাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা লইয়া যতই ইংরাজের অনুকরণ করি; হিন্দুগণের গার্হস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করাইতে গেলে ইংরাজি শিক্ষা যেন উড়িয়া যায়! একবার এক বিবাহের নিমন্ত্রণে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়া বর প্রদক্ষিণ হইতে দেখিয়া আমার চৈতন্য হয়। তখন বুঝিলাম যে সাহেবেরা স্ত্রীজাতির সঙ্গে যেরূপে মিশিয়া জীবন যাপন করেন তাহা কেবল মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায় না। ১৬ আনা কি, বরং ১৮ আনা সাহেব না হইলে সেই প্রণালী আশ্রয় করা অসাধ্য। সাহেবদিগের মধ্যে অথবা থিয়েটারে যেরূপ স্ত্রীপুরুষের সম্ভাষণ দেখা যায় এবং বাঙ্গালা নবেল রোমান্স মধ্যে যেরূপ নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত পাঠ করা যায় তাদৃশ আচরণ মাতা ভগিনী বা কন্যার প্রতি আমরা কদাচ করিতে পারি না। মনে যতই তর্ক করি চক্ষে প্রাগুক্ত আচরণ দেখিলে স্ত্রীজাতির অপকৃষ্ট সম্প্রদায়ের তুলনা স্বভাবতঃ উপস্থিত হয় এবং অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এতদ্বিষয়ে আমাদিগের মনের ভাব নিতান্ত জটিল। তাহা কতক হিন্দুশাস্ত্রকার এবং কতক ইংরাজি শিক্ষকগণের যত্নে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাহা না বুঝিয়া কথা কহিলেই সাহেবেরা বলেন, "বর্ব্বর" অধ্যাপক মহাশয়েরা বলেন "বেল্লিক।"

এইরূপ ঘটনা নানাস্থলেই ঘটিয়া থাকে সুতরাং আমরা না সাহেব না বাঙ্গালি এইরূপ এক অদ্ভুত শ্রেণী হইয়া উঠিতেছি। ইহাতেও মনের ভাব প্রকাশ করা নিতান্ত সঙ্কটস্থল হইত না। যদি এমন হইত যে বাঙ্গালি হইয়া ইংরাজিতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই ইংরাজ এবং হিন্দু সম্প্রদায়চ্যুত হইবেন বটে কিন্তু এরূপ সকল বাঙ্গালির মনের ভাব প্রায় একরূপ হইবে; তাহা হইলেও আমরা নিতান্ত আকর্ষণবিহীন বালুকারাশির ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইতাম না। কেন না তাহা হইলেও মনের ঐক্যহেতু পরস্পরের সহযোগিতা করিবার স্থল থাকিত। এবং সেই আশয়ে মনের চিন্তা ভুল হউক বা ঠিক হউক

ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজি শিক্ষা হইতে উত্তরোত্তর আমাদিগের অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা সকলেই সমাজ নূতন করিয়া গড়িতে চাই কিন্তু ইংরাজ ও বাঙ্গালির মধ্যে ভেদ নির্ণয়পূর্ব্বক বিষয় বিশেষের অনুরোধে অন্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা সম্বরণ পূর্ব্বক স্বজাতির উপযোগী বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম নহি। বঙ্গভাষিগণের পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করা প্রায় আশার অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে। যদি বাঙ্গালি-প্রকৃতিতে কিছু সার পদার্থ থাকে তবে অবশ্যই কোন সময়ে না কোন সময়ে তাহা প্রকাশ হইবে এবং তখন এই অসার বৈষম্য স্বভাবতঃই অপনীত হইয়া যাইবে। এই জন্য বলি যে ইংরাজিভাষাস্ত বাঙ্গালির কোন কথা বলা বিষম সঙ্কটস্থল।

নিম্নলিখিত কথাগুলি যে কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইবে এতদূর প্রত্যাশা করি না। কিন্তু উহার বিষয়ে ইংরাজি ভাব গতিকের আপত্তি আর হিন্দু প্রকৃতিসম্মত বিভেদ পৃথক করিতে পারিয়াছি এইরূপ স্পর্দ্ধা মনে উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য গুটি তিন কথা সম্বন্ধে পাঠকগণের ইংরাজী মত ধরিয়া কয়েকটী কথা এবং হিন্দুসমাজাশ্রিত সংস্কার ধরিয়া আর কতকগুলি বক্তব্য প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। কথা তিনটীর মধ্যে একটী লইয়াই এই প্রস্তাব লিখিব আর দুইটী ইহার সংলগ্ন বলিয়া নাম করিতেছি। তাহার কথা কবে লিখিতে পারিব তাহা বলিতে পারি না।

কথা তিনটী ইংরাজিতে বলিলে এইরূপ নাম দিব (১) Dignity of Labor. (২) Scientific বা Objective method এবং (৩) Principles of theorising অথবা Subjective method। বাঙ্গালাতে ইহার অনুবাদ করিলে আমি ১০ দিন পরে নিজেই সেই অনুবাদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিব না। সে যাহা হউক আপাততঃ প্রথমোক্ত বিষয়টীই আলোচনার স্থল।

Dignity of labor বাক্যের কেবল dignity শব্দ ধরিলে তৎপরিবর্ত্তে বোধ হয় মাহাত্ম্য শব্দই প্রয়োগ করা যাইত। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে প্রাগুক্ত বাক্যে যেরূপ মাহাত্ম্য ব্যক্ত হইতেছে তাহা একজন হিন্দু স্বভাবতঃ প্রকাশ করিতে গেলে বৈরাগ্য শব্দই প্রয়োগ করিবেন। আমার বক্তব্য কথা এই যে ইংরাজিতে শ্রমের যে লক্ষণ বা অঙ্গ ধরিয়া উহার dignity বা মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্যের লক্ষণবিশিষ্ট। কিন্তু হিন্দু সমাজস্থ সংস্কার মতে পরিশ্রমে নিষ্কাম বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায় না। অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য বা শ্রমের বৈরাগ্য বলিলে হিন্দুর পক্ষে হয় দুর্ব্বোধ নচেৎ অগ্রাহ্য হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে বৈরাগ্য অতি মহৎ গুণ। সন্ন্যাসী সর্ব্বতোভাবে বৈরাগী হইবার আকাঙ্ক্ষা বশতঃ আশ্রম ত্যাগ করেন কিন্তু তথাপি গৃহস্থ আশ্রমের শ্রম অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। দণ্ডধারী একসন্ধ্যা আহারের জন্ত গৃহস্থের নিকট একাধিকবার যাচ্ঞা করেন না বটে কিন্তু সেই একবার যাচ্ঞাও হিন্দুধর্ম্মোক্ত সন্ন্যাস লক্ষণবিরুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে। যোগী বলেন আমি জীবনের সমস্ত ক্রিয়া স্তম্ভিত রাখিয়া শ্রমের আবশ্যকতা নিবারণ করিব এবং আত্মহত্যার দোষ হইতেও বিরত থাকিব। কিন্তু যোগ ভঙ্গ হইলেই আবার তাঁহার জীবনের কল চলিবে; জীবনের কল চালাইতে হইলে শ্রমরূপ ইন্ধন অপরিহার্য্য। অতএব হিন্দুশাস্ত্র মতে বৈরাগ্য কখনই অবিশ্রান্ত হয় না। সুতরাং বৈরাগ্য কি প্রকারে অবিশ্রান্ত হইবে তাহাতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর কৌতুক জন্মিতে পারে। আমার স্থূল বক্তব্য এই যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া নিঃস্বার্থভাবে শ্রম করিলে মনোমধ্যে প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করে। অতএব যখন গৃহীর পক্ষে শ্রম হইতে অব্যাহতি নাই তখন সেই অবিশ্রান্ত শ্রমই অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের সার উপায়। বৈরাগ্য রক্ষা করিতে হইলে নিরন্তর জগতের হিতজনক শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই একমাত্র বিধি।

পক্ষান্তরে ইংরাজি ভাষাজ্ঞগণের সমীপে dignity of labor সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বক্তব্য আছে। প্রাগুক্ত বিষয়ে আমার বিদ্যা বুদ্ধি কোমতের উপদেশ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষকের গুরুতর মতভেদ আছে। ইদানীন্তন ইউরোপীয় মণ্ডলী কেহই পরিশ্রমের dignity (মাহাত্ম্য) অস্বীকার করিবেন না কিন্তু আমার সংস্কার এই যে কোম্তের উপদেশ বাস্তবিক বৈবাগ্যলক্ষণবিশিষ্ট এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা বৈরাগ্যের সমাদর করেন না। অতএব শ্রম ও বৈরাগ্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষাজ্ঞের পক্ষে শ্রমের সঙ্গে বৈরাগ্য অবলম্বন করা এবং হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে শ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবিশ্রান্ত করা এই দুটী উপদেশ সপ্রমাণিত করাই আমার সংকল্প।

উপরে বলিয়াছি যে শ্রমের মাহাত্ম্য বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত কি না তদ্বিষয়ে ইউরোপীয়গণের মধ্যে মতভেদ আছে। অতএব এতদ্বিষয়ক বিচার ইংরাজি-ভাষাজ্ঞ পাঠকের উদ্দেশেই বক্তব্য।

এক প্রকার মত এই যে dignity of labor কেবল ইউরোপেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের কথা আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে ব্যবসা, কারখানা, রাস্তা, গাড়ি, জাহাজ, কল, ভাল বন্দুক, ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধপ্রণালী, শাসন

প্রণালী, আচার ব্যবহার, টেবিল, চৌকি, ছুরি, কাঁটা ইত্যাদি civilization নামক পদার্থের অঙ্গমধ্যেই শ্রমের মাহাত্ম্য প্রতীয়মান। তাঁহাদিগের মতে civilization শব্দে উল্লিখিত এবং তদানুষঙ্গিক বিষয়াদি বুঝা আবশ্যক এবং civilization ও পরিশ্রমের মাহাত্ম্য অভেদ্য। এই প্রণালীতে বিচার করিতে হইলে শ্রমজীবিগণকে রাজা ব্রাহ্মণের উপরে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। এবং এই নিমিত্ত বিলাতে শ্রমজীবিগণের উন্নতির জন্য স্কুল, খবরের কাগজ trade-union representation ইত্যাদি ব্যাপার হইয়া থাকে। অনেকের প্রত্যাশা এতদূর যে, অল্পকাল মধ্যে উহারাই পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান অবলম্বন হইবে এবং পাদরি সাহেবেরা ও ভূম্যধিকারীরা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যাইবেন। এবং তাহা হইলেই শ্রমজীবিগণেরও শ্রমের মাহাত্ম্য জগতে যথাযোগ্য মতে জাজ্জ্বল্যমান হইবে। আর ইউরোপীয়েরা সভ্যপ্রধান; তাহাদিগের এইরূপ সভ্যতা শিখিলে সর্ব্বত্র শ্রমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হইবে।

উল্লিখিত প্রণালী মতে আর কিছুদূর বিচার করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইউরোপীয়েরা ভারত অধিকার করিয়া জগতে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। মূর্খ চীনেরা উহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ না করাতে নিতান্ত বর্ব্বরতা প্রকাশ করিতেছে। জাপানবাসীরা ইউরোপেব অনুকরণ করাতেই এসিয়া খণ্ডের মধ্যে উচ্চতম সোপানে আরোহণ কবিয়াছে। আলজিরিয়া, টিউনিস, কম্বোজ, ফরাসি অধিকৃত হওয়াতে পরম মঙ্গল হইয়াছে। কাবুল কাশ্মীর নেপাল ইংরাজাধিকৃত এবং চীন তাতার রুশিয়াধিকৃত হইলে জগতে যারপরনাই সুখ হইবে। কেবল ইজিপ্ট টুরকি এবং পারস্য কে অধিকার করিলে ভাল হয় তাহাই চিন্তার স্থল।

যদি এই মতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান কর তবে এই কথা প্রকাশ হইবে যে struggle for existence একটি নৈসর্গিক নিয়মবিশেষ এবং natural selection ইহার স্বভাবসিদ্ধ ফল। তাহার অন্যথা চেষ্টা করা মূঢ়তার লক্ষণ মাত্র। সভ্য ও অসভ্যগণ বিরোধ করিলে natural selection মতে সভ্যজাতির বর্দ্ধন ও অসভ্যের ক্ষয় অবশ্যই হইবে। অণ্ডামানবাসিগণ, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতিগণ, নিউজিলাণ্ড দেশের লোক ইত্যাদি ইউরোপীয়ের প্রাদুর্ভাবে নিঃশেষিত হইলে এবং উহাদিগের দেশে ইউরোপীয়গণের অধিষ্ঠান হইলে জগতের উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ চালনা হইবে। ইউরোপীয়েরাই শ্রম করিতে সক্ষম; তাঁহারাই শ্রমের সার বুঝিতে পারিয়াছেন; তাঁহারাই সংসারসাগরে শ্রমরূপ মন্থন প্রবর্ত্তন করিয়া civilisation সুধা উদ্ধার করিতেছেন। ইহারা অন্য জাতির সহিত বিরোধ

(struggle) করিয়া জয় লাভ করিবে; কৃষি বাণিজ্যাদির দ্বারা ধনবৃদ্ধি হইবে; বর্ব্বরগণ আলস্যে কালযাপন না করিয়া শ্রম করিতে বাধ্য হইবে, অথবা যদি অবাধ্য হয় তবে ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদিগের স্থলে ইউরোপীয়গণের অভিষেক হইয়া অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জাতি ধরাতল সুশোভিত করিবে।

উল্লিখিত শ্রমের লক্ষণ (struggle for existence) উহাতে বিন্দুমাত্র বৈরাগ্য দেখিতে পাই না। যদি dignity of labor পদে ঐরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে হয় তবে তাহা সত্য হউক বা না হউক তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের সংযোগ সাধন করা আমার সাধ্যাতীত।

Spencer এবং Darwin, struggle for existence ও natural selection নামক মতের পক্ষবাদী। তাঁহারা কেহই এ কথা বলেন না যে এসিয়া আফ্রিকা এবং আমেরিকা হইতে বর্ব্বরদিগকে ধ্বংস কর। কিন্তু তাঁহাদিগের দোহাই দিয়া সকল চা-কর নীলকরই বলিতে পারেন যে, আমরা কোন অপরাধ করি না কেবল স্বভাবসিদ্ধ ঘটনাতে natural selection হেতুক আমাদিগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।*

যাঁহারা উপরিলিখিত মত অবলম্বন করেন তাঁহাদিগের সমীপে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা আছে। মনে কর আমি একজন এণ্ডামানবাসী, ২০০/ বিঘা ভূমিস্থ জঙ্গল ব্যতীত আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, একজন ইংরাজ এখানে থাকিলে আমাকে স্থানান্তরিত হইতে হয় বটে কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডে ৫০ জন ইংরাজের ভরণপোষণ হইবে। তাহাদিগের শ্রমের দ্বারা এই অরণ্য, জঙ্গল, অপূর্ব্ব উদ্যান হইয়া উঠিবে কিন্তু আমার জন্য জগতে আর স্থান নাই, আমার বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং কার্য্যনিষ্ঠা ঐ ইংরাজের ব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আমি ইংরাজের আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে নিতান্ত অক্ষম। এই ২০০/ বিঘা ছাড়িলে আমার আপাততঃ মহা কষ্ট এবং পরিশেষে নিজের অথবা বংশাবলীর দেহনাশ অবশ্যই হইবে। অতএব আমার পক্ষে natural selectionএর সহকারিতা করিয়া

* ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে Pioneer লিখিয়াছেন—There is a great deal of nonsense talked about the impropriety of annexation. Perhaps some annexation in this country in the past, has been needless and impolitic, though it would be difficult to point to any example, which, however little justifiable in diplomacy, has not been a good thing for all parties concerned—a distinct gain to humanity in the end. *May 9, 1882.*

আত্মহত্যা করাই কি বিধেয়? না ইংরাজের পক্ষে শ্রম, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা ও এই ২০০/ বিঘা ভূমি সম্বন্ধে মহীতলের দুরবস্থা সহ্য করা বিধেয়। দুর্ব্বল ও অক্ষমকে বিনষ্ট করা যদি সৎপ্রকৃতির লক্ষণ না হয় তবে উল্লিখিত প্রকরণের পরিশ্রম ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়েও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। অতএব natural selection এবং struggle for existence বিষয়ক মতের সমধিক পোষকতা করিতে হইলে উল্লিখিত লক্ষণ বিশিষ্ট পরিশ্রমের মাহাত্ম্য নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া যায়। সভ্যতা এবং পরিশ্রমের মাহাত্ম্য সমধিকরূপে রক্ষা করিতে হইলে প্রাগুক্ত নিয়মের নিতান্ত অধীন হইয়া থাকা চলে না।

মিল individualityর ভক্ত। Individuality স্থলে স্বানুবর্ত্তিতা শব্দ প্রয়োগ এক প্রকার চলিয়া আসিয়াছে। স্বানুবর্ত্তিতা বর্দ্ধন ইদানীন্তন ইংরাজী শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু মিল যে প্রকার স্বানুবর্ত্তিতার পক্ষবাদ করিয়াছেন তাহা এক বিষয়ে অতি ভয়ানক। মিল বলেন মনুষ্যের সকল প্রকার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এ বিষয়ে লোকে নিজের সুবিধা নিজেই ভাল বুঝে, অপর ব্যক্তিরা ততদূর বুঝিতে পারে না। অতএব স্বানুবর্ত্তিতার কোনরূপ অবরোধ করা কর্ত্তব্য নহে; কেবল এই পর্য্যন্ত নিষেধ থাকিলেই যথেষ্ট যে একজনের স্বানুবর্ত্তিতার দ্বারা অন্য ব্যক্তির স্বানুবর্ত্তিতা খর্ব্ব না হয়। এই নিষেধ পালন করিলেই যথেচ্ছাচাররূপ কলঙ্ক মোচন হইয়া স্বানুবর্ত্তিতার অমল রশ্মি বিকাশিত হইবে।

মিলের অনুসরণ করিতে হইলে স্ব স্ব মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতার চালনা করাই অনন্যকর্ত্তব্য। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, তুমিও সেইরূপ করিও আমি তাহাতে আপত্তি করিব না। আমি ইচ্ছামতে টাকা উপার্জ্জন করিব, টাকা উড়াইব, সামাজিক প্রথা ও ধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিব, তাহাতে আমার পাপ হয়, হউক, দেহ ক্ষয় হয় হউক, অর্থক্ষয় হয় হউক। যতক্ষণ তোমার কোন ক্ষতি না হয় ততক্ষণ তুমি কোন কথা কহিতে পারিবে না, ততক্ষণ আমার কার্য্য স্বানুবর্ত্তিতা নামে অভিধেয়, এবং স্বানুবর্ত্তিতা জগতের অত্যন্ত হিতকর জানিও।

ইহাতে শ্রমের বিলক্ষণ আধিক্য দৃষ্ট হইবে কিন্তু বৈরাগ্যলক্ষণ নিতান্তই বিরল মনে হয়। অতএব শ্রমের মাহাত্ম্য বলিলে যদি এইরূপ স্বানুবর্ত্তিতারই আদর করা হয় তবে আমার প্রস্তাবিত অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের স্থল ইহাতে নাই।

মিলের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। কিন্তু কয়েকটি কথার বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বাঙ্গালী নব্যসম্প্রদায় সর্ব্বদা স্বানুবর্ত্তিতার

ভাণ করিয়া থাকেন। আমিও স্বানুবর্ত্তিতা ভালবাসি বটে কিন্তু মিলের প্রদর্শিত স্বানুবর্ত্তিতাকে যথেচ্ছাচার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সে যাহা হইক মিল অস্মদ্দেশে স্বানুবর্ত্তিতা অবলম্বন বিষয়ে কি বলেন তাহা মনে করা আবশ্যক।

মিল লিখিয়াছেন—

It is perhaps hardly necessary to say that this doctrine (of Liberty) is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties. We are not speaking of children or of young persons below the age which the law may fix as that of manhood or womanhood. Those who are still in a state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against injury. For the same reason we may leave out of consideration those backward states of society (যথা ভারতবর্ষ) in which *the race itself may be considered as in its nonage.* (এরূপ তুলনা দিয়া বর্ণনা করিলে অলঙ্কার দোষ হয় না বটে, কিন্তু বক কাস্তের মত বক্র বলিয়া কাস্তের আঘাত করাটা একটু ন্যায়বিরুদ্ধ বলিতে পারা যায়।) "The early difficulties in the way of spontaneous progress are so great that there is *seldom any choice of means* for overcoming them ; and a ruler (যথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) full of the spirit of improvement is warranted in the use of *any expedients* (যথা Aitchison প্রকাশিত treaty সমূহ) that will attain an end *perhaps* otherwise unattainable. Despotism is a legitimate mode of government in dealing with barbarians provided the end be their improvement and the means justified (কবে?) by actually effecting that end." (*Liberty 4th Edn. p. 22-24.*)

ইনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

"And some of those modern reformers who have placed themselves in strongest opposition to the religions of the past, have been no way behind either churches or sects in their assertion of the right of spiritual domination : M. Comte in particular, whose Social System, as unfolded in his *Systeme*

de Politique positive, aims at establishing (though by moral more than by legal appliances) ইহাতেও মিল সন্তুষ্ট নহেন, a despotism of Society over the individual, surpassing anything contemplated in the political ideal of the most rigid disciplinarian among the ancient philosophers."—(*Do p. 28-29*)

এস্থলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মিল কি ইণ্ডিয়া আফিসে চাকরি করিতেন বলিয়া এতই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্যাধিকার করিলে কি দোষ হয় তাহা কোন মতেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে নাই? ফলতঃ মিল স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দূরে থাকুক আত্মশাসনের মাহাত্ম্যও একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে এবং utility মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু utility মানিলেও আত্মশাসনের প্রতি উপেক্ষা করিবার বিধান দেখা যায় না। যদি মিল, কার্য্যের (utility) বিচার স্থলে, এই কথার অনুসন্ধান করিতেন যে কর্ত্তার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইলে তাঁহার কার্য্যে utility আশ্রয় করা সম্ভব, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতেন যে আত্মহিতের পরিবর্ত্তে পরের হিত অভিলাষ করিলেই অপেক্ষাকৃত বহুলপরিমাণে জগতের হিতসাধন হইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতসাধনে বিরাগ করা মিলের রুচিবহির্ভূত হইয়া থাকিবে। সুতরাং প্রাগুক্ত বৈরাগ্য স্বীকার না করিয়া কতদূর স্বানুবর্ত্তিতা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্যমত প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক পরের হিতসাধন অভিপ্রেত হইলেও স্বানুবর্ত্তিতার যথেষ্ট স্থল থাকে। অন্য ব্যক্তি স্বানুবর্ত্তী হইতে পাইলে স্বেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া সুখী হইবে এবং তাহার মানসিক ও দৈহিক শক্তির যথাযোগ্য চালনা হইয়া তদ্দ্বারা জগতের হিতসাধন হইবে—এরূপ তর্কের দ্বারাও স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করা অসাধ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলে কোমৎ প্রণীত পরার্থপরতামূলক প্রামাণিক (Positive) ধর্ম্ম অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। মিল কোন মতেই তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। মিল কি পিতৃশাসনে এতই উৎপীড়িত জ্ঞান করিয়াছিলেন যে গুরূপদেশ মাত্রেই অভক্তি হইয়াছিল? কিন্তু জেমস্ মিলের শাসনে কই জন মিলের স্বানুবর্ত্তিতার তো কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না! যাহা হউক, মিল এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয়, পিতা স্নেহবশতঃ সন্তানের যেরূপ শাসন করেন তাহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে ভারতবাসীদিগের প্রতি বল প্রয়োগ হয়, আর

কোমৎ প্রণীত ধর্ম্ম শাসনে মিলের স্থায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের বা স্বানুবর্ত্তিতার স্থল থাকে না। সুতরাং মিল উভয় কুল ত্যাগ করিয়া ইউরোপ অঞ্চলে স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। ভূমধ্যসাগব পার হইলে আর স্বানুবর্ত্তিতা চলিবে না। Nature abhors vacuum,—but up to thirty two feet only! আর স্বানুবর্ত্তিতা ও যথেচ্ছাচারের মধ্যে ভেদ কি রহিল? মিল বলেন অন্যের স্বানুবর্ত্তিতা। উত্তরটা সর্ব্বপ্রকারেই ঠিক গ্যালিলিওর মত হইয়াছে। ফলতঃ যথেচ্ছাচার এবং স্বানুবর্ত্তিতার মধ্যে কোন ব্যবধান রাখা আবশ্যক হইলে আত্মশাসন ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই এবং সেই আত্মশাসনেরই নামান্তর স্বার্থপরতা দমন। তাহা হইতেই পরার্থপরতা ধর্ম্ম সাধন হয়। এবং এতদুভয় একত্র করিলেই বাস্তবিক বৈরাগ্যের লক্ষণ সংঘটিত হয়।

মিল যে প্রকারে স্বানুবর্ত্তিতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের প্রতিই বর্ত্তে। পরিশ্রম মাত্রই, হয় আপনার অনুষ্ঠিত নচেৎ অন্যের আদিষ্ট। অন্যের আদেশ পালন করা নিজের সংকল্পিত হইলে তাহাতেও স্বানুবর্ত্তিতা থাকে। কেবল উৎপীড়নভয়ে উহা পালন করিতে হইলেই সকল দোষ আশ্রয় করে। সে যা হউক মিলের কথিত স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তি যত্নসহকারে আপন স্বেচ্ছা চরিতার্থ করেন। ইহাতে ঐ যত্নই প্রকৃত পক্ষে মাঙ্গলিক বিষয়; স্বেচ্ছা চরিতার্থ করিবার স্বাধীনতা কেবল উপায় মাত্র। মনুষ্য শ্রম করিলেই কার্য্যকুশল হয়, ঐ শ্রমের দ্বারা আমাদিগের যে সকল বৃত্তি সঞ্চালিত হয় তৎসমুদায়ই পুষ্টি লাভ করে। আর শ্রমলব্ধ ফল যে কেবল শ্রমী ব্যক্তিরই ভোগে আইসে তাহা নহে। শ্রমী নিজে বেতন বা মূল্য প্রাপ্ত হয় এবং কার্য্যবিশেষে দক্ষতা লাভ করে। কিন্তু তাহার শ্রম কিম্বা শ্রমজাত দ্রব্য যে ক্রয় বা গ্রহণ করে সেও বিশিষ্টরূপে উহার ফলভোগী। যদি কোন স্থলে কাহারো শ্রমের দ্বারা অন্যের অপকার হয় অথবা কোন হিত না হয় তাহা হইলে নানাপ্রকার প্রতীকার হইয়া থাকে। অতএব শ্রমের দ্বারা আপন ও পর, একত্রে বহুলোকেরই হিতসাধন হয়। এবং পরের সুখ দুঃখ আমার কার্য্যেরই উপর নির্ভর করিতেছে এই কথা বুঝিয়া এবং আপন ইষ্ট অপেক্ষা পরের আবশ্যকতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া শ্রম করিলেই স্বানুবর্ত্তিতা পরার্থপর এবং বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠে। মনে কর আমি শ্রম স্বীকার করিয়া একটী গ্যালি কম্পোজ্ করিলাম, ইহাতে যদি টাইপ্ নষ্ট হয় তবে আমাকে অবশ্যই নিন্দা করিবে এবং আমিও ভবিষ্যতে কম্পোজিটরের কার্য্য হইতে বিরত থাকিব। যদি ঐ গেলি বেশি ভুল থাকাহেতু অব্যবহার্য্য হয় অর্থাৎ উহাতে উপকার

অনুপকার কিছুই না দর্শে তবে আমার শ্রমের বেতন পাইব না। সুতরাং আমি তজ্জন্য যে সময় অতিবাহিত করিলাম তাহা আমার জীবন হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইল বলিতে হইবে। এবং সেই পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজনসিদ্ধির কালবিলম্ব এবং অভাবও ঘটিবে।

"We will quote on this subject, the reply made by a workman to the commissioners appointed to inquire into the position of the labouring classes. They told him that his labour was a commodity, on the same footing with other commodities, and that he was free to dispose of it on fair terms.

'And yet' replied the workman 'it has a character of its own, because, if ordinary commodities are not sold one day, they are another ; whereas if I do not sell my labour, it is lost for all the world and for me ; and as the existence of society depends on the results of labor, society is the poorer by the value of what I might have been able to produce.'

A report on the labor question presented to the Positivist Society. Translated from the French. London, George Manwaring, 1861.

অতএব শ্রমী পরের হিত মনে করুক না করুক, শ্রমের নিগূঢ় মাহাত্ম্য লোকের হিত, শ্রমীর নিজের হিত এবং তাহার শ্রমজাত ফল যাহারা উপভোগ করে তাহাদিগের হিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে শ্রমের utility প্রকৃষ্ট রূপেই সাব্যস্ত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য যে ইহার সহিত পরার্থপরতার বিভেদ কি।

Utility মতের বিরুদ্ধে ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহার পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। অন্য পাঠকের নিকট তাহা প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের আয়ত্ত নহে। কিন্তু দুটা কথা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় অসংলগ্ন হইবে।

The greatest happiness of the greatest number—(অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ সুখ) সাধন করিবার উদ্দেশ্যে, সকল কার্য্য করিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে সকল

ব্যক্তিই পরস্পরের সহিত তুল্য। এ কথার ভাবান্তর এইরূপ হইতেছে যে, স্বপরিবার ও স্বগ্রাম বা স্বদেশবাসী বলিয়া যে সম্বন্ধভেদ গণ্য করা গিয়া থাকে তাহা সঙ্গত নহে। অতএব উপকারের পাত্র মধ্যে উল্লিখিত কোন তারতম্য রক্ষা করা utility বিধানের বহির্ভূত। কিন্তু ভরসা করি এ কথাতে অনেকেই অসম্মত হইবেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে প্রাগুক্ত বিধান মতে হিতসাধকের মনের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সকল বিচার পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সাদরে ভোজন করাইলাম। ইহাতে তোমার সুখ বর্দ্ধন হইল সুতরাং utility মতে কার্যটী নিন্দনীয় নহে। কিন্তু মনে কর যে আমার অভিসন্ধি যে তুমি আমার বিশেষ প্রত্যুপকার করিবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই অভিসন্ধি ধরিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য কি না?

খ্রীষ্টানেরা বলেন জগদীশ্বর কেবল লোকের অভিসন্ধিই বিচার করেন কার্য্যের ফলোদয় দেখেন না। মনে কর এক জন খ্রীষ্টান আমার মঙ্গলোদ্দেশে আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। তিনি জানেন যে পরিণামে ইহাতে গুরুতর বিপত্তি হইতে পারে; অর্থাৎ হিন্দু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে বিষম্বাদ হেতু যুদ্ধ বিগ্রহাদিঘটিত নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তিনি সদভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে খ্রীষ্টান করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনাকে এই সকল অহিতের জন্য দায়িক মনে করেন না, এবং জগদীশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবারও আশঙ্কা করেন না।

হিন্দুগণ বলেন ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়। শাস্ত্রকার আদেশ করিয়াছেন এই জন্য বিধেয়। ইহাতে মনের অভিসন্ধি বা কার্য্যের ফলাফল কিছুই বিচার করা আবশ্যক নহে। শাস্ত্রকারের আদেশ পালন করিলে তোমার আজ্ঞাবাহিতা এবং ভক্তির চালনা হইবে। একজন দরিদ্রকে দান করিলে তোমার দয়াধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে পারে, যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনকারী কোন ব্যক্তিকে দান করিলে সংসারে বিদ্যানুশীলন এবং ধর্ম্মানুশীলনের উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু এই সমস্ত হিতাভিসন্ধি অথবা হিতসাধন কিছুই হিন্দুর বিচার্য্য বিষয় নহে। শাস্ত্রানুসারে যে ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে যাহাকে ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য এবং যেখানে এরূপ শাসন (তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার অধিকার চর্চ্চাও বটে) সেস্থলেও এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করা বিধেয়; ইহাতে শাস্ত্রাজ্ঞাই প্রকারান্তরে লঙ্ঘন হইতেছে তথাচ ঐ অব্রাহ্মণকে দান করিয়া শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি তোমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে; তোমার অভিসন্ধি এমন হইতে পারে যে ব্রাহ্মণ

বশীভূত করিয়া সমাজের সমক্ষে তোমার হিঁদুয়ানি বজায় রাখিবে মাত্র, তথাচ তাহাতে দোষ নাই ; ঐ ব্রাহ্মণকে দান করিলে হয় ত সে অদ্য রাত্রেই রেল যাত্রা করিবে এবং তাহার পরিবারবর্গকে যারপরনাই বিপদে নিক্ষেপ করিবে, তুমি ইহা জানিলেও এই অহিতের দায়িক নহ।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা এতই অসঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যে হিন্দুগণ অনেক স্থলেই utility ভক্ত দেখা যায়। ফলাফলের বিচারটা চক্ষে পড়িলে এড়ায় না ; অভিসন্ধির কথা গুহ্য বলিয়া আন্দোলন হয় না। সুতরাং বাঙ্গালি, ইংরাজি শিক্ষাবশতঃ একবার মনু যাজ্ঞবল্ককে ভণ্ড কি মূর্খ মনে করিতে আরম্ভ করিলেই utility বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। কেন না খ্রীষ্টানের প্রতি ঘৃণা অন্য কারণে বদ্ধমূল হইয়াই আছে। এই কথাগুলিতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি হইতেছে বটে তাহা বাদ দিতে হইলে পুঁথি বেড়ে যায়। অতএব যাঁহারা utilityর পরিবর্ত্তে, আদেশ, intuition আদির সমাদর করিয়া থাকেন তাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন! তাঁহাদিগের কথার প্রতিবাদ utility বিষয়ক পুস্তকে যথেষ্টই আছে।

বাস্তবিক মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সময়ে উপরোক্ত তিন বিধানই অবলম্বন করা আবশ্যক। গুরূপদেশ, কর্ত্তার অভিসন্ধি, এবং ক্রিয়ার হিতাহিত ফল, এই তিনটী বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কেবল গুরূপদেশের অধীন হইয়া থাকিলে খ্রীষ্টানের উপদেশটা ত্যাগ করিতে হয় ; অর্থাৎ অভিসন্ধির বিচার থাকে না। কেবল গুরূপদেশ অথবা খ্রীষ্টানের পরামর্শ শুনিলে utility বিধানের অবমাননা পূর্ব্বক কার্য্যের হিতাহিত ফলের প্রতি দৃষ্টি ছাড়িতে হয়। কেবল সদসদভিসন্ধি ধরিয়া গুরূপদেশ এবং ক্রিয়াফল উপেক্ষা করিলে লোকের হিতসাধন বিষয়ে ত্রুটী স্বীকার করিতে হয়। ইহার একটীও নির্দ্দোষ নহে। অমুক কার্য্যে utility আছে কি না এই কথার মীমাংসার জন্য পণ্ডিতগণের অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা utility বিষয়ক বিধানেই আছে। সুতরাং প্রাগুক্ত বিধানে গুরূপদেশের স্থল বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে। লোকের কার্য্য এবং মনের অভিসন্ধি মধ্যে প্রবল সম্বন্ধই আছে। তাহা না থাকিলে লোকের চরিত্র নিতান্ত অব্যবস্থিত হইত, এবং কেহ কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিত না। অতএব মনের অভিসন্ধি উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়। Utility বিধান মতেও greatest happiness of the greatest number (বহু ব্যক্তির সুখ বাহুল্য) লোকের অভিসন্ধি মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। এস্থলে বহু ব্যক্তির মধ্যে কর্ত্তা স্বয়ংও গণনীয়। কিন্তু যতগুলি লোকের সুখ সাধনার্থ utility বিধানমতে কার্য্য করা যায় তন্মধ্যে আপনি ভিন্ন

অন্য সকলের সম্বন্ধেই পরার্থপর অভিসন্ধি বর্ত্তে। Utilityতে স্বচ্ছন্দ পরচ্ছন্দ উভয়ই সংকলিত থাকে। সুতরাং পরচ্ছন্দানুবৃত্তি, utility মতে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যে যে স্থলে স্বচ্ছন্দানুবৃত্তি বা স্বার্থপরতার দ্বারা পরচ্ছন্দের ব্যাঘাত হয় সেখানে পরার্থপরতা (altruism) বিষয়ক বিধান মতে utility দোষণীয় হইয়া উঠে বলিতে হইবে। স্বার্থপরতা হইতে নিজের হিত; পরার্থপরতা হইতে অন্যের হিত হইবার কথা। অভিসন্ধি এবং কার্য্যের সম্বন্ধে এইরূপ। কিন্তু স্বার্থপরতা হইতে পরের অহিতও হইতে পারে। দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত হইতে পারে, দুরভিসন্ধি অভাবেও হইতে পারে। এবং কোম্‌ৎ পরার্থপরতা বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে নিজের অহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। Utility অবলম্বন করিয়া স্বানুবর্ত্তী হইলে স্বচ্ছন্দাভিলাষী এবং পরেব অহিতকারী হওয়া অসম্ভব নহে। স্বানুবর্ত্তিতা বিষয়ে মিল যে নিষেধ অবধারণ কবিয়াছেন তাহাতে পরের অহিত কতকদূব নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে হইতে পারে না।

আমি স্বানুবর্ত্তী চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া স্থিব করিলাম যে এক স্ত্রীর বহু পতি বরণ করাতে কোন দোষ নাই। স্থির কবিয়া স্বানুবর্ত্তিতার বিধান মতে আপন মতানুসাবে কার্য্য করিলাম, এবং মিলের আদেশ প্রতিপালনার্থে অন্যকেও সেইরূপ করিতে দিলাম। মনে করা যাউক যে কার্য্যটা সত্যই নিতান্ত গর্হিত। কিন্তু আমার মতিভ্রম এবং আমার সহকারিগণের যথেচ্ছাচার বশতঃ প্রাগুক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এবং আমার অনুকরণ হেতু কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশ বিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, লোকেব বুদ্ধিবহির্ভূত হইয়া থাকিল। এই অহিতকে স্বানুবর্ত্তিতার ফল বলিতে হইবে।

এস্থলে আমার কার্য্যটীর দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে মিলের মতে দেখিতে হইবে যে কতগুলি লোক আমার মতাবলম্বী হইয়া অহিতগ্রস্ত হইল আর কতগুলি লোক স্বানুবর্ত্তী হইয়া মানব-প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিল। এই কথা স্থির করিতে হইলে সহস্র বৎসর চুপ করিয়া থাকা আবশ্যক। অন্যান্য মত অনুসারে দেখিতে হইবে যে আমার অভিসন্ধি কি ছিল—সমাজের হিতসাধন করা না নিজের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করা! আমার মতাবলম্বিগণের মঙ্গল কামনাই যদি আমার মনোগত অভিপ্রায় হইত তবে সাধ্যপক্ষে প্রস্তাবিত কার্য্যের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না এবং আপন ভ্রম জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ অবশ্য ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু যদি নিজের বাহাদুরী দেখানই আমার অভিপ্রেত হয় তবে আমার স্বানুবর্ত্তিতা হইতে কেবল বিলাস-বাসনাই চরিতার্থ হইবে।

এতাদৃশ আচরণ স্থলে অভিসন্ধির দোষ কিছুতেই খণ্ডন হইতে পারে না। এরূপ স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকে এক বিষয়ে কোনমতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেও প্রকারান্তরে তাহার দ্বারা আবার অহিত সাধন হইবে; অন্ততঃ তাহার অনুকরণ হেতু অন্য ব্যক্তির দ্বারা ক্রমশঃ লোকের অনেক অমঙ্গলই ঘটিতে থাকিবে। অতএব কার্য্যের হিতাহিত ফল জানিবার জন্য কেবল আপন অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর না করিয়া গুরূপদেশ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ব স্ব আন্তরিক প্রকৃতির একতা রক্ষা করিবার জন্য মনোগত অভিসন্ধি গুলিকেও সুনিয়মানুবর্ত্তী করা আবশ্যক। এবং কার্য্যফলের হিতাহিত বিচারে নিতান্ত বিমুখ হইলে গুরূপদেশ এবং মনের অভিসন্ধি উভয়ই বিফল হইতে পারে, অতএব মনোগত অভিসন্ধির অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়াই মনুষ্যবর্গের সেবা করা বিধেয়।

কেবল স্বানুবর্ত্তী হইলেই যে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহা নহে। অন্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে না শিখিলে কখনই ব্যাপক কাল স্বীয় সংকল্পের অনুবর্ত্তী থাকা যায় না। বহুজন সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে একজনের আজ্ঞাদান এবং অন্য সকলের আজ্ঞা বহন ব্যতীত কোন কার্য্যই সমাধা হয় না। যাহারা আজ্ঞা বহন করিতে শিখে নাই তাহারা সুপ্রণালীমতে আজ্ঞা দান করিতেও নিতান্ত অক্ষম হয়। জগতের কার্য্য অল্লাধিক পরিমাণে সমবেত হইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং স্বানুবর্ত্তিতা এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা উভয়ই আবশ্যক। উভয়ের পরিমিত অবস্থাতে কোন দোষই হয় না। অপরিমিত হইলে উভয় হইতেই বিভিন্ন দোষ উৎপন্ন হয়। অপরিমিতরূপে স্বানুবর্ত্তী হইলে স্বানুবর্ত্তী ব্যক্তিকেই দোষী বলিতে হয় কিন্তু অপরিমিতরূপে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে সেই দোষ বাহুল্যপরিমাণে আজ্ঞাদাতাতেই স্পর্শ করে। যে আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাবাহীকে অযথারূপে অবনত রাখেন তাঁহার দোষের বিষয়ে বিচার করিলে প্রকাশ হইবে যে বল প্রয়োগ বিষয়ে স্বানুবর্ত্তিতা এবং পরচ্ছন্দের প্রতি উপেক্ষাই দোষের সার ভাগ। এই কারণেই ইউরোপ কর্ত্তৃক এসিয়ার উপরে যে বলপ্রয়োগ হইতেছে তাহা দূষণীয়। এবং তদ্বিষয়ে মিলের মত ভ্রান্ত।

শ্রীবো

৩

আর এই শীতকালটা ভাল লাগে না। যে অনন্ত নীল আকাশ দেখিতে এত সুন্দর, এত সুশ্রী—যে অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজিপরিবেষ্টিত অনন্ত শোভায় শোভিত চন্দ্রমণ্ডল দেখিলে এত আহ্লাদ, এত উল্লাস, এত মোহ জন্মে শীতকালে সে সকল কিছুই থাকে না। এই স্থূল এবং দৃষ্টি ও ঘ্রাণের অপ্রীতিকর পদার্থে পরিপূর্ণ জড়জগৎ হইতে কি এক রকম ধূমবৎ, কুরূপ এবং স্ফূর্তিনাশক বাষ্প উঠিয়া মানুষের চক্ষু এবং আকাশরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাসস্থলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মানুষ অতুল রূপের পরিবর্ত্তে অসহনীয় কুরূপ দেখিতে থাকে। দ্রষ্টব্য জগতের উপরার্দ্ধ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে এবং মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। জগতের নিম্নার্দ্ধও তদ্রূপ। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মনোহর বৃক্ষলতাশোভিত তটভূমিবেষ্টিত স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, পুষ্করিণী; সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত, প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত, সুনির্ম্মলবারিপূর্ণ সরোবর; পর্ব্বতোদ্ভূতা, ক্রীড়াময়ী, রঙ্গপ্রিয়া, চঞ্চলনেত্রা, মধুরভাষিণী, স্রোতস্বিনী; সুদূরবিস্তৃত, গাম্ভীর্য্যময়, গর্জ্জনপ্রিয়, বাত্যান্দোলিত, সুনীল, স্ফীতবক্ষ সমুদ্র—এ সকলই শীতকালে সেই অনন্ত বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশিতে আবৃত। ইহাদের সমস্ত রূপ, সমস্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত আকাশের অতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিলুপ্ত অথবা কলুষিত। পৃথিবী এবং আকাশ একটা ঘোলা আবরণে মণ্ডিত। দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় এমন কিছুই নাই। বৃক্ষে পত্র নাই। বৃক্ষের শাখাগুলি এক একখানা পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় এদিকে ওদিকে প্রসারিত। বৃক্ষটা যেন মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কীট, পতঙ্গ, পশু কেহ ক্রীড়া করিতেছে না,—যেন সকলেই মরিয়া রহিয়াছে। কি অদূরে কি সুদূরে কোথাও পাখীর ডাক শুনিতে পাই না। মানুষের বাহ্যজগতের সহিত সম্পর্ক নাই। মানুষ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শীতে জড় সড় হইয়া পড়িয়া আছে অথবা বস্ত্রাভাবে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরাভ্যন্তরে কিম্বা পথপার্শ্বে পড়িয়া

হিম ঋতুর নিদারুণ মর্ম্ম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে। রোগী রোগ ঝাড়িয়া রুগ্নশয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবী হিমময়, যেন হিমে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। জড় জগতের শক্তি, জড় জগতের শ্রী, জড় জগতের সৌন্দর্য্য সকলই বিলুপ্ত !

ক্রমে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ণ হইতে উত্তরায়ণে গমন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজ মূর্ত্তি সতেজ ভাব ধারণ করিতেছে। পৃথিবী হাড়ে হাড়ে তাপ অনুভব করিতেছে।

এখন দেখ দেখি পৃথিবীতে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে ! যে অনন্ত বিস্তৃত, কু-রূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশি সুন্দর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সে বাষ্পরাশি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। উপরে তারকাখচিত নীলাকাশ, নীচে নীল সমুদ্র, স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী, এবং প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত সরোবর হাসিতেছে। মৃতবৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে। তাহার প্রতি শাখা এবং প্রশাখা ছোট ছোট কচি কচি পাতায় আবৃত। সেই সকল পাতার ভিতর ছোট ছোট পাখী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মরা গাছ যেন একটি নবজাত শিশুর শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে গাছ অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে—কখনই মরিবে না। আজ যেদিকে চাই, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য, সেই দিকেই জীবন-শক্তির রমণীয় স্ফূর্ত্তি। আজ মানুষ গৃহের দ্বার খুলিয়া বৃক্ষ, লতা, আকাশ, সমুদ্রের শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছে। আজ শীতক্লিষ্ট কাঙ্গাল এবং কৃষক হাসিয়া কথা কহিতেছে। আজ রোগী রুগ্নশয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কীট, পতঙ্গ, পশু উন্মত্ত হইয়া খেলা করিতেছে। আজ কি অদূরে কি সুদূরে সর্ব্বত্রই সুকণ্ঠ পক্ষী গলা ছাড়িয়া গীত গাহিতেছে। আজ পৃথিবীর স্ফূর্ত্তি আকাশের স্ফূর্ত্তিতে মিশিয়াছে। আর এই আজিকার তপনতাপজনিত অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গনে, কাননে, অরণ্যে ফুট্ ফুট্ করিয়া রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া পড়িতেছে।

যে তাপ জড় জগতের প্রাণ, যে তাপে জড় জগৎ ফোটে, সেই তাপ ফুলেরও প্রাণ, সেই তাপে ফুলও ফোটে। যে তাপের প্রভাবে জড় জগতের এত বাহ্যবিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ, সেই তাপের প্রভাবে ফুলেরও এত বাহ্যবিকাশ, এত বাহ্য রঙ্গ। ফুল তুমি এত ক্ষুদ্র, তোমার ভিতর এত তাপ ?

শুধু কি তাই ? ফুল কি শুধু তাপোদ্ভূত, তাপগর্ভ জড় ? ফুল আদর্শ জড়।

দেখ, সকল জড়ের একরকম না আর একরকম রূপ আছে। কিন্তু ফুলের মতন রূপ কার আছে বল দেখি ? প্রশস্ত সরোবরে যখন বড় বড় পদ্ম ফুল

ফুটিয়া থাকে আর সেই পদ্মফুলে অসংখ্য ভ্রমর বসিয়া মধুপান করে তখন দেখিলে মনে হয় না কি যে সরোবরের স্বচ্ছ জলে কত আগ্রীবনিমজ্জিতা সুন্দরী কাল চুল এলাইয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে আপন আপন রূপের প্রশংসা করিতেছে? যখন চাঁপা গাছে চাঁপার কলিটি দেখা দেয় তখন মনে হয় না কি যে জগতের আদর্শ গঠনটি প্রকাশ পাইয়াছে,—ক্ষুদ্র, ঈষৎ দীর্ঘ, নিটোল, নিখুঁত? ঐ দেখ একটি লতা একটা সরলক্রম বেষ্টন করিয়া বৃক্ষটিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে। মন্দ মন্দ সমীরণে লতারাশি অল্প অল্প হেলিতেছে দুলিতেছে। লতার গায় এক একটি গুচ্ছে কতকগুলি করিয়া ঈষৎ দীর্ঘ লাল ফুল ঝুলিতেছে এবং বাতাসে অল্প অল্প নড়িতেছে। ঠিক বোধ হইতেছে যেন লতাম্বুবালে কত অনুপম রূপসী লুকাইয়া ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা করপল্লব গুলি বাহির করিয়া তোমাকে আমাকে খেলা করিতে ডাকিতেছে। ঐ দেখ ওখানে কতকগুলি কিংশুক বৃক্ষ ফুলে ছাইয়া পড়িয়াছে। ঠিক যেন—

> "অদীপ্ত বহ্নিসদৃশৈর্ম্মরুতাবধূতৈঃ সর্ব্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
> সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে হি রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ।"

ঐ স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে ঐ রমণীয় উদ্যানে বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলগাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সকলগুলিই সুন্দর, সুহাস্যময়, রূপের ছটায় চারিদিক আলো করিয়া রহিয়াছে। অল্প অল্প বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া এ ওর গায় ঢলিয়া পড়িতেছে। সকলের মধ্যস্থলে একটা উচ্চ গোলাবের ডালে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে—হেলিতেছেও না দুলিতেছেও না। যেন রূপসীর সভা হইয়াছে—সকল রূপসী হাবভাব প্রকাশ করিয়া রূপের চটক বাড়াইতেছে, কেবল মধ্যস্থলে একটা ক্লিওপেট্রা রূপগর্ব্বে গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার ঐ দেখ নদীর অপর পারে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! অনন্ত বিস্তৃত কানন। কাননে কোথাও অসংখ্য কর্ণিকার বৃক্ষে অসংখ্য কর্ণিকার ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অসংখ্য জবাবৃক্ষে অসংখ্য জবা ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য অশোক বৃক্ষে অসংখ্য অশোক ফুটিয়া রহিয়াছে; কোথাও অসংখ্য টগর বৃক্ষে অসংখ্য টগর ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষও অসংখ্য ফুলও অসংখ্য। বৃক্ষও বিবিধ ফুলও বিবিধ। বৃক্ষও নানাজাতীয় ফুলও নানা বর্ণের। যেন একখানা সুবিস্তৃত সবুজ বস্ত্রে ভারতের খ্যাতনামা শিল্পী নানা বর্ণের রেশমী সূতায় নানাবিধ ফুল তুলিয়া নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত ছড়াইয়া

রাখিয়াছে। অথবা যেন মিল্টন কর্ত্তৃক চিত্রিত সূর্য্যলোকস্থিত নানা রত্নখচিত সুদূর প্রসারিত মহাদেশ ;—

"If metal, part seems gold, part silver clear ;
If stone, carbuncle most or chrysolite,
Ruby or topaz, to the twelve that shone
On Aaron's breastplate, and a stone besides
Imagin'd rather oft than elsewhere seen."

ফুল, তোমার রূপের কথা আর কি বলিব! তোমার রূপেই পৃথিবী রূপবতী। তুমি রূপের উৎস, এবং সেই জন্যই মুগ্ধ Wilhelm অতুল রূপ দেখিতে দেখিতে ভাবিল ;—"As Minerva sprang in complete armour from the head of Jove, so does this goddess seem to have leapt forth with a light foot, in all her ornaments, from the bosom of some flower."

আবার, ফুল, তোমার রূপ যেমন রসও তেমনি। তুমি অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তোমার রসের পরিমাণ নাই। তোমার রসে পৃথিবী ডুবিয়া রহিয়াছে। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় না যে তোমার বেশী রস আছে। কিন্তু তোমার ভিতর প্রবেশ করিলে, রসের হ্রদে পড়িতে হয়। ঐ দেখ দেখি একটী মধুমক্ষিকা ঐ ক্ষুদ্র যুঁই ফুলটীর রস কতবার খাইয়া যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার খাইতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিয়া কতবার খাইতেছে। আবার এদিকে দেখ দেখি একটী ক্ষুদ্র গোলাব ফুলে কত মৌমাছি বসিয়া রসপান করিতেছে। ঐ দেখ মৌমাছিগুলা রস পান করিয়া উড়িয়া গেল ; কিন্তু আর একদল মৌমাছি আসিয়া রস পান করিতে বসিল। দেখ, দেখ, কত মৌমাছির দল রস পান করিতে আসিতেছে, রস পান করিয়া যাইতেছে। তবুও ত ঐ ক্ষুদ্র গোলাবের রসের ভাণ্ডার ফুরাইতেছে না। আর এ রস কি সামান্য রস? এই রসের নামই ত মধু। ফুলের মধু কত মিষ্ট তা কে না জানে? ফুলের মধু যে খায় সে কখন কি ভুলিতে পারে! আবার ফুলের রস যে শুধু মিষ্ট তা নয়। ফুলের রস মাদক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফুলের রসে সুরা প্রস্তুত হয়। সেই সুরা পান করিয়া মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, আপন পর জ্ঞানশূন্য হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, কর্দ্দমকে বিশুদ্ধ শয্যা মনে করে, পাপকে পুণ্য বলিয়া আলিঙ্গন করে, সংসারক্ষেত্রে উন্মত্ত পশুর ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। ফুল, তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি বিষম প্রতারক। তোমাকে দেখিলে বোধ হয় তুমি

নীরস। কিন্তু যে তোমার সহিত আলাপ করে সে তোমার রস পান করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং তোমার রস পান করিয়া মুগ্ধ এবং নেশায় বিহ্বল হইয়া মধুকলসমগ্ন মধুকরের ন্যায় ইহকাল এবং পরকাল হারাইয়া থাকে! তাই বলি, ফুল, তুমি রসের ভাণ্ডার এবং তোমার রসের মতন রস জগতে আর কিছুতেই নাই।

তোমার গন্ধই বা কি চমৎকার! তোমাকে আঘ্রাণ করিলেই শরীরে কি একটা অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। বুঝিতে পারা যায় না যে বিশেষ কিছু অনুভব করিলাম, অথচ সর্ব্বশরীরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। আর যখন সেই পবিবর্ত্তন অনুভূত হয়—যখন সেই চমৎকার সৌরভে শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তখন শরীর, মন, প্রাণ সমস্তই সেই পবিবর্ত্তিত ভাবে, সেই চমৎকাব সৌবভে মজিয়া যায়, ডুবিয়া যায়, গলিযা যায়। তখন এই জগতে শরীর, মন, প্রাণ আব কিছুই অনুভব করে না, আর কিছুই অনুভব করিতে সক্ষম হয না। ফুল, যখন তোমাব কোমল সৌবভ আঘ্রাণ করা যায়, তখন সমস্ত শারীবিক শক্তি যেন অল্পে অল্পে হ্রাস প্রাপ্ত হয—যে শারীরিক তেজ মহাবীরের অদ্ভুত বিক্রমের উৎসস্বরূপ, সেই তেজ অল্পে অল্পে নিবিতে থাকে—যে সচেতন ভাব জীবাত্মার প্রধান ধর্ম্ম এবং লক্ষণ সেই সচেতন ভাব অল্পে অল্পে বিলুপ্ত হইয়া আইসে। ফুল, তোমাব কোমল সৌরভের কি অসাধারণ শক্তি! বোধ হয় যদি মানুষ সর্ব্বক্ষণ তোমার সৌরভ আঘ্রাণ করে তাহা হইলে মানুষ চিরকালই এক রকম মরিয়া থাকে! ক্ষুদ্র ফুল, তোমার কোমল সৌরভে কৃতান্তের কঠিন শাসন দেখিতে পাই! আবার তোমার সৌরভের বৈচিত্র্যই বা কত। চাঁপার উগ্র গন্ধ এবং শিরীষের কোমলতম অপেক্ষা কোমলতর গন্ধ—এই দুই গন্ধের মধ্যে কত রকমের গন্ধ আছে কে ঠিক করিবে? এবং সেই সকল গন্ধের মধ্যে প্রত্যেকেই যে মনোমধ্যে এক একটা বিশেষ স্পৃহার উদ্রেক করে তাহাই বা কে না জানে? কে না জানে যে ফুলের যত রকম সৌরভ ফুল তত রকম লালসা উৎপন্ন করিয়া থাকে? ফুল, তোমার সৌরভের গুণে তুমি ঘোর মায়াবিনী—ঘোর কুহকিনী! ফুলের সৌরভ কি মিষ্ট, কি মাদক! যখন বিস্তীর্ণ পুষ্পকাননে মন্দ মন্দ বাতাস বহে এবং পুষ্পের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দিগ্‌দিগন্ত যথার্থই মধুময় হইয়া যায়, যথার্থই নেশায় ভোর হইয়া উঠে। নিদারুণ গ্রীষ্মের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া যাইতে থাকে তখন ফুলের গন্ধ শরীরে যেন মধু ঢালিয়া দেয়—গ্রীষ্মের জ্বালা যেন সেই মধুর রসে বিলীন হইয়া যায়। ফুলের সৌরভ একটী ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য

বিষয় হইয়াও অনেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। তাই বলি, ফুল, তোমার গন্ধ কি চমৎকার! তোমার গন্ধের গুণে তুমি ঐন্দ্রজালিক।

ফুল, তোমার স্পর্শ কি সুখপ্রদ! জগতে কোমল পদার্থ অনেক আছে। শ্যামল দূর্ব্বাদল অতি কোমল। শুভ্র কার্পাস অতি কোমল। পক্ষীর পক্ষান্তরালস্থিত রোমাবলী অতি কোমল। ভারত শিল্পের গৌরব 'সব্‌নাম' অতি কোমল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটীরই স্পর্শ ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখপ্রদ নয়। কেন? শিরীষ অতিশয় কোমল, মাধবী অতিশয় কোমল তা জানি। কিন্তু মাধবীর কোমলতা কি শিরীষের কোমলতা ইহাদের কোমলতা অপেক্ষা যে বেশী তাহা বলিতে পারি না। তবে কেন ফুলের স্পর্শ ইহাদের স্পর্শাপেক্ষা এত বেশী সুখপ্রদ? কেন তাহা জানি না, কিন্তু বেশী সুখপ্রদ তাহা জানি। ইহাও জানি যে অনেক ফুল অপেক্ষা কার্পাস প্রভৃতি পদার্থ অনেক গুণে কোমল কিন্তু তাহাদের স্পর্শ সেই সকল ফুলের স্পর্শের ন্যায় সুখকর নয়। আর এইটী জানি বলিয়া বলিতে পারি যে, ফুলে এমন কোন গুণ আছে যাঁহা অন্য কোমল পদার্থে নাই। সেটুকু কি? যিনি ফুল স্পর্শ করিয়াছেন তিনি কোমলতা ছাড়া আরো এক প্রকার ভাব অনুভব করিয়াছেন। কোমলতার ন্যায় সে ভাবটুকু শরীরে অনুভূত হয় না, সে ভাবটুকু কেবল প্রাণে অনুভূত হয়। তাই ফুলের স্পর্শে প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের অথবা রসের সঞ্চার হয় আর মনে হয় বুঝি ফুলের কোমলতার সহিত আরো কত কি মিশ্রিত আছে। মনে হয় বুঝি ফুলের একটা প্রাণ আছে, ফুলের একটা ভাব আছে, ফুলের একটা মোহিনী মন্ত্র আছে—ফুল আমাকে সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিল, সেই ভাবে ভাবময় করিল, সেই মন্ত্রে মন্ত্রবদ্ধ করিল। ফুল ছাড়া আর কোন পদার্থে সে প্রাণ নাই, সে ভাব নাই, সে মন্ত্র নাই। তাই ফুলের স্পর্শ সকল স্পর্শাপেক্ষা এত সুখকর, এত মোহকর, এত কোমল, এত কল্পনাবৎ। আর সেই জন্যই কল্পনাময় মহাকবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত কল্পিত সুন্দরীর নিমিত্ত ফুলের শয্যার রচনা করিয়াছেন *।

ফুল, তুমি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, সকল রকমেই শ্রেষ্ঠ। রূপ দেখিতে হইলে মানুষ তোমারই রূপ দেখে; রস পান করিতে হইলে তোমারই রস পান করে; গন্ধে মজিতে হইলে তোমারই গন্ধে মজে; স্পর্শসুখে গলিতে হইলে তোমাকেই স্পর্শ করে। তাই বলি তুমি আদর্শ জড়। এবং তুমি আদর্শ জড় বলিয়াই জগতের জড়প্রকৃতির মূল মন্ত্র, মূল শক্তি, প্রাণের প্রাণ। হিমাচলের

* সেক্ষপীয়রের Midsummer Night's Dream দেখ।

মহারণ্যে মহাদেব যোগমগ্ন। সহসা সেই মহারণ্যে বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিল। অশোক ফুটিল, কর্ণিকার ফুটিল, পলাশ ফুটিল, আরো কত ফুল ফুটিল। যেমন ফুল ফুটিল অমনি—

> মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
> শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
> দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
> অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥
> গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎসমুচ্ছ্বাসিত পত্রলেখম্।
> পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥

ফুল, তুমি আদর্শ জড় বলিয়া, জড় প্রকৃতি তোমাকে লইয়া উন্মত্ত। বৃক্ষ বল, লতা বল, পর্ব্বত বল, সরোবর বল, নদ বল, নদী বল, সকলেই তোমার রূপের পক্ষপাতী, সকলেই তোমার রূপের তৃষ্ণায় কাতর, সকলেই তোমার রূপের দোহাই দিয়া রূপের হাটে পরিচিত, সকলেই তোমার স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধাবান্। যেখানে তুমি নাই সেখানে জড় জগৎ নাই বলিলেই হয়, কেন না সেখানে রূপের ছটা নাই, রসের স্রোত নাই। সৌরভরূপ সুরা নাই, স্পর্শসুখ নাই। যেখানে তুমি নাই সেখানে হাসি নাই, উল্লাস নাই, সঙ্গীত নাই, তৃষ্ণা নাই, পরিতৃপ্তি নাই,—কেন না সেখানে কেহই ফোটে না, কেহই নাচে না, পাখী গীত গায় না, মৌমাছি মধুপান করে না। তাই বলি, ফুল, তুমি জড়প্রকৃতির প্রাণ। একথাটা কিছু তোমার পক্ষে নিন্দার কথা নয়। এ জগতে যে কাহারও প্রাণস্বরূপ হয়, জগৎ তাহাকে চায়, জগতে তাহার কায আছে। সে যে রকমেরই প্রাণ হউক, উচ্চ প্রকৃতির অথবা নীচ প্রকৃতির, জগতের প্রাণ তাহার প্রাণের সহিত জড়িত—তাকে ছাড়িলে জগৎ বাঁচে না। তাই বলি, ফুল, তুমি যদিও জড় প্রকৃতির প্রাণ, তথাপি তুমি নিন্দনীয় নও—তথাপি তুমি অনেক সুখের কারণ, অনেক ভোগের প্রধান উপাদান, অনেক সম্পদের মূল। পৃথিবীতে যতক্ষণ জড়ত্ব আছে, যতক্ষণ জড় প্রকৃতিতে ভোগলালসা আছে, ততক্ষণ পৃথিবী তোমাকে চায়। কিন্তু তোমার কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। তুমি বড় হাল্কা, কেন না তুমি বড় মোহপরবশ। তুমি আদর্শ জড়, কিন্তু তুমি তোমার পদমর্য্যাদা বুঝ না। তোমার আত্মা নাই, হৃদয় নাই, সুরুচি নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই। পৃথিবী তোমায় চায় বলিয়া তুমি পৃথিবীর সহিত এত মেশ কেন, পৃথিবীকে এত মাতাও কেন? ঐ দেখ দেখি তুমি ওখানে ফুটিয়া রহিয়াছ আর কত ভ্রমর, কত মৌমাছি তোমার মধু পান

করিতেছে, মধুপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার তোমার মধুপান করিতেছে, আবার আরও উন্মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ দেখ একটি ক্ষুদ্র পক্ষী ঘৃণা করিয়া তোমাকে তাহার ক্ষুদ্র পদ দ্বারা আঘাত করিয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু তুমি একটিবার মাত্র নড়িয়া আবার স্থির হইয়া বসিলে এবং তোমার নির্লজ্জ ভোমরা এবং মৌমাছিগুলি আবার ঝঙ্কার করিয়া তোমার মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। মধু আছে বলিয়া তাহা কি এই রকম করিয়াই যাহাকে তাহাকে বিলাইতে হয়? ফুল, তোমার মধু আছে বলিয়া তুমি নিজে নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত এবং যে তোমার কাছে আসে তাহাকেই নির্লজ্জ এবং উন্মত্ত করিয়া ফেল। তুমি বড় হাল্‌কা, তুমি বড় অপদার্থ। তুমি নদীর স্রোত, তোমাতে সমুদ্রের মহত্ত্ব, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য নাই। তুমি মর, না কেন?

ফুল, পৃথিবী তোমাকে চায়. তুমি পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু তুমি আপনার রসে এমনি ডুবিয়া থাক যে তোমার নিজের মর্য্যাদা কিছুই মনে থাকে না; তুমি যে জড় এবং ক্ষণস্থায়ী তাহাও মনে থাকে না। তাই তোমার এত দুর্দ্দশা, এত অপমান, এত অধঃপতন। মনে কর দেখি কাল তুমি কি ছিলে? কাল তুমি মনোহর গুচ্ছাকারে মনোহর হর্ম্ম্যে মনোহর পুষ্পাধারে সযত্নে, সাদরে রক্ষিত। কাল তোমাকে যে দেখিয়াছে সেই তোমার গুণগান করিয়াছে, তোমাকে কত আদর করিয়াছে, কত স্নেহের, কত প্রীতির, কত গৌরবের বস্তু বলিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছে। অথবা, কাল তুমি সিংহাসনাধিরূঢ়া মহারাণী। তোমাকে একটিবার মাত্র দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক মাথা ফাটাফাটি করিয়াছে। কাল তোমার স্তাবকের সংখ্যা ছিল না। তোমার একটি কটাক্ষের কামনায় কত লোকে রক্তপাত করিয়াছে। কাল তোমার মজ্‌লিস্‌ই বা কি আর দিল্লীর বাদশাহের মজ্‌লিসই বা কি। কিন্তু আজ তুমি কোথায়? আজ তোমার সেই রাজপ্রাসাদ কোথায়? তোমার যেই স্ফটিক সিংহাসন কোথায়? তোমার সেই স্তাবকবৃন্দ কোথায়? তোমার সে আদর কোথায়, সে গৌরব কোথায়? আজ তুমি ধূলিধূসরিত অঙ্গে ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছ, কাল যাহারা তোমার গুণগান করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, কাল যাহারা তোমার কটাক্ষ লাভার্থ রক্তপাত করিয়াছিল, আজ তাহারা তোমাকে চরণে দলিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আজ তুমি পৃথিবীর ধূলি অপেক্ষা

নিকৃষ্ট। কেন, ফুল, তুমি তোমার আপনার রসে এত ভিজিয়া এত লোককে ভিজাইতে চাও? জান না কি যে, যে বেশী রস বিতরণ করে সে নিজে শেষে শুকাইয়া মরে? তাই বলি, ফুল, সাবধান হইও। রসে অত ডুবিয়া থাকিও না; তাহা হইলে আপনাকে আপনি ভুলিয়া, অপমানিত ভিক্ষুকেরও অধম হইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে। তোমার রসই তোমার সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমার রসের গুণেই তুমি এত মুগ্ধ, এত অন্ধ। তাই বলি, ফুল, তোমার রসকে তুমি আপনি ঘৃণা করিতে শিখিও।

আর, ভাই সকল, তোমাদিগকেও বলি, তোমরা ফুল লইয়া ক্রীড়া করিও না। ফুল আদর্শ জড়, ফুল জড়প্রকৃতির প্রাণ, ফুলের মধু বড় মোহকর, ফুলেব মধুতে বিষ আছে। তপনতাপজনিত ফুলে যে অগ্নি আছে তাহাতে ফুল আপনি পুড়িয়া মরে এবং সকলকেই পোড়াইয়া মাবে। যদি উন্নত হইতে চাও তাহা হইলে ফুলকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে রাখিও যে ফুল জড়, ফুলে জড়ত্ব আছে, ফুল জড়ত্ব পোষণ কবিতে ভালবাসে। অতএব ফুলের কাছে সাবধানে থাকিও। এবং ফুল যাহাতে জগতের জড়ত্ব বৃদ্ধি করিতে না পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিও।
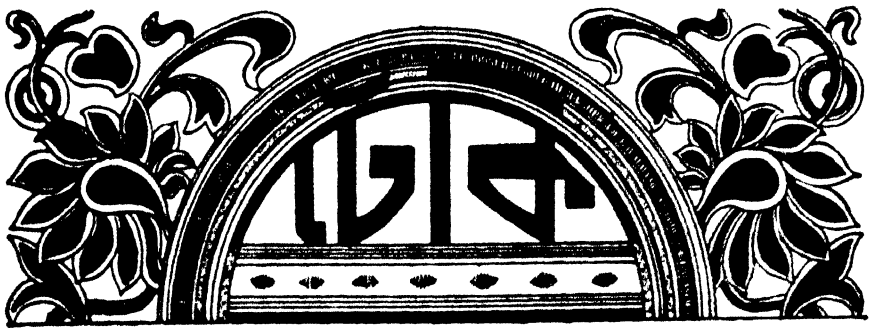
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গলকর্ণতুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মবাইযে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমাব পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গল লইয়া পলাইতাম। আর্য্য-সভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান, চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে কবি—আর্য্য সাহিত্য, আর্য্য দর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমাবসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল কবিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকাবী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে! দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? না বস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপ-

কারে মতি ? এতটা Public spirit ? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই তাঁহার ত কিছুমাত্র Public spirit নাই—শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে ? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার বিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনা-কুল-কলঙ্কিনী,—একদিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা ! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গো-জাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব ? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান। পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোঘ্নী রাক্ষসী ! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওঁচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি। "আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার এই হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল ? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে বসুন্ধরা যদি গো-শূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-নবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে ! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভূসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোঘ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না ? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল ? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ ? ঢেঁকি কখন দেখ নাই ?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিনী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সেদিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্য কারণ সম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐত ঢেঁকির বল!—ঐত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণী-পাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল্ করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচকচ্! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালীকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই।

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া; আনন্দের মধ্যে 'ধান্য'; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেঁচর ঘেঁচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম

নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমীদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিশিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহিব কবিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিশিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র, কারাবাস—ধনীব ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিশিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশার গড়ে বাজার খবচ পিশিয়া বাহির করিতেছেন, —অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁক; সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিশিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক।

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি, নেশাব গড়ে মনোদুঃখ ধানা পিশিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্যলোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে তাহা ত মর্ত্ত্য-লোকেও তুমি পাইয়া থাক—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নর-লোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে একসের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিটলে" "পেটার্থি!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর!"

সামুয়েল হানিমানের জীবনী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার চারিপাতা ভূমিকা লিখিয়াছেন, আবার একজন প্রকাশক তাহার উপর আর চারিপাতা লিখিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বুঝাইয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থ লিখিবার হেতু বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকিবার কথা নহে। প্রকাশক এক স্থলে লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ সঙ্কলনে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের ভরসা হইতেছে, জনসাধারণ এইরূপ মহোচ্চ গুণ-সম্পন্ন গ্রন্থের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন।" এই অনুরোধ গ্রন্থকার নিজে করিতে বোধ হয় একটু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন, তাহাই প্রকাশকের সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা প্রকাশকলিখিত ভূমিকা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন জন্য লিখিত হইয়াছে এমত স্পষ্ট বোধ হইল না।

প্রকাশক আরও একটী কথা আমাদের বলিয়া দিয়াছেন যে এই গ্রন্থ "যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইতে পারে" গ্রন্থকার তাহার উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন। এ কথাটি বলিয়া না দিলে আমরা কোন মতে তাহা অনুভব করিতে পারিতাম না।

তাহার পর ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন "যাহাতে বৈজ্ঞানিক মত সকল সাহিত্যে প্রাঞ্জল ভাষায় পরিব্যক্ত হয়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।" কিন্তু তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের এই ভাষায় কতকটা প্রকাশ আছে। তথাপি প্রকাশক আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—"সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ইহার পঠনাধিকারী হইতে পারেন, তদ্রূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছে।" সুতরাং প্রকাশকের এই সার্টিফিকেটে সাহস করিয়া আমরা পাঠ আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় পাতে দেখিলাম গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"ব্যাধিপ্রশমনের উপায় মন্ত্র, তাঁহাদের (বিদ্যাভিমানী দল) হস্ত-তল-ন্যস্ত থাকিয়া এত ভ্রমসংকুল অসঙ্গতিকে দার্শনিক মতের দোহাই দিয়া কি ধারাবাহিক কাল নির্ব্বিবাদে বিরাজিত রাখিতে পারে? না, অনন্ত শক্তির প্রভুত্ব আকর্ষণে অধিকারী হয়?" প্রকাশকের সার্টিফিকেট মিথ্যা নহে। আশ্চর্য্য প্রাঞ্জল ভাষা!

এই দ্বিতীয় পাতে আর এক স্থানে লিখিত আছে "তাহা জানিতে অবশিষ্ট নাই।" ইহা পড়িয়া আমাদের একজন সেকালের অধ্যাপককে মনে হইল। তিনিও অবিকল এই ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন ছাত্র এক স্থলে লিখিয়াছিল "জানিতে বাকি ছিল না।" অধ্যাপক তাহা কাটিয়া করিলেন "তাহা জানিতে অবশিষ্ট ছিল না।" অধ্যাপক বলিতেন ছোট কথায় কখন বিদ্যা প্রকাশ হয় না। একদিন ছাত্রদিগকে আজ্ঞা করিলেন "ওহে! তোমরা একটি প্রবন্ধ লেখ। Subject কে বৃহৎ মনুষ্য?" ছাত্রেরা হাসিয়া উঠিল। তিনি মুখ ভার করিয়া বলিলেন "ইতর ভাষায় না বলিলে তোমরা বুঝিতে পার না। ভাল! তাহাই বলিতেছি—লেখ 'কে বড়লোক।' একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "কে বৃহৎ মানুষ্য তবে আর লিখিব না?" অধ্যাপক ক্রোধ করিয়া বলিলেন— যাহাকে তোমাদের ভাষায় বড়লোক বলে, সাধু ভাষায় তাহাকে বৃহৎ মনুষ্য বলে। বড় শব্দ ইতর কথা, তৎপরিবর্ত্তে বৃহৎ শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ। ছাত্র বলিল "অপরাধ হইয়াছে।" অধ্যাপক তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন কখন সরল ভাষা ব্যবহার করিও না; তাহা করিলে লোকে তোমায় মূর্খ মনে করিবে, বৃহৎ বৃহৎ বাক্য ব্যবহার করিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে, আর ভাবিবে না জানি এ ব্যক্তি কতই সংস্কৃত কথা জানে। জান না? আমি গ্রন্থ লিখিয়া কতই মান্য হইয়াছি, কেহ সে গ্রন্থ বুঝিতে পারে নাই। সে গ্রন্থ পণ্ডিতী ভাষায় লেখা, অভিধান হাতে করে লেখা! মূর্খের কর্ম্ম তাহা বুঝা?

আমরা বলি না যে এই জীবনীলেখক অভিধান হাতে করিয়া লিখিয়াছেন, সে শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালায় যদিও বিস্তর আছেন, কিন্তু এই গ্রন্থকার সে দলস্থ নন, তবে ইঁহার ভাষা ও ভাব উভয়ই স্থানে স্থানে কিছু জটিল।

এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিবার বড় সাধ ছিল। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কর্ত্তা হানিম্যানকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সকল বাঙ্গালিই অবগত হন ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাষায় জীবনী লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে অধিক লোকে এ গ্রন্থ পড়িবে না। প্রকাশক যে ভরসা করিয়াছেন তাহা বুঝি বৃথা হইবে। "বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য" হওয়া দূরের কথা।

এই পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন ইহা স্বীকার করি। এরূপ পরিশ্রম বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে সুখ্যাতির কথা।

প্রায়শ্চিত্ত। অবকাশ হইতে পুনর্মুদ্রিত। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৵৹

এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে গল্পটি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। নির্ম্মলের অধঃপতন দুই এক স্থলে স্পষ্ট বুঝা যায় না সত্য, কিন্তু তাহা বুঝাইতে গেলে আয়তন বাড়াইতে হয়। সুতরাং ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে, তথাপি গল্পটির আমরা পক্ষপাতী। ইহা সর্ব্বপ্রকারে সাধারণের উপযোগী হইয়াছে, মূল্য আরও অল্প হইলে ভাল হইত। কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যাহারা এইরূপ মূল্য দিয়া পড়িতে সক্ষম তাহাদের মধ্যে শতাংশের একাংশ লোকও এই গ্রন্থ চক্ষে দেখিতে পাইবে না। কে তাহাদের দেখাইবে? পল্লীগ্রামবাসীরা বটতলার হাতভোলা; যে গ্রন্থ বটতলার দল দেখাইবে কেবল সেই গ্রন্থ গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে পাইবে, অন্য গ্রন্থ তাহাদের পক্ষে নষ্টচন্দ্র। যদি তাহারা সকলে এ গ্রন্থখানি দেখিতে পাইত তাহা হইলে ন্যূনকল্পে ইহার দশ হাজার কাপি প্রথমেই বিক্রয় হইত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি natural selection, struggle for existence, utility এবং individuality বিষয়ক মতের প্রতিবাদ করিলাম। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলাম কি না এরূপ প্রশ্ন মনে করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু আমার কথার সার সংগ্রহ এই মাত্র যে ঐ সকল বিধান মতে শ্রম করা মনুষ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য বটে তবে জীবমাত্রেই স্বার্থপরতাবশতঃ পরস্পরের সহিত যে বিরোধ (struggle) করিয়া থাকে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাহার নিবারণ চেষ্টা করাও আবশ্যক। এবং এই চেষ্টাতে কৃতকার্য্য হইলেই শ্রমের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হয়, এবং তাহা হইয়া শ্রমসংসৃষ্ট কার্য্য মাত্রেই বৈরাগ্য আশ্রয় করে। Utility পরার্থপরতার সহিত মিশ্রিত হইলেই অথবা উহার স্বার্থপরতা ভাগ নিবৃত্ত হইলেই তদ্দ্বারা হিন্দু খ্রীষ্টানাদি বিসম্বাদী সম্প্রদায়ের উপদেশও প্রতিপালন করা সাধ্যায়ত্ত হয় এবং তাহা হইলেই আবার স্বানুবর্ত্তিতার এক সুচারু নিয়ামক স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং শ্রমের মধ্যে যে স্বার্থপরতা নিহিত আছে—যাহার জন্য হিন্দু খ্রীষ্টান উভয়েই এতকাল ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন—তাহা চিত্ত হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য এবং দূরীকৃত করিতে পারিলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সমস্তই সুসিদ্ধ হয়।

অতএব পরার্থপরতা এবং স্বার্থপরতা মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের মন একটী স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, এবং কামক্রোধাদি ষড় রিপু যে অন্তরেন্দ্রিয়তে আশ্রয় করে তাহাতেই আবার দয়া দাক্ষিণ্যও অধিষ্ঠান করে এরূপ কথা বলিলে বোধ হয় কোন হিন্দুর সহিত মতভেদের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু খ্রীষ্টানেরা বলেন সয়তান মানবপ্রকৃতি অধিকার করাতে আমাদিগের সমস্ত সদগুণ বিলুপ্ত হইয়াছে তবে মনুষ্যের যে যৎকিঞ্চিৎ সদাচার দেখা যায় সে কেবল ঈশ্বর প্রসাদাৎ (grace)। অতএব ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত আমাদিগের না মুক্তি হইতে পারে, না মুক্তির উপায় স্বরূপ কোন সৎপ্রবৃত্তি (merit)

আমাদিগের আত্মাতে আশ্রয় করিতে পারে। বিশেষতঃ এমন লোক নাই যে সৎকর্ম্ম হইতে কখনই স্খলিতচিত্ত হয় না। পুণ্য কর্ম্ম সকল সময়েই আবশ্যক। এক সময়ের কৃত পাপ সময়ান্তরের পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা বিমুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যও জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব যীশুখ্রীষ্টের অনুসরণ পূর্ব্বক এই কথা মনে করা উচিত যে, যেমন তাঁহার নশ্বর দেহ পতন হইবার পরে তাঁহার অবিনশ্বর দেহ লাভ হইয়াছিল সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মে অবগাহন করিলে জগতের স্বার্থপরতাময় কলুষিত আত্মা হইতে বিমুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব বৈরাগ্য লক্ষণবিশিষ্ট পুনর্জ্জন্ম লাভ করা যায়। এই দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিতে পারিলে, যাহাতে খ্রীষ্টের ইচ্ছা পালন হয় তাহাই আমাদিগের শ্রেয়স্কর হইয়া উঠে। যাহাতে নিজের স্বার্থ চেষ্টা করি অথবা যখন নিজের চেষ্টার উপরে নির্ভর করিয়া মুক্তিলাভের আশা করি সে সমস্তই কেবল উল্লিখিত পূর্ব্বজন্মাশ্রিত সয়তানের কার্য্য। অতঃপর আত্মবিষয়ে একান্ত বিরাগী হইয়া যীশুর অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদিগের মুক্তি-লাভের আর কোন সংশয় থাকিবে না।

এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইলে দয়া আর মনুষ্যের স্বধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং পরচ্ছন্দানুবৃত্তির চালনা করিব অথবা পরার্থপরতারূপ বৈরাগ্য আমাদিগের শ্রম মধ্যে আশ্রয় করিবে এতাদৃশ কথা একবারেই অপ্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে। খ্রীষ্টানের সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত নহে সুতরাং পরার্থপরতা কিসে স্বভাবসিদ্ধ হইল তাহা সপ্রমাণিত করিবার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুগণ পরার্থপরতাকে মনুষ্য প্রকৃতির বহির্ভূত বলেন না সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে vicarious punishment বিষয়ক মত অবলম্বন করা অসাধ্য। তাঁহাদিগের নিমিত্ত স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বৈষম্য দূর করিবার উপায় কি ইহা দেখানই আবশ্যক হইতেছে।

স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার বৈষম্য দুই প্রকারে খর্ব্ব হইয়া থাকে। এক চেষ্টার দ্বারা আর স্বভাবতঃ। আমি স্বার্থপর হইলে তোমার স্বচ্ছন্দের প্রতি উপেক্ষা করা কোন মতেই বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা হইলে তুমিও আবার স্বভাবতঃ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে শাসিত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই প্রণালীতে আমাদিগের পরস্পরের যে বিরোধ হইয়া থাকে, তাহাতে স্বার্থপরতা স্বভাবতই কতকদূর খর্ব্ব হইয়া আইসে। Struggle for existence এবং individualityর বিধানমতে এই বিরোধ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভূপতিগণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে স্ব স্ব রাজ্যের সীমা অবধারণ

করেন। স্বাসুবর্ত্তী ব্যক্তি সম্বন্ধে মিল ঠিক ঐরূপ একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রমিগণ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াও মারামারি হইতে ক্ষান্ত থাকে। ইহার জন্য চেষ্টা আবশ্যক করে না। পরদ্রব্য অপহরণ করিব না, কেবল শ্রমলব্ধ দ্রব্যজাত হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিব, এইরূপ সংকল্প হইতে স্বভাবতঃ পরদ্বেষ অনেকদূর সাম্য লাভ করে বটে, কিন্তু ইহাতে পরার্থপরতা আশ্রয় না করিলে কখনই মনের অভিসন্ধি পবিত্র হয় না।

পরার্থপরতাও নৈসর্গিক ব্যাপার বটে। লোকে শ্রম বা অপহরণ দ্বারা যে প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাতে যদি কেবল নিজের স্বচ্ছন্দলাভই অভীষ্ট হইত তবে মনুষ্য পশুবৎ পৃথক অবস্থায় বিচরণ করিত। তস্কর বল কি দস্যুই বল, ইহারাও স্বভাবতঃ স্নেহ এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে এবং এইরূপে আপ্লুত হইয়া আহরিত দ্রব্যজাতের অধিকাংশ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ইত্যাদির পোষণে নিয়োজিত করে। ইহাতে তাহাদিগের মনে যে ভাব আশ্রয় করে তাহা বাস্তবিক বৈরাগ্য। কিন্তু একথা পরে বিচার করিতে হইবে। এখানে ইহাকে পরচ্ছন্দানুবৃত্তি বা পরার্থপরতা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। অতএব স্বার্থপরতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ এই পরার্থপরতাও সেইরূপ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক প্রধান বিভেদ এই যে একটী বিরোধজনক আর একটী একতাজনক। প্রবৃত্তি সমূহের বৈষম্য দূর হইলে মনের একাগ্রতা জন্মে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একতা লাভের নাম হৃদ্যতা। জগতে বিরোধ হৃদ্যতা উভয়ই বিদ্যমান। বিরোধ হেতু জীবন এবং পরস্পরের তেজ ক্ষয় হয় আর হৃদ্যতা হইতে পরস্পরের সহযোগিতা এবং সহযোগিগণের একত্রিত বল সংগৃহীত হয়।

মনুষ্য যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউক না কালসহকারে অনেকের চরিত্র ক্রমশঃ এমন পাকিয়া উঠে যে অনুসন্ধান করিলে প্রায় সকল কার্য্যই যেন এক সূত্রে গাঁথা বলিয়া প্রকাশ হয়। ইহারই নাম character ; যাহার যে character তাহা তাহার প্রতি কার্য্যেই ব্যক্ত হয়। এবং একজনের character চিনিলে তাহার ভাবী আচরণ কতকদূর গণনা করা যাইতে পারে।

নেপোলিয়ান বিসমার্ক আদির ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কোন মনুষ্যের একটী মাত্র আচরণ দেখিলেই এক রকম স্থির করিতে পারেন যে উহাকে সময়ান্তে অমুক কথা বলিলে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় অমুক প্রকার আচরণ করিবে। কেবল নেপোলিয়ান বিসমার্ক নহে, সকল সিয়ানা ব্যক্তি অল্লাধিক মাত্রায় এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিষয়ী ব্যক্তির যদি আদালতের মত পদে পদে প্রমাণ লইয়া এবং সাক্ষীর মুখভঙ্গির বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইত তবে

সংসার চালান কঠিন হইত। এই নিমিত্তই পরস্পরের character জানা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই প্রকার বুদ্ধিচাতুর্য্য সকলের সমান পরিমাণে নহে। সুতরাং সংসারে এই চতুরতা দ্বারা কেহ লাভ করে কেহ বা ইহার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনি লাভ অথবা ক্ষতি নিবারণ করিব বলিয়া সংসারে ভয় প্রদর্শন কৌশল প্রবঞ্চনা আদির আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের সহকারিতা থাকে না। Struggle for existence প্রকারান্তরে উপস্থিত হইয়া নানা বিপত্তি ঘটায়। নীতি শিক্ষকেরা বলেন যে এটা ভাল নয়। মনুষ্য পরস্পরের সহকারিতা করিলেই ভাল হয়।

ফলতঃ এই প্রণালীকে বিচার করিতে করিতে পরিশেষে এই মূলতত্ত্বের বিচার করা আবশ্যক হয় যে মনুষ্যগণ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে কি না। সমাজের অপেক্ষা না করিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করা কাহারো সাধ্য কি না তাহা বিভিন্ন কথা। আমি বলি অসাধ্য। কিন্তু অসাধ্য না হইলেও এ কথার সন্দেহ নাই যে, সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ ক্ষয় করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য। তুমি কিরূপ ব্যক্তি তাহা আমি বুঝিতে না পারিলে তোমার নিকট কাপট্য ত্যাগ করি না। আমি কিরূপ ব্যক্তি তাহাও ঐরূপে তোমার জানা আবশ্যক। কিন্তু উভয়ের কাপট্য না গেলে কেহ কাহারো উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। পরস্পরের প্রতি নির্ভর না করিতে পারিলে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায় না। বিরোধ ও struggle for existence তো আছেই। পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতীত তাহাই প্রবল হইয়া উঠে এবং পরিশেষে সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব যাহাতে বিরোধের হ্রাস হয় এবং ঐক্যের বর্দ্ধন হয় তাহাই সামাজিকতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এবং মর্ম্ম। সেই মর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই চিত্তের সুচারু ব্যবস্থা উৎপন্ন হয়।

> ক্ষণে তুষ্টিঃ ক্ষণে রুষ্টিঃ তুষ্টি রুষ্টি ক্ষণে ক্ষণে।
> অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।

এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্ত পরিত্যাগ এবং চিত্তব্যবস্থা লাভ করাই সমস্ত নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল যেরূপ হউক, ইহকালের পক্ষে অর্থাৎ নরসমাজের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা উভয়ই স্বভাবতঃ মানব প্রকৃতির অঙ্গ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুতর বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের আচরণে ব্যক্ত হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই আংশিক নিবৃত্তি

স্বভাবসিদ্ধ বটে কিন্তু তাহা সমাজরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। জগতে খলের প্রাদুর্ভাব এবং সরলের দুর্গতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। অতএব স্ব স্ব চেষ্টার দ্বারা স্ব স্ব মনোমধ্যে এই বৈষম্যের কোন প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ চেষ্টাসহকারে উল্লিখিত বৃত্তিদ্বয়ের যে ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় তাহাকেই বলি চিত্ত-ব্যবস্থা।

এই চিত্তব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা মধ্যে কোনটার সমধিক চালনা করা আবশ্যক? এই প্রশ্নের সদুত্তর এই যে দুর্দমনীয় স্বার্থপরতাকে যত দমন করিতে চেষ্টা করিবে ততই পরার্থপরতার পথ খুলিবে। স্বার্থপরতা কখনই একবারে বিনষ্ট হইবার নহে; বিনষ্ট হইলে জীবন রক্ষা হয় না। জীবন থাকিলে তদুপযোগী স্বার্থপরতা লোপের আশঙ্কা নাই। বরং পরার্থপরতার উদ্দেশে জীবন রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। অতএব স্বার্থপরতা দমন করিবার চেষ্টা হইতে অহিত আশঙ্কা করা ভ্রান্তিমাত্র। পরার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে প্রত্যেকেই অন্যের দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এবং পরচ্ছন্দ সাধনান্তে স্বচ্ছন্দ লাভেরও সময় পাওয়া যায়। অতএব ঐকান্তিকচিত্তে পরার্থ-পরতা পালন করিতে চেষ্টা করিলেই উহার সহিত স্বার্থপরতার বৈষম্য এবং ব্যক্তিপরম্পরার স্বার্থপরতাজনিত লোকালয়ের বিসম্বাদ অপনীত হইতে পারিবে।

উল্লিখিত মতে ঐকান্তিকচিত্তে পরার্থপরতাব্রত স্বীকার করাই নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে পরস্পরের সহযোগিতা এবং প্রত্যেকের একাগ্রতা দুইই সুসিদ্ধ হইতে পারে। স্বভাবতঃ মনুষ্যের বিরোধ হইতে স্বার্থপরতার কিঞ্চিৎ দমন হয় আর চেষ্টাপূর্ব্বক পরার্থপরতার চালনা এবং স্বার্থপরতার শাসন করিলে নির্ম্মল ধর্ম্ম বা নীতিশিক্ষা হয়।

পরার্থপরতা হইতে কদাচ বলপ্রয়োগে অভিরুচি হয় না। যদি অগত্যা প্রয়োজন হয় তাহা হইলেও উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যাহার মঙ্গলের জন্য বল প্রয়োগ করা আবশ্যক মনে কর সে তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই শ্রদ্ধা সহকারে তোমার সহযোগিতা করিবে। আর দীর্ঘকাল পরেও যদি সে তাহা না করে তবে তোমার নিজের কার্য্যে কোন দোষ আছে কি না তাহা দেখাই আবশ্যক হইবে। এমন হইতে পারে যে তুমি যাহাতে তাহার হিত হইবে মনে করিতেছ তাহাই ভ্রান্ত। তুমি নিজে ভ্রান্ত অথবা দুষ্টও হইতে পার। আমার হিত আমি বুঝিব। একেবারে না পারি, কালসহকারে পারিব। কিন্তু আমি যদি কিছুতেই না মানি যে তোমার অমুক কার্য্য আমার হিতজনক তবে আমার

বুদ্ধিই যে ভ্রান্ত তাহার প্রমাণ কি? অতএব বল প্রয়োগ করিয়া অসভ্য জাতির শাসন করা বিধিসঙ্গত নহে। যদি কালসহকারে তাহারা বলবানের বশীভূত হয় তাহা হইলে আর বল প্রয়োগের আবশ্যকতা থাকে না। আর যদি চিরকালই বল প্রয়োগ করিতে হয় তবে সেই উৎপীড়িত অসভ্যগণের সুখবর্দ্ধন হইতেছে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ন্যায়সঙ্গত।

শ্রম কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকে। যে কেবল আত্মসুখের লালসাতে শ্রম করে সে ভাবিতে পারে যে শ্রমজনিত দুঃখটুকু না স্বীকার করিতে হইলে আরো ভাল হইত। কিন্তু যে পরের সুখাভিলাষী, পরদুঃখে কাতর সে আর পরোপকার করিবার জন্য মন্ত্রবল লাভ করিবার প্রতীক্ষা করে না। শ্রম ভিন্ন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার নহে জানিয়া সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই পরিশ্রমে রত হয়। কিন্তু ইহাতেও তাহার পরার্থপরতার পূর্ণ উদ্রেক না হইতে পারে। পরিবার প্রতিপালন করা যন্ত্রণাবিশেষ এবং শ্রম সেই যন্ত্রণার অঙ্গ এই প্রকার ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে পরিবারগণের উপকার হয় না এমন নহে। ইহাতে হিতসাধন, utility পালন, সম্পূর্ণরূপেই সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যগুলির অভিসন্ধিতে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক থাকিয়া যায়, এবং চিত্ত-ব্যবস্থার বিষয়েও ব্যতিক্রম থাকে। সেই ব্যক্তির মনের কিম্বা সংসারের অবস্থার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইলেই তাহার সংকল্প পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এতাদৃশ লোকের প্রতিও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। সমাজের বাঁধন রক্ষা করিতে হইলে শ্রম-উদ্দিষ্ট একাগ্রতা বিধেয় নহে।

পরন্তু যদি শ্রমী মনে করে যে পরিবার প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্ম কার্য্য; তাহাদিগের সুখের নিমিত্তই শ্রম করিব, মরি আর বাঁচি যতক্ষণ পারি ততক্ষণ করিব, সাধ্যমতে ক্রটী করিব না। তাহা হইলে শ্রমীর কার্য্যে আর স্বার্থপরতা থাকে না। সকল শ্রমী পরস্পরের সহযোগী হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এবং অক্ষম ব্যক্তিরাও শ্রমীর আশ্রয় লাভ করিতে পারে। শ্রমীর এইরূপ মনের ভাব বৈরাগ্যলক্ষণাক্রান্ত, বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইরূপ পরার্থপরতার সীমা শ্রমীর স্বজন। কিন্তু শ্রমের ফল যে কেবল শ্রমীর স্বজনমধ্যেই নিহিত থাকে তাহা নহে। শ্রমলব্ধ বেতনই তাঁহার স্বজনগণের অবলম্বন। কিন্তু যাহার বিনিময়ে সেই বেতন উপার্জ্জিত হয়, সেই শ্রমজাত বস্তুতে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার দর্শে। অতএব পরার্থপর শ্রমের উপকার জগৎ-বিস্তীর্ণ।

যাঁহারা free trade ভক্ত এবং ঐ নিমিত্ত চীনের স্বাতন্ত্র্যব্যবস্থা সহ্য করিতে পারেন না, আপনাদের শ্রমজাত পণ্য সর্ব্বদেশে বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতে অভিলাষ করেন তাঁহারা হয়ত বুঝিবেন না যে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণ ভারতের উপকারার্থে কৃতসংকল্প হইলেই ভাল হয়। কিন্তু এস্থলে free trade যদি পরার্থপরতার অনুরোধে অবলম্বিত হইত তবে তুলার মাসুল উঠান লইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত আমাদিগের এত মনান্তর ঘটিত না। বাস্তবিক আমরা আমেরিকার কার্পাস-উৎপাদক এবং ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়গণের দ্বারা নিতান্ত উপকৃত হইতেছি। ইহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ক চৈতন্য না আমাদিগের আছে না ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণের আছে।

এই চৈতন্য লাভ হইলেই শ্রমের প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুভূত হইবে। এবং ইহা দ্বারা মনোমধ্যে যে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে তাহাতে বিশ্রাম থাকিবে না। এই মহানুভব শ্রম হইতেই প্রকৃত civilization ন্যায়ানুগত natural selection যথার্থ utility এবং বৈধ স্বানুবর্ত্তিতা সম্ভবে। আর এইরূপ অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য হইতেই বোধ হয়, হিন্দুগণের উন্নতি এবং হিন্দুগণের উদ্ধারসাধন হইতে পারে।

হিন্দুগণ যে ক্রমশঃ এই পথেই চলিয়াছে তাহা ইহার পরে প্রদর্শন করিব।

শ্রী যো—

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বীরভূমি ইংরেজ মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। ইংরেজ মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন কতগুলা লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতার গবর্ণর জেনেরল। ওয়ারেন হেষ্টিংস মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত? অগৌণে বীরভূমি শাসনার্থ উড্ নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

উড্ দেখিলেন এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন। যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার শিবির, সেই দিনের জন্য সেস্থান ব্রিটিশ সেনার অধীন—তার পরদিন ব্রিটিশ সেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারিদিকে "বন্দেমাতরং" গীত হইতে লাগিল। উড্ সাহেব খুঁজিয়া পান না কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত হইয়া যে গ্রাম ইংরাজের বশীভূত হয় তাহা দাহ করিয়া যায় অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে উড্ সাহেব জানিলেন যে, পদচিহ্নে ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সম্বাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে কত সন্তান থাকে। যে সম্বাদ পাইলেন তাহাতে তিনি সহসা দুর্গ আক্রমণ করা

বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে এক অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার শিবিরের অদূরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব-গ্রামে জয়দেব গোস্বামীর মেলা হইবে। এবার মেলায় বড় ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে। বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সন্তানগণের, পূর্ণিমার দিন কেন্দুবিল্বতে একত্র সমাগম হইবে, এমন সম্ভাবনা। মেজর উড্ বিবেচনা করিলেন যে পদচিহ্নের রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর উড্ রটনা করিলেন যে, তিনি মেলার দিবস কেন্দুবিল্ব আক্রমণ করিবেন। এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণব পাইয়া, একদিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সম্বাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সন্তান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্য কেন্দুবিল্ব অভিমুখে ধাবিত হইল। সকল সন্তানই কেন্দুবিল্বে আসিয়া মাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। মেজর উড্ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন। মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া কেন্দুবিল্ব যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শান্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, জয়দেব গোস্বামীর তীর্থে, অজয়ের পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহাই তাহাদের অভিসন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাহারা শুনিল যে, কেন্দুবিল্বে সমবেত সন্তানদিগের সঙ্গে ইংরেজদিগের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিল, "তবে যুদ্ধেই মরিব, শীঘ্র চল।"

তাহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিল। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে পাইল যে, নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শান্তি বলিল, "মরার কথা এখন থাক্—বল বন্দে মাতরং।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তখন দুই জনে কানে কানে কি পরামর্শ করিল। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইল। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভূত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এই পুরুষ বেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি, করিতে করিতে মরা হইবে না। সুতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিল। তাহাতে তাহার সজ্জা সকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকন রকম রসকলির উপর খয়েরের টিপ কাটিয়া, তৎকালপ্রচলিত ফুর ফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলো ঝাঁপটার গোছায় চাঁদমুখখানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারঙ্গ হস্তে বৈষ্ণবীবেশে, ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ দাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?" বৈষ্ণবী বলিল. "তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।" সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর?" বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বাড়ী পদচিহ্নে।" এখন সেই দিন মেজর উড্ পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর উডের কাছে লইয়া গেল। মেজর উডের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্ম্মভেদী কটাক্ষে উড্ সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া, গান ধরিল—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে, কলয়সি করবালং।

উড্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা বিবি।"

বিবি বলিল, "আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।"

উড্। Well that it is Padsin! Padsin * is it? হুঁয়া একটো গর হ্যায়?

---

* পদচিহ্ন।

বৈষ্ণবী বলিল, "ঘর ?—কত ঘর আছে।"

উড্। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর।—

শান্তি। সাহেব তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

উড্। ইয়েস্ ইয়েস্, গর! গর! হ্যায় ?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেল্লা।

উড্। কেট্রে আড্মি ?

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

উড্। নন্সেন্স্। একটো কেল্লেমে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকেল গিয়া ?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা ?

উড্। মেলামে—কিয়া বোল্টা হ্যায়। কিণ্ডেল—

শান্তি। কেঁতুলী—কেঁতুলীর মেলায় তারা যাবে না।

উড্।' টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে ?

শান্তি। কাল এসেছি সায়েব।

উড্। ও লোক আজ নিকেল গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখ্‌বো!" প্রকাশ্যে বলিল, "তা সাহেব হ'তে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবর আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখিনে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, পয়সাটা সিকেটা দাও উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বক্‌শিশ দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।"

উড্ সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া, বলিল—"পরশু নেহি বিবি।"

শান্তি বলিল, "দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্; বিবি কি ?"

উড্। পরশু নেহি, আজ রাৎকো হাম্‌কো খবর মিলনা চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সর্ষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমোও। দশ কোশ রাস্তা যাব আস্‌বো আজ আমি ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার।

উড্। ছুঁচো বেটা কেস্কা কয়তা হ্যায়।

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

উড্। Great general হাম হোশক্তা হ্যায় ক্লাইবকা মাফিক। লেকেন্ আজ হাম্‌কো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও রুপেয়া বখসিস দেঙ্গে।

শান্তি। শ-ই দাও আর হাজারই দাও, বিশ ক্রোশ এ দুখানা ঠেঙ্গে হবে না।

উড্। ঘোড়ে পর।

শান্তি। ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে আর তোমার তাঁবুতে এসে সারেঙ্গ বাজিয়ে ভিক্ষা করি?

উড্। গদি পর লে যায়েগা।

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে? আমার লজ্জা নাই?

উড্। ক্যা মুস্কিল, পান্‌সো রুপেয়া দেঙ্গে।

শান্তি। কে যাবে, তুমি নিজে?

উড্ তখন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিণ্ডলে নামক একজন যুবা এন্‌সাইনকে দেখাইয়া, তাহাকে বলিলেন, "লিণ্ডলে তুমি যাবে?" লিণ্ডলে শান্তির রূপ-যৌবন দেখিয়া বলিল, "আহ্লাদপূর্ব্বক।"

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে লিণ্ডলেও তৈয়ার হইল; শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে গেল। শান্তি বলিল, "ছি, এত লোকের মাঝখানে? আমার কি আর কিছু লজ্জা নাই? আগে চল ছাউনী ছাড়াই।"

লিণ্ডলে ঘোড়ায় চড়িল। ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া হাঁটাইয়া লইয়া চলিল। শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা শিবিরের বাহিরে আসিল।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জ্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি লিণ্ডলের পায়ের উপর পা দিয়া এক লাফে ঘোড়ায় চড়িল। লিণ্ডলে হাসিয়া বলিল, "তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার।"

শান্তি বলিল, "আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার যে, তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে। ছি! জিন পায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া?"

একবার বড়াই করিবার জন্য লিণ্ডলে জিন হইতে পা লইল। শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল। শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আসন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া, বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল। শান্তি চারি বৎসর সন্তানসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণ বিদ্যাও শিখিয়াছিল। তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে

কি বাস করিতে পারিত ? লিণ্ডলে মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিল। শান্তি বায়ু-বেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়া ছিল, শান্তি সেইখানে গিয়া, জীবানন্দকে সকল সম্বাদ অবগত করাইল। জীবানন্দ বলিল, "তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি। তুমি কেন্দুবিল্ব গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও। তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সম্বাদ পান।" তখন দুইজনে দুই দিকে ধাবিত হইল। বলা বৃথা, শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উড্ পাকা ইংরেজ। ঘাটিতে ঘাটিতে তাঁহার লোক ছিল। শীঘ্র তাঁহার নিকট খবর পৌঁছিল যে, সেই বৈষ্ণবীটা লিণ্ডলে সাহেবকে যমালয় নামক খারাপ যায়গায় পাঠাইয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শুনিয়াই মেজার উড্ বলিলেন, "An imp of Satan ! A spy ! Strike the tent !" তখন ঠক্ ঠক্ খটা খট্ তাম্বুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল। মেঘরচিত অমরাবতীর ন্যায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল। মাল গাড়ীতে বোঝাই হইল। মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে—হিন্দু মুসলমান মান্দরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে, মস্ মস্ করিয়া চলিল। কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল।

এদিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে কেন্দুবিল্বের পথে অগ্রসর। মহেন্দ্র ভাবিলেন বেলা পড়িয়া আসিল; শিবির সংস্থাপন করা যাক।

তখন শিবির সংস্থাপন উচিত বোধ হইল। বৈষ্ণবের তাঁবু নাই। গাছ তলায় গুণচট বা কাঁথা পাতিয়া, শয়ন করে। একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রি যাপন করে। ক্ষুধা যেটুকু বাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে। শিবির উপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল। একটা বড় বাগান—আম কাঁঠাল বাবলা তেঁতুল। মহেন্দ্র আজ্ঞা দিলেন, "এই খানেই শিবির কর।" তারি পাশে একটা পাহাড় ছিল, উঠিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন এ পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয়। স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন।

এই ভাবিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতশিখরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুদূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, "চল, পর্ব্বতে চড়।" নিকটে যাহারা ছিল তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন ?"

যোদ্ধা এক শিলাখণ্ডের উপর উঠিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, "চল এই জ্যোৎস্না রাত্রে ঐখানে পর্ব্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের নূতন গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।" সন্তানেরা দেখিল সেনাপতি জীবানন্দ।

তখন হরে মুরারে উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উঁচু হইয়া উঠিল। এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুসরণ পূর্ব্বক, বেগে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল। দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, একি এ? না বলিতে ইহারা আসে কেন?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পিঠে চাবুকের ঘায়ের ধোঁয়া উঠাইয়া দিয়া পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন। সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্ত্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি আনন্দ?"

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আজ বড় আনন্দ। পাহাড়ের ওপিঠে ইংরেজ। যে আগে উপরে উঠ্‌বে তারি জিত।"

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্যের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন, "চেন তোমরা! আমি জীবানন্দ গোস্বামী। অজয়তীরে সহস্র সহস্র ইংরেজের প্রাণ বধ করিয়াছি।"

তুমুল নিনাদে পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল, "চিনি আমরা! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী।"

জীব। বল হরে মুরারে!

পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, হরে মুরারে!

জীব। পাহাড়ের ওপিঠে ইংরেজ। আজ এই পর্ব্বতশিখরে, এই নিলাম্বরী যামিনী সাক্ষাৎকার, ইংরেজে বৈষ্ণবে রণ হইবে। দ্রুত আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে। বল, বন্দে মাতরং।

তখন পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল বন্দে মাতরং। ধীরে ধীরে বৈষ্ণবসেনা পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্রসিংহ অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত অবতরণ করিতে করিতে তূর্য্যনিনাদ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতশিখরদেশে নীলাকাশ-

পটে প্রতিবিম্বিত হইল, কামানশ্রেণী সহিত ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা শোভিত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবসেনা গাহিল,

তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,
তুমি মা বাহুতে শক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম গুড়ুম গুম শব্দে, সে মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল। শত শত সন্তান হত নিহত হইয়া, অশ্ব অস্ত্রসহিত, পর্ব্বতসানুদেশে শয়ান হইল। আবার গুড়ুম গুম, দধিচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র পড়াইতে লাগিল। চাষার কর্ত্তনী সম্মুখে সুপক্ক ধান্যের ন্যায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ন্যায় বৈষ্ণবসেনা পর্ব্বতসানু হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্য হুর্‌রেএ হুর্‌রেএ শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন পাহাড় হইতে নামিল। সঙ্গীন উঁচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্ব্বত-বিমুক্ত বিশাল তটিনীপ্রপাতবৎ দুর্দ্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রিটিশসেনা পলায়ন-পর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, "আজ শেষ। এস এইখানে মরি।"

মহেন্দ্র বলিল, "মরিলে যদি রণজয় হইত তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।"

জীব। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব।

তখন পাছু ফিরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, "কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।"

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, "অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।"

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, "কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।"

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! নবীনানন্দকে বলিও আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।"

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লৌহবৃষ্টি মধ্যে বেগে অশ্বচালনা করিলেন। বামহস্তে বল্গা—দক্ষিণে বন্দুক—মুখে হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে

মুরারে! যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই। এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি হরে মুরারে! হরে মুরারে! গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোঁসাইকে দেখ; দেখিলে মরিবে না।"

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষ কীর্ত্তি দেখিল। প্রথমে বিস্মিত হইল, তারপর বলিল "জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল, জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।"

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল। তাহাদের দেখা দেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখা দেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে, কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান ইংরেজকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য মার মার শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া দুই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিখরাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, পর্ব্বতশিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া, ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন, "সন্তানগণ! ঐ দেখ পর্ব্বতশিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীর ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুকৈটভ-নিসূদন কংস-কেশি-বিনাশন, রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান পর্ব্বতপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! ইংরেজ মুসলমানের বুকে পিঠে চাপিয়া মার। লক্ষ সন্তান পর্ব্বত পিঠে।"

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে পর্ব্বত কন্দর কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ললিত-তাল-ধ্বনি-সম্বলিত অস্ত্রের ঝঞ্চনায় সর্ব্ব জীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাত প্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ ইংরেজের সেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল। সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র বৈষ্ণব-

সেনা লইয়া স্বয়ং সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী পর্ব্বতশিখর হইতে, সমুদ্র প্রপাতবৎ ইংরেজসেনার উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সঙ্ঘর্ষে সেই বিশাল ইংরেজসৈন্য, পর্ব্বত সানুদেশে, নিঃশেষ নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।

ইংরেজ ইংরেজের মত যুদ্ধ করিল। কিন্তু দেশী সিপাহীরা সকলে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ণিমার রাত্রি।—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির। সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্‌—সর্ব্বব্যাপী ধূম, আর কিছুই নাই। কেহ হুররে বলিতেছে না—কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না। শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী। সর্ব্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্ত্তনাদ। কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে। কেহ ডাকিতেছে, মা ! কেহ ডাকিতেছে, বাপ ! কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্রে জড়াজড়ি ; জীবন্তে মৃতে ; মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে সেই রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে, এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল। একটী মশাল জ্বালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল। প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল। কোথাও, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে ; সেখানে যুবতী, মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটি দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তারপর যখন দেখিতে পায় যে, যাকে খুঁজিতেছি সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া লইয়া সরিয়া যায়। এই-রূপ অনুসন্ধান করিয়া যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—কোথাও যা খুঁজে তা পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি, জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময় এক অতি মধুর সকরুণধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে, "উঠ মা! কাঁদিও না।" শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল: যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া, সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল সেই জীবানন্দের দেহ। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা। জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ি টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই। তিনি বলিলেন, "বুকে হাত দিয়া দেখ?"

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, "নাকেব কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

তিনি বলিলেন, "আবার দেখ, মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না?" শান্তি আঙ্গুল দিয়া দেখিয়া বলিল, "বুঝিতে পারিতেছি না।" শান্তি আশামুগ্ধ হইয়াছিল।

মহাপুরুষ, বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপর হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে। নাকের অগ্রে আঙ্গুল রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ ছিল কি? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন, "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতীরে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তির শরীরে অগাধ শক্তি, অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, "তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্ত সকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তার পর, বারম্বার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধে কার জয় হইল?"

শান্তি বলিল, "তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না— সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীব ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "শান্তি! সেই চিকিৎকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।"

শান্তি বলিল, "আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?"

জীব। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শান্তি। রাখিবার জন্য মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন। তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছিলে; এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি। এখন আমাদের দেখিলে, সন্তানেরা বলিবে, জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভয়ে লুকাইয়াছিল, জয় হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে।

জীব। সে কি শান্তি? লোকের অপবাদ ভয়ে আপনার কাজ ছাড়িব? আমার কাজ মাতৃসেবা; যে যা বলুক না কেন, আমি মাতৃসেবাই করিব।

শান্তি। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে,

তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারি কাজ?

জীব। শান্তি! তুমিই সার বুঝিতে পার। আমি এ প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না। আমার সুখ সন্তানধর্ম্মে—সে সুখে আপনাকে বঞ্চিত করিব। কিন্তু যাইব কোথায়? মাতৃসেবা ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না।

শান্তি। তা কি আমি বলিতেছি? ছি! আমরা আর গৃহী নহি; এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াই।

জীব। তার পর?

শান্তি। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া, দুই জনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।

তখন দুইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথ-অনন্তে অন্তর্হিত হইল।

হায়! আবার আসিবে কি? মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?

বিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যানন্দ ঠাকুর, রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া, আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন এমত সময়ে, সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা।"

সত্য। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন্!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জয় করিয়া আর্য্যধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য্য নাই, অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।"

সত্য। মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে, এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?"

তিনি বলিলেন, "না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।"

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া, যোড়হাতে, বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।"

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ! কাতর হইও না। যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই; মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা আর্য্যধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত; লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া, অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ আর

বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্—এখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"

মহাপুরুষ বলিলেন, "ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্য শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন্—আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই- আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও? যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, "শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।"

মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে, এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল জ্ঞান লাভ করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহা প্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষমূর্ত্তি শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে

ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা; মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডপ শূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।

সমাপ্ত।

১

কত মনোহর ছিলি সরোবর
যবে হৃদি' পর তোর।
আলো করি জল ভাসিত কমল
কিরণে রাঙিলে ভোর॥

২

কিবা পরিসর।—ও দেহের পর
সুফুট অফুট কলি,
মৃদুল পবন দুলাত যখন
ঢেউ নাচাইয়া চলি!

৩

সে শোভা নয়নে কখনও দেখিনে
জনমের আগে যাহা;
তবু পদ্মহ্রদ নামেতে আহ্লাদ!
ভুলিতে নারিব তাহা॥

৪

নারিব ভুলিতে যখন নিশিতে
চাঁদখানি ভাঙাভাঙা,
বুকে তুলে নাও দুলে দুলে যাও
চাঁদের কিরণে রাঙা॥

৫

ভুলিতে নারিব যেখানে থাকিব
ও তোর প্রতিমাখানি,
শিশুকাল হতে শিশির শরতে
ঐ রূপই তোর জানি॥

৬

অই সে উত্তরে ত্রিশূল শিখরে
উঠেছে শিবের মঠ।
প্রাসাদ কুটীর ঢাকা চারি তীর
সেই মনোরম পট॥

৭

তরু ছায়াকর তাহার ভিতর
তৃণের কুটীর কোলে;
শাখা ছড়াইয়া আছে দাঁড়াইয়া
পাতাগুলি ধীরে দোলে!

৮

গরিমা করিয়া আকাশে উঠিয়া
নারিকেলসারি তায়
শিরে যেন ছাতা ছড়ায়েছে পাতা
পশ্চিমে গগনগায়॥

৯

হ'লে সন্ধ্যাকাল মৃদু রশ্মিজাল
যখন সে সবে পড়ে,
দিক্ তরু জল করি সুবিমল—
ছবিখানি যেন গড়ে॥

১০

বৃহৎ শরীর জলাশয় নীর
গোধূলি বরণে কালো;
তীরে ঘরে ঘর গৃহতরু'পর
চিকি চিকি করে আলো॥

১১

পশ্চিম চাপিয়া থরে থরে দিয়া
শাদা কালো মেঘদলে
গায়ে মাখি ছটা করি মহা ঘটা
গগনের গায়ে জলে।

১২

জলে তার সনে কত কি বরণে
কলুষর মঠশির।
ছায়াঢাকা জল গৃহ তরুদল
ছবিগুলি তাহে স্থির!

১৩

আরো কিছু দূরে শূন্যদেশ পূরে
আকাশের কোলে গাঁথা
ঝাউ তরুসারি বিথারি বিথারি
ধরে ঝারা রূপ পাতা!!

১৪

সে সবে মিশিয়া আকাশে উঠিয়া
জাহাজের চূড়াগুলি।
কখনও জড়ায়ে কখনও ছড়ায়ে
পতাকা পাইল তুলি!!

১৫

পূর্ণিমা-জোছনা যবে অতুলনা
এ সবে জড়ায়ে রয়।
কিবা মনোহর ছবিটি সুন্দর
তোর চারিধার হয়!

১৬

ভুলিব না ওরে সরোবর তোরে
গগনে যখন মেঘ।
কালো ছায়া জলে ধারা ধেয়ে চলে
ঝাপটে ঝটিকাবেগ!!

১৭

ফুৎকারে ফুৎকারে জলকণা সরে
মুক্তাঝারা যেন ধায়!
মেঘে গরজন, বারি বরিষণ
বায়ুর নর্ত্তন তায়!!

১৮

ভুলিব না তোর সন্ধ্যা নিশি ভোর
এখনও নিরখি যাহা,
যামিনী জোছনা হিল্লোল খেলনা
প্রভাত রক্তিমা আহা!!

১৯

ন বৎসর হ'তে বসন্ত শরতে
হেমন্ত বরিষাভাগে।
হে বিশাল হ্রদ সরল বিশদ
অই রূপ হৃদে জাগে!!

২০

ফুটায়েছে বেলা জীবনের ভেলা
এবে ধিকি ধিকি যায়।
তবু তোর তীর প্রাসাদ কুটীর
ভুলিতে নারিবে হায়!!

২১

চারিধারে ঘাট রজকের পাট
অই তরুসারি জল—
দেখিলে এখনও নিশিতে কখনও
ভেসেরে হৃদয়তল!!

২২

মনে পড়ে কত হারায়েছি যত
এখন খুঁজিলে নাই!—
আমি যাব চলে লোকে যেন বলে
তোর তীরে ছিল ঠাঁই।

কামরূপ—রঙ্গপুর

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে, কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। "বাঙ্গালার ইতিহাস" পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি, কেন না সেন পাল ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়াব খিলিজি লক্ষ্ণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্ণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না, কেন না বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ পৃথক্, স্ব স্ব প্রধান। সকলই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্যজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ব্বত্র প্রায় আর্য্য প্রধান; এই আর্য্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাঁহারা আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্যাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম্ম, একভাষা, তার শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে, বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে, বা নেপল্‌সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয় এই রাজ্য পূর্ব্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমি মধ্যে একা আর্য্যজাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া, ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে, বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয় তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিমভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্য জয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্যজাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তর-পূর্ব্ব মুখে

আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্ব্বে কোন রাজার নামের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে কীচক নামে এক ম্লেচ্ছ জাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তার পর পাল বংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্ব্বে, রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য, পৃথক্ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয় রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বোঁ বংশের, আর আসিয়ার তৈমূর বংশের ন্যায় নানা দেশের রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয় এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড় দুর্দ্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, "আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?" ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়ায় মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নাম মাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজত্ব করিতে দিবেন না স্বয়ং রাজত্ব করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার একশত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিলেন না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর, তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র; নাম হবচন্দ্র নয়, ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত

আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে গবচন্দ্র বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে টিপ্‌লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ আপদ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুঁটুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজ সমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু। বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ্‌লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন, দুইজন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাক শাক করিবার জন্য, সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তাঁর কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভি-প্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিরা রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতব হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কানের টিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে, কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, "নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিরার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুর চোরেরা শূলে যাইবার পূর্ব্বে, পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পরে ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, "হে মহারাজ! দেখুন দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে সে পুনর্জ্জন্মে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতে ছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে; আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল, "মহারাজ!

ও কে যে ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!!" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারীগণকে আজ্ঞা দিলেন যে এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। এবং মন্ত্রীবরকে আহ্বান পূর্ব্বক, সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্ত্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে, এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গাল গল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায় যে, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও হবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজারাজড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল, সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয়, সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোয়ারির সং। আজ কালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না; তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে আমাদের এ নিরীহ জাতীর শাসনকর্ত্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পাল বংশীয় রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মেছ পারো কোচ লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর আবার আর্য্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিম্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯০ ক্রোশ; অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল আর ২।০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত।

প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর ; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সেকালের নগরী সকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সেকালের সহর সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনরায় সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খিড়কিদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজি কালিকার অনেক রাজ্য পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে চোরের মত সেই অন্ধকার পথে গেল। হার মানিল ; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, "মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে।" মহারাজা তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল তাহা রাজপুরী মধ্যে পৌছিলে, তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠান কন্যা, বা কোনও জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল ; নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, কেননা কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান কখনও এদেশে আসেই নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে রঙ্গপুর রাজ্য এই সময়ে পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখ শূন্য যে ইতিহাস—সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই। এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়কর্ত্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

আদিম অবস্থায় স্ত্রীগণ সকলেই একপ্রকার স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারিতা চিরস্থায়ী নহে। ক্রমে ক্রমে তাহা বিনা চেষ্টায় লোপ পায়। তজ্জন্য প্রথমে অন্য দ্রব্যের ন্যায় স্ত্রীতেও সম্পত্তি বোধ আবশ্যক, তাহা সহজেই জন্মে, সুতরাং সহজেই স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায়। সম্পত্তি যেরূপে অর্জ্জিত, স্ত্রীও প্রথমে সেইরূপে অর্জ্জিত হয়। কোন পক্ষী ধরিলে শিকারী যেরূপ মনে করে পক্ষী আমার হইল, বনোরা স্ত্রী ধরিলে ঠিক সেইরূপ মনে করে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিজয়ীরা পরাজিতদের স্ত্রীলোক ধরিয়া আনে। যেটিকে যে ধরিয়া আনে সেটি তাহারই হয়। অন্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া আনিলে যদি তাহা অপহারকের নিজস্ব হয়, তবে স্ত্রী লুঠ করিয়া আনিলে কেন না সে স্ত্রী তাহার নিজস্ব হইবে। স্ত্রী নিজস্ব হইলে আর তাহার স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পায় না।

কিন্তু স্ত্রী প্রথমে নিজস্ব হইতে গেলে ঘটী বাটীর ন্যায় নিজস্ব হইতে হয়, অর্থাৎ ঘটী বাটীর ন্যায় সম্পত্তি স্বরূপে নিজস্ব হইতে হয়। এবং সেই জন্য স্ত্রীরা উত্তরাধিকারীতে অর্পিত হয়। পূর্ব্বসম্বন্ধ তাহার কোন প্রতিবন্ধক হয় না। যে দেশে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী, সে দেশে মাতুল মরিলে মাতুলানীকে ভাগিনেয়ের স্ত্রী হইতে হয়। যে দেশে সহোদর উত্তরাধিকারী, সে দেশে ভ্রাতা মরিলে উত্তরাধিকারী ভ্রাতা ভ্রাতৃপত্নীকে নিজ পত্নীস্বরূপে গ্রহণ করে। অন্য সম্পত্তি যদি উত্তরাধিকারী পায়, স্ত্রীও কেন সে না পাইবে? আমাদের দেশে গল্প আছে, যে নহুষ যখন ইন্দ্রত্ব লাভ করেন শচীকে তিনি এই কারণে দাবি করিয়াছিলেন। বালির রাজ্যে যখন সুগ্রীব রাজা হন, তারাকে এই কারণে তাঁহার রাণী হইতে হইয়াছিল। রাবণের মন্দোদরীকেও এই কারণে বিভীষণের রাণী হইতে হইয়াছিল। এ সকল গল্প সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে যে প্রথার উল্লেখ আছে তাহা সত্য।

স্ত্রী যাহার সম্পত্তি, তাহার নাম স্বামী। যে স্বত্ববলে পুরুষেরা অন্য সম্পত্তির স্বামী সেই স্বত্ববলে স্ত্রীরও স্বামী। "স্ত্রীর স্বামী" এই কথার পূর্ব্ব পরিচয় সমুদয় স্পষ্ট রহিয়াছে। যখন সম্পত্তি বলিয়া স্ত্রী গৃহীত হইয়াছিল, স্বামী কথাটি সেই সময়ের। অদ্যাপি আমরা সেই স্বামী শব্দ ব্যবহার করি। অদ্যাপি আমাদের সংসারে স্ত্রীগণ কতকাংশে সম্পত্তিস্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

যাহা সম্পত্তিস্বরূপ, তাহা দান করা, ধার দেওয়া, নষ্ট করা, ত্যাগ করা স্বামীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। বন্যলোকের মধ্যে অনেক স্থানে এইরূপ স্বামিত্ব অদ্যাবধি আছে। আমাদের দেশেও স্বামীরা পূর্ব্বে এই সকল ক্ষমতার সম্পূর্ণ চালনা করিতেন, পরে বহুকাল হইতে তাহা এক একটি করিয়া কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত আছে যে যখনই স্বামী মনে করেন তখনই তিনি স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীর সম্পত্তিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালায় অদ্যাপি এই শেষ চিহ্ন আছে। শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যদি কেহ স্ত্রী ত্যাগ করে তবে সে ব্যক্তি ত্যক্ত স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবে, তাহাকে খোরাকি দিবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে আর স্ত্রী ত্যাগ করিয়া নিঃসম্বন্ধ হওয়া যায় না। অন্য কোন সম্পত্তি ত্যাগ করিলে আর সে ত্যক্ত সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সেই ত্যক্ত স্ত্রীর সহিত সুতরাং এক্ষণে ঈষৎ সম্বন্ধ থাকিতেছে। কতক সুবিধা বটে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীত্যাগ করার এই ক্ষমতা যতদিন না একেবারে যাইবে ততদিন স্ত্রী এদেশে সম্পত্তিরূপে থাকিবেন। এক্ষণে ব্রাহ্মদল, সাম্যবাদীদল সকলেই দাসী শব্দ এবালিস করিয়া স্ত্রীকে স্বাধীন করিয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি তাঁহাদের স্ত্রীরা যেন স্বামী শব্দ এবালিস করিয়া সেই স্বাধীনতার আরও বৃদ্ধি করেন। স্বামী শব্দ বড় কুপরিচয় দেয়। স্বামী শব্দ যতদিন ব্যবহার থাকিবে ততদিন তাঁহাদিগকে স্বামীর সম্পত্তি বুঝাইবে।

স্ত্রী প্রথমে কেবল যে সম্পত্তিস্বরূপে নিজস্ব হইয়াছিল এমত নহে, ভৃত্যস্বরূপেও নিজস্ব হইয়াছিল। বন্য অবস্থায় কুটীর প্রস্তুত করা, মোট বহন করা, ফল মূল আহরণ করা, এ সকল ভৃত্যের কার্য্য; স্ত্রীরা ভৃত্য-রূপে এ সকল করিত। যখন সম্পত্তিস্বরূপা, তখন স্ত্রীর অধিকারীর নাম স্বামী। যখন ভৃত্যস্বরূপা তখন তাহার প্রভুর নাম ভর্ত্তা। এই নামটি আমাদের দেশে অদ্যাপি আছে। এখনকার উন্নত যুবতীরা হয় ত "ভর্ত্তা" শব্দ আর সহ্য করিতে পারিবেন না, সে বিষয়ে ব্রাহ্মবিবাহিতাদের মত কি

আমরা এক্ষণে জানি না। কিন্তু স্বামী শব্দ, ভর্ত্তা শব্দ, উভয় শব্দই অপরাধী; উভয়ই কাটা পড়িবার যোগ্য।

কিন্তু আসল কথা, বাঙ্গালার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শতবার ভর্ত্তা শব্দ, শতবার স্বামী শব্দ কাটা পড়িলে, অথবা তাহাদের পুরুষেরা, ওরফে "বাড়ীর লোক", শতবার দাসী শব্দ কাটিয়া দিলেও বিবাহিতার দাসীত্ব ঘুচিবে না। কেবল বাঙ্গালায় কেন? ইংলণ্ডে, ফরাসীদেশে, মার্কিন দেশে, অন্যান্য সভ্য দেশে অদ্যাপিও প্রকারান্তরে স্ত্রীর দাসীত্ব আছে। তাহাই মোচন করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায়েরা মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল করিয়া থাকেন। এবং Liberty of women বলিয়া নানাপ্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু সংসারের বর্ত্তমান প্রণালীর যতদিন পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন এইরূপ দাসীত্ব থাকিবে। যতদিন প্রণয়ের, স্নেহের বেগ ও বন্ধন, পরিবর্ত্তন না হইবে, ততদিন এইরূপ দাসীত্ব থাকিবে। ততদিন পতিব্রতারা এ দাসীত্ব আপনারাই পরিয়া আত্মভূষণ করিবে। তবে যেখানে ভক্তি প্রীতি কিছু মন্দা পড়িয়াছে, বা রূপান্তর হইয়াছে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে।

স্ত্রীর এরূপ দাসীত্ব নিতান্ত অর্থাভাবে নহে। এ দাসীত্ব কেবল উন্নতির জন্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক সম্পত্তির সামিল না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের উপর স্বত্বাধিকার জন্মিতে পায় নাই অর্থাৎ তাহারা কাহারও নিজস্ব হইতে পায় নাই, সুতরাং সে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা কমিবার কোন উপায় হয় নাই। প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোককে সম্পত্তি জ্ঞান করাই মহা মঙ্গলের বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর স্ত্রীর দাসীত্ব দ্বারা সংসার বাঁধিয়াছে, সংসার আঁটিয়াছে, সংসার হইতে সমাজ গড়িয়াছে। দাসীত্বের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, তদ্দ্বারা আরও কোন ইষ্টসাধন হইবার সম্ভাবনা এখনও আছে। তাহা সিদ্ধ হইলে দাসীত্ব আপনিই যাইবে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। এক সময় ভারতবর্ষে ভক্তি, প্রীতি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় ভারতমহিলাদের দাসীত্বও বড় বাড়িয়াছিল; তাহারা সকলেই পতিব্রতা হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে সেই দাসীত্ব এতটা পরিপুষ্ট হইয়াছিল যে, স্বামীর নিমিত্ত স্ত্রীরা অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিত। তাহাদের দের যুক্তি কি ছিল জানি না। হয় ত তাহারা মনে ভাবিত "সেবার ভর্ত্তার দেহ আর রক্ষা হইল না, তবে দাসীর দেহে আর কাজ কি? অর্দ্ধ দেহ গেলে অপরার্দ্ধে আর কাজ কি? বরং উভয় অর্দ্ধ একত্রে ভস্মীভূত হওয়া ভাল।" একত্র মরণ, সহমরণ, প্রণয়িনীর একমাত্র অভিলাষ। সে অভিলাষ ভারতে নিত্য পূর্ণ হইতে

লাগিল। জর্ম্মণি ভিন্ন আর কোন দেশের কবিরাও কখন এই অভিলাষ ধ্যানেও পান নাই। কিন্তু ভারতে গ্রামে গ্রামে এই নাটক নিত্য অভিনীত হইতে লাগিল। সেই অবধি ভারতমহিলাদের মূলমন্ত্র হইল—**আত্মবিসর্জ্জন**। এই মহাকাব্য নিজোদ্ভব হইয়াছিল। কবির কাব্য লেখন, সমাজ ও মহাকাব্য উদ্ভাবন করে। কিন্তু সে মহাকাব্য কেহ দেখে না, দেখিতে পাইলেও কেহ বুঝে না। কে বুঝাইয়া দিবে? কোন দেশেই তাহার টীকাকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তবে দুই একজন মহাত্মা পূর্ব্বগত সমাজের স্তিমিত উচ্ছ্বাস কখন কখন দূরগত শব্দের ন্যায় মাত্র অনুভব করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদের মহাকবি বলে। তাঁহারাই সমাজ-সৃষ্ট মহাকাব্যের টীকা লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন। টীকা সম্পূর্ণ না হউক, লোকে তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু লোকে কেবল টীকাই পড়িল, কেহ কখন মূল আর খুলিল না! মূল সমাজতত্ত্ব!

আমরা যে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছি। বন্য অবস্থায় যাহারা দলপতি, বলবীর্য্যে অসাধারণ, তাহারাই প্রথমে স্ত্রীর স্বামী হয়। একটী দুইটী করিয়া তাহারা ক্রমে বহু স্ত্রীর স্বামী হয়। সর্ব্বদাই পরাজিতদের স্ত্রী লুঠ করিয়া আনে এবং সেই সকল স্ত্রীকে নিজস্ব করিয়া রাখে। ইহাই বহুপত্নীত্বের আদি।

যাহার বলবীর্য্য অসাধারণ তাহারই বহু স্ত্রী। সুতরাং বহুপত্নীত্ব গৌরবের পরিচয় হইয়া উঠে। তখন অন্য সকলেই সম্ভ্রমের নিমিত্ত বহুস্ত্রী লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। প্রধানের অনুকরণ সকল অবস্থাতেই আছে। হীনবলেরা যুদ্ধে স্ত্রী লুঠ করিতে পারে না গোপনে স্ত্রী চুরি করিতে আরম্ভ করে, তাহাতেও সম্মান। সে চুরি বিপক্ষদলের সম্বন্ধে হউক, অথবা নিজ দলের সম্বন্ধে হউক বহুস্ত্রী থাকিলেই সম্মান। বহুপত্নী কেবল বল বীর্য্যের পরিচয় নহে, সঙ্গতিরও পরিচয়, বহুস্ত্রী প্রতিপালন করা অর্থসাপেক্ষ। সুতরাং বর্ব্বর অবস্থায় একপত্নীত্ব হীনবল ও হীনঅর্থের পরিচয়, আর বহুপত্নীত্ব বহু বল ও বহু অর্থের পরিচয়। কাজে কাজেই সকলেই বহু স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে।

কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই যে বহুপত্নী লাভ করিবে এমত সম্ভব নহে। যদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক জন্মিত তবে সকলেরই বহু স্ত্রী সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা জন্মে না। বন্য অবস্থায় পুরুষের সংখ্যা কতক কমিয়া যায় সত্য,—তাহাদের বিপদ অনেক, সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে হয়, সর্ব্বদাই ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়—কিন্তু তথাপি যে সকল পুরুষ জীবিত থাকে

তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে বহুপত্নী পড়ে না। কেবল তাহাদের মধ্যে কতক লোক বহুপত্নী লাভ করে।

বহু স্ত্রী নিজস্ব থাকিলে বন্যদেশে অনেক সুবিধা হয়। যাহা পূর্ব্বে নিঃসহায় হইয়া একা করিতে হইত, বহু স্ত্রী দ্বারা তাহা অক্লেশে সুসম্পাদিত করা যায়। নিজস্ব স্ত্রীরা আহার প্রস্তুত করে, কুটীর প্রস্তুত করে, ফল আহরণ করে, চাষ করে, মোট বহন করে, শিকারে তীর যোগায়। এ সকল ত পূর্ব্বে আপনাকে একা করিতে হইত, একা বলিয়া আবার হয় ত তাহা কিছুই সুসম্পাদিত হইত না।

আর এক কথা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বন্যদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে, তাহাদের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত না হইলে কখন কখন বংশ লোপ পায়। মনে কর অহাদের একপক্ষের পুরুষেরা মাত্র এক একটী করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিল, অপর পক্ষের পুরুষেরা এক একটী স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া প্রত্যেকে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিল। এ অবস্থায় বহুপত্নীকদের যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হইবে, একপত্নীকদের বংশ সে পরিমাণে কদাপি বৃদ্ধি হইবে না। বহুপত্নীকদের সমুদয় স্ত্রী পুত্রবতী হইবে, কিন্তু একপত্নীকদের অনেক স্ত্রী অবিবাহিতা থাকিবে। সুতরাং সংখ্যা-প্রাবল্য হেতু বহুপত্নীকেরা যুদ্ধে বিজয়ী হইবে; আর একপত্নীকের বংশ ক্রমে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কথা। বন্য অবস্থায় আত্মরক্ষা অতি কঠিন; পুরুষের সাহায্য ব্যতীত যুবতীরাই প্রাণ ধারণ করিতে প্রায় অক্ষম, বয়স্থা হইলে ত আর কথাই নাই। আহার অর্জ্জন করা দুর্ব্বল বা পীড়িতের পক্ষে অতি কঠিন, তদ্ব্যতীত হিংস্র জন্তু হইতে উদ্ধার পাওয়া আরও কঠিন। স্ত্রীলোকদের কথা দূরে থাক, সে অবস্থায় পুরুষেরাই অধিক দিন রক্ষা পায় না। আণ্ডামানের মধ্যে চল্লিশ বৎসর বয়স কোন পুরুষেই অতিক্রম করিতে পায় না, সেই বয়সের পূর্ব্বেই তাহাদের বলক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, আর তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সুতরাং মরিতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের কথা বাহুল্য। এস্কুইমো জাতির মধ্যে দেখা যায় স্বামী না থাকিলে বয়স্থারা একেবারেই বাঁচে না। অনেক বর্ব্বর জাতির মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রী যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ অন্য কিছুই নাই। এই সকল দুর্দ্দশা বহুপত্নীর দ্বারা কতকাংশে মোচন হয়। বহু-পত্নীতে সকলেই স্বামী পায়, স্বামীর আশ্রয়ে স্ত্রীলোকেরা অপেক্ষাকৃত কিছুকাল বাঁচিতে পারে।

বন্য অবস্থায় বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক, কিন্তু সকল দেশে, সকল অবস্থায় তাহা নহে। মরুভূমি অঞ্চলে বহু স্ত্রী বড় কষ্টদায়ক। যথায় বহুশ্রমেও স্ত্রীগণ আপন আপন উদরান্ন উপার্জ্জন করিতে পারে না, তথায় বহু স্ত্রী অসম্ভব। যাহারা মরুভূমে থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বহুপত্নী গ্রহণ করে তাহাদের অন্নাভাব বৃদ্ধি পায়, সন্তান সন্ততিরা সুতরাং প্রতিপালিত হয় না; দুই এক পুরুষের মধ্যে তাহাদের বংশলোপ হইয়া যায়।

যে আচার ব্যবহার এক সমাজের উপযোগী, তাহা যে অবশ্য অন্য সমাজের উপযোগী হইবে এমত মনে করাই ভ্রম। এই ভ্রম আমাদের দেশে ইদানীং অতি প্রবল হইয়াছে।

এক সমাজে বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক দেখিয়া অন্য সমাজে তাহা জোর করিয়া প্রচলিত করিলে, সে সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে বহুপতিত্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে তিব্বৎদেশের পক্ষে বহুপতিত্ব সম্পূর্ণ উপযোগী! যদি তথাকার অধিবাসীরা এক্ষণে সকলে একবাক্যে বহুপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বহুপত্নীত্ব প্রচলিত করে, তাহা হইলে তিব্বৎদেশে আপাততঃ হঠাৎ প্রজাবৃদ্ধি হইবে। প্রজা বৃদ্ধিতে অন্নাভাব হইবে। তথায় যে সংখ্যক লোকের ভক্ষ্য উৎপন্ন হইতে পারে, এক্ষণে কেবল সেই সংখ্যক লোকের জন্ম হইয়া থাকে। বহুপতিত্ব দ্বারা জন্ম সম্বন্ধে এই বন্দোবস্ত বহুকাল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তৎবিরুদ্ধে এখন বহুপত্নীত্ব দ্বারা লোকের সংখ্যা বাড়াইলে ভক্ষ্য অকুলান হইবে, সকলেই মরিবে। যদি সভ্যতার অনুরোধে তথা হইতে বহুপতিত্ব উঠাইতে চাও, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় কেবল গলাবাজি না করিয়া প্রথমতঃ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কর। যদি তাহা করা সম্ভব হয় এবং যদি কৌশলে সে শক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর বহুপত্নীত্ব কিম্বা এক পত্নীত্বের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গও আবশ্যক হইবে না, যাহা সেই অবস্থার উপযোগী তাহা আপনা আপনি উদ্ভাবিত হইবে। সমাজ তাহা আপনিই উদ্ভাবন করিবে। তিব্বৎদেশের বহুপতিত্ব কেহ কখন অনুরোধ করিয়া বা বক্তৃতা করিয়া প্রচলিত করায় নাই। যাহা আবশ্যক এবং সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী তাহা বহুদিন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে আপনিই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের সামাজিক নিয়মাদি দেখিয়া আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত যুবারা তাহা অনুকরণ করিতে গেলে এই সকল কারণে সে উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যাহা এখন আছে, তাহা পরেও থাকিবে। অন্যথার কারণ ঘটিলে, তাহা আপনি অন্যথা হইবে। কদাচ বক্তৃতাদ্বারা অন্যথা হইবে না।

বলা হইয়াছে বন্য অবস্থায় বহুপত্নীত্ব মঙ্গলদায়ক। কিন্তু সেই অবস্থার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলে বহুপত্নীত্ব অনিষ্টদায়ক হইয়া পড়ে, যাহা অনিষ্টদায়ক তাহা

ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। এই জন্য বিদেশী ব্যবহার দেখিয়া স্বদেশে সেই ব্যবহার প্রচলিত করা কঠিন। যাহা সমাজোপযোগী নহে তাহা অবশ্য লোপ পাইবে, কোন মতে প্রচলিত থাকিবে না।

আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বহুপত্নীত্ব চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যতটা ছিল এখন আর ততটা নাই। এক্ষণে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অনায়াসে বলা যাইতে পারে এখানে বহুপত্নীত্বে অনিষ্ট ঘটে, কুলীনেরা তাহার উদাহরণস্থল। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কুলীনেরা বাঙ্গালার প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ধনবান্, বিদ্বান্, গুণবান্, কেহ বিদ্যালঙ্কার, কেহ বিদ্যাবাচস্পতি এইরূপ উপাধি তাঁহাদের ছিল। এই অবস্থায় দেবীবর ঘটক অকুলীন হেতু মাতৃসম্মুখে একদিন অপমানিত হন। তিনি সেই অবধি কুলীনের অধঃপতন চেষ্টায় দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সাত বৎসর পরে কৌলীন্য ধ্বংসের বীজ বপন করিলেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ হইয়াছেন রাষ্ট্র করিয়া সকলের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং একদিন কুলীনদের সমবেত করিয়া মেল বাঁধিয়া দিলেন। অর্থাৎ কে কোন্ গোষ্ঠিতে বিবাহ করিবে ইহাই নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ঘর বাঁধাবাঁধির পর দেখা গেল অনেক কন্যার বিবাহ হয় না। কোন গোষ্ঠিতে কন্যা বিস্তর কিন্তু তাহার "পালটী" গোষ্ঠিতে পুত্র অল্প। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ক্রমে বহুপত্নীত্ব আরম্ভ হইল। বহুপত্নীত্বের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের একেবারে অধঃপতন হইয়া গেল। যাঁহারা দেশের শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারা এখন দেশের অপকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, আছে কেবল অভিমান। আজন্ম পরান্নে প্রতিপালিত, পিতৃস্নেহে, পিতৃযত্নে বিবর্জ্জিত। বন্য অবস্থায় যখন বহুপত্নীত্ব প্রচলিত থাকে, তখন পিতা অপরিচিত বলিয়া সন্তানের যে দুর্দ্দশা ঘটে, কুলীন বংশীয়দের বাঙ্গালায় সেই সকল দুর্দ্দশা ঘটিতে লাগিল। হতভাগ্যদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, সংসার নাই, আবার, বলিলে বলা যায় যে তাহাদের বিবাহও নাই। তাঁহারা যে বিবাহ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সে বিবাহে কেবল মন্ত্রপড়া মাত্র। আমরা একবার একটী কন্যাকে পুষ্পবৃক্ষের সহিত বিবাহ দিতে দেখিয়াছিলাম; কন্যাটী বড় হইল, পুষ্পবৃক্ষও বড় হইল, কিন্তু পুষ্পবৃক্ষ কখন কন্যাটীকে লইয়া সংসার করিল না। দেখিতাম কন্যাটী মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃক্ষে জল দিত; লোকে জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিত আমি কুলীনের স্ত্রী। সত্য কথা!

কুলীনদের অধঃপতন দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে বহুপত্নীত্ব আর বাঙ্গালার উপযোগী নহে।

কুলীন ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় মধ্যে রীতিমত বহুপত্নীত্ব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না; যাঁহারা পুত্র কামনায় বা কোন মন্ত্রণায় পড়িয়া একাধিক বিবাহ করেন তাঁহাদের লইয়া বহুপত্নীত্বের ফলাফল বিচার হয় না।

আমাদের দেশে এক্ষণে কেবল এক প্রকার বহুপত্নীত্ব প্রচলিত। এই জাতীয় বহুপত্নীত্বে পত্নীরা প্রায়ই পরস্পর নিঃসম্পর্কীয়া। কিন্তু পূর্ব্বে সহোদরারাই সপত্নী হইত, একজনের সহিত সমুদয় সহোদরার বিবাহ হইত। জ্যেষ্ঠা ভগিনী যাহার স্ত্রী, কনিষ্ঠাও তাহারই স্ত্রী। সে প্রথা গিয়াছে কিন্তু সে অবস্থায় সম্ভাষণ কতকটা অদ্যাপি থাকিয়া গিয়াছে।

সাধারণতঃ মানবসমাজের একই ধারণা,—তাঁহাদের সমাজ প্রকৃতির অনুকরণ মাত্র। সুতরাং তাহার ফল এই হইয়াছে যে প্রকৃতি* বা স্বভাব সকল দেশে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। সেই অর্থ একটু ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে বড় গোল বাঁধিয়া যায়। বুঝা যায় যে প্রকৃতির মৌলিক অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের নামে প্রতিবাদে যেমন পাপাচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, স্বভাবের অর্থবিকৃতিতে তেমনি আমাদের রুচি ও নীতি সর্ব্বথা কলঙ্কিত হইয়াছে। এবং অনেক সময় ভ্রমাত্মক দর্শনশাস্ত্র বা ভ্রমসঙ্কুল ব্যবহারশাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রণীত হইয়াছে। স্বভাবের দোহাই দিতে পারিলে সকলেই একরূপ নিরাপদ। ধার্ম্মিকের প্রধান সহায় এই স্বভাব ;—Intuition বা সহজ জ্ঞান। পাপী অনেক সময় স্বভাবের দোহাই দিয়া বাঁচিতে চায় ; এবং যেখানে সমাজ বিচারক, সেখানে তাহার মুক্তি অনেক সময় নিশ্চিন্ত। ছেলে যদি পিতামহীর আদর পাইয়া বহিয়া গিয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তবে পিতার মন খুলিয়া তাহাকে শাসন করিবার যো নাই।—গৃহে মাতা দোহাই দিবেন সেই স্বভাবের। শাসনার্থী পুত্রকে বুঝাইয়া দিবেন যে ছেলেবেলায় তিনিও তেমনি দুরন্ত ছিলেন! যৌন কারণে অনুদিন সমাজে যে অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহার যথোচিত শাসনের দিকে আমাদের তত মনোযোগ নাই। কেন না সমাজ জানেন, প্রকৃতির শাসন কেবল কথার কথা মাত্র। এইরূপে দেখান যায় যে প্রকৃতির অতি কদর্থ সমূহ দুষ্ট শোণিতের মত সমাজ-শরীরের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত তাহা সমাজ-কণ্ঠে লাগিয়াই রহিয়াছে। তাহা জীর্ণ হইবার নহে ;—সহজে উদ্‌গীর্ণ হইবারও নহে।

প্রকৃতির এইরূপ অর্থবিকৃতিতে মানবসমাজ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে। নীতিবীর মিলের তাহা সহ্য হইল না। তাই তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের মত চিরাচরিত কুসংস্কার ভেদ করিয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রচার

* Nature : Vide Three Essays on Religion By J. S. Mill.

করিয়াছেন। তাঁহার "Liberty"র ন্যায় এই প্রবন্ধ অনেকের কাছে দৈব প্রসাদস্বরূপ গণ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে সেই মহৎ প্রবন্ধই অবলম্বন।

প্লেটোর রীতি অবলম্বন করিয়া মিল বিশেষ (particular) অর্থের দ্বারা, সাধারণ (general) অর্থ স্থির করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি প্রকৃতির অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া কোন্ পদার্থের প্রকৃতি কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই দেখাইয়াছেন। অগ্নি বা জল, উদ্ভিদ বা জন্তুবিশেষের প্রকৃতি কি? উত্তর—সেই সেই পদার্থের একীভূত শক্তি বা গুণই তাহার প্রকৃতি। অতএব এক পদার্থ অন্য পদার্থের উপর যে প্রণালীতে আপন শক্তি প্রয়োগ করে, অথবা অন্যের শক্তি দ্বারা যে প্রণালীতে পরিচালিত হয়, তাহাকেও সেই পদার্থের প্রকৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানবান জীবের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইলে, সাধারণ শক্তির উপর তাহার অনুভব শক্তি এবং হিতাহিত জ্ঞানের শক্তিও ধর্ত্তব্য। বস্তুবিশেষের প্রকৃতির অর্থ এইরূপে স্থির করিয়া প্রকৃতির সাধারণ অর্থ বুঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। সকল পদার্থের একীভূত শক্তি বা গুণসমষ্টির নামই প্রকৃতি। এই চরাচর বিশ্বে যে সকল ব্যাপার নিত্য ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিতে পারে, তাহারা ও তাহাদের কারণ সমূহ সেই প্রকৃতি। কারণসমূহের যে শক্তি পরম্পরা আজিও অপরিণতাবস্থায় রহিয়াছে তাহারাও সুতরাং পরিণত শক্তির মত প্রকৃতিরই অঙ্গ। মনুষ্য এত কাল ধরিয়া প্রকৃতির যে সকল ব্যাপারকে নিয়মিতরূপে এবং যথাসময়ে ঘটিতে দেখিয়াছে তাহাদিগকেই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম সাধারণ, আর কতকগুলি বিশেষ। মাধ্যাকর্ষণের যে শক্তি, তাহা সকলের পক্ষেই প্রযুজ্য, এজন্য সেটি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। জীবমাত্রের পক্ষে বায়ু ও খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, এই চিরজ্ঞাত সত্যের যদি ব্যভিচারস্থল না থাকে তবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের মত সাধারণ নিয়ম নহে,—প্রকৃতির বিশেষ নিয়ম মাত্র।

সুতরাং সহজ অর্থে, প্রকৃত এবং সম্ভব ঘটনাবলীর একীভূত নামকেই প্রকৃতি বলে। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে প্রণালীতে সংসারে ব্যাপার সকল ঘটিতেছে—তাহার কতক আমরা জানি, কতক বা জানি না—সেই প্রণালীর নামই প্রকৃতি।

প্রকৃতির এই সংজ্ঞাই ঠিক বটে কিন্তু তথাপি গোল মিটিল না। অর্থ সম্বন্ধে শিল্প (Art) ও প্রকৃতি (Nature) চিরদিন পরস্পরের বিরোধী। প্রকৃতির উপস্থিত অর্থে চিরদিনের সেই বিরোধ লোপ হইয়া যাইবার কথা। কেন না এখন

বুঝা যায় যে আর আর সকলের মত শিল্পও প্রকৃতির অঙ্গমাত্র। যাহা কিছু শিল্প তাহাই কৃত্রিম, সুতরাং তাহাই প্রাকৃতিক; শিল্পের নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব কিছুই নাই। কোন একটা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মনুষ্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়োগ করে। সেই নিয়োগের ফলে শিল্পের জন্ম। চিরদিন ধরিয়া হাজার চেষ্টা করিয়াও কেহ কখন নূতন সত্তার সৃষ্টি করিতে পারিল না,—কখন পারিবেও না। আমরা কেবল প্রাকৃতিক সত্তার সহায়ে যাহা কিছু করিতে পারি। প্রকৃতির যে যে শক্তি-প্রভাবে প্রবল ঝড়ে গগনস্পর্শী বৃক্ষও উন্মূলিত হয় এবং জলে ভাসিতে থাকে, সেই সেই শক্তি সহায়ে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া আমরা বিজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাই। আরণ্য-কুসুম সকল নির্জ্জনে, নীরবে ফুটিয়া, আপনাদের রূপ সৌরভের পরিচয় কাহাকেও না দিয়া যে নিয়মে ফলে পরিণত হয়, আমাদের জীবনযাত্রার উপায় স্বরূপ শস্য সকলও সেই নিয়মে জন্মে। এই সকল ব্যাপার মানুষের কাজ অতি সামান্য;—কেবল জিনিষগুলিকে স্থানান্তরিত করা মাত্র। দুইটা জিনিষ স্বতন্ত্র আছে, আমরা মিলিত করিলাম; অথবা মিলিত আছে, আমরা পৃথক করিয়া দিলাম। এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে, প্রকৃতির নিদ্রিত শক্তি সকল সুপ্তোত্থিত মহাবল সিংহের মত জাগিয়া উঠে এবং তখন কার্য্যে পরিণত হয়। সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের যে কিছু বল, যে কিছু বিকাশ; শারীরিক যে কিছু সামর্থ্য, যে কিছু স্ফূর্ত্তি সে সকল আর কিছুই নহে; প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র।

এইরূপে মিল প্রকৃতির দুইটী প্রধান অর্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক অর্থে অন্তর ও বহির্জগতের শক্তিসমূহ এবং তাহাদের কার্য্যগুলি প্রকৃতি। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র বিরহিত;—যাহা কিছু মানবসহায়তা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি। বলা বাহুল্য, যে নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শীর নিকট এখনও গোল মিটিল না। যাহা হউক, বিচারের পথ এক্ষণে নিষ্কণ্টক হইয়া আসিয়াছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে স্বীকৃত অর্থ দুইটার মধ্যে, কাহার দোহাই দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে প্রশংসা ও নীতির আদর্শ মনে করে? কোন্ প্রকৃতি দেবতার নাম গ্রহণ করিলেই পাপ পুণ্যের ভেদ থাকে না, সুন্দর, কুৎসিত সব সমান হইয়া যায়? আর মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত বিষম লোকলজ্জা ভয় পর্য্যন্ত কাহার নাম মাহাত্ম্যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে?

প্রকৃতির প্রথম অর্থ,—যাহা কিছু সংসারে আছে তাহাই;—সকল পদার্থের একীভূত শক্তি ও গুণসমূহ। আমরা কি এই প্রকৃতির অনুকরণ করিতে যাই? কিন্তু এজন্য আবার অনুরোধ কেন? যাহা না করিলে নহে, গত্যন্তর নাই, তার জন্য অনুরোধ করিলে যেন তামাসা করা হয়। উপস্থিত অর্থে, ইচ্ছার

অনিচ্ছায় সকলেই প্রকৃতির অন্ধ দাস মাত্র। এমন কাজ কিছুই হইতে পারে না, যাহা এই অর্থে প্রকৃতিসঙ্গত নহে। কার্য্যমাত্রেই প্রাকৃতিক শক্তির আন্দোলন এবং তাহার পরিণাম, প্রকৃতির কোন না কোন নিয়মের অধীন। মনে করুন আমার আহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আহারের চেষ্টা ও উদর পূর্ত্তি দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমি যদি ক্ষীরের বাটী ভাবিয়া বিষপাত্র হস্তে লইয়া ক্ষুধার জ্বালায় সদ্য-প্রাণহারক হলাহল পান করিয়া ভূতের দেহ ভূতে মিশাই, তবে কি আমি কোন অস্বাভাবিক কার্য্য করিলাম? অতএব প্রকৃতিকে এই অর্থে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া হাস্যভাজন হওয়া উচিৎ নহে। আমরা এই মাত্র শিক্ষা দিতে পারি যে বিশেষ কার্য্যে বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়োগ করা বিহিত। মনে করুন কেহ অতি সঙ্কীর্ণ অথচ অরক্ষিত সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইবেন। সেখানে যদি তিনি সমসংস্থিতির নিয়মের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পার হইতে চান, তবে তাঁহার কোন ভয় নাই। কিন্তু তখন মাধ্যাকর্ষণশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নিমজ্জন নিশ্চিত।

অতএব এই অর্থে প্রকৃতিকে মানুষের আদর্শ বলা বাতুলের কাজ। তথাপি এই অর্থেও আমাদের পরম লাভ আছে। বেকন্ বলিয়াছিলেন যে আমরা প্রকৃতির আজ্ঞাবহ হইয়াও উহার প্রভু হইতে পারি। প্রকৃতির সম্যক্ শক্তি হইতে আমরা আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না বটে, কিন্তু যত্ন করিলে বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারি। অবস্থা পরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং কোন লক্ষ্য সাধন করিবার সময়, উচিৎ বোধ হইলে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা প্রাকৃতিক শক্তিবিশেষের বলের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি। এই কথা বুঝিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করা মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য। এতদিন ইহা বুঝিলে মনুষ্য উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিত। সেই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই একদিন ইউরোপের ঘোর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমির মধ্যে জ্ঞানচক্ষুতে বেকন ভাবী জ্যোতির আভাস দেখিয়াছিলেন। সে কথা বুঝেন নাই বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখের ভাবনায় সুখময় শান্তিময় সংসার ছাড়িয়া, সোণার ভারতবর্ষ শ্মশানে পরিণত করিয়া, কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। *

---

* লেখক প্রবন্ধে স্বাক্ষর করিয়াছেন, ভরসা করি কোন পাঠকই ইহা সাধারণতঃ বঙ্গদর্শনের মত বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। "আর্য্য ঋষিরা ভারতবর্ষকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন"—ঠিক ইহার বিপরীত মতই বঙ্গদর্শনে অনেক সময়ে সমর্থিত হইয়াছে। বং সং

মানুষের ধৈর্য্য ও বুদ্ধিবৃত্তির যত বিকাশ হইবে, ততই মানুষ প্রকৃতির নিয়মাবলী আলোচনা করিয়া নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে শিখিবে। প্রকৃতির অনুকরণ করিবে না। অনুকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির। ভাল, দেখা যাউক প্রকৃতির দ্বিতীয় অর্থে এই নীতির ভাব ঠিক থাকে কি না।

দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মনুষ্যগন্ধমাত্র বিরহিত ;—সংসারে যাহা কিছু মানব-সহায়তা ব্যতীত নিষ্পন্ন হয়, তাহাই প্রকৃতি। এ অর্থে কি প্রকৃতি আমাদের অনুকরণীয় ? একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, অনুকরণের কথাটা এ স্থলেও অর্থহীন। প্রকৃতিকে যদি অনুকরণই করিব, তবে উহাকে নিজের উপযোগী করিবার জন্য পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত করিয়া লইব কেন ? সংসার ধর্ম্মের সকল ব্যাপারই ত কৃত্রিম। কৃত্রিম যদি প্রাকৃতিক অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে হিতকর না হইত, তবে ইষ্টক প্রস্তরে সৌধমালা রচনা করি কেন, বন জঙ্গল কাটিয়া অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মাণ করি কেন, প্রবল প্রবাহের উপর সেতু নির্ম্মাণ করি কেন, ছত্রের আশ্রয়ে তাপ জলের অত্যাচার নিবারণ করি কেন, আহার্য্য পাক করিয়া লই কেন ? মানুষের পক্ষে প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, সর্ব্বসন্তোষবিধায়িনী হইলে, মানুষকে এত পরিশ্রম করিতে হইত না। সংসারের ঘোর জীবন-সংগ্রামে তাহা হইলে মানুষকে প্রতিপদে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।

আবার, আমরা যাহাকে নীতি বলি প্রকৃতিতে তাহার সকলই বিপরীত। যে সকল কার্য্য অহরহঃ প্রকৃতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ তাহার সহস্রাংশের একাংশ করিলেও গুরুতর শাস্তি পাইবার যোগ্য। আমরা কি সাধারণ জন্তু-গণের আচার ব্যবহার দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বসিব ? যে আত্মসংযম, যে সতীত্ব সমাজে নরনারীর ভূষণ, যাহার বলে ইহসংসার স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতির কথা শুনিতে গেলে ত তাহা বিসর্জ্জন দিতে হয়! দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতিতে সদাই দেখিতে পাই। সিংহ পশুর রাজা—কেন না সিংহ বলবান্, একাই অনেক জন্তুর জীবন সংহার করিয়া উদর পূর্ত্তির সামর্থ্য শরীরে ধারণ করে। ভাল, প্রকৃতির অনুকরণ কর্ত্তব্য হইলে আমরা অত্যাচারী জমীদারের কবল হইতে নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত কপর্দ্দকশূন্য, দুর্ব্বল অনক্ষর প্রজাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য চীৎকার করিয়া মরি কেন ? প্রকৃতি বলিতে কোন্ ভাগ অনুকরণের উপযুক্ত ? প্রকৃতি যখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভীষণ বাত্যা বা বন্যার উচ্ছ্বাসে অসংখ্য জীবের প্রাণ নাশ করেন, অসংখ্য জীবের জীবিকা হরণ করিয়া প্রাণনাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন, তারপর অবিচলিতচিত্তে,

রাক্ষসী-গাম্ভীর্য্যে শান্তি লাভ করেন, প্রকৃতির সেই ভাব, সেই বেশ আদর্শ করিয়া কি কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিব? শুধু তাহাই নহে। প্রকৃতিকে অনুকরণ করিতে গেলে কি মনুষ্যকুলরত্ন সাম্যবাদিগণ কোন কাজ করিতে পারিতেন? রুসো সেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কৃত কার্য্যে যত অনিষ্ট হইয়াছে, ইষ্ট তত হয় নাই। বৈষম্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, সাম্য তাহার ব্যভিচার মাত্র। রোমের জগদ্‌গুরু পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিতেন না যে মানুষে মানুষে সমান এবং দাসত্ব মহাপাপ। এ সংসারে জলে জল বাঁধে, তৈলাক্ত শিরে তৈল বর্ষিত হয়। যাহার ধন সম্পদ মানের অবধি নাই, সেই আবার অধিকতর সম্মান, অধিকতর সম্পদ লাভ করে। যে সুন্দর, যে পবিত্র, যে উন্নত—সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা এবং উন্নতি তাহার নিত্য সহচর। আর যাহার ভাঙ্গা কপাল? তাহার কপাল আরও ভাঙ্গে। এক বার যে পাপ করিল, আর তার উদ্ধার নাই। কোথা হইতে পাপের শক্তিসমূহ একত্রিত হইয়া দুর্দ্দম বলে তাহাকে পাপের পথে আরও অগ্রসর করে। "যেমন জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়।"

মুখে স্বীকার করুক বা না করুক কার্য্যে মানুষ প্রতিপদে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সামাজিক সুখে সুখী হইয়াছে। একদিন সমবেত শিষ্য-সম্প্রদায়কে নরদেব সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন, "আমি প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিয়া তবে নীতির বলে বলীয়ান্ হইয়াছি।" যিনি মহাত্মা তিনিই তাহা করেন। যাহাকে আমরা instinct বা পশুবুদ্ধি বলি তাহা অবশ্য জীবমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ। এই পশুবুদ্ধি কি ধর্ম্মভাবের সহায়কারিণী? পশুবুদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট শক্তি হিংসাবৃত্তি। এই হিংসাবৃত্তি সংসার-বন্ধনের, সামাজিক শুভস্থাপনের একমাত্র বিঘ্নকারিণী। প্রতিপদে এই বৃত্তিকে দমন করিয়াছে বলিয়াই মানুষ এত উন্নত হইয়াছে। এখন মানুষ পরের দুঃখে আত্মবিস্মৃত হয়, পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলী দেয়। মহাত্মা ডার্ব্বিন দেখাইয়াছেন যে কালক্রমে মনের সামাজিক বৃত্তিসমূহ শিক্ষা প্রভাবে পশুবৃত্তির উপর আশ্চর্য্য আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। যাহাকে আমরা হিতাহিত জ্ঞান বলি তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সামাজিক বৃত্তির পূর্ণ শক্তি মাত্র। মানুষ যদি প্রকৃতিস্রোতে ভাসিয়া আত্মসংযম করিতে না পারিয়া কখন পাপ করিয়া বসে, তবে এই সামাজিক বৃত্তি ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে শাসন করে। এইরূপে দেখান যায় যে আমরা

প্রকৃতিকে যতই দমন করিতেছি, ততই সংসারে পাপস্রোত কমিতেছে। যে নৈতিক বল, যে পবিত্রতা আমাদের সকল সুখের আকর, তাহা মানুষেরই সৃষ্ট;—প্রকৃতি তাহার নেতা বা বিধাতা নহে।

অতএব প্রকৃতির ঠিক অর্থ আমরা যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, ততই মঙ্গল। মানুষ এখন প্রকৃতিকে পবিত্রতারূপিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী - সুতরাং আমাদের আদর্শ—বলিয়া জানে অথচ কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করে। অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দেয় যে এমন দিনও ছিল যখন লোকে ভাবিত যে শিল্পীরা ঐশী শক্তির অবমাননা করে। পোত নির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রা একদিন ইউরোপে অধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধির অন্তরালে ঐরূপ একটা কিছু রহস্য লুকান আছে বোধ হয়। প্রকৃতিকে সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি জানিয়াও যখন মানুষেরা প্রতিপদে প্রয়োজনানুবোধে তাহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোভিত করিয়া লইতে বিমুখ হয় নাই, তখন প্রকৃতির ঠিক অর্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় অনেক স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে। মিলের ধ্রুব বিশ্বাস তাহাই। বাস্তবিক যে নৈতিক শিথিলতা, পাপের প্রতি যে অন্যায় সহানুভূতি আজিও মানবসমাজ কলঙ্কিত করিতেছে, প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ সাধারণের ধারণা হইলে তাহা আর থাকিবে না। মানবসমাজের সেই উচ্চ ভাব, সেই অপাপবিদ্ধতা কল্পনা করিলেও অপরিমেয় সুখ আছে।

অন্যের কথা যাহাই হউক, স্বভাবের দোহাই দিয়া সাধারণতঃ কাব্য-শাস্ত্রের প্রতি বড় অবিচার করা হয়। চিরদিন সেইরূপ অবিচার হইয়া আসিতেছে। প্রায় সাড়ে পনর আনা লোকের ধারণা যে কাব্য কেবল প্রকৃতির যথাযথ চিত্র মাত্র। একবার তাহাদের মনে হয় না যে প্রত্যক্ষ থাকিতে নকল দেখিবার জন্য পুস্তকের অন্বেষণ করিব কেন? যে হিমালয় দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে, সে আবার পরিশ্রম করিয়া কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা পড়িতে যাইবে কেন? অতএব কাব্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকৃতি নহে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য;—প্রকৃতি অনন্ত সৌন্দর্য্যরূপিণী। তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিচ্ছিন্ন এবং সে সৌন্দর্য্য নৈতিক বলে সুকুমার নহে। কাব্যের সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় বিভাসিত এবং কাব্যের সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কাব্যের সৃষ্টি অপূর্ণ বহির্জ্জগতের ভিত্তিতে নির্ম্মিত বটে কিন্তু সে সৃষ্টি উন্নততর। বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রবাহে অন্তর-সৌন্দর্য্য প্রবাহ মিশাইয়া কবি অপূর্ব্ব সৃষ্টির অবতারণা করেন। তিনি শারীরিক

বলে ধর্ম্মবল প্রয়োগ করেন। যে রাম বা যুধিষ্ঠির কবির মোহময় শক্তির ফল; সংসারে, প্রকৃতিতে তাহা সুলভ নহে। সীতার সেই পবিত্রতা, দেসদিমোনার সেই সতীত্ব গর্ব্ব, শকুন্তলার সেই কমনীয়তা, মিরন্দার সেই সরলতা অপার্থিব;— প্রকৃতিতে ত তেমন কিছু দেখিতে পাই না! যে কবি সে কথা মানেন না, তাঁহার স্থান বটতলায় নির্ণীত হইয়া থাকে।

এ সংসারের প্রধান শিক্ষক কবিগণ। মনুষ্যলোকে তাঁহাদের ন্যায় মানসিক শক্তিসম্পন্ন আর কেহই নহে। ধার্ম্মিক বা নীতিবেত্তা, দার্শনিক বা ব্যবহারশাস্ত্র-বিৎ, প্রকৃতির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাই মনুষ্য গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া প্রকৃতিকে চিরদিন আদর্শ মনে করিয়া আসিয়াছে। কেবল জগৎগুরু কবিগণের সে ভ্রম হয় নাই। তাঁহারা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে প্রকৃতি কদাপি অনুকরণীয় নহে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সভার কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ক বিধি। হৌস অফ কমন্স সভার সহকারী ক্লার্ক শ্রীযুক্ত পালগ্রেভ সাহেব বিরচিত 'চেয়ারম্যান্‌স্‌ হ্যাণ্ডবুক' নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত। ভবানীপুর যন্ত্র। মূল্য ।০ আনা।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন লিখিবার বিষয় এত থাকিতে, এ গ্রন্থ কেন? অনুবাদক তাহার উত্তর কতকটা দিয়াছেন। "এতদ্দেশে এখন যে সমস্ত সভা ও কমিটি সংস্থাপিত হইতেছে তাহার আদর্শ ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট। সাক্ষাৎকল্পে না হউক নিগূঢ় সম্বন্ধে বটে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল সভার কার্য্যনির্ব্বাহের সাহায্য, অন্ততঃ পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালী ও তৎসংসৃষ্ট ইংলণ্ডের ইতিবৃত্ত বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে এই সংস্কার বশতঃ এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পুস্তকের সারকথা আমাদিগের স্বদেশবাসীগণের বোধগম্য করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রণালী অবলম্বন করা অসাধ্য না হইতে পারে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে মূল গ্রন্থকারের যে ব্যুৎপত্তি এবং খ্যাতি আছে তাহার আশ্রয় পাইবার আশা করিলে অনুবাদ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

"অনুবাদক পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীকে যে একান্তচিত্তে ভক্তি করেন এমন নহে। কিন্তু ঐ প্রণালী বুঝিলে এদেশের লোক স্বকীয় বুদ্ধিমতে দলাদলি করিবার জন্য সম্ভবতঃ একটি সুচারু পদ্ধতি ক্রমশঃ সংস্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন। পল্লিগ্রামের দলাদলি এখনকার উপহাস স্থল হইলেও উহাই আমাদিগের প্রকৃতি সঙ্গত অনুমান হয়; ঐ প্রথার পূর্ণ লোপ সম্ভব বোধ হয় না, এবং তাহা বাঞ্ছনীয় কিনা আরও সন্দেহের স্থল। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যও বাস্তবিক আমাদিগের দলাদলি হইতে বড় বিভিন্ন নয়। পরন্তু এ সমস্ত ঘরের কথা। ইংরাজিমতে ইংরাজের সঙ্গে একত্রে সভায় কার্য্য করিতে

হইলে এই সকল পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মের প্রতি উপেক্ষা করা বর্ত্তমান অবস্থায় সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।"

এ দেশে আজিকালি বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা রোডশেষ কমিটির মেম্বর, ব্রাঞ্চ রোডশেষ কমিটির মেম্বর, মিউনিসিপল কমিটি, ডিস্পেনসরি কমিটি, ড্রেনেজ কমিটি প্রভৃতি কমিটির মেম্বর, সম্প্রতি Self government ওরফে "আত্মশাসন" ওরফে "স্বায়ত্ব শাসনের" আবির্ভাবে এই শ্রেণীর লোক আরও বাড়িবে। তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র লোক সর্ব্বদা এখানে এসোসিয়েশন, ওখানে ক্লব, সেখানে পব্লিক মিটিং প্রভৃতিতে সমবেত হয়েন। তাঁহারা অনেকেই জানেন না, যে এই সকল কার্য্যপ্রণালী কোথা হইতে আসিল? মোশন, ভোট, আমেণ্ডমেণ্ট, প্রভৃতির মূল কোথায়? সকলই সেই পার্লিয়ামেণ্ট কার্য্যবিধির অনুকরণ। সেই কার্য্যবিধি সবিশেষ অবগত না থাকাতে অনেকেই রীতিবিপরীত কাজ করিয়া সভামধ্যে উপহাসাস্পদ হয়েন। অতএব এ দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এ সকল নিয়ম অবগত হওয়া উচিৎ—কেন না সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল সভার কাজে লিপ্ত। বিশেষ সেল্‌ফগবর্ণমেণ্টের বিস্তারে এইরূপ কাজের বিশেষ বিস্তার হইতে চলিল: এখন এইরূপ গ্রন্থ সকলের ঘরেই থাকা চাই। এ সময়ে এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারের জন্য আমরা অনুবাদককে ধন্যবাদ করি। অনুবাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুপণ্ডিত লেখক, সুতরাং অনুবাদের প্রশংসা করা বাহুল্য।

বন-প্রসুন। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিচরিত। কলিকাতা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র। ১৮৮২। মূল্য ৸০ আনা।

"বনপ্রসূন" নাম শুনিয়াই পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন এখানি কাব্য গ্রন্থ; ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে। আর "মুখোপাধ্যায়" শব্দ ব্যবহার সত্বেও পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, ইহা কোন মুখুয্যা মহাশয়ের লিখিত নহে—শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীর রচিত। শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী, দেবী সংজ্ঞায় যে অসন্তুষ্ট, শচী সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতি যে নামের অনুরাগিণী, তাহা ছাড়িয়া, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়া" হইতে কামনা করেন, আমরা এ রুচির প্রশংসা করি না। কিন্তু কোন্দল ছাড়িয়া দিই—ও বিদ্যায় আমরা শ্রীমতীগণের সমকক্ষ হইবার প্রত্যাশা রাখি না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে। স্ত্রীলোকের কবিতার বেশী প্রশংসা করিতে আমরা বড় ভয় পাই—পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল, গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসেন! তাহা হইলে গরীব পুরুষের দল একমুঠা অন্ন পাইবে না।

অতএব শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, আমাদের একটু মার্জ্জনা করিবেন—আমরা একটু কম করিয়া প্রশংসা করিব। পুরুষ গ্রন্থকার হইলে আমরা এ ভিক্ষা করিতাম না; পুরুষের এত ক্ষমাগুণ প্রকাশের ক্ষমতা নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মিনিটে মিনিটে পাঁচ দিক হইতে পঞ্চাশ রকম প্রশংসা পাইতেছেন—রূপের প্রশংসা—বস্ত্রালঙ্কারের প্রশংসা, গৃহিণীপনার প্রশংসা—রান্নার প্রশংসা—শিল্পকার্য্যের প্রশংসা—আর ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিনা দাবি দাওয়াতে হরিয়েক রকমের প্রশংসা দিনেও রাত্রে পাইয়া থাকেন। তাঁহারা কাজে কাজে বাজে লোকের বাজে প্রশংসা একটু কম করিয়া লইতে পারেন। অতএব আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন,বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালার মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায়, অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙ্গদার—লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা—আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য। আমরা এ কবিতাটি কিছু বাদ দিয়া প্রায় সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম—গ্রন্থকর্ত্রী আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ;—

"কে নায় কে খায় অই, করে দড়বড়,
বাঙ্গালীর বাবু! হায় বড় তাড়াতাড়ি;
সাহেব করিবে রাগ, বেলা হ'লে যেতে,
তাই এত তাড়াতাড়ি, নাইতে খাইতে।
চাপকান পেণ্টালুনে, পোষাকের ঘটা,
শিরে শোভে শোলা পাকড়ী, শাল দিয়ে আঁটা;

চেহারির মত দৃশ্য কিবা চমৎকার!
দিতে কিছু দেরী হ'লে করেন চীৎকার,
সে সময় ছেলে যদি বাবা ব'লে ডাকে,
মারিতে উদ্যত হ'য়ে খিঁচে যান তাকে।
তাড়াতাড়ি করে অন্য সব কর্ম্ম হয়,
তামাক টানিতে থাকে, যথেষ্ট সময়,
টানিতে টানিতে ধূম, দয়া হ'লে মনে,
শিশুরে সান্ত্বনা করা উচিৎই পানে।

গাড়ী ভাড়া পাঁচ পয়সা, চল্‌তে হ'ন কাবু,
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু!
দশ্‌টা হতে চার্‌টাবধি দাসবৃত্তি করা
সারাদিন খাটতে হয় দাসত্ব পসরা।
উকীল, ডেপুটী কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সব্ জজ কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেটের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।
"বড় কর্ম্ম করি" ভেবে, দেমাকে অজ্ঞান,
এদিকে সাহেব দেখে, হৃদি কম্পমান;

সাহেব দেখে মান্য করা, ইংরাজি বুলি,
হদ্দ হলো নিজ ভাষে, দেন তারে গালি ;
শিখিয়া ইংরাজি ভাষা, বড় অহঙ্কার,
তাড়াতাড়ি যান দিতে ইংরাজি লেক্‌চার,
কহিতে ইংরাজি বুলি, খান হাবুডুবু,
শুনে যা, ইংরাজি কয়, বাঙ্গালীর বাবু।

হায় হায় অই যায় বাঙ্গালির বাবু!
খোলা হয় ধরা চূড়া গোলামির ভার,
ঘরে এলে খোলা গায়ে চটিতে বাহার,
পরিধান থান ফাড়া চাকর কোঁচানে,
সিলিপার কাজ পায়ে চটি ঠনঠনে।
আয়েস তামাক পানে, তাকিয়া হেলন,
চঁকা-নল মুখে দিলে স্বর্গে আরোহণ।
বৈঠক্‌খানা গুলজার, হাসির ধমকে ;
পাপোশেতে খুথু ফেলা, পিক্‌দানি সম্মুখে।
নাহি কোন ধর্ম্ম চর্চা, শুয়ে গীত গান,
মধ্যে মধ্যে হুংকারেন "পান তামাক আন"
সম্মুখে সেজের আলো, ভ্যারাণ্ডার হেলে
মদ্যানি ফলান হয়, দুষ্ট কেহ এলে।
ইয়ার এলে খেলা হয়, পাশা কিম্বা গ্রাবু,
হায় হায় অই বোসে বাঙালির বাবু!

হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু!
ছড়ি হাতে, সুজ পায়ে, মুখেতে চুরোট,
কাহারো সাহেবি চাল পরা হ্যাট কোট,

• • • •

ফর্শা হ'তে বড় সাধ সাবাং মাখা কোসে,
উঠে যায় ছাল চামড়া, তোয়ালেতে ঘোসে।
সোজা সিঁতে কাটা চুল, আল্‌বার্ট ফ্যাশান,
সেণ্ট মেখে গন্ধগোকুল, হন মূর্ত্তিমান্।

• • • •

নাটক দেখিতে সাধ সখে ভরা প্রাণ,
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিটুকু, গালে ভরা পান ;
এক্‌সেলেণ্ট এন্‌কোরে যেন ছাড়ে বৃষ নাদ,
ধূম টেনে দমরাখা, দোকানিপ্রসাদ।
ঋণে মাথা ডুবে আছে, সখে মত্ত তবু
হায় হায় অই যায় বাঙালির বাবু!

যিনি নাহি মদ খান, তাঁর অহঙ্কার
বুঝি বা যে করিলান ভারত উদ্ধার,
নাম লিখায়ে ব্রাহ্ম হন, ধর্ম্ম গজে পেটে,
দোকানি পশারি তাক বক্তৃতার চোটে,
স্বাধীন করিতে নারী হন ব্রহ্মজ্ঞানী
আনেন বাহির করে কুলের কামিনী ;
মদ্যপায়ী মদ খেয়ে, খুলে দেয় মন
ভারত উদ্ধার হেতু হয় আস্ফালন,
কথা কন খই, মুড়কী, ইংরাজি, বাঙালি,
মন খুলে ইংরাজেরে দেন গালাগালি ;
লীলা খেলা বাবুদের যত রাত্রিকালে,
মুখ মুচে ভদ্র হন সকাল হইলে।

• • • •

• • • •

এখন আমাদের ছুইটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম, "বাঙ্গালি বাবু" দিগকে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনীর এই পদগুলির আঘাত, সহ্য হইবে কি? দ্বিতীয় হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি, মিষ্ট লাগে কি? সেবার মহারাজ্ঞীর পুত্র ভারতবর্ষে আসিলে, কবি যাত্রা পাইয়াছিলেন, তাহার অধিক কিছু হইল কি?

উপসংহারে শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবীকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কবিতাটির কিয়দংশ পরিত্যাগ করিলাম কেন, বুঝিয়াছেন কি? আমাদের বিবেচনায় বন-

প্রসূনের অনেক স্থান এইরূপ পরিত্যজ্য ; দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। পুরুষে যাহাই লিখুক, কুলকামিনীগণের ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করাই উচিত।

দুই শিকারী। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই কিন্তু তাহা গোপনও নাই। ইনি "ঘোড়ার ডিম" হইতে নাটক পর্য্যন্ত সকলই লেখেন। এরূপ অবিশ্রান্ত লেখক বাঙ্গালায় অতি অল্প। অন্য দেশে হইলে ইনি ধনী হইতে পারিতেন। কিন্তু এদেশে লোকে বড় পড়ে না, পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও পড়িতে বড় পায় না। মফস্বলে গ্রন্থ বিক্রয়ের উপায় এপর্য্যন্ত রীতিমত হয় নাই। সুতরাং এ সকল লেখকের শ্রম বৃথা হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপায় ভবিষ্যতে আপনিই হইবে, কিন্তু আপাতত তাহা করিতে হইলে কিছু যত্ন আবশ্যক। যে সকল গ্রন্থকার অপর সাধারণ সকলকে পড়াইবার জন্য এত শ্রম করিতেছেন তাঁহাদের আর একটু শ্রম করা উচিত। মফস্বলের পথ পরিষ্কার আছে, কেবল কোথায় কোন নূতন পথ আবশ্যক কি না তাহা একবার দেখা চাই। পূর্ব্বে যে সকল উপন্যাস শুনাইয়া পিতামহীরা শিশুদিগকে "ঘুম পাড়াইতেন" সেই সকল উপন্যাস অবলম্বন করিয়া "দুই শিকারী" লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সাতমুণ্ড রাক্ষস আছে, ডাকিনী আছে, মায়াবন আছে, ইহাতে শৃগাল কুক্কুর ঔষধ জানে, তাহারা পয়ারে কথা কয়, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দেয়। বালক ও ইতর লোকেরা যাহা শুনিতে চায় তাহা ইহাতে যথেষ্ট আছে। তাহাদের বোধগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার গল্পটি যথেষ্ট সরল ভাষায় লিখিয়াছেন।

নবম বর্ষঃ তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালিদিগের যে বিষয়ে যতদূর উন্নতি হউক না কেন, কাপুরুষ বলিয়া যে তাহাদের কলঙ্ক আছে, সে কলঙ্কের অপনয়ন না হইলে, তাহারা মানবজাতির মধ্যে কস্মিন্‌কালে গণনীয় হইবে না।

বাঙ্গালিদের শারীরিক দৌর্ব্বল্যই তাহাদের পৌরুষাভাবের প্রধান কারণ। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন কখন সাহসী হয় বটে, এবং সবল ব্যক্তিও সময়ে সময়ে ভীরু হয়, কিন্তু সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে বল ও সাহস একত্র বর্ত্তমান থাকে। বায়ুর দোষে, আহারের দোষে, এবং বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার দোষে, ঐ দৌর্ব্বল্য উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষার গুণে পৌরুষ কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।

যে বনে দুর্দ্দান্ত ইংরাজসৈনিক বন্দুক হাতে না করিয়া প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সে বনে সাঁওতালবালক অনায়াসে বিচরণ করে। প্রস্তাব-লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন একদা বলেশ্বর নদে প্রবল বাতাসে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে একজন ধীবরবালক অকুতোভয়ে আপন পিতার নৌকার কর্ণ ধরিয়া রহিয়াছে; কোন সিপাহী ঐ বালকের কার্য্য করিতে সক্ষম হইত কি না সন্দেহ। আবার যদি সাঁওতালবালককে নৌকায় উঠান যায়, এবং ধীবরবালককে বনে পাঠান যায়, উভয়ে ভীত হয়; এমন স্থলে সাঁওতাল ও ধীবরবালককে সাহসী বলা উচিত কি ভীরু বলা উচিত? আমাদের বিবেচনায় এমন স্থলে সাহসগুণ অথবা ভীরুতাদোষ আরোপ করা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, বাল্যাবধি যে প্রকার আপদের সম্মুখীন হইবার শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই প্রকার আপদ উপস্থিত হইলে ভয় জন্মে না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালিবালক বাল্যাবধি ঘোড়ায় চড়িতে শিখিলে নিপুণ অশ্বারোহী হয়; তবে যিনি অধিক বয়সে সব্‌ডিপুটী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অথবা কোন কার্য্যানুরোধে অশ্বারোহণ করিতে শিখেন তাঁহার

অশ্বারোহণে প্রায়ই পারদর্শিতা জন্মে না, এবং যদি তাঁহার হাত, পা, দাঁত না ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তিনি সৌভাগ্যশালী পুরুষ। অস্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্যসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। অশ্বারোহণ ও অস্ত্র ব্যবহার যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যদি বাঙ্গালিরা বাল্যাবস্থা হইতে শিক্ষা পাইয়া অশ্বারোহী ও অস্ত্রবিৎ হইতে পারে, তবে তাহারা যোদ্ধা হইতে কেন পারিবে না? অনেকেই এই আপত্তি করিবেন যে তাহাদের সাহস নাই; কিন্তু সাহস যে অনেক পরিমাণে অভ্যাসগত তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যদি বাঙ্গালি বালকেরা বাল্যাবধি রাজপুতানার ক্ষত্রিয় বালকদের ন্যায় শিক্ষা পায় যে, "প্রাণ অপেক্ষা মান অধিকতর আদরের বস্তু, এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া অতি নীচ পুরুষের কর্ম্ম," তাহা হইলে বাঙ্গালিদের ভীরুতার অনেক লাঘব হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অশ্বারোহণ, বন্দুক শিক্ষা এবং মৃগয়ায় বাঙ্গালিদিগের বাল্যাবধি প্রবৃত্তি থাকিলে তাহারা অধিকতর সাহসী হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বনে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ব্যাঘ্রকে নিপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া সহসা কেন ভীত হইবে? মার্শল সানে নামক একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী যোদ্ধা একজন সহযোগীকে বলিয়াছিলেন, "কর্ণেল সাহেব! যে ব্যক্তি বলেন যে আমি কস্মিন কালে ভয় পাই নাই, সে ব্যক্তি দাম্ভিক, কাপুরুষ।" কোন কোন সময়ে মনুষ্যের এমন আপদ ঘটে যে অতি সাহসী পুরুষও ভীত হয়। মহাবীর নাপোলেয়ন্ বনা-পার্টও কোন সময়ে রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন। তেমন স্থলের কথা বলা যাইতেছে না, কিন্তু সাধারণ যুদ্ধের স্থলে শিক্ষিত বাঙ্গালী যোদ্ধা যে ভীরুতা প্রকাশ করিবে এরূপ বিবেচনা একান্ত সঙ্গত নহে।

আমাদের সমাজের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়াকে অধিকাংশ বাঙ্গালিই গোঁয়ার ও ডাংপিটের কার্য্য বলিয়া নিন্দা করে। কয়েক বৎসর হইল রাজা দিগম্বর মিত্রের পুত্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া হত হওয়ায় কলিকাতার অনেক বাঙ্গালি বালক অশ্বারোহণে বিরত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কলিকাতা অনেক বিষয়ে বাঙ্গালার আদর্শ স্বরূপ হইয়াও যুদ্ধাভ্যাস ব্যায়াম সম্বন্ধে মফস্বলের অনেক স্থান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে পুরুষের শরীর নারীশরীরের ন্যায় কোমল, যাহার মাংস-পেশী অপেক্ষা মেদভাগ অধিক, সেই পুরুষেরই অধিক আদর; কারণ তাহার দেহ বড়মানুষের লক্ষণোপেত। বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীদের এই সংস্কার যেমন বদ্ধমূল, এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

মৃগয়া বিষয়ে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালিদের প্রবৃত্তি নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের মৃগয়া, উল্টাডিঙ্গি, ঘুঘুডাঙ্গা ও বেলগেছিয়ার পুকুরে মৎস্য ধরা। এক্ষণে কলিকাতাবাসীদিগের পৌরষের কথা ছাড়িয়া মফস্বলবাসীদিগের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি। প্রায় ২৬ বৎসর হইল বাকরগঞ্জ জেলার গায়েস উদ্দিন ওরফে গগনমিঞা এবং মণিরুদ্দিন ওরফে মোহন মিঞা নামে দুইজন সামান্য হাওলাদার এমন ব্যাপার করিয়াছিল, যে ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার এচ, এ, আর, আলেকজেণ্ডার তাহাদের বিরুদ্ধে এক সময়ে কতিপয় সৈনিক নিযুক্ত করার মানস করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অভিযোগ তাহাদের নামে উপস্থিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তাহাদের নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারাণ্ট বাহির হয়। তাহারা টগরা থানার দারোগাকে বেদখল করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য থানার দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদার নিযুক্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গগনমিঞা ও মোহনমিঞার লাঠিয়ালের ভয়ে সকলে প্রস্থান করিলে, পরিশেষে আলেকজেণ্ডর সাহেব সকল থানা হইতে দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ ও চৌকিদার প্রভৃতি আনাইয়া এবং সরলিয়ার মোরেল সাহেবদিগকে সঙ্গে লইয়া মিঞাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মিঞারা যে বাটীতে থাকিত তাহা একটা ক্ষুদ্র দুর্গ। নারিকেল, সুপারী ও বাঁশ গাছ এবং নালা তাহাদের গৃহ এরূপ পরিবেষ্টন করিয়াছিল যে, তাহাতে শত্রুপক্ষ সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। আলেকজেন্দার সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার এবং মোরেলদের হাতে বন্দুক দেখিয়া মিঞারা পরাজয় স্বীকার করিবে, কিন্তু তাঁহার সে বিশ্বাস অমূলক। তাঁহারা অগ্রসর হইলে মিঞাদের লাঠিয়াল সকল সড়কী, লাঠি এবং বাঁশের ঢাল হাতে করিয়া মার মার শব্দে বাহির হইল। অবশেষে যখন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গুলি দ্বারা হত এবং আহত হইল, তখন তাহরা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যে, যে বাঙ্গালীরা লাঠি এবং সড়কী ও বাঁশের ঢাল লইয়া ইউরোপীয় বন্দুকীদের সম্মুখীন হইতে পারে, তাহারা কি অস্ত্র-শিক্ষা এবং নিয়মিত রণকৌশল শিক্ষা করিলে যোদ্ধা হইতে পারে না? লাঠালাঠি করিয়া অনেকানেক বাঙ্গালি মরিয়াছে, এবং দেশ সুশাসিত হইলেও, স্থানে স্থানে অদ্যাপি মরিতেছে। যদি সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধপ্রিয় বাঙ্গালিদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে লাঠির আঘাতে মরণ ও গুলির আঘাতে মরণ দুই সমান, বরং শেষোক্ত প্রকার মরণ সহজ, তাহা হইলে কি তাহারা কস্মিন্‌কালে সিপাহি হইতে পারে না? আমরা লাঠিয়াল কর্তৃক শান্তিভঙ্গের পোষকতা করি না, কিন্তু ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে লাঠিয়ালেরা সময়ে সময়ে এমন পৌরুষ দেখায় যে তাহতে যুদ্ধোপযোগী গুণ তাহাদের শরীরে

বর্ত্তমান আছে, ইহা প্রতীয়মান হয়। বাঙ্গালিদের মধ্যে অনেক কাপুরুষ আছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে সংস্কার আছে যে, সকল বাঙ্গালিই কাপুরুষ, তাহা নিতান্ত অমূলক।

নবাব আলীবর্দ্দির শাসনকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, বাঁকুড়া জেলা নিবাসী মল্লরা বিষ্ণুপুরের দুর্গ রক্ষা করিতে বিলক্ষণ পৌরুষ দেখাইয়াছিলেন। এক্ষণে বিষ্ণুপুরের যে পল্লীতে ফৌজদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছে সে পল্লী মহারাট্টা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে মহারাষ্ট্র সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের লোক বলিয়া থাকে যে প্রভু মদনমোহন দেবের কৃপায় তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং দল মাদল নামক বৃহৎ দুই কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করায় তাহার শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং নিক্ষিপ্ত গোলাতে শত শত মহারাষ্ট্র সৈনিক হত হওয়ায় ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্থান করিয়াছিল। মল্লদিগের জয় সম্বন্ধে যে কবিতা আছে, আমরা তাহা স্থানান্তরে প্রকাশ করিব। মল্লদিগের এক্ষণে তাদৃশ পৌরুষ নাই কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে সাহসী শিকারী বলিয়া বিখ্যাত আছেন।

বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে মল্লরাজ মহারাষ্ট্রদিগকে তাড়াইয়া যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, পূর্ব্বাঞ্চলে রাজা প্রতাপাদিত্য তাদৃশ সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন নাই। তিনি কি সাহসে জাহাঙ্গীর বাদসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু তিনি যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। "কালিকা প্রসন্না আছেন, তাঁহার প্রসাদে যবনজিৎ হইব," যদি তিনি কেবল এরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃত বীর না বলিয়া উন্মত্ত ডাপিটে বলিতে হইবে, কিন্তু বোধ হয় তিনি কেবল কালীভক্তির উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন নাই; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে পাঠানেরা সকলেই মোগলদের বিপক্ষ; তাহারা তাঁহার সহায়তা করিবে। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অনুকরণীয় নহে; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, লাক্ষ্মণ্য সেন আপন কাপুরুষতা দোষে যে কলঙ্কসাগরে বাঙ্গালীকুলকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাঙ্গালির উদ্ধার জন্য প্রতাপাদিত্য বিলক্ষণ যত্নবান্ ছিলেন। তিতুমিরের পৌরুষের কথা শুনিলেই লোকে হাসে। তাঁহার "বাঁশের কেল্লা গোলা খাইলো" পরিহাসজনক প্রবাদবচন সমূহের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সেনানী গোলাম মাসুম্ একজন প্রকৃত সাহসী যুদ্ধবিশারদ পুরুষ ছিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাঙ্গালিদের পৌরুষবিষয়ক প্রস্তাবে

এ সকল লোকের কথা কেন? আমরা স্বীকার করি যে মল্লরাজ ব্যতীত উল্লিখিত কোন ব্যক্তির কার্য্য অনুকরণীয় নহে; কিন্তু যাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালিতে যুদ্ধপ-যোগী গুণ নাই ও কখনও ছিল না তাঁহাদের মত খণ্ডন করা আবশ্যক। ২৪ বৎসর হইল উত্তরপাড়ানিবাসী বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মুন্‌সেফ ছিলেন। বিদ্রোহীরা কাছারি লুঠ করিতে আসিলে তিনি পেয়াদা প্রভৃতি কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করেন। সে জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জাইগির দান করিয়াছিলেন। প্যারী বাবুর ন্যায় বাঙ্গালি রণ-কৌশল শিখিলে কি সিপাহি, হাবলদার, সুবাদার অথবা কাপ্তেন হইতে পারে না?

বাল্যশিক্ষার ফল অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রৌঢ়কে সাহসী করিতে হইলে, বালককে অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়া প্রভৃতি যুদ্ধাভাস ব্যায়াম প্রবৃত্ত করিতে হইবে। কিন্তু যোদ্ধা করিতে হইলে কেবল এইরূপ শিক্ষাতেই সম্যক্ ফল উৎপন্ন হইবে না। রণকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। যৎকালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সহিত পার্লেমেণ্টের যুদ্ধারম্ভ হয়, তৎকালে পার্লেমেণ্টের সেনা রাজকীয় সেনা কর্ত্তৃক প্রায়ই পরাজিত হইত। উভয় সেনাই অশিক্ষিত ছিল; কিন্তু রাজকীয় সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণ, বন্দুক ব্যবহার ও মৃগয়ায় পারদর্শী ছিলেন। পরে ক্রমওএল্ পার্লেমেণ্টের সেনাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে উক্ত সেনা অজেয় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎকৃষ্ট রণকৌশল শিক্ষা দিতে দিতে ক্রমওএল্ সৈনিকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া ছিলেন, যে রাজার পক্ষে যুদ্ধ রাজার গৌরব ও প্রজার দাসত্ব জন্য; কিন্তু পর্লেমেণ্টের পক্ষে যুদ্ধ ঈশ্বরের মহাত্ম্য প্রকাশ সদ্ধর্ম্ম প্রচার, ও ইংরেজদের স্বাধীনতার জন্য। পার্লেমেণ্টের সৈনিকদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইল যে ঐ ধর্ম্মযুদ্ধে হত হইলে, নিশ্চয় স্বর্গ-লাভ হইবে। ফরাশিশ পণ্ডিত ভল্টেয়ার বলেন যে এই বিশ্বাস থাকাতেই ক্রমওএলের সেনা অজেয় হইয়াছিল।*

পরিশেষে পার্লেমেণ্টের ১০,০০০ সৈনিকের নিকট রাজকীয় ৩০,০০০ সৈনিক অপদস্থ হইলেন। যে বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় ক্রমওয়েলের সুশিক্ষিত সেনা অজেয়প্রায় হইয়াছিল, সেইরূপ প্রবল বিশ্বাস প্রবাহে উৎসাহিত হইয়া মুসল-মানগণ দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল।

রণকৌশল শিক্ষার প্রভাবে মনুষ্যের পৌরুষ ও পরাক্রম কতদূর বর্দ্ধিত হয়, তাহার আর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনাধিরূঢ় হইবার অত্যল্পকাল পরে, কতকগুলি ইংরেজ রাজশাসন প্রণালী

* Dictionnaire philosophique, Art, Fanatisime, Sec : 4

পরিবর্ত্তিত করার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহারা চাটিষ্ট্‌ নামে বিখ্যাত। প্রথমতঃ তাঁহারা সভাস্থাপন, বক্তৃতা, পালেমেণ্টে আবেদন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, এইরূপ জনরব হইল যে তাঁহারা বল পূর্ব্বক নিউপোর্ট নগর অধিকার করিবেন। নগরের মাজিষ্ট্রেটের প্রার্থনা মতে, তথায় ৩০ জন সৈনিক লেপ্টনেণ্ট গ্রে নায়কের অধীনে প্রেরিত হয়। সৈনিকেরা, তাহাদের নায়ক ও মাজিষ্ট্রেট নগরের প্রধান হোটেলের দ্বিতীয় তলগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে অন্যূন ৫০০০ চাটিষ্ট আসিয়া হোটেল আক্রমণ করিল এবং তাঁহাদের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রে সাহেব ও তাঁহার সৈনিক ত্রিশজন এমন যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, যে চাটিষ্ট সকলে সত্বর রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে চাটিষ্টরা কি বাঙ্গালি কাপুরুষ, না সাহসী ইংরেজ? ৫০০০ লোক ৩২ জন কর্ত্তৃক পরাজিত হইল! ইহার উত্তর এই যে চাটিষ্ট্‌রা ঐ সৈনিকদের ন্যায় ইংরেজ এবং প্রকৃতিদত্ত পৌরুষে তাহারা সৈনিকদের সমান; কিন্তু সৈনিকদের এরূপ শিক্ষা যে তাহাদের পরাক্রম ও পৌরুষ চাটিষ্ট্‌দের পরাক্রম ও পৌরুষের শতগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

রণকৌশল শিক্ষা গুণে ইংরেজদের মধ্যে যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, বাঙ্গালিদের মধ্যে কি তাহার কিছুই হইতে পারে না? যিনি বলেন হইতে পারে না, তাঁহার সত্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, অথবা তিনি মানবপ্রকৃতির কিছুই জানেন না।

এক্ষণে আমাদের যুবকদের নিকট এই নিবেদন যে যাঁহার শরীরে বল ও সাহস আছে, তিনি রাজকার্য্যে সৈনিক বা সৈনিকনায়ক হইবার চেষ্টা করুন। যাঁহারা জাতিকুল ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন, তাঁহাদের কপালশূন্য বারিষ্টার হওয়ার ফল কি? ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই একটি মুনসেফির জন্য হাইকোর্টে উমেদারি করেন। সে বিড়ম্বনা অপেক্ষা সৈনিক কমিসন্ পাইবার চেষ্টা করিলে, যদি কৃতকার্য্য হন, বাঙ্গালার বহুকালের কলঙ্ক অপনয়ন করার উপায় করিতে পারিবেন ও বাঙ্গালিজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বাঙ্গালিরা যতই লেখাপড়া শিখুন না কেন, বাণিজ্য বৃত্তিতে ও শিল্পে যতই প্রতিষ্ঠা লাভ করুন না কেন, যত কাল তাহাদের মধ্যে কতক লোক যোদ্ধা না হইবে, ততকাল অন্যান্য জাতি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে। পৃথিবীর এই গতি যে, যে জাতির বাহুবল নাই তাহাদের বুদ্ধিবলের আদর থাকে না; এমন কি তাহাদের ধর্ম্মবলকেও লোকে উপেক্ষা করে।

তা. প্র. চ.

বিষ্ণুপুর হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্থান

(প্রাচীন কবিতা)

দক্ষিণের এক ভাস্কর বর্গী (১) চড়াও করিল,
গুপ্তবৃন্দাবন (২) লুঠ্‌ব বলে তারা মনে
দড়াইল।

ঢাকা মুর্শিদাবাদ লুঠে বর্গী এল বিষ্ণুপুরে,
দেবতারো শিয়াতি গড় তারা সেন্ধাতে
না পারে।

হাতি আড় দিয়ে বর্গী, পানা যে কাটিছে,
সেই ঘাটের গোলন্দাজ তখন দেখি-
বারে গেছে।

সেই ঘাটের গোলন্দাজ তখন দেখি-
বারে পেলো

দ্রুতগতি কামানেতে পল্‌তে লাগাইল।
দুইচার দেউড় পিটে ভাই মুচ্ছার উপরে,
বর্গীর মাথার উপর দিয়ে গোলা গেল
তাদের কিছু করতে নারে।

দ্রুতগতি সেই গোলন্দাজ গমন করিল,
দক্ষিণ ভয়ে মহারাজায় এসে আহ্বাণ
করিল।

শুন শুন মহারাজা বসে কর কি,
প্রায় বর্গী গড় সেন্ধিল, রাজা! বলতে
এসেছি।

রাজা বলে শুন গোলন্দাজ বলিরে বচন,
আমাদের কিছু আর নাই আছেন মদন
মোহন।

সহরেতে ঢেঁড়রা দিং রাজা প্রজার ঘরে ঘরে,
ঘরে ঘরে নাম সংকীর্ত্তন তোমরা করগে
উচ্চৈঃস্বরে।

জয় জয় মদনমোহন বলে উঠে গেল গোল
জয় জয় মদন মোহন বলে বাজ্‌ছে কত
খোল।

বাবুভেয়ে চাকর নফর তারা হেতের ফেলিল,
জয় জয় মদন মোহন বলে নাচতে লাগিল।
অন্তর্যামী মদন মোহন লাগ জানিলেন অন্তরে,
রাজায় প্রজায় ভার দিয়েছে বর্গী
তাড়াবার তরে।

দুই প্রহর বেলা যখন ভাই গগনে লাগিল,
নীল জামা যোড়া পরিধান প্রভু ঘোড়ায়
সওয়ার হোল।

ধবলা হাঁসা ঘোড়ার উপরে প্রভু সওয়ার
হইয়ে,
বর্গী তাড়াতে যান মদন মোহন তখন
শাঁখারি বাজার দিয়ে।

---

(১) বর্গী বোধ হয় আরবী বাগী শব্দের অপভ্রংশ—বাগী; অর্থাৎ বিদ্রোহী। কবির সংস্কার ছিল যে দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্রদিগের দেশ।

(২) বিষ্ণুপুর মদনমোহন দেবের গুপ্তবৃন্দাবন বলিয়া খ্যাত ছিল।

শাঁখারি বাজার দিয়ে প্রভুর ঘোড়া ছুটে যায়,
প্রভুকে কেউ দেখতে পায় না প্রভুর ঘোড়া
দেখতে পায়।
মল বেড়ার লোক ছুটল ভাই ঘোড়া
ধরবার তরে,
কার সাধ্য ঘোড়া ধরি প্রভু আছেন উপরে।
মুড় মাদার মুচ্চায় (৩) যেয়ে প্রভুর
ঘোড়া দাঁড়াইল
বর্গীর কর্ত্তা ভাস্কর পণ্ডিত তখন দেখি-
বারে পেলো।
কেউ দেখে বার বৎসরের ব্রাহ্মণ ছাও-
য়াল মুচ্চার উপরে,
নীল জামা যোড়া পরিধান প্রভুর ঢাল
তরবার করে।
কেউ দেখে পর্ব্বত আকার যমের স্বরূপ,
কেউ হারে শ্যাম বংশীবদন যেমন
রসের কূপ।
এসব চরিত্র দেখে বর্গী আপনার মোট
মাট্ বান্ধে
আপনা আপনি গণ্ডগোল করে তারা পড়ে
কান্দে।
কেউ বলে তোদিকে পূর্ব্বে বলেছিলাম ভাই,
দেবতার গড় লুঠ্তে নারবি চল পলায়ে
যাই।
এমন সময় ভূমে নামলেন প্রভু মদন মোহন,
নিজ করে পলতে প্রভু নিলেন তখন।
নিজ করে পল্‌তে লয়ে দল মাদল কামানেতে
দিল,
ধানগড়ার মাঠে গোলা খেয়ে যত বর্গী মরে
গেল।
নিজ মন্দিরে মদন মোহন এসে বিশ্রাম
করিল।
তিন দিন গুরগুরুণি ভাই গগনে লাগিল।
তিন দিন গুরগুরুণি ভাই গগনে লাগিল,
যত গর্ভবতী নারী ছিল তাদের গর্ভপাত
হোল।
রাজা বলে এমন কর্ম্ম কে করিলে ভাই,
হুকুম ছাড়া কামান দাগে বুঝি চিনতে পারে
নাই।
চার ঘাটের শাত শ গোলন্দাজকে রাজা
ডাকাইল
একে একে গোলন্দাজে রাজা জিজ্ঞাসা করিল।
তাল বোয়জের গোলন্দাজ এসে বলছে
ধীরে ধীরে,
আমার একটী নিবেদন আছে রাজা, বলিগো
তোমারে।
যখন বর্গী এসে থানা কাটে, রাজা হলাম
নিরানন্দ,
ভাব্‌তে ভাব্‌তে মুচ্চার পাড়ে পেলাম
কৃষ্ণ অঙ্গের গন্ধ।
তেমন সময় দুটী নয়ন অন্ধ হইল শুন
হে রাজন,
এমন সময় শব্দ পেলাম রাজা, করি
নিবেদন।
বিষ্ণুপুরের মহারাজার দেব অংশে জন্ম,
যত কিছু বুঝতে পারলেন সব মদন
মোহনের মর্ম্ম।
খোল সম্প্রদায় কীর্ত্তন করে রাজা গমন করিল,
পূজার ডাকিয়ে কপাট ঘুচায়ে প্রভুর বারা-
মত হোল।

---

(৩) দুর্গের উন্নত কোণ, যে অংশকে ইংরেজিতে Bastion বলে বোধ হয় তাহাই মুচ্চা। বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিলে বোধ হয় তাহা এক সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল।

রাঙ্গা দেখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম চোয়াচ্ছে মদন
মোহনের পায়,
করে সকল বারুদ লেগে আর ধূলা লেগে
পায়।
সুকোমল অঙ্গে কত পরিশ্রম করেছেন প্রভু
মদন মোহন

আপনার গড় আপনি রাখলেন আপনার
গুপ্ত বৃন্দাবন।
আর কি আসিবে এমন দিন কি হবে মদন
মোহন লাল,
তোমার গড়ের ভিতর দিয়ে ইংরাজ বেন্ধেছে
জাঙ্গাল (৪)

---

(৪) বিষ্ণুপুরে ইংরেজাধিকারের পর এই কবিতা লিখিত হইয়াছিল স্পষ্ট বোধ হইতেছে। মহারাষ্ট্রদের উৎপাতে বর্দ্ধমানের মহারাজা মূলাজোড় ও কাউগাছি গ্রামের মধ্যে গড় জামনগর নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ছিল। বিষ্ণুপুরে দুর্গ থাকায় মল্লরাজের সে দুর্গতি ঘটে নাই।

হিন্দুধর্ম্ম উপলক্ষিত কথা

(১)

মোরে না মানিয়া সব লোক হইল নাশ।
এই লাগি মহাপ্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসি জানিয়া মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার॥

আদ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ।

• • • • •

• • • • •

শচী আগে পড়িল প্রভু দণ্ডবৎ হইয়া।
কান্দিতে লাগিল শচী কোলে উঠাইয়া॥
দুঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥

• • • • •

"যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হইতে নহিব উদাস॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোল না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥"

• • • • •

• "এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচল নবদ্বীপ যেন দুই ঘর।"

মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ।
চৈতন্যচরিতামৃত।

আমার পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এই কার্য্যের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং যাজন কার্য্যবিষয়ক সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য মতের সারভাগ জানিয়া তাহার প্রতি যথাযোগ্য সমাদর করাও চাই। এ সমস্ত যে আমার অনধিকৃত একথা বলাই অতিরিক্ত। কিন্তু ইংরাজির চর্চ্চা করিলেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অল্পাধিক অনাস্থা জন্মে। আর যতদিন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ আস্থা থাকে ততদিন ইউরোপীয়গণকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে হয়। এ রোগের প্রতীকার দেখি না; অথচ

প্রতীকার ভিন্নও মঙ্গল নাই। শাস্ত্রে বলে কলিকালে হিন্দুধর্ম্ম উৎসন্ন হইবে, ইংরাজের নিকট শিক্ষা, জীর্ণ বস্ত্রে তালি দেওয়া, বাতুলের কার্য্য। সুতরাং কি করিলে লোকের মনে হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ইচ্ছা হয় তাহাতে কাহারই মন নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের গৌরব করেন তাঁহাদের উর্দ্ধতম চেষ্টা যে আপন আপন দেহটা অপবিত্র না হয়। পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার স্পষ্টাক্ষরে ত্যাগ করা অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু 'শিক্ষা' বলিতে স্কুলের পড়া মুখস্থ করা—উর্দ্ধ-সংখ্যা বহি লেখা—ইহার অধিক আর কাহারই মনে হয় না। কিন্তু ধর্ম্মটাও শিখিতে হয়। এ কথা তুলিলে, হয় ত, কেহই না বলিবেন না, অথচ কার্য্যে দেখা যায় যে ধর্ম্মোপদেশ খ্রীষ্টানের অধিকার, এবং ব্রাহ্মের চীৎকার ভিন্ন নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত উপনয়ন দীক্ষা আদি ব্যতীত যে অনেক জিনিস আবশ্যক তাহা হিন্দুগণের বুঝা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে বুঝান পর্য্যন্ত কঠিন হইয়াছে। আমাদিগের স্থির সংস্কার এইরূপ মনে হয় যে, বিধবা কিম্বা তীর্থবাসী না হইলে ধর্ম্মের আলোচনা করা জেঠামী মাত্র। সাংসারিক কার্য্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব নাই। সুতরাং ধর্ম্ম শিখাও, এইরূপ প্রস্তাব করিলে সহজ উত্তরটী জানিতে বিলম্ব হয় না। 'শাস্ত্রের বচন এই, এইরূপে স্নান আহ্নিক কর, ব্রতনিয়ম রক্ষা কর, শ্রাদ্ধ পূজা নির্ব্বাহ কর ইত্যাদি।' কিন্তু এই পর্য্যন্ত। কেন করিব? না করিলে কি ক্ষতি? প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা সেই সকল ক্ষতি নিবারণ হয় কি না? এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া কাহারই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং যাঁহারা ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন করেন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি পর্য্যন্ত হইল তাহা দেখিবারও লোক নাই। হিন্দুধর্ম্ম শুনিয়া শিখিতে না পাইলেও দেখিয়া শিক্ষা করা চলিতে পারিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের যুক্তি বিষয়ক উপদেশ অভাবে প্রথম পথ অবরুদ্ধ, আর উহার দোষ গুণের বিচার এবং সমালোচনা অভাবে দ্বিতীয় উপায়টী অসাধ্য হইয়াছে। বাস্তবিক হিন্দুশাস্ত্র ঠেকিয়া শিখিতে হয় সুতরাং তাহা জীবনের শেষ কালেরই কার্য্য হইয়া আছে, তাহাতে যৌবনের তেজ সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। হিন্দুধর্ম্ম লোপের সহস্র কারণ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে উপদেষ্টার ক্রটী সর্ব্বপ্রধান। বাইবেলের বচন যেরূপ বিচার দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার শতাংশের একাংশ যত্নপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের অবক্তব্য (apocrypha) পরিত্যাগ করিলে এ দুঃখ অনেক দিন পূর্ব্বে অপনীত হইত।

আমরা—ইংরাজী-ভাষাজ্ঞেরা—ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর আদেশ গ্রহণ করি না। এ দোষ আমাদিগের মধ্যে অতি প্রবল বটে এবং মার্জ্জনার যোগ্য নহে, স্বীকার

করি; কিন্তু শিষ্য কেন গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু? গুরু ত তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠিত হন না। ধর্ম্মোপদেশ কি কেবল শিষ্যের মনের অবস্থার প্রতিই নির্ভর করে? সন্তান মন্দ হইলে শিক্ষাদান বিষয়ে ঔদাস্য করাই কি ন্যায়সঙ্গত? না অধিকতর যত্ন করাই বিধেয়? নব্য সম্প্রদায়ের জবানী কথা বলিতে ভয় করে। তথাচ বলিলাম যে শিষ্যগণের সহস্র দোষ আছে। কিন্তু এক হাতে তো তালি বাজে না; তবে গুরু পুরোহিত ও অধ্যাপক মহাশয়দিগের ভ্রম দূর করিবার উপায় কি? তাঁহারা শিখিবেন না, শিখাইবেন না, অথচ যাজন অধ্যাপন কার্য্য একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন। এই দুঃখেই এত কথা বলিলাম। আমরা যদি মাথা কুটিয়া মরি যে গ্রহণের মুক্তি হইয়াছে, এখন স্নানের সময় উপস্থিত, মা ঠাকুরাণী তাহাতে একবারও কর্ণপাত করিবেন না, কিন্তু যদি একজন গণ্ডমূর্খ শিখাধারী আসিয়া বলে যে কবে একাদশীর উপবাস তাহা বলিতে পারি না, অমনি তিন দিন অনশন স্বীকার করিবেন।

গুরু পুরোহিত মহাশয়দিগকে আমি এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে অভিলাষ করি যে শিষ্যের মনের ভাব বুঝা তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। শিশু সন্তান যদি বাবাকে দাদা, কি দাদাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে কি তাহার সম্বোধন ত্যাগ করিতে হইবে? বালকেরা শিক্ষককে প্রায়ই অক্ষম অমনোযোগী অথবা পক্ষপাতী মনে করে; কিন্তু এরূপ দোষের দণ্ড করিবার বিধান নাই। যদি গুরুর সহ্য এতটুকুও না হয়, তবে শিষ্যের সহিষ্ণুতা আর কত অধিক হইবে?

বর্ত্তমান কালের প্রধান কথা এই যে ইউরোপ বর্ব্বর নহে; ইউরোপীয়েরা যে সকল বিজ্ঞান, ন্যায় এবং মীমাংসা শিখাইতেছেন তাহা ফেলিবার বস্তু নহে, সম্যকরূপে প্রণিধান করাই আবশ্যক; তাহা করিয়া হিন্দু এবং তৎপ্রতিকূল ধর্ম্ম সমূহের বৈষম্য বুঝা কর্ত্তব্য এবং বুঝিবার পরে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া শিষ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা করিতে অনিচ্ছু, তাঁহারা আপন কার্য্যেরই জবাবদিহি করিতে বাধ্য; অন্যের প্রতি দোষার্পণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে পাতক বলিয়া গণনীয়।

ইংরাজি বিদ্যা কেবল অর্থকরি নহে। পক্ষান্তরে ইহাতে পরকালের মঙ্গল না হউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণরূপ বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু "চোরের উপরে রাগ করিয়া" সন্ততিবর্গের শিক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করাও কর্ত্তব্য নহে। এতাদৃশ ব্যবস্থা যাঁহারা অবলম্বন করেন তাঁহারা আর একটী কথা বিবেচনা করিবেন। হিন্দুধর্ম্ম যদি ইংরাজী বিদ্যার সংস্পর্শে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে পরমার্থ লাভ বিষয়ে আমাদিগের পিতৃ পৈতামহিক বিধান প্রতিপালন করাতে আর লক্ষ

কি ? পৃথিবী হইতে ইউরোপ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা বড় দেখা যায় না। আর হিন্দুগণও এমন কথা বলেন না যে ইউরোপীয়েরা স্বধর্ম্ম পালন করিলে মুক্তিলাভ করিবে না। ব্যাপটাইজের পদ্ধতি আমাদের মধ্যে চলিবে না। জমা শূন্য, খরচ বিলক্ষণ। অতএব ইউরোপীয় শিক্ষার প্রতি বেশী বিদ্বেষ করিলে পূর্ব্বপক্ষের কথা এমন হইতে পারে যে হিন্দুধর্ম্ম লোপ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করাই বিধেয়। ইউরোপীয় বিদ্যা ছাড়িবার যো নাই ; উহা বেষ্টন করাই কর্ত্তব্য।

ফলতঃ ইংরাজি বিজ্ঞান এবং ইংরাজি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত হিন্দুধর্ম্মের ভেদ নির্ণয় করা এবং সেই ভেদের অপনয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই নিমিত্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগেরও একটু বিনয় অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। "আমি অমুক বিষয় জানি না" এইরূপ বিনীত ভাব মনে উদয় না হইলে সেই বিষয়ের জ্ঞান দূরে থাকুক, তাহার চেষ্টা পর্য্যন্ত লাভ কখনও হইতে পারে না। ইংরাজিতে না জানি কি উপদেশ আছে, এইরূপ মনের ভাব না হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং সেই জ্ঞান ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত নহে।

"যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন তত দিন হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ নাই" এই কথা শুনিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব প্রভাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাঁহার সেই প্রফুল্ল বদন মনে করিলে এই সকল কথা লিখিতেও কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু যদি বলি "যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছেন" এই কথার স্বরূপ অর্থ এই যে "যতদিন মনুষ্য বর্গ চন্দ্রালোকে উল্লসিত হইবে, সূর্য্যাতপে ধান্য উৎপাদন করিবে" তাহা হইলেই বিরোধের সূত্রপাত হয়। ইহার পরে যদি কথা তুলিতে পাই এবং বলিতে পথ পাই যে "হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ মাত্র ততদিন থাকিবে"—যদি বলি যে সত্যের মাহাত্ম্য হিন্দু ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক, হিন্দু ধর্ম্মে যে অমূলক ভ্রমাত্মক অসার কথা আছে, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা হইলেই অধ্যাপক মহাশয়ের মনের কপাট বন্ধ হইবে ; আমার কথা বিলাতী বলিয়া ঘৃণিত হইবে ; এবং "ইহাদিগের দ্বারাই ধর্ম্মলোপ হইল" বলিয়া কাণের বাহিরে আরো দুই চারিটী মিষ্ট কথা নিঃসৃত হইবে। এ রোগের প্রতীকার ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল নাই।

মনুষ্যের জ্ঞান, আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক বিষয় একত্রিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহার একটী ছাড়িয়া আর একটী ধরিলে জ্ঞান কোন মতে ফুটে না। অপর, একজনের আভ্যন্তরিক বিষয় অন্যের মনে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। "এটা অগ্নি, দহন করে," এই জ্ঞানটী কেবল আমার মনে উদয় হইলেই হয় না। আর একটু আবশ্যক আছে। আমি "হাঁ—হাঁ, কি কর, সর সর" বলিলে তুমি সরিয়া দাঁড়াইবে ; পতঙ্গের মত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে যাইবে না এটাও আবশ্যক।

ইহার একমাত্র উপায় ভাষা। শব্দ শুনিয়া, লিপি পড়িয়া, আলেখ্য দেখিয়া, ইঙ্গিত অঙ্গভঙ্গি বুঝিয়া অন্য ব্যক্তির মনের ভাব আপন মনে গ্রহণ করিতে হয়, আপনার ভাব অন্যকে দিতে হয়। ইহাই মনুষ্য পরম্পরায় মহাগ্রন্থি। এক-ভাষীর মধ্যে এই গ্রন্থি স্বভাবসিদ্ধ। দ্বিভাষীর সাহায্যে এই গ্রন্থি দ্বারা সমগ্র মনুষ্যজাতি একত্রিত হয়। গো অশ্বাদি গৃহপালিত পশুগণও কতকদূর এই গ্রন্থিতে আবদ্ধ কিন্তু কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাঘ্রাদি ইহার বহির্ভূত। এই গ্রন্থিতেই এক জনের সাহায্যে অন্যের জ্ঞান লাভ হয়, এক জনের দ্বারা আর এক জনের ভ্রম ব্যক্ত হয়, এবং উভয় হইতে তৃতীয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে। ইহাতেই এক সময়ের কথা, সেই সময় অবসান হইলেও যেন সজীব থাকে; এক সময়ের ভুল আর এক সময়ে অপনীত হয় এবং কাল পরম্পরায় বিরোধ, কাল সহকারে শান্তিলাভ করে। ইহাতেই সত্য, মিথ্যাকে পরাজয় করে। ইহাতেই দশজনের অর্জিত জ্ঞান এক জনের আয়ত্ত হয়। এবং মহামহোপাধ্যায়ের উপদেশ সামান্য ব্যক্তির মনে প্রবেশ করে, করিয়া তাহার কার্য্যে নিযোজিত হয়। ইহাতেই এক পুরুষের লব্ধ জ্ঞানরত্ন পুরুষান্তর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, ভূতকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রাধান্য অনন্যচিত্তে আশা করা যায়। মহাকাল কেবল নশ্বর পদার্থকেই গ্রাস করেন। অবিনশ্বর সত্যই ত্রিকালব্যাপী কালীর বরাভয়ের মূল কারণ। নশ্বর বিষয়—কু এবং ভ্রান্তি—মনুষ্যের স্মৃতিবহির্ভূত হইয়া অন্ধকারময়ী কালীর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। অবিনশ্বর বিষয় ও বুদ্ধি নীল নভোমণ্ডলের ন্যায় জগৎব্যাপী হইয়া—কালান্তর কাল উত্তীর্ণ হইয়া—তাবৎ লোককে তারণ করে। ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। মনুষ্য বহু কষ্টে যে জ্ঞান লাভ করে তাহার বিস্মরণই ঘোরতর অমঙ্গল। জ্ঞান কখন জ্ঞানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা যায় না। নতুবা এতাদৃশ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। মনুষ্যের মন্দ অংশ ভ্রান্তি মাত্র; সত্যের এবং মঙ্গলের নির্ম্মল বায়ু স্পর্শমাত্রই তাহার পূতিগন্ধ অনুভূত হয় এবং তখন তাহাকে ত্যাগ করাই সংস্কৃতি বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। অতএব যে ব্রাহ্মণ মনে করেন আমার দেহাবসান পর্য্যন্ত সদাচার রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট; কলির প্রভাবে পুত্র কলত্র সবর্ণাদি অধঃপাতে যাউক; কিম্বা বলেন সবর্ণগণ রক্ষা হউক, বিবর্ণগণ অধঃপাতে যাউক, অথবা, হিন্দুগণ রক্ষা হউক, ইউরোপীয়েরা অধঃপাতে যাউক, তিনি সদাচারী হউন বা কদাচারী হউন, তাঁহার কথা সত্য নহে, উহা কেহ শুনিবে না। তিনি নিজেও অন্যের মুখে শুনিলে এরূপ কথা স্বীকার করিবেন না। এরূপ কথা ভ্রান্ত এবং হিন্দুধর্ম্ম যদি সত্য হয় তবে উহা কখনই

হিন্দু ধর্ম্ম সম্মত হইতে পারে না। যদি হিন্দু ধর্ম্মে কোন সার পদার্থ থাকে তবে উহা বাইবেল কোরাণ উপাসকদিগের পক্ষে কেনই বা বোধগম্য হইবে না? আর যদি বাইবেল কোরাণে কিছু মঙ্গলের পথ থাকে তবে বেদোপাসকের নিকটে কেনই বা তাহা ত্যাজ্য হইবে? আমাদের বেদ আমরা পালন করিব, ইংরাজকে এবং ইংরাজ-শিক্ষিতস্বদেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া দিব না, এরূপ সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে বিচারের পথ বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের বিচার করিতে অনিচ্ছু তাঁহারাই বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্মের দ্বেষক। তাঁহাদিগের গঙ্গাস্নান অবগাহন মাত্র, তাঁহাদিগের সংকল্পই দূষিত, সুতরাং উহাতে সার্থকতা নাই।

আমার মূল সূত্র দুটী। "কালপ্রবাহ" এবং "লোক সমষ্টি।" কাল প্রবাহ অর্থাৎ আজি, কালি পরশ্ব— গত এবং আগামী—সমস্তই এক সূত্রে গাঁথা। গত পরশ্ব ও গত কল্য ভুলিব না, আগামি কল্য আগামি পরশ্ব ছাড়িব না। গত পরশ্বের যে ভুল গতকল্য দেখিয়াছি আগামি পরশ্ব দিবস যাহাতে তাহা নিবারণ হয় অদ্য তাহার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিব। কে করিবে? যে এতকাল করিয়া আসিয়াছে সেই করিবে। মনুষ্যবর্গ—লোকসমষ্টি এ চেষ্টা করিবে। আমি করিব, তুমি করিবে, উনি করিবেন। সকলে সমবেত হইয়া করিব, সকলে পরামর্শ করিয়া করিব। ভুল হইলে একবারে না শিখি দশবারে শিখিব। কিন্তু শিখিবই শিখিব। দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া শিখিব। আর শিখিয়া বসিয়া থাকিব না; ভুলিবার সূত্রপাত করিব না, যাহাতে ভুল ক্রমশঃ সংশোধন হয় তাহাই করিব। এই কার্য্যের কর্ত্তা, প্রতি ব্যক্তি—উদ্যোগী সমষ্টি—বর্গাশ্রিত মনুষ্য। আর, কাল প্রবাহ ইহার সীমা। চিরকাল এইরূপ হইয়াছে, এখনও তাহাই হইবে। যাহাতে হয় তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে। সত্য ত্রেতা ভেদে যাহা হইবার তাহা হউক। কলির শেষে যাহা ঘটিবে তাহা ঘটুক। আমাদের কার্য্য আমরা করিব। কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিবার নহে। করিতে নাই। নিরবচ্ছিন্ন অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা সম্ভবপর নহে, এবং উহা শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে না। শাস্ত্রের সদর্থ করাই কর্ত্তব্য। কূটার্থ ধরিয়া কুকর্ম্মান্বিত হওয়া অনুচিত।

আমি বৈরাগ্যের কথা লিখিতে বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মানুসারে বৈরাগ্যই জীবনের সার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি যে বৈরাগ্যের কথা বলিব তাহা হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত কিনা একথা বিবেচনা করা আবশ্যক। তুমি বলিবে বৈরাগ্যের কথা বলা আমার অধিকার বহির্ভূত। আমি বলি আমার প্রদর্শিত বৈরাগ্য কেন অগ্রাহ্য তাহা বুঝাইয়া দেও। আমি দেখিতেছি ব্রাহ্মণের অন্নত্যাগ, বৌদ্ধের প্রব্রজ্যা, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধারণ স্বীকার, তান্ত্রিকের পঞ্চতত্ত্ব সাধন, চৈতন্যের শিক্ষিত পঞ্চরস,

খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টোদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন, এবং কোম্‌তের পরার্থপর পরিশ্রম সমস্তই বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত*। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে বল সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগে হিন্দুগণ ক্রমশঃ বৈরাগ্যের বিষয় কি শিখিয়াছেন। এবং কি শিখাইয়াছেন; অহিন্দুগণই বা এতদিন কি করিয়াছেন? আর এতদুভয়ের ঐক্য বুঝাইয়া দেও, নতুবা বৈলক্ষণ্য এবং বৈলক্ষণ্যের হেতু ও পরিণাম দেখাইয়া দেও। আমি বলি বৈরাগ্য সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তুমি যদি তাহা স্বীকার না কর, তবে বল তোমার মতে যাহাদের বৈরাগ্যের অধিকার নাই, যাহারা বৈরাগ্য চেষ্টার অযোগ্য, তাহারা কি করিলে ভাল হয়। তোমার লক্ষিত শ্রেষ্ঠ পথ এবং অহিন্দু-প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ পথ পরস্পরের তুলনা করিয়া, উভয়ের হয় ঐক্য দেখাইয়া দেও, নচেৎ বল উভয়ের ভেদ এই, এবং এই ভেদের ফলাফল এই। কেবল তাহা নহে, তোমাকে আরো দেখাইতে হইবে যে, তোমার দ্বারা মনুষ্যবর্গের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পরকাল বল, মুক্তি বল, আর পুণ্য বল তাহার উপায় আমি একাকী কাণে কাণে শুনিয়া স্থির থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে সকলের মঙ্গল সাধন হয় তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অতএব বৈরাগ্য বা ধর্ম্ম সঞ্চয়ের পথে কাহাকেও ছাড়িতে বলিও না। অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ কেবল শাস্ত্র হইতে দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে না, শাস্ত্রের আদেশ কেমন করিয়া প্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহার ফলাফল কি দেখিয়াছ এবং তদনুসারে এখনকার কর্ত্তব্যই বা কি? তোমার কর্ত্তব্য আমার কর্ত্তব্য এবং সসাগরা পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের কর্ত্তব্য কি এ সমস্ত বুঝাইয়া দেও। তদ্ভিন্ন কেন ক্ষান্ত হইব?

তৈলঙ্গস্বামী

আমি একবার মনে করিয়াছিলাম যে ইংরাজী দুই একখানি পুঁথি ঘাঁটিয়া, কি সংস্কৃতজ্ঞ দুই একজন বন্ধু তাড়াইয়া বৈরাগ্যের লক্ষণগুলি বাঁধিয়া লইব। কথাতে লক্ষণ বাঁধিতে পারিলে কথার লড়াই করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। কিন্তু এ প্রণালীটী ন্যায়বিরুদ্ধ, এই মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছি। ত্যাগ করাতে পাঠকের অসুবিধা জন্মিবে জানিতেছি, এই দোষ অপনয়ন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি যাহা জানি না, তাহা প্রকারান্তরে একটী বচনের মধ্যে

---

*চৈতন্য চরিতামৃত লেখক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে একটী পদ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন—যথা "মর্কট বৈরাগ্য।" নাম করিলেই পদার্থটা কতক উপলব্ধ হইবে। কথাটা একটু কটু বটে। কিন্তু গায়ে না মাখলেই হ'ল। মূল কথা এই যে "মর্কটবৈরাগ্য" ত্যাগ করা আবশ্যক।

পুরিয়া তর্ক করিলে অন্ধকারে ঢিল মারা হইবে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে পর্য্যন্ত জানি তাহারই প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, তাহার অতিরিক্ত চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়েরা বৈরাগ্যের যে লক্ষণ বলিবেন তাহা হয়তো আমি সহসা বুঝিতে পারিব না। আমি মোটামুটী যাহা বুঝি এবং যাহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে পারি সেই প্রণালীই আমাকে অগত্যা অবলম্বন করিতে হইবে।

বৈরাগ্য কাহাকে বলে? ইহা চক্ষে দেখিবার জন্য একবার বারাণসী ধামে তৈলঙ্গস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহারা স্বামীজির বিষয় কিছুমাত্র জানেন না তাঁহাদিগের জন্য বলা আবশ্যক যে তৈলঙ্গস্বামী পরমহংসগণ মধ্যে অপেক্ষাকৃত-রূপে পূজিত। ইনি নগ্ন এবং মৌনী। এবং সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত পুষ্টকায়। প্রবাদ আছে যে গবিণ সাহেব তাঁহাকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহার বিষ্ঠা চন্দন তুল্য জ্ঞান হইয়াছে।

সন ১৮৭৪ সাল নবেম্বর মাসে একদিন বেলা আন্দাজ ২টার সময়ে আমরা প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্বামীজির নিকটে বসিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তিনি তখন মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিতেছেন। নিকটে দুই জন চেলা, বোধ হইল তাঁহাদিগের আহার সমাধা হইয়াছে। স্বামীর নিকটে দুই খানি শাল পত্রের পাতা। এক খানি সম্মুখে তাহাতে খিচুড়ি অন্ন এবং অন্যান্য "কাঁচা" খাদ্যসামগ্রী। আর একখানি অপেক্ষাকৃত ছোট পাতা বাম পার্শ্বে। তাহাতে নানাবিধ মিষ্টান্ন। খিচুড়ির উপরে স্বামীজি প্রসারিত হস্তে দুইটি রেখা দিয়া তিন ভাগ করিলেন। তৎপূর্ব্বে খিচুড়ি ভাত খাইয়াছিলেন কি না লক্ষ্য করি নাই। আমরা দেখিলাম একবার এ পাতা একবার ও পাতা হইতে এক এক প্রকার খাদ্য মুখে দিতেছেন এবং উচ্ছিষ্টগুলি পাতে রাখিয়া দিতেছেন। বোধ হইল যেন কোন্ জিনিষটার কি আস্বাদ তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। খিচুড়ি ভাগ করিবার পূর্ব্বে এবং পরেও এইরূপ করিতেছিলেন; কিছুক্ষণ পরে হাত বাড়াইয়া দিলেন অমনি একজন চেলা তাহা ধৌত করিতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে একবার হাত টানিয়া একটা ভাঁড় মুখে দিলেন। বোধ হইল তাহাতে দধি ছিল। পরে আঁচাইয়া একখানা তক্তপোষে উঠিয়া বসিলেন এবং নগ্নাবস্থাতেও গাত্রে যে এক খানা গেরুয়া বস্ত্র ছিল তাহা টানিয়া নিলেন। তাহাতেও হইল না। নবেম্বর মাস শীত পড়িয়াছিল। একখানি লেপ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সেই পুষ্ট কলেবর সঙ্কালন করিতে যেন বিপাক উপস্থিত হইল। পরে একজন চেলা আসিয়া তাঁহার শীত নিবারণের উপায় করিয়া দিল। তৈলঙ্গস্বামী

মৌনী। কৌপীন ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পিত বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। বাক্যালাপেও বীতরাগ হইয়া আছেন। এতাদৃশ অবস্থায় আমার পক্ষে এক অতি রহস্যজনক ঘটনা উপস্থিত হইল। স্বামী কথা কহিবে না কিন্তু কথা কহিবার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে পারেন না। কৌপীন ত্যাগ করিয়া নগ্নাবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ লজ্জিত হয়. সে চিন্তা বিষয়ে বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শীতের যন্ত্রণা আর দধি আস্বাদনের ইচ্ছা ছাড়িতে পারেন নাই। এ গুলিতেও আমার ভক্তি সম্পূর্ণরূপে টলে নাই। কিন্তু পরমহংসের সঞ্চয় বাসনা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইল। স্বামীকে পয়সা টাকা দিলে তাহা লইয়া তিনি খেলা করেন এবং যথেচ্ছা বিলাইয়া দেন। কিন্তু আহারান্তে উচ্ছিষ্ট সামগ্রীগুলি ছাড়িতে পারিলেন না। একটী পিত্তলের পাত্র একখানা পাতা এবং কমণ্ডলুতে মিষ্টান্ন ভাত এবং খিচুড়ির অবশিষ্ট সযত্নে রক্ষিত হইল। ইহাতে দোষ কি? হয়তো এগুলি দরিদ্র ভিক্ষুকদিগের নিমিত্ত রাখিতেছিলেন। কিন্তু আবার দেখিলাম যে চিনির মঠ আদি স্থায়ী খাদ্যগুলি বহুযত্নে পৃথক একটী লোটাতে উঠিল। অতঃপর একখণ্ড জীর্ণবস্ত্রের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে লোটার মুখ বাঁধা আবশ্যক। লোটা আচ্ছাদন করিয়া পরিশেষে তাহা দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হইবে. এতক্ষণ স্বামী ইঙ্গিতের দ্বারা আদেশ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছিলেন। এখন প্রাজ্ঞ স্বয় একখণ্ড রজ্জু সংগ্রহ করিয়া চেলাদিগকে দিলেন। চেলাগণ ঘটির মুখ বাঁধিয়া মাথার উপরে শিকাতে তুলিয়া রাখিল। তবে স্বামীজির শান্তি লাভ হইল। আমি অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি তাঁহাদিগের বৈরাগ্য?

স্বামী ভণ্ড নহেন। দয়াশূন্যও নহেন। আমাদিগকে চেলার দ্বারা সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আহার হইয়াছে?" কিন্তু যখন আমাদিগের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের প্রার্থনা করিলাম তখন চেলার মারফত আদেশ হইল যে "কল্য প্রাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া আসিও, যে সকল পণ্ডিতেরা স্বামীজির দর্শন লাভার্থে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাদিগের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।" "স্বামীজি কতক্ষণ বিশ্রাম করিবেন?" "প্রদীপ জ্বালিবার সময় পর্য্যন্ত।" "অনুগ্রহ করিয়া যদি একটা দোয়াত কলম দেন তবে প্রাচীরে যে সকল শ্লোক লেখা আছে তাহা নকল করিয়া লই।" চেলা বলিল "দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া রাখিব কল্য প্রাতে আসিয়া নকল করিও।" তখন স্বামী একটু শব্দ করিলেন, চেলা মুখ ফিরাইয়া তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া বলিল "না, না, তোমরা সঙ্গে লইয়া আসিও।" স্বামীজি পুনঃ পুনঃ আমাদিগের প্রতি আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন। রকম দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল যে আমরা বিদায় হইলেই অব্যাহতি পান। তাঁহার ঘরে একখানা

তক্তপোষ, দুইখানা লেপ, দুইটা বালিশ, মাথার উপরে রৌদ্র নিবারণার্থে একখানি কম্বল টাঙ্গান। এতভিন্ন একটা সিন্দুক, কতকগুলা জলের কুঁজা, আর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির উপরে যেরূপ পিত্তলের মুকস দেয় সেইরূপ কতকগুলি। শিকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেওয়ালে লেখা—

> অন্নং ব্রহ্ম রসং বিষ্ণুঃ ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ
> প্রিয়তাং ভগবানীশঃ পরমাত্মা সদাশিবঃ।
> ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ ভগিনী শান্তিশ্চিত্তং গেহিনী, ইত্যাদি।

সর্ব্বত্যাগী পরমহংস ও দণ্ডী আদির দ্বারা সমাজের কোন উপকার হয় না, এইরূপ কথা সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত স্বীকার করি যে লোককে এই শ্রেণীর বৈরাগ্য শিখাইবার নিমিত্তে এরূপ আদর্শ থাকা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু ইহাতে তৈলঙ্গস্বামীর বিষয়ে পরাজয় মানিতে হয়। ইহাঁর মত ধৈর্য্যশিক্ষা এবং শান্তি লাভ হইলেই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা হইবে।

ভরত রাজা বানপ্রস্থ হইবার পরে মৃগ শাবকের প্রতি অকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্যত্যাগ ব্যর্থ হইয়াছিল। তবে তৈলঙ্গস্বামী লোটার মধ্যে মিষ্টান্ন রাখিয়া উদ্ধার হইবার আশা করেন কি প্রকারে? লোকেই বা তাঁহাকে নির্ব্বাণ পদের সমীপবর্ত্তী মনে করে কেন? ফলতঃ তৈলঙ্গস্বামী কেবল মৌন হইবার ব্রত রক্ষা করিতেছেন মাত্র। বৈরাগ্য কি তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে দর্শন করা ছাড়িয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করা আবশ্যক।

বৈরাগ্য বাহ্যিক আচরণে লব্ধ হয় না। তবে উহা কি বহু শাস্ত্র পাঠ করিলেই হয়? শুকদেব দ্বাদশ বর্ষ গর্ভ মধ্যে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র লোকালয় পরিত্যাগ করেন। ইহাই কি বৈরাগ্যের সার লক্ষণ? রাশি রাশি পুস্তক পাঠ ভিন্ন কি বৈরাগ্য হয় না? রত্নাকর বীতরাগ হইয়া উপাস্যদেবের নামোচ্চারণ মাত্র করিতে শিখিবেন বলিয়া "মরা, মরা" জপ করিয়াছিলেন। ধ্রুব নিবিড় বনে শার্দ্দূলাদিকেও পদ্মপলাশলোচন বলিয়া সম্বোধন করেন। রত্নাকর ও ধ্রুবের পাণ্ডিত্য আবশ্যক হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির চালনা ব্যতীত যদি বৈরাগ্য অনায়ত্ত হইত তবে ধ্রুব ও রত্নাকরের মুক্তির পথ থাকিত না।

রত্নাকরের গল্প বাল্মীকিতে নাই বলিয়া শুনিয়াছি। বোধ হয় কৃত্তিবাস নিম্নলিখিত স্থল হইতে প্রাগুক্ত কথা উঠাইয়াছেন।

হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নমাভাবে॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥

চৈতন্যচরিতামৃত। অন্ত্যখণ্ড
৩য় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য স্বভাবতঃই হউক, বা কাহারও অনুকরণ করিয়াই হউক, আপামর তাবৎ লোকের—কেবল তাহা নহে—স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত পদার্থের মুক্তিলাভ বিষয়ে উৎসুক হইয়াছিলেন। স্থাবর জঙ্গমের মুক্তির কথাতে মনে হয় যে হিন্দু সকল বিষয়েই কাজিল। শুকদেবের উপগর্ভ মধ্যে বেদশিক্ষা; তৈলঙ্গ-স্বামীর আচরণ; হারাম, মরা-মরার সঙ্গে রাম নামের সংযোগ, এবং হালের হ্যাট কোট, মায় দাড়ী ধারণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প, সকলই ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগে না। হিন্দুও কাজিল বুদ্ধি ছাড়ে না। মোটা কথা, বৈরাগ্য ভাবটি মনে রক্ষা করিয়া সকল কার্য্য করা যাইতে পারে, বৈরাগ্যও চাই কার্য্যে অনুরাগও চাই, এ কথা একবারও মনে হয় না। আমি যেটা করিব সেটা আর দশজনেরও কর্ত্তব্য হইবে এ কথা বুঝিয়া পরস্পরের সহযোগীতা না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না। কিন্তু সহযোগীতা যেন আমাদের দুই চক্ষের বিষ। বিভিন্ন বুদ্ধির সহযোগীতা, বিভিন্ন ইচ্ছার সহ-যোগীতা, ইচ্ছা বুদ্ধির সহযোগীতা, অন্তর বাহিরের সহযোগীতা, দেহ মনের সহযোগীতা এ গুলি ধর্ম্মের পথ; পরিবার, গ্রাম, বর্ণ, রাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সহযোগীতা সংসারের ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে কোন সহযোগীতার মাহাত্ম্যই আমাদের মনে তেজ করে না, ধর্ম্মোপাসনা ও সাংসারিক কার্য্যের সহযোগী-তার তো কথাই নাই। সন্ত পাতঞ্জলীর বি—য়োগ। আর কত পোড় পুড়িলে এই পতঙ্গ কুলের অগ্নি বোধ জন্মিবে তাহা বলা যায় না।
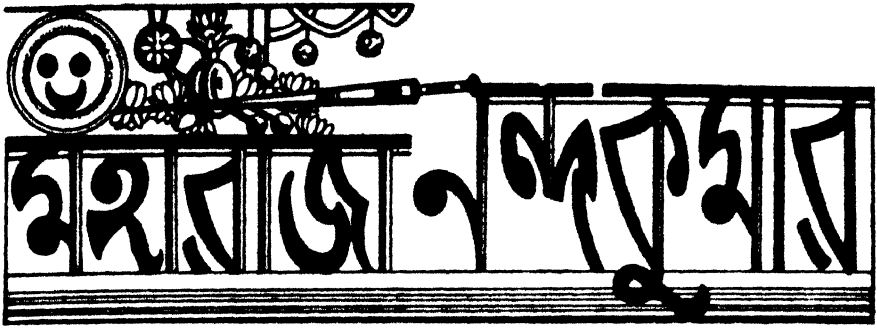
সকলেই অবগত আছেন যে, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতার গড়ের মাঠে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, আপনার মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, সুপ্রীম কোর্টের চিফ জষ্টিস ইম্পেসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার বধ সাধন করেন। ফ্রান্সিস, ক্লাবরিং, মনসন প্রভৃতি কৌন্সিলের মেম্বারগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রকাণ্ড পুরুষ কে? ইহাঁকে মারিবার জন্য বঙ্গের অদ্বিতীয় অধীশ্বর এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন? এবং কৌন্সিলের মেম্বরেরা ইহাঁর জীবন রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত কেন? জানিবার জন্য অনেকেরই ঔৎসুক্য হইতে পারে। তাঁহাদের সেই ঔৎসুক্য কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

কিন্তু নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিতে গিয়াও আমরা কোন সন্ধান পাই না। তিনি সবেমাত্র ১০৭ বৎসর গত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথায় জন্মান, কিরূপে লেখা পড়া শিখেন, কিরূপে প্রথম চাকরী করিতে যান, কত জায়গায় কি কি চাকরী করেন, এ সকল কথা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। একশত সাত বৎসরের মধ্যে এতবড় একটা লোকের কথা লোকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা যাহা জানিতে পারি, ইংরাজ ও মুসলমান লেখকের নিকট। তাহাও নন্দকুমারের জীবনের শেষ ২০ বৎসরের কথা। কিন্তু এই কুড়ি বৎসর বাঙ্গালার ভয়ানক সময়। এই ভয়ানক সময়ের নন্দকুমার একজন প্রধান লোক। দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার যখন বিপদ পড়িয়াছে, তিনিই নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কি হেষ্টিংস, কি মীরজাফর, কি নজমউদ্দৌলা, কি ক্লাইভ, কি মণিবেগম, সকলেই এক না এক সময়ে তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন। আবার বাঙ্গালায় এমন বড় লোক অল্পই ছিলেন যাঁহারা নন্দকুমারকে ভয় না করিতেন। তাঁহার মত তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক অতি বিরল, ভয় কাহাকে বলে তিনি বোধ হয় একেবারেই জানিতেন না।

নন্দকুমারের জীবনচরিত লিখিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা যে মুসলমানের চাকরী করিতে যাইত, তাহার কতকটা ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক। যখন পাঠানেরা রাজা, তখন হিন্দুরা বড় চাকরী করিত না এবং পাইতও না। আরস্কিন সাহেব "বাবর ও হুমায়ুন নামক" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিত না। মুসলমানেরাও মুসলমান না হইলে তাহার সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিত না। ফেরিস্তা ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণেরা প্রয়োজন হইলে কখন কখন দরবারে আসিত; কিন্তু কখন চাকরী স্বীকার করে নাই। তাঁহার মতে দিল্লীর গঙ্গু নামক ব্রাহ্মণ দক্ষিণের বামনী রাজ্যের রাজস্বসচিব হন। এই ব্রাহ্মণ প্রথম মুসলমানের নিকট চাকরী স্বীকার করে। ইহার পূর্ব্বে দুই এক জন হীন জাতীয় লোক বড় চাকরী পাইয়াছে শুনা যায়, কিন্তু বড় লোকে মুসলমানের চাকর হইয়াছে শুনা যায় না। হিমু বড় চাকরী করিয়াছিল, কিন্তু সে কি জাতি ছিল জানা যায় না।

পাঠানরাজ্য যায় যায় এমন সময়ে, হিন্দুবুদ্ধির একটা নূতন বিপ্লব হয়। সেই বুদ্ধিবিপ্লবের ফল এই হয় যে, হিন্দুসমাজের বাঁধাবাঁধি একটু কমিয়া যায়। আর উহাদের একটু নূতন জীবনের আভাস উপলব্ধ হয়। কয়েকটা নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, নূতন ন্যায়, নূতন স্মৃতি, নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই জীবনের ফল কতকগুলি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য স্থাপন, অনেক স্থানে স্বাধীন হইবার চেষ্টা এবং যেখানে যেখানে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সেখানে সেখানেই রাজকর্ম্মে প্রবেশ করা ও তাহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা।

বাবর ও আকবর আসিয়া এইটি লক্ষ্য করেন এবং ঐ হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া একটা মহাপরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেন। যাঁহাদিগের উপর মোগলেরা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। তবে মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল কেন? মহারাষ্ট্রীদের পরাক্রমে, নূতন মুসলমানদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতায়, এবং আরঙ্গজীবের গোঁড়ামীতে।

যে রূপেই হউক, আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতেই যত এদিকে গোলযোগ বাড়িতে লাগিল, চাকরিয়া হিন্দুরাও ততই বলবান হইতে লাগিল। দিল্লীর উজীরের দেওয়ান রতনচাঁদ যেরূপ কিছু দিন সমস্ত মুলুকের কর্ত্তা হইয়াছিল, যা বলিত তাই হইত, তাহা অনেকেই জানেন।

হিন্দুরা যেখানে যতই ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, বাঙ্গালায় তাহাদের আধি-পত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। মুরশিদ কুলী খাজনার কাজে হিন্দু বই মুসলমান রাখিতেন না। সুজার দরবারে দুইজন মুসলমান এবং তিন জন হিন্দু দরবারী

ছিলেন। এ ত গেল কেবল রাজস্বের কার্য্যে। কিন্তু মীরহবীব সমসের খাঁ প্রভৃতি মুসলমানদিগের বার বার বিদ্রোহে যখন আলিবর্দ্দি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তিনি প্রায় সকল বড় পদেই হিন্দু নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণকে বেহারের নায়েবনিজাম করিলেন। রায় দুর্ল ভ রায় রাইএঁা হই-লেন, রামরাম সিং ডাক ও গুইন্দা বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। মাণিকচাঁদ নবাবের প্রিয় পাত্র হইলেন। রাজবল্লভ ঢাকার নায়েবনিজাম হইলেন, শ্যামসুন্দর পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের কর্ত্তা হইলেন। যিনি আলিবর্দ্দির বঙ্গ অধিকারের প্রধান সহায় ছিলেন, তিনিও হিন্দু। তাঁহার নাম নন্দ সিং। তিনি ১৭৪০ সালে রাজমহলের নিকট আলিবর্দ্দির জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এইরূপে আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে যে সকল লোক বড় বড় পদ প্রাপ্ত হয় আমাদের নন্দকুমার তাহাদের একজন। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভঙ্গকুলীন। ইঁহার জন্মস্থান কোথায় জানি না, কিন্তু ইনি মুরশিদাবাদের নিকট কুঞ্জঘাটায় বাস করিতেন বোধ হয় তাঁহার জন্মস্থানও ঐখানে। কারণ সেকালের হিন্দুরা নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করিতে প্রায়ই চাহিতেন না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমেই ইঁহার জন্ম হয়। কারণ বর্ক বলিয়াছেন "যে ফাঁসির সময় ইহার বয়স ৭০ বৎসর।"*

আমরা শুনিয়াছি ইনি প্রথম হইতে আপনার দক্ষতাগুণে নবাবের প্রিয়-পাত্র হন। ইতিহাসলেখকেরা বলেন, যে ইনি অতি দরিদ্রের সন্তান। নন্দ-কুমারের বিষয় কিছু কিছু জানেন আমরা এমন একজনের মুখে শুনিয়াছি যে, এক সময়ে মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রজারা খাজনা দিতে চাহে না, যে কেহ নবাব সরকারের লোক যায় তাহাকেই মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। সুতরাং সে অঞ্চলে কেহই যাইতে চাহে না। সেই সময় নন্দকুমার—তখন প্রথম চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছেন,—যাইতে চাহিলেন, এবং অল্প দিবস মধ্যে সে মহল শাসিত করিয়া আসিলেন। ইহাতে নবাব তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান হইল। কিন্তু ঐ সময়ে নবাব কে ছিলেন তাহা আমাদের সংবাদদাতা বলিতে পারিলেন না। এ কথাটীতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, কারণ তাঁহার জীবনচরিতে খাজনা আদায় সম্বন্ধে আরও এইরূপ দুই একটী দুঃসাহসিক কার্য্যের কথা লিখিত হইবে।

যাহা হউক আমরা এক্ষণে শোনা কথা ত্যাগ করিয়া ইতিহাস ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব।

---

* Burke. Vol. X III. 591.

সিরাজ উদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।* কিন্তু কলিকাতা আক্রমণসম্বন্ধে তাঁহার কথা একবারও শুনিতে পাই না। বরং আর্ম্ম বলেন যে, সে সময় মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।† কিন্তু সিয়ার মতক্ষরীণের গ্রন্থকার বলেন যে মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে রাজা নন্দকুমার অনেক কাল ধরিয়া হুগলীতে ফৌজদারী করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন যে, যখন সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে উৎসন্ন দিয়া ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকেও উৎসন্ন দিবার ভয় দেখান, তখন নন্দকুমার তাহাদিগকে টাকা দিয়া এ দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পরামর্শ দেন। তাহাতেই ফরাসীরা ৪৷৷০ লক্ষ এবং ওলন্দাজেরা ৩৷৷০ লক্ষ টাকা দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পায়।

—— এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হইয়াছেন। তৎকালে সুবা বাঙ্গালায় দশটী ফৌজদারী ছিল। ইস্‌লামাবাদ চাটগাঁ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, রাঙামাটি, জেলালগড় পূর্ণিয়া, রাজমহল আকবরনগর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং বক্সীবন্দর হুগলী।‡ জমিদারদিগকে দমনে রাখা চোর ডাকাত লুঠেড়ার শাস্তি দেওয়া এবং সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধারণ করা ইত্যাদি ফৌজদারের কর্ম্ম, নিজামের অনুমতি মাত্র সসৈন্যে তাঁহার নিকট পৌছান তাঁহাব অপর এক কার্য্য। নন্দকুমার ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরাজেরা উৎসন্ন গেলেন। সিরাজ উদ্দৌলা খুড়তত ভায়ের সঙ্গে লড়াই করিতে পুরণিয়ায় গেলেন। এ অঞ্চল ঠাণ্ডা হইল। সবাই জানিল ঠাণ্ডা হইল। মাণিকচাঁদ কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া বর্দ্ধমানে গেলেন। তিনি জৈন ছিলেন, বেহারের পাহাড়ে তাঁহার মন্দির তৈয়ার হইতেছিল, কলিকাতার লুঠের টাকা লইয়া সেই সদ্ব্যয়ে লাগাইয়া দিলেন। সকলেই জানিল যে ইংরাজেরা ইহকালের মত এ দেশ হইতে বিদায় হইল। কিন্তু হুগলীর ফৌজদারের ধারণা অন্যরূপ ছিল। তিনি কলিকাতার দক্ষিণ তানার ওপারে আলিগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, এবং যদি দুর্গ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইংরাজ আইসে এই জন্য দুইখানি জাহাজ কিনিয়া তাহাতে ইট

* Mill Vol III 277.

† Orme's Indostan Book VI. P 63.

‡ Seer Ul mataksherim, Vol III. 724.

বোম্বাই* করিয়া রাখিলেন, যে বিপদের সময় তানা ও আলিগড়ের মধ্যে গঙ্গার সঙ্কীর্ণ অংশ ঐ ইট দিয়া বুজাইয়া দিবেন। পরে ইংরেজেরা সসৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া আবার মাণিকচাঁদ কলিকাতায় আসিয়া জুটিলেন। তাহার গুইন্দারা ক্লাইবের সৈন্যের সঙ্গ লইল, এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু একটি সামান্য যুদ্ধে মাণিকচাঁদ এত ভয় পাইলেন যে, পলায়ন করিয়া একেবারে মুরশিদাবাদে উপস্থিত। ইংরাজেরাও অতি সত্বর আলিগড়ের নিকটে যুদ্ধ জাহাজ আনিয়া উপস্থিত করিল। নন্দকুমারের দুই জাহাজ ইট হুগলীর ঘাটেই বাঁধা রহিল।

মাণিকচাঁদ কলিকাতা হইতে যাইবার সময় হুগলী হইয়া গেলেন, সকলকে বলিয়া গেলেন যে, ইংরাজের সাহস ভয়ানক, তোমরা সাবধান! সেনাগণ অত্যন্ত ভীত হইল। নন্দকুমার এই সময়ে মাণিকচাঁদের মত ভীত হইলে হুগলীও নবাবের হাতছাড়া হইত। ইংরাজেরা কলিকাতা অধিকার করিলেন, এবং হুগলীতে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিয়া হুগলী দখল করিবার জন্য অনেক সৈন্য ও জাহাজ লইয়া যাত্রা করিলেন। রাস্তায় ৫ দিন দেরি হইয়া গেল। এই সময়ে চুচুড়ার কোল হইতে হুগলী গঙ্গার ধারে ৩ মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের উত্তর ধারে একটী কেল্লা ছিল, হুগলীতে তখন দুই সহস্র সৈন্য থাকিত, এবং তিন সহস্র সৈন্য মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছিল। ইংরেজেরা জল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং কেল্লার উপর তোপ ছাড়িতে লাগিলেন। কেল্লার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ইংরাজেরা বড় ফটকের দিকে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান সৈন্য সেইদিকে ধাবিত হইল। এদিকে ছিদ্রপথে আর একদল দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। অনায়াসেই দুর্গ অধিকৃত হইল, ইংরাজের নাকি এই যুদ্ধে সবে ৩ জন গোরা আর দশ জন সিপাহী মরে। দুর্গ দখল হইলেও ইংরেজেরা নগর অধিকারের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা পরদিন ধানের গোলা লুঠ করিতে করিতে বান্দেলে পঁহুছেন। কিন্তু তথায় তাহাদিগকে এমনি ঘেরাও করে যে, অতি কষ্টে তাঁহারা পলায়ন করেন। তাহার পর জলে জলে লুঠতরাজ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে নন্দকুমার কি করেন জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি মাণিকচাঁদের ন্যায় পলায়ন করিলে ইংরাজেরা নিশ্চয়ই হুগলী অধিকার করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে স্থলে বিশেষ উপদ্রব করেন নাই এবং হুগলী দখল করিয়াও রাখিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাতেই বোধ হয় নন্দকুমার বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

* Seer mataksherim Vol II. Sec VI.

আবার সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় আসিলেন, আবার ইংরাজদিগের সহিত মুসলমানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সে সকল বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যখন ইংরাজেরা চন্দননগর অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তখন নবাব নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তুমি অতি সত্বর সমস্ত সৈন্য সঙ্গে ফরাসীদিগের সাহায্য করিবে। আমার সমস্ত সৈন্য অগ্রদ্বীপে রহিল, প্রয়োজন হইলে তাহারাও গিয়া পৌঁছিবে।" নন্দকুমার অমনি তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সৈন্য লইয়া ফরাসডাঙ্গায় ছাউনী করিলেন।

এই সময়ে ওয়াট সাহেব ও উমিচাঁদ আসিয়া হুগলী উপস্থিত হইলেন। এবং নন্দকুমারকে নানারূপ আশা ভরসা দিলেন, বলিলেন "ইংরেজদের যুদ্ধে কেহ পারিবে না।" কিছু ঘুস দিলেন এবং বলিয়া দিলেন ইংরেজেরা চিরদিন তোমার বন্ধু থাকিবে, তুমি আমাদের পক্ষ হও। নন্দকুমার সম্মত হইলেন এবং উঁহারাও নবাবের অনুমতির জন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। *

নবাবের অনুমতি পাওয়া গেল, এবং গেলও না, কেন না সিরাজ একবার বলিলেন "আচ্ছা তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর।" আর একবার বলিলেন, "না, চন্দননগর আক্রমণ করিও না।" কিন্তু বোম্বাই হইতে ইংরাজদিগের তিনখানি যুদ্ধজাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা নবাবের অনুমতির প্রতি তত লক্ষ্য না করিয়া এই সুযোগে ফরাসডাঙ্গা আক্রমণ করিলেন। এবং যত শীঘ্র নগর দখল হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন। এত তাড়াতাড়ি করিবার কারণ এই যে নবাব বারতায় দূত পাঠাইয়াছেন, যে, তোমরা ফরাসডাঙ্গায় ঘেরাও করিও না। এবং রায়দুর্ল্লভকে অনেক সৈন্যের সঙ্গে সত্বর ফরাসডাঙ্গায় পৌঁছিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। রায়দুর্ল্লভও হুগলীর দশ ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নন্দকুমার তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে আপনার আসা বৃথা, আপনি আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ জয় হইয়া যাইবে। দুর্গ জয় হইল, ইংরাজের সহিত নন্দকুমারের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে নবাবের অনুমতি অনুসারে হুগলীর লোকে ফরাসী সৈন্যগণের বিস্তর উপকার করিয়াছিল, না হইলে ইংরাজেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেরূপ ধাবমান হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের একটীও নিরাপদ হইতে পারিত না। ফরাসীদিগের উদ্ধার সম্বন্ধে নন্দকুমার বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহারাও নির্ব্বিঘ্নে মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়াছিল।

---

* Orme's Indostan Book VII, 123—125.

নন্দকুমার আলিবর্দ্দি খাঁর বংশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি পলাশির যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে নবাব তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া হুগলীর ফৌজদারী হইতে অবসৃত করেন।* সুতরাং পলাসীর যুদ্ধের সময় নন্দকুমার কি অবস্থায় ছিলেন আমরা জানিতে পাই না। কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিল, তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না।

সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ বলেন যে, সিরাজ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হন।† তাঁহার পূর্ব্বে বড় বাজারের, দেওয়ান কাশীরাম নামে একজন ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন।

মীরজাফর নবাব হইবার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, এবং ক্লাইভের সহিত সসৈন্যে পাটনাযাত্রা করেন। কিন্তু রামনারায়ণ ইংরাজের শরণাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মনোরথ বিফল হয়। রামনারায়ণকে বাঁচাইবার জন্য নন্দকুমারকে অনেকবার ক্লাইবের এজেন্ট হইয়া নবাবের নিকট যাইতে হইয়াছিল। § তিনি এ বিষয়ে ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ক্লাইব, রামনারায়ণ ও নবাব, এ তিনজনের যাহাতে সম্প্রীতি থাকে, তাহার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সসৈন্যে পাটনাযাত্রা কালে নন্দকুমার বরাবর ক্লাইবের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, যখন যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইয়া গেল, তখন ক্লাইব মুরশিদাবাদে আসিলেন, এবং সেখান হইতে সত্বর কলিকাতায় আসিলেন। কেবল সানক্রফ্ট সাহেব নবাবের নিকট টাকা আদায় করিবার জন্য মুরশিদাবাদে রহিলেন, নবাব ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজার উপর ইংরাজদিগকে টাকা দিবার বরাত দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজারা টাকা দিতে পারেন নাই। নন্দকুমার সুবা বাঙ্গালার সব খবর রাখিতেন, তিনি রাজস্ব বিষয়ে অতিশয় দক্ষ ছিলেন, এজন্য রাজা রায় দুর্ল্লভ তাঁহাকে আপন অধীনে নিযুক্ত করেন। বরাতী টাকা আদায় না হওয়ায় যখন ইংরাজেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, তখন নন্দকুমার প্রস্তাব করেন যে, যদি নবাব, রায় দুর্ল্লভ এবং ইংরাজেরা আমায় ভার দেন, আমি অতি অল্প দিনেই টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি। সকলে ভার দিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনগরের রাজাকে একেবারে কয়েদ করিবার হুকুম দিলেন। রাজা পলায়ন করিয়া কলিকাতার ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। নন্দকুমারের প্রাদুর্ভাব বাড়িতে

---

* Orme Book VII 164.

† Seir Mutakherim. Vol. II Sect XII P. 378.

§ A note Seir. Mutakherim. Vol II. Sec IX 90.

লাগিল। সকলেই তাহাকে ভয় করিতে লাগিল। এই সময়ে নবাব, রায়-দুর্ল্লভের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু এতদিন পারেন নাই, কারণ, ইংরাজেরা তাহার পক্ষ ছিলেন। নন্দকুমার ইংরাজদিগকে বেশ চিনিয়াছিলেন, তিনি নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, টাকা দিতে পারিলে, ইংরাজেরা কিছুই বলিবে না এবং তিনি নবাবকে বলিয়াছিলেন যে, আমিই ইংরাজদের টাকা যেরূপে পারি দিব। তিনি শেঠদিগকে বলিলেন যে, রায়দুর্ল্লভ যদি রাজকোষ হইতে টাকা দিতে না চান, তাহা হইলে নবাবের যেরূপ টাকার দরকার, হয় ত, তোমাদেরই সেই টাকা দিতে হইবে। এই কথায় তাহারাও রায়দুর্ল্লভের উপর বিরক্ত হইল।

তখন মীরণ ঢাকার ডেপুটী গবর্ণর, রাজবল্লভকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন, এবং রায়দুর্ল্লভকে ঢাকা সুবার নিকাশ দিতে বলিলেন। রায়দুর্ল্লভ পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন, মীরণ বলিলেন, নবাবের সৈন্য-গণের যতদিন মাহিয়ানা না দেওয়া হয় ততদিন আপনি যাইতে পারিবেন না। যাহাই হউক, শেষ ইংরাজদিগের সহায়তায় রায়দুর্ল্লভ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ পান।

ইহার পর নন্দকুমার আবার হুগলী আইসেন, নবাব এই সময়ে রায়দুর্ল্ল-ভের উপর ইংরাজদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিবার জন্য একটা কাণ্ড উপস্থিত করেন। তিনি একদিন মসজিদে যাইতেছেন, দেখিলেন খোজাহাদীর কতকগুলি অধীনস্থ লোক সশস্ত্রে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কোন মতে তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রটাইয়া দিলেন যে রায়দুর্ল্লভ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এই সকল লোক রাখিয়াছিল। নবাব রায়দুর্ল্লভের একখানি চিঠি দেখান, ঐ চিঠি খোজা হাদীর নামে লিখিত, উহাতে লেখা আছে যে "আমি ক্লাইবেরও এ বিষয়ে মত করিবার চেষ্টায় আছি, এবং সে জন্য ওয়াট ও সানক্রপ্ট্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি আমার সাহায্য কর"। চিঠিখানি জাল। কিন্তু মীরজাফর ঐ চিঠিখানি সত্য বলিয়া প্রমাণ করাইতে চাহেন, এবং তজ্জন্য নন্দকুমারকে লিখেন যে "তুমি যদি ঐ চিঠি সত্য বলিয়া ইংরাজদের বিশ্বাস করাইয়া দিতে পার, আমি তোমায় উপাধি দিব এবং জায়গীর দিব।"* নন্দকুমার ঐ পত্র ক্লাইবকে দেখান, ঐ পত্র মীরজাফরের স্বহস্তে লিখিত। ক্লাইব বরাবর নন্দকুমারকে সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে বাধ্য করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

---

* Orme Book XI; P 356 to 62.

ক্লাইব বিলাত চলিয়া গেলে কলিকাতায় দুইটী দল হয়। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস একদল এবং এমিএট প্রভৃতি আর একদল। এই সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি মীরজাফরের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহারা মীরজাফরকে কলিকাতায় নজরবন্দী রাখিয়া মীরকাশিমকে নবাব করিল, তাহারা সুতরাংই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। আমরা এই চারি বৎসর নন্দকুমার কি করিয়াছিলেন জানি না। মিল বলেন যে তিনি ইংরাজদিগের শত্রুগণের সহিত পত্রাদি লিখিতেন এবং একবার কারারুদ্ধ হইয়া ছিলেন।* গোলাম হোসেন বলেন নন্দকুমার সমস্ত দেশের লোককে চটাইয়াছিলেন। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা ভয়ানক ছিল। গবর্ণর হেনরি বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের উপর এত চটিয়াছিলেন যে, তিনি নন্দকুমারের সর্ব্বনাশের জন্য একখানি বই দপ্তরীর বাড়ী হইতে বাঁধাইয়া আনেন। তাহাতে নন্দকুমারের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া রেকর্ড রাখিয়া যান। তিনি বেশ জানিতেন যে ক্লাইভ নন্দকুমারের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। পাছে ক্লাইব তাহাকে কোন উচ্চ পদ প্রদান করেন এই জন্য বান্সিটার্ট বিলাত যাইবার সময় আপন ভ্রাতা জর্জ্জ বান্সিটার্টের হাতে ঐ বাঁধান বই কৌন্সিলে এবং ক্লাইভের নিকট উপস্থিত করিবার উপদেশ দিয়া যান।†

নন্দকুমার এত কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার গবর্ণর বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য এতদূর গুরুতর কার্য্য করিয়া যান, তাহা আমরা জানি না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, মীরজাফরের নন্দকুমার নহিলে চলিত না, যখন ইংরাজেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, যখন তিনি মুরশিদাবাদের সিংহাসন হারাইলেন, যখন পৃথিবীতে তাঁহার আর আমার বলিবার লোক রহিল না, তখন নন্দকুমারই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিলেন। যে সকল কৌন্সিলের মেম্বরেরা মীরজাফরের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারেরও পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে যেখানে বিডন স্কোয়ার হইয়াছে ঐখানে নন্দকুমারের বাড়ী ছিল।‡ কলিকাতার সাহেব মহলে তাঁহার খুব পসার ছিল। তিনি তন্তুবায় জাতীয় শেঠ দিগকে কলিকাতায় আনিয়া বাস করান। যখন মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হন তখন তিনি নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান করেন। বান্সিটার্ট সাহেব বাধা দিলেন, মীরজাফর ছাড়িলেন না। শেষ নন্দকুমার কলি-

* Mill. Vol III 360.

† Seir Metakherim Vol II Sec XII, 375. 76. 77.

‡ রাজা নবকৃষ্ণের জীবন চরিত।

কাতায় বসিয়াই দেওয়ানী করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবাব বারম্বার তাঁহাকে মুরশিদাবাদে লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন; রাজ্যের মধ্যে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। বান্সিটার্ট সাহেব তথাপি ছাড়িবেন না; কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বারেরা অনেকেই নন্দকুমারের পক্ষ ছিলেন। নন্দকুমার মুরশিদাবাদ যাইবার অনুমতি পাইলেন। তিনি তথায় গিয়াই ঢাকার নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া মুরশিদাবাদে আনিলেন। তাঁহার নাজিমি কাড়িয়া লইলেন, এবং ঢাকায় সমস্ত কাজে মুরশিদাবাদ হইতে নিজের লোক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি মহম্মদ রেজা খাঁর বিচারের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীমবাজারের ইংরাজ চিফ তাঁহাকে বাধা দিলেন এবং এই সময়ে মীরজাফরের সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। মীরজাফর মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নন্দকুমারকে কিরীটকোনা নামক স্থানের ঠাকুরের চরণামৃত আনিতে আদেশ এবং সেই চরণামৃত পান করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বান্সিটার্ট চলিয়া গেলেন। মীরজাফর মরিয়া গেলেন। নন্দকুমারের প্রধান শত্রু ও প্রধান মিত্র দূর হইলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা নজমউদ্দৌলাকে নবাব করিলেন। নন্দকুমারকে দেওয়ান করিলেন। কিছুদিন নন্দকুমার বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু জর্জ বান্সিটার্ট তাঁহার দাদার পুস্তক খানি একদিন কৌন্সিলে পাঠ করিলেন। তখন কৌন্সিলের মেম্বারেরা তাঁহাকে মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিতে বলিলেন। কিন্তু পদচ্যুত করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারই অধীনস্থগণ মুরশিদাবাদে তাঁহার নামে দেওয়ানের কার্য্য করিতে লাগিল। কৌন্সিলের মেম্বারেরা তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্লাইব কলিকাতায় আসিলে নন্দকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ক্লাইবের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁহার উপকার করেন, কিন্তু বান্সিটার্টের পুস্তক পড়িয়া তিনি নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন, এবং তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে মহম্মদ রেজা খাঁ দেওয়ানী লাভ করিলেন।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে নন্দকুমার কমলঘোষ নামক আর এক জন লোকের সহিত যোগ করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের নামে ঘুষ লওয়া অপরাধের নালিশ করেন, রাজা নবকৃষ্ণ এই সময়ে সাতটী বড় বড় ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বিচারক গবর্ণরের কৌন্সিল। এই বিচারে নবকৃষ্ণ অব্যাহতি পান। *

ক্লাইব যখন শেষবারে এখান হইতে যান তখন বান্সিটার্টের শত্রুরা এবং ক্লাইবের মিত্রেরা একত্র হইয়া নন্দকুমারকে বান্সিটার্টের শাসনের দোষ প্রকাশ

* রাজা নবকৃষ্ণের জীবন রচিত।

করিতে বলেন। নন্দকুমারের নিকট ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ আর কি হইতে পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হন, এবং বান্সিটার্টের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন, গোলাম হোসেন বলেন তিনি এই কথা শুনিয়াছেন কিন্তু ইহার বিশেষ খবর কিছু জানেন না।

ইহার পর তিন চারি বৎসর নন্দকুমারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে যখন ইংরাজেরা মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিলেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে কে ভালরূপ সংবাদ দিতে পারে, তাহার সন্ধান আরম্ভ হইল, তখন নন্দকুমারই এ কাজের উপযুক্ত বোধে তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে মুরশিদাবাদের দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল। মহম্মদ রেজা খাঁর সমস্ত লোককে বিদায় দিয়া রাজা নন্দকুমারের সমস্ত লোককে তথায় চাকরী দেওয়া হইল। আবার নন্দকুমার বাঙ্গালার কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার প্রভুত্ব পূর্ব্বের মত নহে। এখন কোম্পানি দেওয়ান, কোম্পানির অধীন একজন রায় রাইঞা আছেন। এখন রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হইলেন মাত্র। নবাব নাবালক, তাহার শিক্ষার ভার মণি বেগমের হস্তে অর্পিত হইল।

সকলেই অবগত আছেন যে বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব বরাবর এক মত ছিলেন। সুতরাং হেষ্টিংস নন্দকুমারের একজন প্রধান বিরোধী। এখন নন্দকুমারকে এরূপ পদ ও ক্ষমতা দেওয়ায় সকলেই হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কেন এমন অন্যায় কার্য্য করেন। তাহাতে হেষ্টিংস উত্তর দেন, নন্দকুমার যখন মীরজাফরের কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের প্রজা ছিলেন না। তখন তিনি মীরজাফরের মঙ্গলের জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিজ প্রভুর কখন মন্দ করেন নাই। মীরজাফর ও মীরজাফরের বংশে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল অতএব তিনি এখন ইংরাজের প্রজা এবং ইংরাজের অধীন হইলে, ইংরাজদিগের প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন।*

আমরা হেষ্টিংসের এই সার্টিফিকেট হইতে নন্দকুমারের চরিত্রের বিষয় অনেক বুঝিতে পারি। তাঁহাকে ইংরাজেরা যেরূপ ভয়ানক নরাধম বলিয়া বর্ণনা করেন তিনি তাহা ছিলেন না। এইরূপ পদপ্রাপ্তির কিছু দিন পরেই ক্লেবরিং, ফ্রান্সিস, ও মনসন মেম্বর হইয়া আসিলেন। তাঁহারা হেষ্টিংসের নামে নানারূপ নালিশ লইতে লাগিলেন। তখন নন্দকুমারও হেষ্টিংসের নামে কৌন্সিলে নালিশ করিতে গেলেন। নন্দকুমার কেন হেষ্টিংসের নামে শুধু শুধু নালিশ করিতে যান, জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। নন্দকুমার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে

* Burke. Vol XIII 497.

জানিয়াছিলেন যে, একদিন না একদিন, হেষ্টিংস তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবেন। এমন কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, হেষ্টিংস তাঁহার দুই একজন কর্ম্মচারীর সহিত গোপনে কি পরামর্শ করেন। একদিন নন্দকুমার হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, সাক্ষাৎ পাইলেন না, বরং শুনিলেন তাঁহারই পদচ্যুত দুইজন কর্ম্মচারীর সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি হেষ্টিংস কিছু করিবার পূর্ব্বেই হেষ্টিংসের সর্ব্বনাশ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরদিগকে বলিলেন, আমি স্বহস্তে মণিবেগমের ঘুস হেষ্টিংসকে দিয়াছি। তখন হেষ্টিংস দেখিলেন মহা বিভ্রাট—নন্দকুমার অনায়াসেই তাঁহার দোষ সাব্যস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। তখন তিনি কৌন্সিল সভা ভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি এই সময়ে যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে দোষী তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হয়। তিনি নিজে ও বারওএল, ও বাসিটার্ট সাহেব ও কান্তবাবু এবং রায় রাইঞা রাজা রাজবল্লভ, একত্র হইয়া সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমার ও তাঁহার জামাই রায় রাধাচরণ এবং ফক সাহেবের নামে এক ষড়যন্ত্রের জন্য ইনডাইটমেণ্ট আনিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। মেম্বরেরা নন্দকুমারের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া গেলেন। তখন হেষ্টিংস সাহেব মোহনপ্রসাদ নামক নন্দকুমারের একজন অনুচরের সহিত মিলিত হইয়া, তাহার নামে জাল করার এক নালিশ রুজু করিলেন। নন্দকুমারকে লইয়া গিয়া জেলে রাখা হইল। নন্দকুমার অত্যন্ত ইষ্টনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে তাঁহার আহারাদি করার বিশেষ আপত্তি ছিল। তিনি সে বিষয়ে কৌন্সিলের সাহেবদিগকে জানাইলেন, এদিকে জজ ইম্পে ভট্টাচার্য্যদিগের মত গ্রহণ করিলেন। রাজধানীঘেঁসা ভট্টাচার্য্যগণ প্রবল পক্ষেরই চিরকাল পক্ষপাতী। তাঁহারা বলিলেন নন্দকুমার যে গৃহে ছিলেন তথায় আহার করিলে জাতিপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কৌন্সিলের মেম্বরেরা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার পর কয়েক দিনের মধ্যে একদল ইংরেজ জুরি নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিল, এবং তদনুসারে তাঁহার ফাঁসী হইল।

ফাঁসীর দিন নন্দকুমার হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে পালকীতে, গড়ের দক্ষিণ ফাঁসী তলায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে কিছুমাত্র ভয়ের বা ক্ষোভের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহার পাল্কীর দুইধারে অসংখ্য লোক আসিয়াছিল। কেহ ৫।৭।১০ ক্রোশ তফাৎ হইতেও আসিয়াছিল। কাহারই বিশ্বাস হয় নাই যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট—অন্য বিষয়ে এত দয়ালু—ব্রাহ্মণের ফাঁসি দিয়া হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। মহাপুরুষ অক্ষুব্ধ মনে বন্ধু বান্ধবের সহিত কথা

বার্ত্তা কহিয়া পাদুকা ত্যাগ করিয়া কাঠগড়ায় আরোহণ করিতে লাগিলেন। তখনও কাহারও বিশ্বাস হয় নাই যে, রায়রাইঞা রাজা নন্দকুমারের বাস্তবিক ফাঁসী হইবে। পরে যখন ফাঁসীর দড়ী তাঁহার গলায় লাগিল, যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদেহ ফাঁসী কাঠে ঝুলিতে লাগিল, তখনও হস্তে হরিনামের মালা ঘুরিতেছে। তখন প্রান্তরস্থ অসংখ্য জনমণ্ডলী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ হইল, সকলে ভাবিল হিন্দুর গৌরব অস্তমিত হইল। ইংরাজেরা যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসী পর্য্যন্ত দিতে পারিল, তখন আর হিন্দু ধর্ম্মের মান রহিল কই? বালীর কতকগুলি ভট্টাচার্য্য তৎকালে গড়ের মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে গেলেন এবং একেবারে গঙ্গাপার হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের অনেকে আর কলিকাতার পাপভূমিতে পদার্পণ করেন নাই।

এইরূপে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে মাহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হয়, তাঁহার চেহারা দেখিলে সকল লোকেরই ভয় ও ভক্তি হইত। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার এক জামাই শাক্ত ছিলেন। নন্দকুমার তাঁহাকে বৈষ্ণব করেন। তদবধি ঐ জামাইএর বংশে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা হয়। তৎকালে বড় বড় জমীদারেরা প্রায় শাক্ত ছিলেন কিন্তু যাঁহারা মুসলমানের চাকুরী করিতেন তাঁহারা প্রায়ই বৈষ্ণব ছিলেন। দেশের বড় বড় জমীদারেরা যে নন্দকুমারের নামে কাঁপিত, ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ মতভেদও তাহার এক প্রধান কারণ। নন্দকুমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ভক্তি করিতেন। প্রবাদ আছে তিনি হুগলী থাকিবার সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে একটী অঙ্গুরী দেওয়াইয়া ছিলেন; জগন্নাথ যে অনেক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, নন্দকুমারের সপক্ষতাই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাস-লেখক বড়ই দুর্ম্মুখ। তিনি বলেন নন্দকুমার অহঙ্কৃত নষ্টস্বভাব লোক ছিলেন; দেশের লোক তাঁহার উপর চটা ছিল। এমন কি, তিনি দুইটা কোয়ার্টো পেজ পুরিয়া নন্দকুমারের উপর গালি বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি একটা সার্টফিকিট দিয়াছেন। নন্দকুমার দুই চারি জন লোকের ভাল করিয়াছিলেন এবং তিনি যাহাদিগকে ভালবাসিতেন তাহাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ অচল ছিল।* আমরা জানি নন্দকুমার, দুইচারিজনের নহে, অনেকের ভাল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনেক লোক প্রত্যাশা করিত। দুইবার তিনি নিজের লোক দিয়া সমস্ত বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার কার্য্য চালাইয়া

---

* Mutakherin. Vol. III XIII P.P. 464-65.

ছিলেন। শেষ বার যে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নিজের জন্য নহে, কেবল নিজের অধীনস্থ লোকের জন্য। সত্তর বৎসর বয়সে যে লোক শুদ্ধ আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য বিনা পয়সায় হেষ্টিংসের ন্যায় পরম শত্রুর অধীনে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সে-লোক আত্মীয়দিগের বড় অল্প হিতৈষী নহেন। তিনি এতবার দুই গভর্ণমেন্টের এত কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু কখন টাকা বক্‌সিস্ লন নাই। বর্ক তাঁহাকে "The great Nuncomar" বলিয়াছেন। তিনি এই নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মুসলমান ইতিহাস-লেখক নন্দকুমারের নামে দুই দোষারোপ করেন; তিনি বলেন নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার বাড়ী হইতে এক বাক্স মোহর পাওয়া যায়। ইহাতে বাঙ্গালার সমস্ত বড় বড় লোকের জাল মোহর ছিল। অনেক ইতিহাস লেখক এ কথা বিশ্বাস করেন না।

আর এক দোষ এই যে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার বাড়ীতে নগদ ৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এই টাকা নন্দকুমারের মত লোকের পক্ষে বড় অধিক নহে। হুগলীর ফৌজদারের মাহিনা ও উপরিতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় ছিল। মহামদ রেজা খাঁ নায়েব নাজিম হইয়া বৎসরে নয় লক্ষ টাকা পাইতেন। কথিত আছে গোবিন্দ সিংহ চারি বৎসর বোর্ডের দেওয়ানি করিয়া আড়াই কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ অল্পদিন চাকরী করিয়া নয় লক্ষ টাকা মাতৃশ্রাদ্ধে খরচ করিয়াছিলেন। লেডি হেষ্টিংসের সরকারের বংশ এখন কলিকাতার একঘর বড় বড়মানুষ। সুতরাং নন্দকুমার যে ২০ বৎসর ফৌজদারী দাওয়ানী, নায়েব দাওয়ানী, প্রভৃতি বড় কাজ করিয়া ৫২ লক্ষ টাকা ও যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি রাখিয়া যাইবেন ইহা বিচিত্র নহে। ইহাতে তিনি বড় লোভী ছিলেন বোধ না করিয়া বরং তাঁহার লোভ কম ছিল বোধ করাই উচিত।
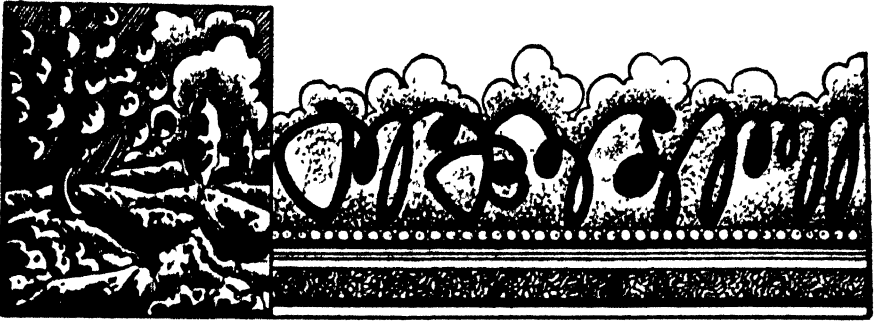
উপন্যাস

প্রথম খণ্ড

দুইটী ফুল, সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদ করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে, একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর। এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত, সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর।

আবার দুইটী পাখী,—সুন্দর—সুরস—সুকণ্ঠ—সুপুষ্ট—ও সুহৃষ্ট,—যখন মদভরে খেলা করে তখন উহারা কেমন সুন্দর! এই উড়িতেছে, এই পড়িতেছে, এই বসিতেছে, আবার উড়িতেছে, একবার দেখিতে না পাইলেই করুণস্বরে বন পুরিয়া ডাকিতেছে, আবার দেখা হইলেই ঠোকরাইতেছে, কেমন? এমন দুটী পাখীর মিল কেমন সুন্দর।

পাখী ও ফুলের মিল সুন্দর বটে, কিন্তু যদি ঐরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত সমসুরভি মানুষের মিল হয়, তাহার চেয়ে সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে আর আছে কি? সুন্দর,—সুস্থ,—সবল,—সতেজ,—সুশিক্ষিত,—সুবংশজাত,—কলাকোবিদ দুটী মানুষের যদি মিল হয়, তবে তাহা কবির বড় লোভনীয় হয়, তাহার উপর আবার যদি তাহাদের দুইটী হৃদয়ের মিল হয়, যদি সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমসুরভি, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিল হইয়া যায়, তবে দেবতারাও তাহা স্বর্গ হইতে দেখেন।

এমন মিল কেহ কোথাও দেখিয়াছ কি? হৃদয়ে হৃদয় প্রেমডোরে বাঁধা দেখিয়াছ কি? নয়নের আড় হইলে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়াছ কি?

নয়নে নয়নে এক হইলে প্রাণ কাড়িয়া লয় দেখিয়াছ কি? দেখিলে বাক্‌শক্তি থাকে না দেখিয়াছ কি? না দেখিলে সব অন্ধকার হয় দেখিয়াছ কি? নয়নে শরৎ জ্যোৎস্না, কর্ণে সুধাধারা, স্পর্শে অমৃতহ্রদ, আর হৃদয়ে মহামোহ, এমন মিল দেখিয়াছ কি? অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ বারিধির সহিত অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ আকাশের মিল দেখিয়াছ কি? তেমনি অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশির মিল দেখিয়াছ কি? যখন আবার সেই অপার, অগাধ, অনন্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশিদ্বয় পরস্পর সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়, যখন সেই অনন্ত সমুদ্রে আকাশস্পর্শী তরঙ্গ উঠে, দেখিয়াছ কি? আবার যখন অদর্শনে অনন্ত আকাশে ভীষণ ঝটিকা উঠে, যখন ঝটিকায় অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করে দেখিয়াছ কি?

দেখিবে কোথা হইতে? অবোধ মানুষ আহারের জ্বালায় ব্যস্ত, এরূপ দেবদুর্ল্লভ প্রেমরাশি কোথা হইতে দেখিবে? পৃথিবীতে এরূপ অপার, অগাধ, অনন্ত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, প্রেমরাশি কদাচ কখন মিলে বলিয়া কবিরা লেখেন বটে, কিন্তু কাজে মিলে না।

একবার মিলিয়াছিল। দুহাজার বৎসর আগে পাটলীপুত্র নগরে একবার মিলিয়াছিল, সেইখানে একবার দেখিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময়, গঙ্গার তীরে অশোক রাজার প্রমোদ কাননে, এইরূপ দুইটী হৃদয় মিলিতে দেখিয়াছিলাম।

২

একটী রমণী, অপরটী পুরুষ। দাঁড়াইয়া মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের মধ্যে অগাধ পুষ্পরাশি; মল্লিকা, মালতী, যূথি, জাতি, সেফালিকারাশির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই জনে মালা গাঁথিতেছেন। উভয়ের রূপরাশি পুষ্পরাশিতে প্রতিফলিত হইতেছে। পুষ্পরাশির রূপরাশি উভয়ের কমনীয় শরীরপ্রভায় প্রতিফলিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময় পুষ্পরাশিতে প্রেমিক যুগলের জ্যোৎস্নাময় লাবণ্য পতিত হইয়া, শাদার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা, তাহার উপর শাদা মিশাইতেছে। তরল দীপ্তির উপর তরল দীপ্তি, তাহার উপর তরল দীপ্তি, পড়িয়া মিশিয়া তরলতর তরলতম হইয়া যাইতেছে। যুবকের উজ্জল, শ্যামল, দীর্ঘ, কর্ণান্তবিশ্রান্ত নয়ন একবার মালায় আর একবার যুবতীর মুখে পড়িতেছে। নয়নের গতি কখন অলস, কখন চঞ্চল হইতেছে। অলস,—অথচ মধুর; চঞ্চল—অথচ মধুর, সদাসর্ব্বদাই মধুর। দৃষ্টি "অলস বলিত মুগ্ধ স্নিগ্ধ নিস্পন্দ, মন্দ"; অলস অথচ মধুর; বলিত কুঞ্চিত, অথচ মধুর; মুগ্ধ,—হৃদয়ের মোহব্যঞ্জক,—অথচ

মধুর ; স্নিগ্ধ, স্নেহপরিপূর্ণ, অথচ মধুর ; নিস্পন্দ, অথচ মধুর ; মন্দ,—ধীর গতি,—অথচ মধুর ; ডাগর ডাগর চক্ষু মধ্যে, গাঢ়ান্ধকারময় স্থানের ভিতর দিয়া এক একবার বিদ্যুত ঝলসিতেছে। প্রতিনয়ননিপাতে প্রণয়িনীর উপর স্নেহ, মমতা, প্রেম, বিকীর্ণ করিতেছেন। নয়ন দিয়া হৃদয় যেন গলিয়া প্রাণেশ্বরীকে স্নান করাইয়া দিতেছে।

যুবতীও মুগ্ধ, সুন্দর ও কমনীয়। তিনি আপন মনে মালা গাঁথিতেছেন। আর মনে মনে কি ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন কেমন করিয়া জানিব, বোধ হয় প্রাণনাথের অপরিমেয়, অজেয়, অক্ষুব্ধ, প্রেমরাশির কথা ভাবিতেছেন। নহিলে তাঁহার কোমল, চিক্কণ, মার্জ্জিত, মহামূল্য মণিমনোহর কপোলে মধ্যে মধ্যে রক্তিমোদয় হইতেছে কেন? তিনি এক একবার তাঁহার প্রিয়তমের দিকে চাহিতেছেন কেন? তাঁহার চাহনি বড় চমৎকার, তিনি চঞ্চলসুন্দরীর ন্যায় আড়ে আড়ে চাহিতেছেন না ; একবার চাহিয়াই চক্ষু ফিরাইতেছেন না ; যখন চাহিতেছেন উজ্জ্বল ও বৃহৎ চক্ষু মেলিয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিতেছেন ; যেন এক তান মনে, প্রাণ ভরিয়া, নয়নচকোরকে প্রিয়বক্তু সুধা পান করাইতেছেন।

তাঁহাদের কাজ দেখিয়া বোধ হইতেছে একটু ত্বরা আছে, মালা গাঁথিতে দুইজনেই ক্ষিপ্রহস্ত। দেখিতে দেখিতে ফুল অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়াইল। তখন যুবক আপন হস্ত স্থিত মালাগুলি যুবতীর মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন। যুবতীও আপন মালাগুলি যুবকের মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিলেন, সেই সময়ে যুবক রমণীর চিবুক ধরিয়া তুলিলে যুবতী দেখিলেন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; যুবক দেখিলেন, মাটীতে চাঁদ উঠিয়াছে। দুজনেই দেখিলেন, দুজনেই মুগ্ধ হইলেন, নয়ন ভরিয়া দেখিলেন, তৃপ্ত হইলেন না। যুবক মুখ অবনত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময়ে যুবতী হটাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, আকাশের দিকে দেখিতেছ না? আর যে বেলা নাই, মালা গাঁথিয়া শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়া লইতে হইবে।

যুবক "তাহোক" বলিয়া বাহুযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বারম্বার যুবতীর বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধরের উপর, আপনার বিম্ববিনিন্দিত, কোমল, মসৃণ, রসপরিপূর্ণ অধর স্থাপন করতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন। যুবতীও একটু অপ্রতিভ হইয়া আবার মালা গাঁথিতে গেলেন।

৩

মালা গাঁথিতেছেন। এক হস্তে সূচি ও সূত্র, অন্য হস্তে ফুল। টুপ টুপ করিয়া তুলিতেছেন ও পরাইতেছেন ; যেটীর পর যেটী বসিবে, যেটীর পর যেটী বসিলে সুন্দর দেখাইবে, সেটী ঠিক সেইটীর পর সেইরূপেই বসিতেছে। উভয়েই

কৃতকর্ম্মা, এজন্য ফুল তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইতেছে না। একছড়া মালা হইল সরু যুঁইফুলের, এক ছড়া মোটা মল্লিকার, একছড়া ছোট কুঁদফুলের। কোন ছড়ায় দুই প্রকার ফুল, কোনটীতে তিন প্রকার, কোনটীতে চারি প্রকার। লাল, নীল, সবুজ পুষ্প, কেয়ারিতে সাজান হইতে লাগিল। যুবকের মস্তকে যুঁইএর গড়ে, তাহার পার্শ্ব হইতে কর্ণবিলম্বী দুই ছড়া ছোট ছোট মালার আগায় ভূমিচম্পক দুলিতেছে। তিনি যতবার হাত নাড়িতেছেন, ভূমিচম্পক ততবার তাঁহার নাকের উপর পড়িয়া তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীতল করিয়া দিতেছে।

রমণীর অঙ্গে সমস্ত পুষ্প আভরণ, পুষ্পের কঙ্কণ, পুষ্পের মুকুট, পুষ্পের হার, পুষ্পের অঙ্গদ, পুষ্পের অবতংস, পুষ্প নির্ম্মিত গ্রীবা ভূষণ। তিনি মালা গাঁথিতে-ছেন, আর সেইগুলি নড়িতেছে, দুলিতেছে। পুষ্পরাশি যত কমিয়া আসিতেছে, দুজনে তত নিকট হইতেছেন, ততই কাছে আসিতেছেন। এক একখানি গহণা গাঁথা হইতেছে, আর উহা যথাস্থানে পরান হইতেছে, আর দেখা হইতেছে। একে ত যখনই দেখা যায় তখনই নূতন, তাহাতে আবার নূতন নূতন গহনা, বড়ই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যত পুষ্পরাশি ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, প্রণয়িযুগল, ততই বসিতে লাগিলেন। মনে মনে বাসনা সমস্ত পুষ্পাভরণ প্রস্তুত হইলে খানিক দুজনে একটু গল্প করিয়া যান; দুইজনে সেই পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া একবার কাছে কাছে বসিয়া, গাছ, পালা, বন, জঙ্গল, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পার্থিব সমস্ত ব্যাপার ভুলিয়া স্বর্গের উপর স্বর্গ, তাহার উপর স্বর্গ, তাহার উপর যে স্বর্গ আছে, একবার সেই স্বর্গীয় লোকের মত "প্রেমে সুখে মোহে আর মোহি-নীতে মজিয়ে" কিছুকাল মনুষ্য জীবনে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য, সুখস্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃদু মৃদু আলাপ করেন। আলাপ বলিব, না রসালাপ? ছি! রসালাপ! অশোক রাজার প্রিয়পুত্র, প্রধান সেনাপতি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত, কলাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুরাগী কুণাল, রমণী কুলচূড়া, সুশিক্ষিতা, সুপণ্ডিতা, প্রেমপূর্ণহৃদয়া, কাঞ্চনমালার সঙ্গে রসালাপ করিবে? কুৎসিত নায়ক নায়িকাবৎ কদর্য্য ভাবের অথবা কদর্য্যভাবব্যঞ্জক কথায় ঠাট্টাতামাসা করিবে? আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইত, যদি তাহারা সেইরূপ আলাপ বা রসালাপ করিতে পারিত, তবে বুঝি-তাম, লিখিতেও পারিতাম কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু এখনও ফুলধনু প্রস্তুত হয় নাই, এখনও পঞ্চশর প্রস্তুত হয় নাই, এখনও কাঞ্চনমালার মুকুটের মাথার ফুলের থোবনা প্রস্তুত হয় নাই, ফুল ফুরাইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যা প্রায় উপস্থিত; সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ হইয়াছেন, এখনও ডুবেন নাই। মৃদু পবন হিল্লোলে গঙ্গাতরঙ্গ দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কিন্তু ফুল ফুরাইয়াছে,

সন্ধ্যার একটু পরেই তূর্য্যধ্বনি হইবে সেই সময় সকলকে সাজিয়া ললিত বিস্তরের অভিনয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু সাজা এখনও হয় নাই, ফুলও ফুরাইয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে বাগানের অর্দ্ধ স্ফুটিত কোরক পর্য্যন্ত তোলা হইয়াছে, আর ফুল বাগানে নাই। কুণাল ও কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন নবদূর্ব্বাদলময় সমতল ভূভাগ, তাহার উপর দূর্ব্বা পুষ্প সুধাময় শ্বেতকান্তি ছলাইয়া নমিয়া নমিয়া পড়িতেছে; দেখিলেন, অশোক কিংশুক, বক, বকুল, নাগ, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ বায়ুভরে নড়িতেছে, দেওদার জাতীয় নানা বৃক্ষ শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। বক্ষঃস্থলে ছায়াকাশ ধারণ করিয়া গঙ্গাবক্ষঃ প্রেমভরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তদুপরি ক্ষুদ্র নৌকা সমূহ সারি দিয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাইতেছে, নাবিকেরা প্রাণ খুলিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে, তাহার স্বরের দূরস্থ তরঙ্গ, গঙ্গা সমীরণে শীতল হইয়া মৃদু মৃদু কাণে লাগিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের একটু উৎকণ্ঠা থাকায় তাঁহারা ইহার তত মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা দ্রুতপদে লতা, কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, পুষ্পবৃক্ষাদি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, পুষ্প কোথাও পাইলেন না। সময় যত বহিয়া যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু করিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটু ত্বরাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা গাত্রস্থিত পুষ্পাভরণ সকল মোচন করিয়া নিকটস্থ মর্ম্মর নির্ম্মিত মঞ্চে রাখিলেন। কাঞ্চনমালার অলঙ্কারগুলি বামে ও কুণালের গুলি দক্ষিণে রক্ষিত হইল; তখন উভয়ে একটুকু উত্তর মুখে গেলেন। তথায় নিকটে কৃত্রিম শৈলের প্রতি তাঁহাদের নয়ন পড়িল। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন, "যাহারা পুষ্পচয়ন করিয়াছিল তাহারা বাগানের ফুলই তুলিয়াছে। বোধ হয় দুরারোহ বলিয়া এই শৈল-শিখরস্থিত পুষ্পচয়ন করে নাই। উহার উপর গেলে নিশ্চয়ই ফুল পাইব।" কুণালও সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে শৈল আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন।

যে দুইটী পথ শৈল বেষ্টন করিয়া বরাবর উপরে উঠিয়াছে তাহার একটীর পার্শ্বে অত্যন্ত বন হইয়াছে। ঘাস, লতা, ফুলগাছ প্রভৃতি এত ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কিছুই দেখা যায় না। এইটী কিছু অধিক খাড়াই, অতএব ইহা দ্বারা শীঘ্র উঠিতে পারিবেন ভাবিয়া উভয়ে ঐ পথই অবলম্বন করিলেন। দুই এক পা উঠিতে না উঠিতেই নিবিড় লতান্তরাল হইতে কুপিতফণিফণার ঘোরগর্জ্জনবৎ কি শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু ত্বরা প্রযুক্ত তাঁহারা কেহই উহার প্রতি কোন লক্ষ্য করিলেন না। কিছু দূর উঠিয়াই দেখিলেন কোথাও একটা পাতা ছেঁড়া, কোথাও একটা ডাল ভাঙ্গা, কোথাও পুষ্প দলিত। দেখিয়া কাঞ্চন বলিল, "বুঝি কে এইমাত্র এখানে

আসিয়াছিল।" আরও কিছু দূর উঠিয়া একস্থানে দেখিলেন, একটী ডালে একেবারে পাতা নাই, পাতাগুলি যেন পদদলিত; দেখিয়া কুণাল বলিলেন, "যে আসিয়াছিল সে বোধ হয় এইখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়াছিল"। আর একটু উপরে উঠিয়াই দেখিলেন কাঞ্চন যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক, পুষ্প চয়নকারীরা এতদূব উঠে নাই। রাশি রাশি পুষ্প শৈলাগ্রদেশ পর্য্যন্ত ফুটিয়া যেন আকাশের লঘুবায়ুকেও সৌরভময় করিয়া তুলিতেছে। তখন কাঞ্চন আপন অঞ্চলে এবং কুণাল উত্তরীয়ে পুষ্প তুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। উভয়ে পুষ্পচয়নে ক্ষিপ্রহস্ত,—ফুল চয়ন বড় সোজা, টানিয়া ছিঁড়িতে হয় না, হাত দিলেই খসিয়া যায়—অমনি ধরেন, আর যথাস্থানে রাখেন। এই ফুল, এই ফুল, এই ফুল, দুটীতে নড়িয়া নড়িয়া যাইতেছেন আর ফুল তুলিতেছেন। নাচ ইহার কাছে কোথায় লাগে? হে নৃত্যকলাকোবিদত্বগর্ব্বকারিণী বঙ্গীয় নৃত্যেশ্বরীগণ! তোমরা যদি তাহাদেব দুজনের সেদিনকার ফুল তোলা দেখিতে, তোমাদের নৃত্যগর্ব্ব কোথায় থাকিত? এই এখানে, আবার পাহাড়ের আড়ালে, আবার উপরে, আবাব পার্শ্বে। কুণাল যেমন সময়ে সময়ে আপন মনোমধ্যে দেখিতেন, এই আসে, এই যায়, থাকে না তিলেক, এখানেও সেইরূপ দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই বিদ্যুৎবৎ চঞ্চল পদে চলিতেছেন। আর তর তর করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, আর ফুল তুলিতেছেন। অত দ্রুত না কাঞ্চন, অত দ্রুত না কুণাল, একবার একটু থাম, আমি একবার তোমাদের এই অবস্থার চিত্র লিখিয়া লই। না, তোমরা থামিবে না। বুঝিয়াছি তোমাদের ত্বরা আছে। যাও, শীঘ্র পুষ্প চয়ন করিয়া ধনুক বাণ আর খোপনাটী তৈয়ারী করিয়া লও। দাঁড়াইও না, যে মহৎ কর্ম্মের জন্য আজি উদ্যোগী, বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্ব্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্ব্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎ কৃতকৃতার্থ কর।

ক্রমে ফুল তুলিতে তুলিতে অপ্সরার ন্যায় প্রোজ্জ্বলকান্তি দেব দেবীর ন্যায় কুণাল ও কাঞ্চনমালা পর্ব্বতের শিখরারোহণ করিলেন। তথায় উপবেশনার্থ যে সুন্দর মর্ম্মরখণ্ড পাতিত ছিল, তথায় বসিয়া অঞ্চল ও উত্তরীয়স্থিত পুষ্প লইয়া ত্বরায় অভিলষিত ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত হইল। গগনে বিষমমণ্ডল রাজহংস ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধফেণধবল কিরণমালা বসুধাকে স্নাপিত করিয়া দিতে লাগিল। শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মলয় সমীর দক্ষিণদিক হইতে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে শীতল করিতে লাগিল।

কুণাল তখন বলিতে লাগিলেন, "কাঞ্চন, আমি যখন যখন এই শৈল-শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনই আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

কা। তুমি আমায় এখানে আর আসিতে দিবে না তাহারই যোগাড় করিতেছ।

কু। না কাঞ্চন! এখানে আসিলেই সেই কথা মনে পড়ে, যেদিন গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়া—

কা। আমি কাণে আঙ্গুল দিলাম ও কথা আমি শুনিব না।

কু। কেন কাঞ্চন, যেদিন আমার ধর্ম্ম লাভ হয়, যে দিন আমার প্রাণ লাভ হয়, যে দিন আমার তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনের কথা শুনিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন, কাঞ্চন?

কাঞ্চন মৃণালকোমল বাহুযুগলে কুণালের কণ্ঠ জড়াইয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "কণ্ঠরত্ন, যাহাতে তোমার এত আমোদ তাহা শুনিতে কি আমার অনিচ্ছা হইতে পারে, তবে—"

কু। তবে তোমার অনেক প্রশংসার কথা আছে বলিয়া তুমি শুনিতে রাজী নহ।

কা। তা কেন?

কু। তবে কি?

কা। তুমি আমার কথা কেন বলিবে? তুমি তোমার কথা বল।

কু। তাকি হয়, কাঞ্চন, সেইদিন থেকে আমার কথা বলিলেই তোমার কথা, তোমার কথা বলিলেই আমার কথা—

কা। হবে বই কি? বলিবে বল। তোমার কথা তুমি বল, আমার কথা তাহার পরে আমি বলি।

কু। আচ্ছা বেশ! প্রায় আট বৎসর হইল ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমার দিন আমি শীকার করিতে করিতে গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিলাম, তথা হইতে দেখিলাম একটী ব্যাঘ্রদম্পতী এক জায়গায় রহিয়াছে, আমি একেবারে অশ্বপৃষ্ঠে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রদিগের খরনখর প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছি, স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন এক প্রাচীন ঋষির আদেশে ব্যাঘ্রেরা, পালিত কুক্কুরের মত তাঁহার পা চাটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী একটী দেবকন্যাকে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। কন্যা আমার বক্ষঃস্থলে

রাখিয়া আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করাইল। তখন আমার চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সত্য সত্যই সেই বটবৃক্ষ, সত্য সত্যই সে অপ্সরানিন্দিত রূপমাধুরী কন্যা, আর সত্য সত্যই সেই ঋষি তুল্য সিতশ্মশ্রু স্থবিরবর রক্তাম্বর পরিধায়ী। তাঁহার দুইদিকে দুইটি ব্যাঘ্র। তিনি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে আমার মন গলিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাঁহার বাটী রহিলাম। আহা! তেমন সুখের দিন কি আর হইবে! তাহার পর আমি একদিন সেই অপ্সরার সহিত গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গেলাম, সে কত কি বলিল। রোজ সেইখানে বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। ঋষি প্রবর্ত্তনায় অপ্সরার প্ররোচনায় ও নিজের মনের আবর্ত্তনায়, সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিলাম, ঐহিক ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে। ভোগ ভিন্ন জগৎ চলে, আকাঙ্ক্ষা অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, অনেক সুন্দর হইতে পারে। ক্রমে সেই ঋষির অনুকম্পায় আমার ত্রিরত্ন লাভ হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমা হেন চতুর্থ রত্ন লাভ করিলাম।

কা। আর কত বলিবে।

কু। তাহার পর ধর্ম্ম ত্যাগ করায় পিতা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, কত দেশে কত অবস্থায়ই ঘুরিয়াছি, কিন্তু দেখিলাম গৃহে বনে শ্মশান মশানে গাছতলায় পালঙ্কে তুমি সকল অবস্থাতেই সমান।"

কা। সে কাহার গুণ? তোমার না আমার?

কু। আজ এই পাহাড়ে উঠিয়া পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। যেদিন ত্রিরত্ন লাভ হয়, যেদিন তোমায় লাভ হয়, যেদিন ঐহিক পারত্রিক সুখের বীজ বপন হয়, আজি সেই দিন স্মরণ হইতেছে; কারণ, সে একদিন ছিল, আর এ আর একদিন। বল দেখি তোমার কোন্‌টি ভাল লাগে, কাঞ্চন?

কা। যখন রোজ রোজ বনে ও পাহাড়ে তোমায় দেখিতাম, তুমি বাঘ শিকার করিতে, বাঘের পীঠে বর্শা ফুটাইয়া দিয়া তাহারই উপর আরোহণ করিয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে পর্ব্বতচূড়া গমন করিতে, তোমায় দেখিতাম। আর পিতার সহিত সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতাম, সে সময়ের কথা মনে হইলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। তুমি তখন আমার প্রতি কত সদয় ছিলে, পরিচয় ছিল না অথচ বোধিবৃক্ষমূলের নিকটে আসিলে আমার সঙ্গে দুই চারি দণ্ড গল্প না করিয়া যাইতে না। সে এক দিনই ছিল। যে দিনের কথা কহিতে তুমি এত ভালবাস, যেদিন তুমি যখন ব্যাঘ্রনখরাঘাতে পীড়িত হইলে, পিতা তোমার উদ্ধার করিলেন, তখন তোমার অসুখ দেখিয়া আমার যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা কি প্রকারে বলিব।

তাহার পর তোমায় যখন বোধিবৃক্ষমূলে লইয়া গেলাম, তখন বড়ই আনন্দ হইল, বোধিদ্রুম সহসা মুকুলিত হইল। উহার শোভা সমৃদ্ধি যে, শুদ্ধ আমিই দেখিলাম এমন নহে, পিতা দেখিয়া বলিলেন, এই রাজকুমার হইতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছিলাম, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ নও জানিতাম। কিন্তু শুদ্ধ ভোগমাত্র যে প্রণয়ের উদ্দেশ্য, সে প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। যখন শুনিলাম, তোমা হইতে আমার চির অভিলষিত সদ্ধর্ম্ম বিস্তার হইবে, "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার হইবে, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বিস্তার হইবে, তখন তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড়ই বাসনা হইল। পিতার অনুগ্রহে ত্রিরত্ন প্রসাদে ও তোমার অনুকম্পায় মিলন হইল, তোমার সহিত মিলনে একদিনও অসুখী নহি। এখন সদ্ধর্ম্ম প্রচারের যত সমৃদ্ধি হয়, ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সত্য বলিতে কি ? সদ্ধর্ম্ম প্রচার, আর তোমার অতুল্য প্রণয়, এই উভয়ে আমি এত মগ্ন আছি, আর আমার অন্য চিন্তা নাই।

এইরূপ প্রণয়পূর্ণ হৃদয়োন্মাদক বাক্যলহরী সৃজন করিয়া উভয়ে উভয়কে মোহিত করিতেছেন। উচ্চপর্ব্বতোপরি শান্ত সমীরণ বহিতেছে, নির্ম্মল আকাশে উজ্জ্বল তারা জ্বলিতেছে, জগত যেন তাঁহাদের অগাধ অপার অনন্ত প্রশান্ত প্রণয়ের প্রতিকৃতি। ঝিল্লীরব যেন তাহাদের প্রণয়পূর্ণ স্বরলহরীর প্রতিধ্বনি।

৫

উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কথাবার্ত্তায় বিশ্রাম, হৃদয় পূরিয়া উঠিয়াছে, মন উন্মত্ত হইতেছে, মন ক্রমে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে, তাহার ভুবোলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি সপ্তশত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম অব্যক্ত, সুখময়, প্রেমময়, মোহময় ধামে উঠিতেছে। সমস্ত জগতের সত্তালোপ হইয়াছে, শরীর আছে কি না আছে, জ্ঞান নাই, আছে কেবল তিনটী জিনিস, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় স্বর লহরী, একটী সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় আত্মা, আর তাহার সঙ্গে উহারই সমান সুধাময় সুখময় প্রেমময় কি যেন কি ময় আর একটী আত্মা। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে।

এমন সময়ে দূরে বাজনা বাজিল, অভিনয়ারম্ভসূচক তূর্য্যধ্বনি হইল। উভয়কে আবার পৃথিবীর অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিল। উভয়ে আবার পৃথিবী বায়ু স্পর্শ অনুভব করিলেন, আসনস্বরূপ মর্ম্মর প্রস্তরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। কিন্তু হঠাৎ স্বর্গ হইতে নামিতে হইল বলিয়াই হউক বা আর কিছুতেই হউক কাঞ্চনমালা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। যেন মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। কি যেন হারাইয়াছি, আশা যেন পূরিল না। যে সুখে এতক্ষণ নিমগ্ন ছিলাম, উহা যেন

আর ইহজন্মে ফিরিয়া আসিবে না। যেন যে সকল আশা এতক্ষণ করিতেছিলাম, তাহা যেন স্বপ্ন, কখন পূরিবে না। তিনি একবার বলিলেন, "হঠাৎ মনটা কেন উদ্বিগ্ন হইল, বল দেখি?"

কুণাল বলিলেন, "আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ অন্তচিন্তায় বিশেষ কার্য্যনাশ সম্ভাবনা চিন্তা উদয় হওয়ায় আমিও উদ্বিগ্ন হইলাম!"

কাঞ্চন বলিলেন, "না এ সে উদ্বেগ নহে, বোধ হয় কোন বিপদ শীঘ্র উপস্থিত হইবে।" এই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে সত্বরে শৈল-শিখর হইতে নামিয়া আসিলেন।
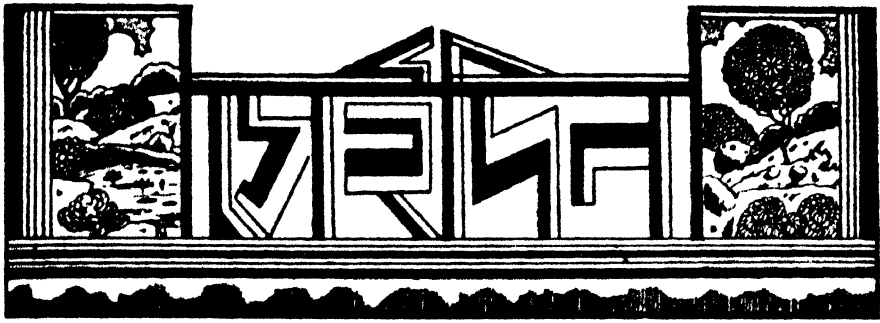
সেই দিন

ফুল্ল শরতের চাঁদ গগন মণ্ডলে,
জগত কিরণময়,
নীরবে সমীর বয়,
বিষাদ-প্রতিমা সেই বাতায়ন তলে,
দুই চক্ষু অবিরল ভাসে অশ্রুজলে।

সেই দিন

নব অনুরাগে যবে প্রথম মিলন,
সলাজ সরল মুখ,
অলক চুম্বিত বুক,
সপ্রেম চকিত দৃষ্টি মানস মোহন;
শুভ্র বালিকার সেই শুভ্র দরশন।

সেই দিন

বিকসিত মুখপদ্ম জ্যো'স্নার প্রভায়,
কুসুমে জড়িত কেশ,
স্নেহে বিগলিত বেশ,
স্ফুরিত অধর ওষ্ঠ দীপ্ত প্রতিভায়,
আধ হাসি যেন মুখে মিলাইয়া যায়।

সেই দিন

বালিকার কণ্ঠে যবে নব সম্ভাষণ,
প্রতি অক্ষরেতে যার,
বেজেছিল হৃদিতার,
অন্তরে অন্তরে যাহা রয়েছে এখন,
অস্ফুট মধুর সেই প্রণয় বচন।

সেই দিন

সুখ সায়াহ্নের তারা আকাশ সীমায়,
একাকিনী ফুল বনে,
ভ্রমিলে যবে গোপনে,
ফুলকুলেশ্বরী যেন ফুলের ভূষায়,
স্বপ্নময় সেই নৈশ পুষ্পবাটিকায়।

সেই দিন

বহুকাল পরে যবে ফিরিনু ভবন,
প্রভাত নক্ষত্রপ্রায়,
ম্লান জ্যোতির্ময় কায়,
পাগলিনী বেশে মোরে দিলে দরশন,
রাহুগ্রস্ত তব সেই মলিন আনন।

সেই দিন

গভীর তাহার স্মৃতি, ভুলিব কেমনে,
আদরে গলিয়ে প্রিয়ে,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে,
কত যে প্রণয় কথা কহিলে গোপনে
—ভালবাসা-মাখা সেই হৃদয়বেদনে।

সেই দিন

স্মৃতিপটে চিরকাল থাকিবে অঙ্কিত;
সেই লজ্জাবতী বালা,
সেই পরিণয় মালা.
প্রেমময় মুখখানি অলক-শোভিত,
বালিকা হৃদয় কাব্য নব-প্রফুটিত।

সেই দিন! হায় রে,
গত সে সুখের দিন প্রেয়সী এখন,
স্মৃতিমাত্র হৃদয়েতে আছে নিমগন;
সেই প্রেম, সে আনন্দ,
সেই মন সদানন্দ,
বৃন্তচ্যুত সে কুসুম কানন রতন.
আর কি পাইব ফিরি সে সুখ জীবন।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত।

মেঘেতে—বিজলী, বা হরিশ্চন্দ্র। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। বালকের লেখা বলিয়া বোধ হয়।

The Bengal Miscellany. মাসিক পত্র। মে ১৮৮২। বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত। বাৎসরিক মূল্য ২।০ টাকা।

মাসিকপত্রখানি কতক ইংরেজী কতক বাঙ্গালা। আমরা ইহার মাত্র একখানি পাইয়াছি। ইংরেজীতে দুইটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম Sir Ashley Eden, দ্বিতীয় The Governor Generals of India. প্রথমটিতে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেপটিনাণ্ট গবর্ণরের রাজকার্য্য সম্বন্ধে উপহাস করিয়া এক আবেদন পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে; তাহাতে স্বাক্ষরকারির নাম, প্রথম কালাগোপাল পাল, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী লাল ঠাকুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রুচির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমাদের সংবাদ পত্র এ সকল বিষয় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, মাসিক পত্রের আর তাহাতে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই। এতৎভিন্ন এই মাসিক পত্রে আর আর যাহা পাঠ করা গেল, তাহা কিছুই নিন্দার নহে বরং প্রশংসার যোগ্য।

প্রবাহ। মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত বি, ব্যানার্জি, এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

প্রবাহের প্রধান সংকল্প এই যে ইহা নিয়মিত মত মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। এই সংকল্পে আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইলাম। অন্যান্য মাসিকপত্র কেন নিয়মিত মত প্রকাশ হয় না ইহা প্রবাহ প্রকাশকগণ অবশ্য জানিয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া এই সংকল্প করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের সাহস হইতেছে যে প্রবাহ স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যদি না জানিয়া না বুঝিয়া কেবল প্রবাহর টাকায় প্রবাহ প্রতিপালিত হইবে এরূপ অনুভাবে এ সংকল্প করিয়া থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় ভ্রম হইয়াছে। প্রবাহর লিপি পরিপাট্য মন্দ নহে। দুই এক জন সুলেখক ইহাতে ব্রতী আছেন বলিয়া বোধ হইল।

রাজ উদাসীন। শাক্যসিংহ ও রামমোহন রায়। কলিকাতা ৩৭নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

মেছুয়াবাজার, বীণা, শরচ্চন্দ্র এই তিন জিনিস একত্র মনে করিয়া আমাদের প্রথমে হাসি আসিয়াছিল। কিন্তু পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থকারের কবিতা শক্তি আছে। আর কিছু দিন পরে ইনি একজন সুলেখক হইবেন। তাহার পরিচয় স্বরূপ আমরা গুটিকতক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। শাক্যসিংহ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া যান, "তখন তামস বাসনা নিশা দ্বিতীয় প্রহর।" তাঁহার স্ত্রী নিদ্রাগত। তিনি যাইতে উদ্যত অথচ যাইতে পারিতেছেন না, শেষে :—

"যাই এই বার। বলি ফিরায়ে বদন,
চাহিলা বিষাদে যুবা প্রিয়া মুখ পানে।
দেখিলা সে মুখ-শশি সরলতাময়
রয়েছে তেমতি, শুধু নিদ্রার আবেশে
চারু অলকার দাম পড়েছে ছড়ায়ে
মুখের উপর; অর্দ্ধ স্খলিত বসন,
তেমতি মুদিত নেত্র,—সেই স্থির ভাব,
কেবল কপোল বহি নয়নের জল
ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু বাহুর উপর,
স্ফুরিছে নাসিকা—ধীরে কাঁপে ওষ্ঠাধর
বুঝি কি দুঃস্বপ্ন বালা দেখি নিদ্রাবেশে,
কাঁদিছে নীরবে। হায়! প্রণয়ীর মন,
দেখি হেন ভাব, কভু পারে কি থাকিতে?
অমনি সে মুখ-শশি তুলিয়া আদরে
চুম্বিলা হৃদয়ে ধরি। স্বপ্নাবেশে বালা,
"যাবে নাথ—যাবে তুমি ত্যজি এ দাসীরে?
তা আমি দিবনা যেতে জীবন থাকিতে"
কহিলা অস্ফুট স্বরে।"

আর এক স্থানে :—

"ভীষণ শ্মশান।—তার দূর প্রান্তদেশে
—বিনাশিয়া রজনীর গাঢ় তমোরাশি—
জ্বলে চিতানল। • • •
————চিতার পারশে
একটি রমণী মূর্ত্তি দাঁড়ায়ে নীরবে
পাষাণ প্রতিমা সম। ঝরে না নয়নে
একটি অশ্রুর বিন্দু, এক দৃষ্টে চেয়ে
আছে শুধু হৃদয়ের রতন তাহার
পুড়িছে যেখানে; যেন হু হু হু হু রবে
পোড়ায় অনল আজি হৃৎপিণ্ড তার,
তবু সংজ্ঞাহীন। সেই নিবিল অনল
"কোথা গেলি বাপ" বলি পড়িল ভূতলে।"

কতকটা "যোগেশের" অনুকরণ।

যাবনিক পরাক্রম। উপন্যাস। নীলরতন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা। ২৫ কর্ণোওয়ালিস ষ্ট্রীট।

উপন্যাসটীর সংক্ষেপ বিবরণ কতক অংশ গ্রন্থকারের নিজ ভাষায় বলিতে পারিলে গ্রন্থের গুণাগুণ অনেকটা বুঝা যায়।

রাজা মানসিংহের ভ্রাতৃকন্যা ইন্দুমতীর সয়ম্বর সভায় ঘোষণা হইল যে, যে বীরপুরুষ পেশওয়ারের দুর্গ সেকন্দর খাঁর হস্ত হইতে পুনর্জ্জয় করিয়া দুই বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিতে পারিবেন তিনিই ইন্দুমতীর বরমাল্য পাইবার যোগ্য। এই ঘোষণা শুনিয়া সয়ম্বর

সভায় রঘুনাথ সিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমিই এ কার্য্য উদ্ধার করিব। "তদবধি তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি" ইন্দুমতীর "হৃদয় পটে চিত্রিত" রহিল। রঘুনাথ সিংহ পেশওয়ারের দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন, এমত সময় ইন্দুমতী আপনার "প্রিয়তমকে ঘোর বিপদগুলী পরিবৃত শুনিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া ছদ্মবেশে" (অর্থাৎ যুবা পুরুষ বেশে) হরিৎস্বামী নামক একজন বৃদ্ধ গায়কের "সমভিব্যাহারে প্রিয়তমের সমদুঃখ ভাগিনী হইবার নিমিত্ত" তথায় যাত্রা করিলেন। পেশওয়ার প্রদেশ কাবুল নদীর "সুরম্য বক্রগতি দ্বারা তত্রত্য ক্ষেত্রমালা অপর্য্যাপ্ত শস্যশালিনী হইয়া রাজলক্ষ্মীর সুচারু লাবণ্য প্রফুল্লাস্যে প্রকটিত করিত।" সেই প্রদেশে কতক দূর গিয়া ইন্দুমতী (ওরফে বিজয়) হরিৎস্বামীকে বলিলেন "পিতঃ! পেশওয়ারের দুর্গ আর কত দূর? পথ শ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছি।" হরিৎস্বামী উত্তর করিলেন, "আহা! লাবণ্যময়ী বালেন্দুবৎ দেহবল্লী অধ্বশ্রমে ও বিচ্ছেদোত্তাপে একেবারে শুষ্ক ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।" "হরিৎস্বামী এইরূপ বলায় যুবতীর শোকাবেগ একেবারে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল।" শেষে স্থির হইল নিকটেই আলম খাঁর ভবন, তথায় যাইয়া রাত্রি-যাপন করা কর্ত্তব্য। ইনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। যুবতী বলিলেন, "তবে কি তিনি সৈনিক পুরুষ?" হরিৎস্বামী উত্তর করিলেন আলম খাঁ "কখন কখন অসিধারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি অবিমৃষ্যকারিতা কি জিঘাংসা পরতন্ত্র নহেন।" শেষ আলম খাঁর সহিত উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। আলম খাঁর ভবনে রঘুনাথ সিংহর কথকগুলি রাজপুত সেনা থাকিত, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল খাঁ সাহেবের সঙ্গে অপর দুইজন (ইন্দুমতী আর হরিৎস্বামী) "দেখিতেছি, উহারা কে?—দেখিতে যে ভয় করে—"।

পর দিবস প্রাতে হরিৎস্বামী বিজয়কে এক ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বলদেব সিংহের সঙ্গে দুর্গে গেলেন। তৎকালে রঘুনাথ সিংহ তথায় ছিলেন না, পরে তাঁহার অনুপস্থিত সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি দুর্গে স্থান পাইয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন, আগন্তুক শত্রুপক্ষীয় কোন দূত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে গেলেন না, তাহার কোন অনুসন্ধানও লইলেন না। পরদিবস মৃগয়ায় গেলেন। তথায় বিকটাকার এক পুরুষ দেখিলেন, তাঁহার নাম করম খাঁ। রঘুনাথ সিং "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া বলিলেন—"যবনের কি দুঃসাহস? যবন উত্তর করিল, সেকন্দর খাঁর অনুচর করম খাঁর ভয় কিসের? রঘুনাথ সিং এক্ষণে স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে এব্যক্তি সেকেন্দর খাঁর প্রেরিত।" শেষ করম খাঁ "সাহসে নির্ভর করত এক

ভয়ানক লম্ফ দ্বারা” পলাইল। রঘুনাথ ও বলদেব দুর্গে আসিলেন। পর দিবস প্রাতে হরিৎস্বামী সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল। হরিৎস্বামী বলিলেন বিজয়ের অনুমতি ব্যতীত আমি উভয়ের “রহস্য” ব্যক্ত করিতে পারি না। রঘুনাথ সুতরাং ধর্ম্মশালায় বিজয়ের নিকট গেলেন, বিজয় দেখা দিল না। রঘুনাথ প্রত্যাগমন করিয়া বলদেবকে পাঠাইয়া দিলেন। বলদেবের সঙ্গে পথে সেকন্দরের সাক্ষাৎ হইল; তিনি আপনার পরিচয় দিয়া “অচিন্তনীয় দ্রুতবেগে সমীপবর্ত্তী গহ্বরমধ্যে বিদ্যুৎপ্রায় অন্তর্হিত হইলেন।” বলদেব শেষে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া তথাকার অধ্যক্ষের দ্বারা বিজয়কে আপনার সম্মুখে আনাইলেন। অধ্যক্ষ এই সময় বলদেবকে বলিয়া দিলেন যে ইনি “ইন্দুমতী এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন।” ইন্দুমতীর সঙ্গে বলদেবের কথা বার্ত্তা হইল। ইন্দুমতী শয়নগৃহে গেলেন। বলদেব তথায় একজন প্রহরী রাখিলেন কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখেন শয়নগৃহে বিজয় নাই। গ্রন্থকার এই সময় বলিতেছেন “পাঠক মহাশয়! উৎকণ্ঠা হইবেন না, আমি নিম্নেই বিজয়ের অন্তর্ধান বিবরণ বর্ণনা করিয়া আপনার কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।”

এই সময় আমরাও বলি, পাঠক মহাশয়! উৎকণ্ঠা হইবেন না, আমরা ক্ষান্ত হইলাম। এই মাথামুণ্ডু লিখিয়া আমরা অনেকটা কষ্ট দিয়াছি অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য, উপন্যাস লেখকের যে সকল শক্তি আবশ্যক, গ্রন্থকারের তাহা কিছুই নাই অন্তত এপর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাই না।
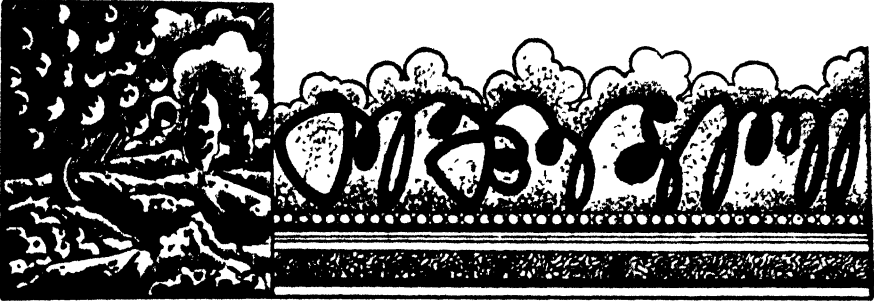
দ্বিতীয় ভাগ

১

কুণাল নামিয়া আসিয়া দেখেন, কাঞ্চনমালার উৎকণ্ঠার বাস্তবিকই কারণ হইয়াছে। যেখানে তাঁহারা আপন আপন পুষ্পাভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, কুণালের আভরণ সেইখানেই রহিয়াছে। কিন্তু কাঞ্চনের পুষ্পগুলি সেখানে নাই। কোথায় গেল? কে লইল? এ রাত্রে এখানে লোক আসিবার ত সম্ভাবনা নাই? আর ত সময় নাই যে খুঁজি। অভিনয় সত্বর আরম্ভ হইবে। ললিত বিস্তরের তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইলেই কুণাল ও কাঞ্চনমালা মার ও মারপত্নী সাজিয়া বুদ্ধদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইবেন। উভয়েই অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কি করা যায়, কাঞ্চন ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন, কুণালের আর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও অবসর হইল না। আবার তূর্য্যধ্বনি হইল, প্রস্তাবনা শেষ হইয়াছে। পাত্র প্রবেশ আবশ্যক। কুণাল বলিলেন, কাঞ্চন তুমি অমনি আইস তুমি নিরাভরণা হইয়াও মার পত্নীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে। কিন্তু কাঞ্চন কোন জবাব করিল না। তাহার উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, সে কেবলই ভাবিতেছে, আমার মন যে চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে জানিয়াছিলাম অমঙ্গল অবশ্য হইবে। কিন্তু সে অমঙ্গল কি এই মাত্র—না তা হইবে না—এখনও ত উৎকণ্ঠা দূর হইতেছে না, তবে নিশ্চয় আরও বিপদ হইবে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সুতরাং কুণালের কথার উত্তর দিলেন না, সমস্ত শুনিলেন কি না সন্দেহ। কুণাল বলিলেন "মারপত্নী কিছু নাটকে নাই, তুমি আমায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব অশোক রাজার ধর্ম্ম গ্রহণের সময় তুমি আমোদ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমি মারপত্নী নামে একটী নূতন পাত্র উহাতে নিবেশ করিয়াছি। অতএব তুমি না যাইলেও আমি যাই। নচেৎ অভিনয় ব্যাঘাত হইবে।" বলিয়া কুণাল দ্রুততর অভিনয়স্থলে গমন করিলেন। কাঞ্চন ভাবিতে লাগিলেন, আমার অমঙ্গলের কি এইখানেই বিরাম হইবে?

২

কুণাল আসিয়া দেখেন সমস্ত প্রস্তুত, তাঁহার জন্য নেপথ্য গৃহে সকলেই ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার অন্বেষণ জন্য লোকও প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার রঙ্গস্থল প্রবেশের আর বিলম্ব নাই, বরং দুই এক মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। কুণাল আর নেপথ্যশালায় বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কই ? আমার সেনাপতি ও দুহিতৃগণ কই"? অমনি মারপত্নী আসিয়া কহিলেন, "নাথ ! সকলই উপস্থিত। বসন্ত, কোকিলকুহু, আম্রমুকুল, দক্ষিণপবন প্রভৃতি দল বল সব উপস্থিত। আপনার কন্যাগণ সব উপস্থিত।" কুণাল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। যে মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে, এ কে ? মুখ দেখিতে পাইলেন না, কারণ উহা আবৃত। গলার স্বরে বুঝিলেন কাঞ্চনমালা নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার স্বহস্তগ্রথিত পুষ্প অলঙ্কারগুলি সমস্তই তাহার গায়ে রহিয়াছে। এ অলঙ্কার এ কোথা হইতে পাইল ? তিনি এই সকল ভাবিতেছেন আর অন্যমনস্ক হইতেছেন। যে যুবতী মারপত্নী সাজিয়া আসিয়াছে সে অতি রসিকা, প্রত্যুৎপন্ন মতিশালিনী। সে অমনি বলিল "নাথ এত চিন্তিত কেন ? যখন সত্যযুগে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের ধ্যানভঙ্গ করাইয়াছ তখন কলিতে এই সামান্য রাজপুত্রের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিবে না ?" কুণাল ভয়বিস্ময়সূচক স্বরে কহিলেন "কিন্তু বোধ হয় এ অত্যন্ত কঠিন ঠাঁই"; তাঁহার ভাব এমনি মনোহর হইল যে সভাস্থ লোক সকলেই "বেশ বলিয়াছ" "খুব বলিয়াছ" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া উঠিল। কুণালের বিস্ময়জড়তা কতক দূর হইল। তিনি তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন; দেখিতে লাগিলেন যে মারপত্নী হাবভাব আদর দ্বারা তাঁহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা কে জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার এইরূপ কৌতূহল ও বিস্ময় থাকা প্রযুক্ত তাঁহার অভিনয় আজি অন্য দিন অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই কুণালের অভিনয়-পারিপাট্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কুণাল অভিনয়ে অত্যন্ত পটু, কিন্তু আজি তাঁহার সুখ্যাতির কারণ শিক্ষার গুণ নহে। ঐ যে চমকিত ভাব উহাই সভাস্থ জনগণের মনোরঞ্জনের মূল। তাহারা কিন্তু জানিল না যে কেন তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর, তিনিও জানিতে পারিলেন না কেন আজিকার অভিনয় লোকের এত ভাল লাগিল।

এই রমণী কে ? এ ত কাঞ্চনের ফুলের গহনাগুলি চুরি করিয়াছে ? নিশ্চয়ই ঐ করিয়াছে, নহিলে সে সব দেবদুর্লভ অলঙ্কার, কুণালের স্বহস্তগ্রথিত, ও ত আমরা কেন চিনি, ও গহনা ও কোথায় পাইল, বিশেষ ঐ দেখ মুকুটের খোপনা নাই। "এই খোপনার ফুলের জন্য পাহাড়ে উঠিয়াই ত কাঞ্চন

বেচারার আজি এই মনঃপীড়া ভুগিতে হইল। অতএব এ নিশ্চয় সেই গহনা চুরি করিয়াছে, কিন্তু লোকটা কে? কেমন করিয়া জানিব? স্ত্রীলোকের মুখের ঘোমটা খুলিয়া ত দেখিতে পারি না। আপনার কেহ হইত, কোন রূপ আশা থাকিত, না হয় অভব্যতা করিয়াও দেখিতাম। কিন্তু ঐ চোরের মুখের ঘোমটা খুলিয়া উহার পরিচয় লইব, উহাকে চিনিয়া লইব? ছি! ও কেন রাজরাণী হউক না? ও চোর—না হয় চোরাও মাল কিনিয়াছে—ওর সঙ্গ আমরা চাইনা।"

নিজেই চুরি করিয়াছে, নহিলে ফুল আবার কে চুরি করিতে যাইবে? ধরা পড়ারও ত ভয় করিতেছে না! কি সাহস, যাহার চুরি করিয়াছে তাহারই সম্মুখে, সেই জিনিষ লইয়া কেমন সপ্রতিভের মত কথা কহিতেছে, যেন কোন দুষ্কর্ম্মই করে নাই। এত সাহস! এ ত সামান্য লোক নয়। কিন্তু কি জন্য চুরিই করিল, কি জন্যই বা এত সাহস করিয়া চোরাও মাল শুদ্ধ রাজাধিরাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল? দেখিতেছ না উহার রকম? ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া কুণালের কাছে দাঁড়াইতেছে, যতবার নাম করিতেছে যেন গলার স্বর জড়িত হইয়া আসিতেছে, দেখিতেছ না ভাবভঙ্গী? ওকি ভাল? ওর বড় সুবিধা হয়েছে, লোকে জানে এ কাঞ্চনমালা—কুণাল ভিন্ন আর কেহ ত জানে না যে ও কাঞ্চনমালা নহে। কাঞ্চনমালা হতাশ্বাস হইয়া অভিনয় দেখিতেও আজি আইসেন নাই। সুতরাং ও লোকের কাছে ঠিক কাঞ্চনের মতই বোধ হইতেছে। দুষ্টাও এ সব ঠিক বুঝিয়া বুঝিয়া আপনার সুবিধা পাইয়াছে, একেবারে মারপত্নী ও কাঞ্চনমালা এই উভয়ের ভূমিকা ধারণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। কুণাল প্রথম খানিক হাঁ করিয়া অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার পর রীতিমত অভিনয় করিতে লাগিলেন। হতবুদ্ধি ভাবটা কতক অন্তরিত হইল। তিনি আপন কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল নজর রাখিলেন যে, দুষ্ট মাগী যেন হঠাৎ বাহির হইয়া না যায়। উহার প্রতি কুণালের বার বার দৃষ্টি পড়ায় সে মনে করিল, বুঝি শিকার পাকড়াইয়াছি। সে তখন মারপত্নীর কর্ত্তব্য নৃত্য করিতে লাগিল। সম্মুখে উপগুপ্ত, অশোকের দীক্ষাগুরু, বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি, বুদ্ধ সাজিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যান করিতেছেন। প্রশান্তমূর্ত্তি, স্থূলকায় মুণ্ডিতশিরঃ, কৌপীনমাত্ররক্তাম্বর পরিধান, অটল অচলবৎ নিস্পন্দ। তাহারই প্রলোভনার্থ মার ও মারপত্নী বসন্তসেনা মারদুহিতাদিগের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মারপত্নী নৃত্য করিতে লাগিল। যে হও তুমি সে হও, অত নাচিও না সুন্দরি! কি নৃত্য! ! মরি মরি মরি! বুদ্ধদেব নিতান্ত পাষাণ তাই তোমার নৃত্যে ভুলে নাই। তোমার নৃত্য ধ্যানের দুর্লভ, কামনার উচ্চপদ, সার হইতেও সার,—অত নাচিও না সুন্দরি! মনুষ্য দর্শক মজিয়া যাইবে, হয় ত অশোক রাজার দীক্ষা লওয়া ফিরিয়া যাইবে। অত নাচিও না।

উহার সঙ্গে আবার ওকি ! কটাক্ষ ! এক একবার বিদ্যুৎ ছুটিতেছে। ও কাহার উপর ! কুণাল, আজি বুঝিব, তুমি সীসা কি সোণা, আজি তোমার ধর্ম্ম বুঝিব, আজি তোমার বিদ্যা পরীক্ষা হইবে। ওকি কুণাল, তুমিও যে আরম্ভ করিলে, তুমিও কটাক্ষ করিতেছ, একি তোমার কলানৈপুণ্য ? তুমি কি শুদ্ধ দর্শকমণ্ডলীর মন রাখিবার জন্য কটাক্ষে কটাক্ষের জবাব দিতেছ ? না, কাচ মূল্যে কাঞ্চন মণি বিক্রয় করিতেছ। না ! না ! তোমার কটাক্ষ আমি বুঝিয়াছি, ভয় নাই ও কখন পালাবে না, তোমার রূপ দেখিয়া যে মজিয়াছে তাহাকে না তাড়াইলে সে যাইবে না নিশ্চয়।

কিন্তু হঠাৎ সব স্তব্ধ হইল কেন ? এ কি ? সূচ পড়িলে শুনা যায়, হঠাৎ এরূপ কেন হইল ? এক অংশে রাজপরিবার সমভিব্যাহারে মহারাজ অশোক, আর এক পার্শ্বে করদ ও মিত্ররাজগণ, মধ্যস্থলে মন্ত্রী প্রাড্বিবাক মহামাত্র প্রভৃতি সকলেই নিস্তব্ধ। পার্শ্বে রমণীকুল নিস্তব্ধ। কেন এত নিস্তব্ধ ? শুদ্ধ নিস্তব্ধ ? সকলে একতানমনে বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া আছে। অর্হৎ-শ্রেষ্ঠ উপগুপ্তের ধ্যানভঙ্গ হইল. তিনি কথা কহিতেছেন, মার কন্যারা তাঁহাকে লোভ দেখাইতেছে, আর তিনি তাহার জবাব দিতেছেন। কি গভীর ভাব ! কি গভীর স্বর ! যে স্বরে উপগুপ্ত দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নর কিন্নর সমীপে সদ্ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন, যে স্বরে বৌদ্ধ-মণ্ডলী মোহিনীমুগ্ধ হইয়া থাকে, আজি সেই স্বরে ভগবান উপগুপ্ত মার দুহিতা-দিগের সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমরা আমার নির্ব্বাণ পথ দেখাইয়া দিতে পার ত দাও। ধর্ম্মপথ ছাড়িয়া আমার মন তোমাদের ভোগ আশায় নিবিষ্ট হইবে না। তোমরা বিদায় হও। অসংখ্য প্রাণী আমার চারিপার্শ্বে জন্ম জরা মরণকৃত দুঃখের জ্বালায় দহিয়া মরিতেছে, আমি দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কিরূপে আবার সেই দুঃখে পড়িব। আমি প্রাণত্যাগ করিয়া এই অসংখ্য জীবের মুক্তির উপায় দিব। তাহাদের নির্ব্বাণ লাভের পথ করিয়া দিব। তোমরা কি মনে কর আমায় ভুলাইবে ?" এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল, শ্রোতৃ-বৃন্দ স্তব্ধ হইয়া. কর্ণ ভরিয়া নিজ উপাস্য দেবতার অধরচ্যুত বচনসুধাপানে আত্ম-জীবন সার্থক করিতে লাগিল। কুণালের চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

চোরের মন বোঁচকির দিকে। দুষ্টরমণী ক্রমাগত কুণালের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপগুপ্তের বক্তৃতায় সকলে মোহিত হইতেছে, কিন্তু সে দুষ্ট-চরিত্রার তাহাতে কাণও নাই। না শুনিলে কে কবে কোন কথায় মজিয়া থাকে। তাহার চেষ্টা কুণালকে লইয়া কোন ঘরাও কথা পাড়ে, অভিনয় ছাড়া অন্য কথা পাড়ে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি কুণাল উপগুপ্তের বক্তৃতায় মোহিত হইতেছেন, বক্তৃতা যখন বড় জমিয়া আসিল, তাঁহার নয়ন বাষ্পে ভরিয়া গেল, সে অমনি তাড়াতাড়ি অঞ্চল

দিয়া তাঁহার মদন মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। কি দুষ্ট! কুণালের এটা অত্যন্ত অসহ্য হইল। তিনি সরিয়া গিয়া দূরে উপগুপ্তের ওপাশে দাঁড়াইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কুণালের বড় অনুরাগ, তিনি যদিও মার সাজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পাটলী-পুত্র রাজধানীর প্রথম বৌদ্ধ। উপগুপ্তের বক্তৃতায় তাঁহার ভাব লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণের পর উপগুপ্ত মার দুহিতাদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আবার ধ্যানস্থ হইলেন। পাত্রগণ রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। কুণাল বাহির হইয়া যে রমণী মারপত্নী সাজিয়াছিল তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাকে পাইলেন না। তখন কাঞ্চনমালাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার জানাইবার জন্য দ্রুতপদবিক্ষেপে কাঞ্চনপুরী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। আর একবার ফুলের গহনা পরিয়া যাত্রা ভঙ্গের সময় দেবদম্পতী সাজিয়া অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে হইবে। এবার স্থির করিয়াছেন নিরাভরণা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

৩

তিনি দ্রুতপদে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, আহা! কাঞ্চন এতক্ষণ কত মনস্তাপ পাইতেছে, তাহার এই অভিনয়ে উপস্থিত হইবার বড়ই সাধ ছিল। তাহাকে গৃহে গিয়া কি ভাবে দেখিব? হয়ত শয্যায় শুইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে, না হয় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত আছে, না হয় গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি জ্যোৎস্নায় নাহিয়া জ্যোৎস্নায় মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এই ভাবিতেছেন আর দ্রুতপদে যাইতেছেন। এমন সময়ে রাজবাটীর একজন দাসী বলিল যে, তোমার ফুল যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাও? কুণাল কহিলেন, হাঁ চাই। সে বলিল, তবে ঐ লতাকুঞ্জমধ্যে যাও। কুণাল ভাবিলেন, একাকী লতাকুঞ্জমধ্যে স্ত্রীলোকের নিকট যাওয়া উচিত কি না—কিন্তু মালা-চোর কে, ও চুরি করার অভিপ্রায়ই বা কি, জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য ছিল, এই ঔৎসুক্যের প্রধান কারণ এই যে, জানিলে কাঞ্চনমালাকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

৪

স্ত্রীলোকটা কোন পথে আসিয়াছিল জানি না, আসিয়া এই লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে, কুঞ্জটী নানা বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। কোথাও ঝারিপূর্ণ গন্ধবারি কোথাও খাদ্যভোজ্য, কোথাও খাদ্য অন্ন প্রভৃতিতে সুশোভিত। সে কি ভাবিতেছিল জানি না, বোধ হয় ভাবিতেছিল কতদিন ভেবেছি কুণালকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, যে দিন অশোক রাজার বাটীতে কুণাল আমার নজরে পড়িয়াছে সেইদিন অবধি

জানিয়াছি যে রাজপরিবারে এই বৃদ্ধ স্বামীর সংসারে কুণাল বই আমার গতি নাই। কত দিন কত দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি পারি নাই, কতদিন ঠারে ঠোরে লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছি, প্রত্যাখ্যান বই পাই নাই। আজ পাহাড় থেকে প্রাণভরে দেখিয়াছি। আর আসবার সময় ফুলের মালা চুরি করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। রঙ্গভূমে কেহই টের পায় নাই আমি কে? আমি প্রাণ ভরিয়া তাহারে আমার জীবন সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তাহাকে "নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। কত কথাই কহিয়াছি। কতবার কটাক্ষ করিয়াছি। বোধ হয় কুণালও একটু টলিয়াছেন। টলিবার কথাই ত? তাতে আর সন্দেহ আছে? একবার, দুইবার, বার বার, আড়ে আড়ে দেখিতেছিলেন, না টলিবে কেন? যা হোক আজ অতি সুদিন, যা ধরেছি তাই হয়েছে, ধরিলাম দেখিব—প্রাণভরে দেখিলাম। ধরিলাম রঙ্গভূমে উহার পাশে উহার স্ত্রী সাজিয়া দাঁড়াইব—বিধাতা ফুলের গহনাগুলি আমার পথে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর রঙ্গস্থলে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বিধাতা বুঝি বড় সদয়। কি চোখ পটলচেরা !! এমন চোখ কখন দেখি নাই। মরি, সেই চোখের আড়ে আড়ে চাহনিতে প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমায় মজাইয়াছে। ঐ চোখেই ত আমার এই কলঙ্ক টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু কলঙ্কই বা কি? টের ত কেউ পাবে না, আর যদি কেউ টের পায়, আমার রসিক বুড়া কখন বিশ্বাস করিবে না। বাকী লোক ত বাজে লোক। বিশ্বাস করলে আর না করলে বড় বয়ে গেল। কিন্তু এই যে নূতন ফাঁদ পেতে বসে আছি, এফাঁদে ত এখনও কিছু হল না।

সে স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে বাহিরের দিকে খানিক চাহিয়া রহিল। তখনও কুণাল ইতস্তত: করিতেছেন। পরে কুণাল যখন যাওয়াই স্থির করিলেন, তখন লতাকুঞ্জমধ্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা এইরূপ চিন্তায় আকুল ছিলেন।

৫

কুণাল ক্রমে যত নিকটে আসিতে লাগিলেন তিষ্যরক্ষা আহ্লাদে আটখান হইতে লাগিলেন। দ্বারের আড়ালে লুকাইয়া উহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন কুণাল কুঞ্জগৃহে কাহাকেও না দেখিয়া কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন, তখন তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি রাজকুমার চিনতে পার?" তখনও অভিনয়ের বেশ অপনীত হয় নাই।

"পারি বই কি—মালাচোর!"

"তবে চোরের কাছে এত রাত্রে নির্জ্জনে!"

কুণালের স্বর একটু গম্ভীর হইল, বলিলেন, "আমি জানিতে আসিয়াছি আপনি কাঞ্চনের গহনাগুলি কেন চুরি করিলেন।"

"সত্য কথা বলিব" ?

"নির্ভয়ে বলুন"।

"তুমি আমার মন কেন চুরি করিলে ?"

"আমি আপনার কথার ভাব পাইলাম না।"

তখন পাপীয়সী তিষ্যরক্ষা আপন অন্তরের পাপ আশা, আকাঙ্ক্ষা, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিল ; আপনার অন্তরের পাপজ্বালা জানাইল ; স্বামীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল ; আপনার পরিচয় দিল ; বলিতে লাগিল "জানি আমি, তোমার পাপ হইবে, কিন্তু এই সংসারে বিশুদ্ধ পুণ্য কোথাও নাই। তোমার হৃদয় বিশাল, তাহার এক প্রান্তে আমায় স্থান দাও। আমার দারুণ পিপাসা, আমায় বারি দান কর।"

কুণাল বলিল, "মাতঃ"—

"এই সম্বোধনটী করিও না। তোমার মুখে ও সম্বোধন বিষবৎ লাগে।"

"আপনি এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না।"

"দেখ কুণাল! তুমি আমায় চরণে রাখ। আমি তোমার উপকার করিব, তুমি জান অশোক রাজা আমা অস্তু প্রাণ। আমি বলিতেছি এই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তোমায় দেওয়াইব। তুমি জান তোমার শতাধিক ভ্রাতা আছে, তোমার উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা বড় অল্প। তুমি জান রাজকর্ম্মচারী মধ্যে তোমার অনেক শত্রু। সমস্ত হিন্দুগণ তোমার বিদ্বেষী, তোমার জীবন নাশের জন্য অনেকে উদ্যোগী আছে। তোমার বন্ধু নাই, তোমার ন্যায় গুণবান্ সাধুশীলের বন্ধু মিলে না। অতএব যদি বন্ধু চাও যদি উত্তরাধিকার চাও আমায় ভিক্ষা দাও। আর দেখ অশোক রাজার জীবন আমার মুষ্টিমধ্যে, চাও কালই তোমায় উত্তরাধিকার দেওয়াইতে পারি।"

কুণাল। আপনি এ সকল নিষ্ঠুর কথা মুখেও আনিবেন না। ত্রিরত্ন আমার এক মাত্র সহায় ও বন্ধু। আমি উত্তরাধিকার চাহি না, বিশেষ আপনি যে উপায়ে উহা দিতেছেন, ও উপায়ে আমি ইন্দ্রত্ব লইতেও স্বীকৃত নহি। আমায় আর কিছু বলিবেন না, আমি চলিলাম।

তি। বলিব না, জানিও তুমি স্ত্রীহত্যা করিলে, জানিও তুমি মাতৃহত্যা করিলে।

কু। আমি নির্দ্দোষী।

তি। একদিন ইহার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে। একদিন বলিবে তিল্যরক্ষার মান রাখিলে আমার এ বিপদ হইত না।

"কখন না" বলিতে বলিতে কুণাল কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইলেন। এবং ত্বরিতগতিতে কাঞ্চনমালার অন্বেষণে গেলেন।

৬

তখন তিষ্যরক্ষার মনের ভিতর বসিয়া সুমতি আর কুমতি দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল। সুমতি বলিল, কেমন? সতীনপোর কাছে গিয়েছিলে, উচিত শাস্তি হয়েছে?

কু। একদিনেই কি আশা ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

সু। আবার যাবে নাকি?

কু। যাব না? আজ ও আমার কাছে এসেছিলে, এবার আমি ওর কাছে যাব।

সুমতি। ধন্য মেয়ে! আবার যদি অমনি হয়। এবার কি কিছু সুবিধা দেখেছ না কি।

কু। না।

সু। তবে আর কেন? মিছা কষ্ট পাবে। ও আশা ছেড়ে দাও।

কু। খুব বুদ্ধি! এতটা করিলাম, এত অবমান সইলাম, বুঝি ছেড়ে দিবার জন্যে?

সু। ধরতে ত পার নাই, তবে আর ছাড়লে কষ্ট? বৃথা চেষ্টায় কষ্ট পাও কেন? তাই বলি ও আশা ত্যাগ কর। কুণাল বড় ভাল ছেলে।

তখন কুমতি ও সুমতি একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সুমতি। বলি অবমানটার শোধ লও না কেন? যে ভরসায় যাইতেছে সে ভরসা নাই।

কুমতি। এই ভাল পরামর্শ, খানিকটে জব্দ হলে উহাকে বশে আনা সুকর হইবে।

কুমতি। তবে সেই ভাল, যাও।

এই বলিয়া দুজনে নিরস্ত হইল। তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল।

তৃতীয় খণ্ড

১

কুণাল অত্যন্ত কাতর ও আকুল মনে কাঞ্চনের সন্ধানে গেলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে উঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, পুষ্পোদ্যানে খুঁজিলেন, পাইলেন না, বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। যেখানে কাঞ্চনমালাকে ফেলিয়া অভিনয়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া খানিক ভাবিলেন। তথা হইতে নিকটবর্ত্তী মঠায়তনে দেখিলেন, তখনও আলো জ্বলিতেছে। কাঞ্চন প্রত্যহ তথায় ত্রিরত্নসেবার্থ গমন করেন, কিন্তু সে ত এত রাত্রে নয়। এরাত্রে কাঞ্চন কুণালের কাছ ছাড়া প্রায় থাকেন না, আজি কাছ ছাড়া হওয়ায়, কোথায় গেলেন, ভাবিয়া কুণাল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার মঠ দেখা ভাল বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ও ত্রাস্ত ভাবে তথায় গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুণাল ত্যাগ করিয়া গেলে পর কাঞ্চন খানিক আপনাকে বড়ই অসহায় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, স্বামী বুঝি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অন্তঃপুরে গেলেন না। রঙ্গভূমিতে গেলেন না, কোন খানেই গেলেন না। খানিক ত্রিরত্নের ধ্যান করিয়া "ভগবান রক্ষা কর, যে বিপদ হয় আমার হউক, যেন কুণালের পায়ে কাঁটাটীও না ফুটে। আর যেন, অভিনয়ান্তে তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ক্রমে মঠের সন্ধ্যাকালীন পূজা আরম্ভ হইল, কাঞ্চন সেই দিকে গেলেন, পূজার সমস্ত উদ্যোগ স্বয়ং স্বহস্তে করিলেন। পূজার পর অর্হৎগণের অনুমতি লইয়া ত্রিরত্নমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া পূজা, স্তব ও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। মঠবাসীরা অনেকেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সুতরাং কাঞ্চনকে, কেন এখানে? কি বৃত্তান্ত? ইত্যাদি প্রশ্নের বড় একটা জবাব দিতে হইল না। যাহাও হইল তাহা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়া একান্ত মনে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! আমার উৎকণ্ঠা দূর কর, আমার স্বামীর কোনরূপ অমঙ্গল না হউক, আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে আমার নিকট আনিয়া দাও।"

এমন সময়ে স্বয়ং কুণাল ত্রিরত্ন সমীপে গললগ্নীকৃতবাসাঃ হইয়া নমস্কার করতঃ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ত্রিশরণ! আমার সম্মুখ বিপদ উপস্থিত, আমার চিত্ত স্থির করিয়া দাও, আজি যাহা শুনিলাম ও এপর্য্যন্ত যাহা জানি, ইহাতে প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, ধৈর্য্য হইতেছে না। দেখ!

মনে বল দাও, তোমাতে যেন মন স্থির থাকে, ইহা করিয়া দাও, আমি রাজ্য ধন কিছু চাহি না। সদ্ধর্ম্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য, যাহাতে সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হয়, করিয়া দাও, পাপ হইতে রক্ষা কর।"

উভয়েই অবনত মস্তক হইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, আর প্রার্থনা করিতেছেন, কুণাল যে উপস্থিত তাহা কাঞ্চন জানেন না। কুণালও কাঞ্চনের ধ্যানে এ পর্য্যন্ত বাধা দেন নাই। কিন্তু প্রণয়ীদের মনে কিছু বৈদ্যুতী আছে, তাহার বলে উহারা পরস্পরের কার্য্যকলাপ যেন কিছু কিছু টের পায়। বিশেষ কাছে আসিলে, কে যেন সে সুখের কথা উহাদের মনোমধ্যে বলিয়া দেয়। সেই ঘোরা দ্বিপ্রহরা, শাস্তনলিনী,কুমুদগন্ধামোদিনী, ঝিল্লীরবব্যস্তমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরব বিধ্বংসিনী. পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় কচিৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌত বিধৌত সুরভিচর্চ্চিত বদন শাটাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হতেছেন. তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞান পবিশূন্য মেধামনঃ সংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। যেন ঘোর ঝটিকা বৃষ্টির পর আকাশ পরিষ্কার হইল। যেন দারুণ গ্রীষ্মক্লেদের পর ধীরে ধীরে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যময় সমীরণ বহিল। তখন দেবতা প্রসন্ন বুঝিয়া কাঞ্চনমালা মস্তক উত্তোলন করিলেন, দেখিলেন, পার্শ্বেই কুণাল—গভীর ধ্যানে মগ্ন, কাঞ্চন একবার ভাবিতেছেন, ধ্যান ভঙ্গ করি কি না? তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, অমঙ্গলের ভাবিফল উত্তম, অতএব তিনি নির্ভয়ে উহার ধ্যানভঙ্গ করাইলেন, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা চিন্তা মনো বেগের পর পরস্পর সাক্ষাতে,পরস্পর গাঢ়ালিঙ্গনের পর কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ। আমার প্রতি ত্রিরত্ন প্রসন্ন হইয়াছেন, আমাদের উপস্থিত অমঙ্গল শুভফল প্রসব করিবে। কিন্তু নাথ। রাজবাটীর এ সকল সুখ দুঃখময়, ইহাতে পদে পদে উৎকণ্ঠা, পদে পদে বিপদ ও পদে পদে বাধা, আইস অদ্যাবধি আমরা এই বৃথা সুখভোগ ত্যাগ করিয়া সদ্ধর্ম্ম প্রচারার্থ তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াই গিয়া, আমাদেরও কখন বিচ্ছেদ হইবে না। বিশেষ যাহার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা তাহারও সুসিদ্ধি হইবে।"

কুণাল। কাঞ্চন। তুমি কি মনে করিয়াছ আমি সুখভোগের জন্য আবার রাজবাটীতে আসিয়াছি? ধনলোভে অথবা যশো লোভে আসিয়াছি? কিছুমাত্র না। আমি এই আশায় আসিয়াছি যে, এখানে থাকিলে,—রাজার প্রিয়পুত্র হইতে পারিলে, সদ্ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে। দেখ আমি করি আর নাই করি, রাজপরিবারের কেহ কেহ আমাদের মত গ্রহণ করিতেছে, রাজা সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আবার উপগুপ্তের নিকট পুনর্দ্দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এবার

উনি সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাবিহিত চেষ্টা করিবেন; এইবার আমার দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ভরসা আছে।

কাঞ্চন কহিলেন, "নাথ, তোমার এরূপ উদ্দেশ্য তাহা কি আমি জানি না? জানি, কিন্তু আজি আমার এক প্রস্তাব আছে, আজি পূর্ণিমা রাত্রি শুভলগ্ন উপস্থিত। আজি ত্রিরত্ন আমাদের উপর বড় সদয়। নচেৎ এমন উৎকণ্ঠার সময় তোমায় আমার কাছে আনিয়া দিবেন কেন? অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা আজি এই দ্বিপ্রহররাত্রে দেবতা সাক্ষাৎ শুভলগ্নে আমরা সদ্ধর্ম্মের জন্য এ জীবন উৎসর্গ করি।"

কুণাল "সেটা বাহুল্য কাঞ্চন।" বলিয়া জোড়করে গললগ্নীকৃতবাসে জানূপরি উপবেশন করতঃ উভয়ে একতান মনঃপ্রাণ হইয়া একস্বরে পরস্পরের গলা মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ত্রিরত্ন! হে ধর্ম্ম! হে সংঘ! হে বুদ্ধ! হে বোধিসত্ব! প্রত্যেক বুদ্ধ! শুদ্ধ বুদ্ধ! জীবন্মুক্তগণ, তোমরা সাক্ষী, আমরা স্ত্রী পুরুষ অদ্য শুভদিনে, শুভক্ষণে, সদ্ধর্ম্মের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য জীবনের অবশিষ্ট অংশ উৎসর্গ করিলাম। যাহাতে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই, যাহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা ঘোষণা নাই, এমন কার্য্য আমরা কখন করিব না। অদ্যাবধি ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, বিদ্যা যদি কখন চাই, সে কেবল ঐ এক মাত্র কার্য্যের জন্য। হে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ, বোধিসত্বগণ, আমাদের চিত্ত-স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" সহসা মঠায়তনের দীপ হাসিয়া উঠিল। দেবমূর্ত্তির মুখে আনন্দময় মৃদু হাস্য আবির্ভাব হইল। শৈত্য, সৌগন্ধ, মান্দ্যময় বায়ু প্রবাহিত হইল: আকাশে যেন মাঙ্গল্য তূর্য্যধ্বনি হইল, বোধিসত্বগণ যেন বলিলেন "তোমাদের মঙ্গল হউক।" এইরূপে জীবন উৎসর্গ করার পর উভয়ে দীক্ষানন্তর অশোক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবদম্পতী সাজিতে গেলেন।

২

তিষ্যরক্ষা লতাকুঞ্জ হইতে যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, ভয়মৈত্রতা ভিন্ন কুণালকে বশ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি অশোককে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। অশোককে আশু খুসী করার একমাত্র উপায় আছে বলিয়া বোধ হইল। অশোকের কোন মহিষীই অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তিষ্যরক্ষা যদি এই দিনেই অশোকের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বড়ই প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পাপীয়সী নিজ পাপবাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে অনায়াসে এক ধর্ম্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত

হইল। নিজ গৃহে গিয়া নিভৃতে অশোক রাজার নামে এক চিঠি লিখিল, পত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, "কয়েক মাস ধরিয়া আমি স্বপ্নে দেখিতেছি, ভগবান বুদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। পাছে লোকে অন্যরূপ ভাবে বলিয়া শ্রীচরণে এ ঘটনার বৃত্তান্ত নিবেদন করি নাই, কিন্তু আজি এ উৎসবের সময় আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না, প্রার্থনা দাসীর অনুনয় গ্রাহ্য হয়, ইতি।" দাসী দ্বারা পত্র প্রাড়্বিবাকের নিকট প্রেরিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই প্রাড়্বিবাক নানাকারণে এই দুশ্চারিণীর বশীভূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মুহূর্ত্ত মধ্যে সভাস্থ রাজার হস্তে পত্র পহুঁছিল, রাজা পত্র পাঠে মহাহৃষ্ট হইয়া তিষ্যরক্ষাকে সময়োচিত রক্তাম্বর পরিধান করিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন, মহা আদরে নিকটবর্ত্তী অনুচরবর্গকে পত্র দেখাইলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে আজি রাজার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষারও দীক্ষা হইবে।

গভীর নিবাত নিস্তব্ধ পয়োধির ন্যায় মহার্হৎ উপগুপ্ত বুদ্ধ সাজিয়া বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তাঁহার সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন, অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। নয়ন মুদ্রিত, মুখ হাস্যময় হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর আহ্লাদে কাঁপিতে লাগিল, তিনি ক্রমে নয়ন উন্মীলিত করিলেন; তাঁহার কণ্ঠ ভেদ করিয়া ত্রিশরণের নাম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। স্বর্গ হইতে সিদ্ধপুরুষ একজন নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবন্ আপনার তপঃসিদ্ধির উদ্দেশ্য কি?" উত্তর হইল "মগধ সাম্রাজ্যে ধর্ম্মভ্রংশ হইয়াছে, এই খানে সদ্ধর্ম্ম প্রচারই আমার উদ্দেশ্য।" অমনি সিদ্ধপুরুষবেশী অশোকরাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপনীত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ সদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাসনা করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়মহিষী তিষ্যরক্ষাও এই সঙ্গে দীক্ষিত হইতে চান।" তখন বুদ্ধরূপী উপগুপ্ত উভয় হস্তে উভয়কে ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে সহস্র সহস্র গাথা পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই গভীরস্বরে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তব্ধভাব ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। সভ্যবৃন্দ একতান মনে তাঁহার গাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে স্বর্গে দেবদম্পতী উপস্থিত হইলেন। শরীর নিরাভরণ অথচ শরীর প্রভায় সভাস্থ দীপমালা নিস্তেজ হইয়া গেল। তাঁহারা আশীর্ব্বাদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, অচিরাৎ সসাগরা সদ্বীপা মেদিনী বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমায় ব্যাপ্ত হইবে। অশোকের কীর্ত্তিকলাপ দিকচক্রবাল আচ্ছাদন করিবে। মহারাজাকে আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না, তাঁহার ইহলোকেই নির্ব্বাণ লাভ হইবে। যেমন কৌমুদী স্রোত এক প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া অবিরতধারে

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পূরিত করে, তেমনি অশোকের যশঃ একমাত্র প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্দিগন্তর আচ্ছাদিত করুক।” সকলে মুগ্ধ হইয়া দেবদম্পতীর আশীর্ব্বাদ শুনিতে লাগিলেন, মহারাজ অশোক দেখিতে লাগিলেন। দিঙ্মণ্ডল সমুদ্র জলে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কেন্দ্রস্থ দ্বীপে তিনি বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে দ্বীপমালা! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋত যে দিকে চাও দ্বীপের পর দ্বীপ, তাহার পর দ্বীপ, অনন্ত দ্বীপমালা অনন্ত দিঙ্মণ্ডলে লীন হইয়াছে, আর দেখা যায় না। প্রত্যেক দ্বীপে এক একটী বোধিদ্রুম এক একটী বৃক্ষের বহুকোটী পত্র, বহুকোটী ফল, বহুকোটী শাখা এবং বহুকোটী কাণ্ড। কোথাও পত্র সকল মরকতময়, স্বর্ণময় ফল, মর্ম্মর নির্ম্মিত ডাল পালা ও স্ফটিকের কাণ্ড, কোথাও শ্বেতমণির পত্র পীতমণির ফল, নীলমণির পত্র, কৃষ্ণমণির গুঁড়ি, কোথাও কোটী পত্র নীল, কোটী পত্র সবুজ, বৃক্ষ সমূহ আত্যন্ত উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সমস্তের উপর ধর্ম্মজ্যোতি চন্দ্রজ্যোতি অপেক্ষা শুভ্রতর স্নিগ্ধতর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। বোধ হইতেছে দুগ্ধসমুদ্রে নবনীত দ্বীপ সমূহ ভাসমান। প্রত্যেক বোধিদ্রুম তলে এক একজন বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন, কেহ নবনবতি কোটিকল্প ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা তাহার অধিক, কেহ বা তাহা অপেক্ষা অল্প ধ্যান করিতেছে। কেহ কীটযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি কোটী যোনি ভ্রমণান্তেও এক্ষণে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধ্যান করিতেছে। কেহ কেহ বুদ্ধ হইতেছেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে হাস্য হইতেছে আর দন্তপাতি হইতে শ্বেত নীল পীত হরিদ্বর্ণের অংশু নির্গত হইয়া জগৎব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া গাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীবগণের নিকট ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে।

তিষ্যরক্ষা দেখিলেন ভয়ানক অন্ধকার মধ্যে চৌরাশীটী নরককুণ্ড রহিয়াছে, একরকম না আলো না অন্ধকারে দেখা যাইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক এই অন্ধকারে চীৎকার করিতেছে, একটি নরকে গন্ধকের অগ্নি জ্বলিতেছে, নাক জ্বলিয়া যায়, কোথাও বিষ্মূত্রহ্রদে পড়িয়া পাপী বিষ্মূত্র উদ্গার করিতেছে, তাহাদের যাতনায় উঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। উনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। করিলে কি হয়? তখনও উপগুপ্তের হস্ত তাঁহার অঙ্গে স্থাপিত, সেই নরকদৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন কাঞ্চনমালা অবলোকিতেশ্বর সাজিয়া পাপীদের ত্রাণার্থ উপস্থিত, দেখিলেন লক্ষ লক্ষ পাপী চৌরাশীকুণ্ড ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা তাঁহার দিকে চাহিল না। সমস্ত পাপীগুলি উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। সেই ঘোরান্ধকার

মধ্যে চৌরাশী ভীষণ নরককুণ্ডের মধ্যে তিষ্যরক্ষা—একাকিনী—বড় ভীতা—প্রায় সেই সভামধ্যে চীৎকারোন্মত্তা। এমন সময়ে একটি রশ্মি উপর হইতে তাহার মুখে পড়িল। রশ্মিপথে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কাঞ্চনমালা তাঁহাকে "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছে, আর কুণাল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। এই ভাবে উভয়ে আছেন, উপগুপ্ত তাহাদের শরীর স্পর্শ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা আবার মর্ত্ত্যভুবনে প্রবেশ করিয়া উপগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। উপগুপ্ত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণাল ও কাঞ্চনমালা কোথায়? তিনি তাহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করিতে চান। তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মার্থ বহুতর ক্লেশ পাইয়াছে। তখন অশোকরাজা প্রিয় পুত্রের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করার জন্য লোক পাঠাইলেন। পুত্র উপরে বসিয়া তিষ্যরক্ষার ভাব দেখিতেছিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল, তাহার পর দেখিলেন, তিষ্য কেমন ভাল মানুষের মত, বক:পরম-ধার্ম্মিকের মত, অশোকের পাশে বসিয়া দীক্ষাসূচক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। যেন সে লোকই নয়। কুণাল তিষ্যের আচরণে স্ত্রীচাতুরীর চরম দেখিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন পিতা তাঁহার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিতেছেন। অমনি সস্ত্রীক উপর হইতে নামিয়া পিতার চরণে নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া উপগুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপগুপ্ত তাঁহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া গাথা উচ্চারণ করত: আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কুণাল দেখিলেন যে জেতবনে বুদ্ধদেব সদ্ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। সিদ্ধচারণ দেব নর কিন্নর সকলে শুনিতেছেন, বুদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিতেছেন, এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধ হওয়া যায়, কিরূপে ক্রমে দশভূমি অতিক্রম করিয়া বুদ্ধ হওয়া যায়, সমস্ত বিবৃত করিতেছেন, কর্ণামৃত পানে হৃদয় পুলকিত. শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, এমন সময়ে বুদ্ধদেব কুণালকে লইয়া আপন আসন-পার্শ্বে বসাইলেন, অমনি সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় কুণাল, জয় কুণাল" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।

কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন তিনি নিজে বোধিদ্রুম মূলে ধ্যানমগ্না, তাঁহার নির্ব্বাণ সময় উপস্থিত, প্রায় দশমভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাণ্ডস্থ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেবদানব সিদ্ধচারণগণ তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'মাতঃ! আমাদের কি উপায় করিয়া গেলে' বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল। তখন কাঞ্চনমালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আমিও অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ব্রহ্মাণ্ডে এক প্রাণী নির্ব্বাণশূন্য যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণপ্রত্যাশী নহি। অমনি সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল, পৃথিবী, চৌরাশী

নরক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলেন ভগবান তেজঃপুঞ্জ অবলোকিতেশ্বর তাঁহার দেহে মিশাইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি শুনিতেছেন, আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। উপগুপ্ত কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ আপনার পুত্র ও পুত্রবধূর তুল্য লোক জগতে আর নাই। উহারা সদ্ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কুণাল ও কাঞ্চনমালার প্রতি, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাবধি, রাজার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অদ্য উপগুপ্তের মুখে তাহাদের অতিবাদ প্রশংসা শুনিয়া রাজার আনন্দ আরো বৃদ্ধি হইল। তিনি স্নেহনির্ভরহৃদয়ে উহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন জয় ধর্ম্ম, জয় সংঘ, জয় বুদ্ধ, জয় মহারাজ ধর্ম্মাশোক, জয় কুণাল, জয় কাঞ্চনমালা, জয় রাজমহিষী তিষ্যরক্ষা ইত্যাকার জয়ধ্বনির মধ্যে সকলে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপন আপন বিশ্রামালয়ে গমন করিলেন।

১
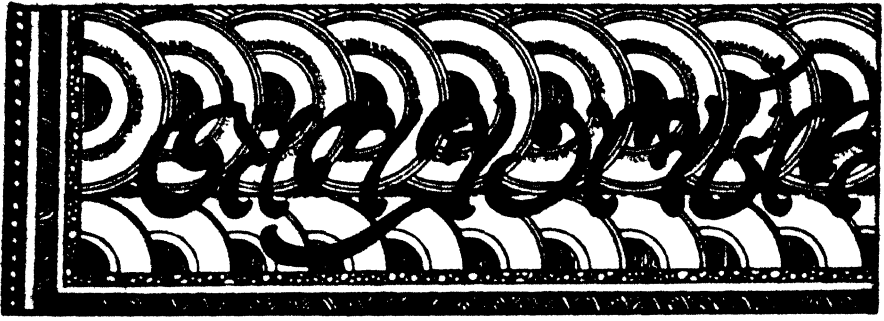
পূর্ব্ব কথা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল, হুগলীতে জাল রাজার মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে প্রতাপচাঁদ নাই, সে পরাণ বাবু নাই, সে জজ নাই, সে মেজেষ্টর নাই, সে মহিবুল্লা দারগা নাই, সে আসাদ আলি নাজির নাই, সে মনসারাম সেরেস্তাদার নাই; সুতরাং এ পুরাতন কথা তুলিলে কাহারও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই একজন সাক্ষী অদ্যাপি জীবিত আছেন, ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন।

আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ছিল, বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, আর সে সময়ে আমাদের এই অঞ্চলের এই বাঙ্গালিরা কিরূপ ছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা জালরাজার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি। মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বিবরটি লিখিলাম। এই স্থলে বলিয়া রাখি যে লেখক নিজে সেই সময়ে হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প, কিন্তু এই মোকর্দ্দমা লইয়া ঘরে ঘরে যেরূপ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার স্মরণ আছে।

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোক মাত্রেই জালরাজার পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাহারা গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপূজা ভুলিয়া, কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কহিত। ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণগীত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গীত গাইত, প্রতাপচাঁদের জয় হউক বলিয়া ভিক্ষা চাহিত। বৈষ্ণবের গীত বালকেরা শিখিয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইত। "পরাণ বাবু, হয়ে কাবু, হাবু ডুবু খেতেছে" এই গীত যখন তখন যেখানে সেখানে তাহাদের মুখে শুনা যাইত।

মূল কথা, এ অঞ্চলের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই এইরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। হুগলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশের অন্যূন দশ হাজার লোক নিত্য আদালতে আসিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিত; কে কে সাক্ষী দেয়, তাহারা কে কি বলে শুনিয়া যাইত, গ্রামে গিয়া সেই সকল পরিচয় দিত। যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের সাপক্ষ কথা বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না; সে দিন গঙ্গার বক্ষে শত শত নৌকা ছুটাছুটি করিত, ময়রার দোকানে খরিদ্দারের উপর খরিদ্দার ঝুঁকিত। আর যে দিবস সাক্ষীরা বিপক্ষতা করিত, সে দিবস লোকে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিত।

প্রতাপচাঁদের দুর্গতি সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। জাল প্রমাণের পূর্ব্বেই তাঁহার পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব রটনা অনুরোধেই হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জালরাজার সাপক্ষ হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হইয়াছিল যে, প্রতাপচাঁদ কোন পাপিষ্ঠার কৌশলে পড়িয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন—মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ করিলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাই তিনি কালনার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস করিল। বিশ্বাসের তাৎপর্য্যও ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সকল ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলেন! এরূপ যাওয়াই বীরত্ব। এ বীরত্বের কথা শুনিয়া বাঙ্গালির অন্তঃকরণে কেমন এক প্রকার পবিত্র সুখ উদয় হইল। সে পবিত্র সুখ লোকে ত্যাগ করিতে পারিল না। সুতরাং সকলে এ রটনা বিশ্বাস করিল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা বাড়িল, সকলেই ঘরে বসিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। "আহা! ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসুন"—এ কামনা স্ত্রীলোক মাত্রেই করিল।

পনর বৎসর পরে একজন আসিয়া বলিল, আমি প্রতাপচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তঃকরণ একেবারে উথলিয়া উঠিল। সকলেই ভাবিল, তাঁহার আসিবার ত কথাই ছিল। কিন্তু যখন লোকে শুনিল, প্রতাপচাঁদকে বর্দ্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, মেজেষ্টর তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছে, তখন লোকের আর সহ্য হইল না। তাহাই এতটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু সে সকল পরিচয় আনুপূর্ব্বিক দিবার অগ্রে প্রতাপচাঁদের পিতা মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কেন না, পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অনেকটা সেই প্রকৃতির ফল। দুই একটি ঘটনা বলিলে তাঁহার প্রকৃতি সহজেই অনুভব হইতে পারিবে।

২

তেজচন্দ্র বাহাদুর

(বর্দ্ধমানের বুড়া রাজা)

প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোহসাহেব, ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, অন্দরমহলের দ্বারে আসিয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন, তেজচন্দ্র যথা সময়ে এক স্বর্ণপিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন, পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত, তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত, মহারাজও হাসিমুখে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দর মহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, "মহারাজ হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।" তেজচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "চুপ! হামারা লাল ঘবরাওয়েগা!" এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লালপক্ষী ভয় পাইবে এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইল! এই মনে করিয়া কর্ম্মচারী বড় রাগ করিলেন, পাপীষ্ঠ মোক্তারকে সমুদয় টাকা উদগীরণ করাইব নতুবা কর্ম্ম ত্যাগ করিব এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই করিতেছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজসরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচন্দ্র তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিছু দিন পরে মোক্তার ধৃত হইয়া রাজবাটীতে আনীত হইল। রাজা মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি আমার একলক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?

মোক্তার : না, মহারাজ, আমি চুরি করি নাই, আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র। কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার। মহারাজের কার্য্যে ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটীও শিবমন্দির ছিল না, কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপ জ্বালেনর জন্য

পাইত না, যুবতীরা শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথিশালা করিয়াছি, ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাই-তেছে।

তেজচন্দ্র। তুমি কি সমুদয় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না মহারাজ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গোবৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না, আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কার ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র। পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার। আজ্ঞা না, টাকায় কুলায় নাই।

তেজচন্দ্র। এখন কত টাকা হইলে প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার। নূন্যকল্পে আর দশহাজার টাকা চাই।

তেজচন্দ্র। কিন্তু দেখ!—খবরদার!—দশহাজার টাকার এক পয়সা বেশী না লাগে, তাহা হইলে আর আমি দিব না।

তাহার পর পূর্ব্বকথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আমি ত মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম। কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।

মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্যবয়সের একটা কথা বলি, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের আর একদিকে দৃষ্টি হইবে। তিনি একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন, বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল, পিতার নাম কাশীনাথ, জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। জাতিতে ক্ষত্রিয়। মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না, দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিলেন। কন্যাটীর নাম কমলকুমারী, তিনিই মহারাণী কমলকুমারী হইলেন।

সেই অবধি দরিদ্র কাশীনাথের অদৃষ্ট ফিরিল, পুত্র লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পুত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ,—শেষে তিনি পরাণ বাবু হন—তখন কেহ জানিত না যে ভবিষ্যতে সেই পরাণের পুত্র মহারাজাধিরাজ হইবেন!

যেরূপ এক্ষণে বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠি বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতে চাহেন না, পূর্ব্বরাজারা সেরূপ "এক ঘরের" মত থাকিতেন না। তখন এদেশী অধিকাংশ প্রধান ও ধনবানদের সঙ্গে তেজচাঁদ বাহাদুরের আত্মীয়তা ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন, এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন, সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভালবাসিতেন, সালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া "প্রমারা" খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় মহারাজের হাতে "মাছ" ছিল, রাধামোহন বাবুর হাতে "কাতুর" ছিল; দুই প্রধান "দান", সুতরাং দুইজনেই "ডাকাডাকি" চলিল। ক্রমে দেড়লক্ষ পর্য্যন্ত "ডাক" উঠিল। রাধামোহন বাবু দেড়লক্ষ টাকা সহিলেন। শেষ মহারাজ "মাছ" দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে দেড়লক্ষ টাকার নোট লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলার অতিশয় চলন ছিল। সকলেই প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্য্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজাগর লক্ষ্মী পূজার রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, সেইরূপ ঐ রাত্রে প্রমারা খেলাও অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাস যাত্রায়, ঝুলন যাত্রায়, যে কোন যাত্রায় হৌক যেখানে লোক সমারোহ হইত সেইখানেই প্রমারার দোকান খুলিত, বড় বড় বাটী ভাড়া করিয়া আড্ডাধারীরা পরিষ্কার দোসুতি বিছাইয়া তাহার উপর প্রমারার নূতন তাস সাজাইয়া বসিত। ক্রমে ক্রমে সেই আড্ডায় খেলওয়াড় জমিতে আরম্ভ হইত, শেষ, উপর, নীচে, দালানে, বারেণ্ডায়, উঠানে কোথাও স্থান থাকিত না, সর্ব্বত্র প্রমারা চলিত। সে সময় দেখিতে চমৎকার। খেলোয়াড়রা চক্ষু নাশা উভয় কুঞ্চিত করিয়া একাগ্র চিত্তে তাস টিপিতেছেন, একবারে সে কাগজ দেখিতে সাহস হয় না, তাহাই তাস ক্রমে ক্রমে টিপিয়া দেখিতেছেন, ভয় আছে পাছে "কিগরু" সরিয়া থাকে! পাছে বাজে রং সরিয়া থাকে! তাহা হইলেই সর্ব্বস্ব যাবে। আবার, যদি যাহা ধরিয়াছি তাহাই আসিয়া থাকে, যদি তেরেস্তার উপর পঞ্জা সরিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলের কোল কুড়াইব, এই প্রবল আশা। এই আশা, এই ভয়। আবার এই ভয়, এই আশা। অন্য সময়ের এক যুগের চাঞ্চল্য সে সময়ের এক দণ্ডে উপস্থিত হয়। প্রমারা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু খেলটী *Dramatic*। যে খেলা এ সংসারে সকলে নিত্য খেলিতেছি সেই খেলার আশ্চর্য্য অনুকরণ এই প্রমারা। তবে প্রভেদ এই যে, এ সংসারে যে চাঞ্চল্য, যে বেগ, যে আশা দশ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, মন্দ গতিতে, কখন আইসে কখন আইসে না; সেই আশা, সেই বেগ, সেই চাঞ্চল্য,

এক দিনে, এক দণ্ডে, দুর্দ্দম বেগে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাই এ খেলার সুখ। আবার তাহার উপর অদৃষ্টের নাম কুহক। প্রমারায় অদৃষ্টের "পড়্‌তা।" এ সংসারে অদৃষ্ট খুলিলে "ধুলা মুটা ধরিলে সোণা মুটা হয়"; প্রমারার পড়তা লাগিলে যে কাগজ ধর সেই কাগজে তুমি জিতিবে। একরঙ্গা ফিগর ধর তুমি ফুরুস মারিবে, ফুরুস পাচার কর ন্যূনকল্পে তোমার কোরেস্তা দান জুটিবে। পড়তা সম্বন্ধে স্পেন্সার *Spencer* বলেন, যে তাস যেরূপ ভাল মন্দ পরম্পরা ক্রমে সাজান থাকে, সেইরূপ একজন ভাল এক জন মন্দ পায়। মিথ্যা কথা! তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া কাগজ সাজাইয়া দেও, ভাঁজিয়া দেও, পড়তা ঠিক থাকিবে, যে তাস লইয়া খেলিতেছিলে, সে তাস ফেলিয়া অন্য তাস দেও, পড়তা সেইরূপ থাকিবে।

আমি প্রমারা খেলার পক্ষপাতী নহি, বা সে জন্য এই খেলার পরিচয় দিতে বা প্রশংসা করিতে বসিয়াছি এমত নহে। তখনকার লোক কেন প্রমারায় মাতিয়া উঠিত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এত কথা বলিলাম। প্রমারা খেলায় উন্মত্ত করে, দিন রাত্রি কখন আইসে কখন যায় তাহা খেলোয়াড় কিছুই জানিতে পারে না। এখন প্রমারা খেলা নাই তাই এখনকার লোক মদ খায়। একালে মদ খাইয়া যে অভাব পূরণ হয়, সেকালের প্রমারা দ্বারা সেই অভাব পূরণ হইত। এ উভয়ের মধ্যে কোনটী ভাল আমি বলিব না। মোট কথা, পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ হইতে জেলেমালা পর্য্যন্ত প্রমারা খেলিত, আর—কবি শুনিত।

কবির কথা এখন আর তুলিব না। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবি সে সময়ের *Esthetic culture*র প্রধান সহায় ছিল। তদ্দ্বারা তখনকার লোক কবিত্ব বুঝিয়াছিল, কবিত্ব লইয়া মাতিয়াছিল। সেরূপ জিনিষ এখন কিছুই নাই। একালের পুঁজি কেবল নাটক! তাহা দেখিয়া শুনিয়া হাসি পায়, তাহা যে কিছুই নহে একথা বুঝাইবার সাধ্য নাই। এ নাটক এখনকার সময়োপযোগী। যিনি এখনকার সময়োপযোগী নহেন, তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন, তাঁহাকেই কেবল বুঝান যাইতে পারে যে এই সকল নাটক নাটিকা কিছুই নহে। মূল কথা, এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক তাহা বাঙ্গালির অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মজ্জা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত, সমাজগত। তাহা আমাদের কই? ইস্পেনদেশ যখন কার্য্যকারিতায় অতুল, তখন তথায় সরবন্টিস নাটক লিখিয়াছিলেন। মহারাজ্ঞী ইলিজেবেতের সময় ইংলণ্ডের কার্য্যকারিতাশক্তি বড় প্রবল হইয়াছিল, সেই সময়

ইংরেজি ভাষায় নাটক হয়। তাহার পর উভয় দেশের কার্য্যকারিতাশক্তি কমিয়াছে, উভয় দেশের নাটকপ্রসবিনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে এখন যে সকল নাটক তথায় লেখালেখি হয়, তাহা প্রায় আমাদের বাঙ্গালা নাটকের মত—বাক্‌বিতণ্ডা মাত্র! বকাবকি, হাঁকাহাঁকি!

সে সকল কথা এখন যাক্। তেজচাঁদ বাহাদুরের কথা হইতেছিল, তিনি শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটি করিয়া ক্রমে সাতটি বিবাহ করেন। শেষবিবাহটি অতি বৃদ্ধবয়সে করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বিষয়কার্য্য তিনিই দেখেন, বৃদ্ধরাজা অপটু বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

কুমার বাহাদুর

কুমার প্রতাপচাঁদের বালককালের কথা সবিশেষ বড় প্রকাশ নাই, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন, ঘুঁড়ি উড়াইবার সখ তাঁহার বিশেষ ছিল, একবার ঘুঁড়ির নক পড়িয়া তাঁহার কর্ণের উপরিভাগ কাটিয়া গিয়াছিল। একবার একটা ঘোড়া তাঁহার পীঠ কামড়াইয়া মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। গোলকচাঁদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইংরেজি পড়াইতেন। এদেশে রাজকুমারদের যেরূপ বিদ্যা হইয়া থাকে, প্রতাপচাঁদের তাহাই হইয়াছিল।

সর্ব্বদাই প্রতাপচন্দ্র আহ্লাদ আমোদ করিয়া বেড়াইতেন, তিনি হাসিতে বড় পটু ছিলেন, হাসিতে গেলে তাঁহার গালে টোল পড়িত। সর্ব্বদাই তাঁহার ঘর্ম্ম হইত, পৌষমাসের শীতেও তিনি ঘামিতেন। এই ঘর্ম্মরোগ তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি ছিল।

অল্প বয়সেই তাঁহার গর্ভধারিণী নান্‌কী রাণীর কাল হয়। সেই অবধি তাঁহার পিতামহী বিষণকুমারী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিষণকুমারীর আদরে প্রতাপচাঁদের কোন শিক্ষা হইতে পায় নাই।

কমলকুমারী তাঁহার বিমাতা, তাঁহার প্রতি বড় সদয় ছিলেন না। বিমাতা সর্ব্বত্রে কুমাতা, বিশেষ রাজবাটীতে। একা বিমাতা নহে, বিমাতার সহোদর পরাণবাবু প্রতাপচন্দ্রকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। প্রতাপ তাহা

জানিতেন এবং তাহার প্রতিশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। জনশ্রুতি আছে যে এক দিন প্রতাপচন্দ্র পরাণ বাবুর পশ্চাদ্দেশে কলিকা পুড়াইয়া ছাপ দিয়াছিলেন।

৪

ছোট রাজা

প্রতাপচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ছোট রাজা বলিত। তিনি বালককালে দুরন্ত ছিলেন, যৌবনকালে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও শক্তি সকলেই জানিত, এই জন্য সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। কিন্তু সামন্য লোকের নিকট তিনি বড় শান্ত ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি যেরূপে পারেন তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। তজ্জন্য যদি নিজে বিপদগ্রস্ত হইতে হইত, তাহাতে তিনি বর সুখী হইতেন। বিপদ তিনি খুঁজিতেন। রাজা বলিয়া একটা দাম্ভিকতা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকিত; কেবল অন্যকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার সময় সেটি একেবারে লোপ পাইত।

তাঁহার সঙ্গে একটি পালওয়ান সর্ব্বদা ছায়ার মত বেড়াইত, তাহার নাম আগা আব্বাছ—মোগল—সেই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতেন। অপঘাত মৃত্যু যে কখন হইতে পারে, এ কথা বুঝি তাঁহার বুদ্ধির অতীত ছিল।

তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ একহারা পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল। নিত্য প্রাতে কুস্তি করিতেন; কুস্তি করা তখনকার প্রথাই ছিল। সঙ্গীতবিদ্যা আর মল্লবিদ্যা না জানা অভদ্রের লক্ষণ বলিয়া তখনকার ধনবানদের ধারণা ছিল। এ ধারণা বোধ হয়, গায়ক ও পালওয়ানদিগের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকিবে। পশ্চিমাঞ্চলের নানা প্রদেশ হইতে "কুস্তিগীর পালওয়ান" আসিয়া বল ও কৌশল দেখাইত। তদুপলক্ষে বিস্তর ধনবান একত্রিত হইতেন। তাঁহারা পালওয়ানদের মুখে শুনিতেন যে, পশ্চিমাঞ্চলের মহারাজারা কুস্তিগীরকে কোল দেন, ইংরেজ ডাকিয়া তাহাদের তসবি লন, এবং আপনারা স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কুস্তি করিয়া সাধারণ সমক্ষে বলবন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভরত নামে একজন প্রসিদ্ধ পালওয়ান এ অঞ্চলে ছিল, সে ব্যক্তি হিন্দুস্থানী। এই সময় বাঙ্গালির মধ্যে অনেকে বলবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন; তন্মধ্যে মনোহর চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র নাকি বড় কুস্তিকৌশলী ছিলেন, তাঁহার বলমাংস এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি মাথা নিম্নভাগে রাখিয়া ঊর্দ্ধভাগে পা তুলিয়া কেবল দুই হস্ত দ্বারা অনায়াসে নারিকেল গাছে উঠিতেন।

প্রতাপচাঁদ কুস্তি করিতে, সাঁতার দিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, বড় পরিপক্ক ছিলেন। লোকে বলে তিনি ইংরেজ ঠেঙ্গাইতে আরও মজবুদ ছিলেন। গল্প আছে, বর্দ্ধমানের একজন জজ্‌কে তিনি বড় মর্ম্মপীড়া দিয়াছিলেন, সেই অবধি অধিকাংশ সিবিল সরবণ্ট তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল যে ধোপা নাপিতের ছেলেরা সিবিল সর্ব্বাণ্ট হইয়া এদেশে আসে। এবং সেই জন্য তাহাদের দাম্ভিকতা তাঁহার সহ্য হইত না। একবার তাঁহার সহিত পথে একজন মেজেষ্টরের দেখা হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব সেই সময় তাঁহার বগি একপার্শ্বে লইয়া যান নাই, কি কি একটা এইরূপ সামান্য ত্রুটি করিয়াছিলেন, প্রতাপচন্দ্রের নিকট ইহা “বেয়াদবি” বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বগি হইতে মেজেষ্টরকে নামাইয়া আগা গোড়া বিতাইয়া দিলেন। লোকে বলে তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্ট হইতে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। তিনি আবার এদিকে বড় সামাজিক ছিলেন। দেশী বিদেশী সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন। এ অঞ্চলে আসিলে একবার সালিখায় যাইতেন, একবার তেলিনী-পাড়ার রামধন বাবুর ভদ্রেশ্বরের বৈঠকখানায় আমোদ করিয়া আসিতেন। চুচড়ায় রাজবাটী আছে, তথায় আসিয়া দীনামারের গবর্ণর ওবারবেক সাহেব, হাজি আবু তালিব প্রভৃতি অনেকানেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সীঙ্গুরের নবাব বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। কথিত আছে, নবাব বাবু দোল উপলক্ষে তাঁহার সহিত ফাক খেলিবার জন্য বর্দ্ধমান প্রতি বৎসর যাইতেন, একবার এত ফাক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, যে পোনর দিবস ধরিয়া অনবরত ব্যয় করিয়াও তাহা ফুরাইল না, শেষ প্রত্যাগমন কালে বস্তা বস্তা ফাক বাঁকার জলে ফেলিয়া আসিলেন, বাঁকার জল একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া গেল। কয়েক দিন ধরিয়া লোকে সে জল ব্যবহার করিতে পারিল না। সেই নবাব বাবুর স্ত্রী ইদানীং বৃন্দাবনে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

অল্প বয়সে প্রতাপচাঁদের ভারীত্ব এত দূর জন্মিয়াছিল, যে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার নিকট কুণ্ঠিত হইত, অথচ তাঁহার বয়সসুলভ আহ্লাদ আমোদ সর্ব্বদাই ছিল, হাসি ভিন্ন তিনি কথা কহিতেন না।

প্রতাপচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এবং অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লোকে বলে পরাণ বাবু তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন তাহা কেহ বুঝে নাই, কিন্তু প্রতাপচাঁদ সে কথা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য কৌশল করিয়া পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় লিখিয়া লইয়াছিলেন।

পরাণ বাবু ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলেন, কিছুকাল পরে এক নূতন চাল চালিলেন। তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজচন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী বলিয়া পরিচিতা।

লোকে এ বিবাহের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই বিবাহে সকলেই বিরক্ত হইল, অনেকে সন্দেহ করিল। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পরাণ-বাবুর ভগিনীপতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। লোকে ভাবিল, ইহা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি। প্রতাপচাঁদ ভাবিলেন, পরাণ "মামা দড়ি পাকাচ্ছেন," বাঁধনের উপর বাঁধন দিতেছেন।

পরাণ বাবুর যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, অষ্টম গর্ভের পুত্র যদি বাঁচে, তবে অসাধারণ ব্যক্তি হইবে। শুনা যায় এই কথায় প্রতাপচন্দ্র বিমর্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, অষ্টম গর্ভের সন্তান বাঁচিলে রাজা হয়, পরাণের পুত্র নিশ্চয় রাজা হবে, যদি পরাণ ততদিন জীবিত থাকে, তবে আমার অন্ন উঠিবে, আমার গদিতে পরাণের পুত্র বসিবে বরং তোমারা এ কথা লিখিয়া রাখ। এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এবং পরাণ বাবুর ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর বীজ স্বরূপ হইল।

দানপত্রের পর হইতেই পরাণ বাবুর সহিত প্রতাপচন্দ্রের অকৌশল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু এই বিবাহের পর আরও বাড়িয়া উঠিল। সে সকল পরিচয় এখন অপ্রয়োজন।

প্রতাপচন্দ্র বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে দান আর সঞ্চয় সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাজবাটীতে কেবল মুষ্টি ভিক্ষা ছিল, তিনি তাহার

পরিবর্ত্তে পূর্ণ মাত্রা বরাদ্দ করিয়া দেন। পূর্ণ মাত্রা অর্থাৎ চাল, দাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি যে পরিমাণ দ্রব্য প্রত্যেক ভিক্ষুকের আবশ্যক, তাহা সমুদয় দিবার নিয়ম করিয়া দেন। পূর্ব্বে ধনসঞ্চয় হইত না, তিনি আমলাদিগের চুরি অনেকটা খর্ব্ব করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির পন্থা করিয়া দেন। প্রতি লাটে কর্জ্জ করিয়া খাজনা দিতে হইত, এখন কর্জ্জ করা দূরে থাকুক, প্রতি লাটে টাকা জমিতে লাগিল। শুনা যায়, প্রথমে তিনিই "হৌজে" টাকা ফেলার নিয়ম করেন।

কথিত আছে ১৮১৯ সালের ৮ আইন যাহাকে সচরাচর "অষ্টম" আইন বলে তাহা প্রতাপচাঁদ নিজে উদ্ভাবন করেন। গভর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে নিয়মিত দিনে সূর্য্য অস্তর মধ্যে সরকারি রাজস্ব সমুদয় না দিতে পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। এই নিয়মের চক্রে, বড় বড় জমীদারদিগের জমিদারী নিলাম হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান রাজার জমিদারী বিস্তর, তাহার খাজনা নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এ অবস্থায় প্রতাপচাঁদ স্থির করিলেন গবর্ণমেণ্ট যেমন খাস তহসিলের দায় নিজে গ্রহণ করেন নাই, মধ্যবর্ত্তী জমিদারের স্কন্ধে তাহা ফেলিয়া খাজনা তহসিল করেন, আমিও সেইরূপ করিব। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত মধ্যবর্ত্তী পত্তনীদার রাখিব। জমীদার নিয়মিত মুহূর্ত্ত মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমিদারী নিলাম করিয়া লন, আমিও সেই মত অনাদায়ের নিমিত্ত পত্তনী নিলাম করিয়া সেই নিলামের টাকা হইতে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিব। এই বিষয় দরখাস্ত করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইন দ্বারা পত্তনী নিলামের বিধি করিয়া দিলেন।

এই কৌশলে প্রতাপচাঁদ আপনার জমিদারী চিরস্থায়ী করিয়া লইলেন। এবং সেই সঙ্গে অন্য জমিদারে জমিদারী রক্ষা পাইল। নতুবা পূর্ব্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) নামে মাত্র চিরস্থায়ী বলা হইত। চির-স্থায়ী দূরে থাক কাহার জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না। এ অস্থায়ীত্ব লইয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা অনেক পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কিছুই করিতে পারেন নাই।

বুদ্ধিমান বা কার্য্যকৌশলী বলিয়া প্রতাপচাঁদের যতই প্রশংসনীয় থাক, তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইদানীং তাঁহাকে এই জন্য দেখিতে পারিতেন না। কেহ কেহ বলেন, না দেখিতে পারার অন্য কারণ ছিল। তাহা যাহাই হউক, শেষ অবস্থায় তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কুমার কৃষ্ণনাথকে দেখিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয়, প্রতাপচাঁদের সহিত তাঁহার কতক সাদৃশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, দুই জনের প্রকৃতি একই রূপ ছিল। যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময় এইরূপ ব্যক্তি আরও দুই একটি জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহই দীর্ঘকাল টিকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময়োপযোগী বা সমাজোপযোগী ছিলেন না। যেরূপ চারিপার্শ্বস্থ আর সকল, সেইরূপ হইলেই, মানুষ বল, পশু বল, যাহা বল তাহা টেকসই হয়, নতুবা লোপ পায়। এই নিয়ম। যেখানে সমাজ অতি নীচ সেখানে নীচ ব্যক্তিরই উন্নতি, উচ্চপ্রকৃতির লোক সে সমাজে প্রধানত্ব পাওয়া দূরে থাক লোপ পাইবে। কৃষ্ণনাথ প্রতাপচাঁদ উভয়ে লোপ পাইয়াছিলেন। উভয়েই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের মত ছিলেন না, কিছু ভিন্ন ছিলেন, ভাল ছিলেন কি মন্দ ছিলেন তাহা বলিতেছি না।

৫

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু

প্রতাপচাঁদ ছাব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিলেন। তাহার পর তাঁহার মানসিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি হাসিলে ঘর ভরিয়া যাইত, তাঁহার সে হাসি আর বড় শুনা যাইত না। নিত্য অপরাহ্নে বারদ্বারির ছাদে উঠিয়া তিনি নীলপুরের দিকে দূরবীণ কসিতেন, কখন তথাকার একটি গেট হইতে একখানি বগি ছুটিয়া বাহির হয় দেখিতেন, তিনি আর সে ছাদে যান না। দূরবীণ স্পর্শ করেন না, হেয়ার সাহেবকে একটি দূর-বীক্ষণ মেরামত করিতে দিয়াছিলেন, তাহা মেরামত হইয়া আসিল, আর তাহা স্পর্শ করিলেন না। রাজবাটীর দক্ষিণভাগে বহু ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব স্নানাগার প্রস্তুত করাইতেছিলেন, তাহা প্রস্তুত হইল, কর্ম্মচারী আসিয়া সে সংবাদ দিল, একবার তাহা দেখিতে গেলেন না। শেষ, মোসাহেবদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিতেন না। শ্যামচাঁদ বাবু নামে একজন পারিষদ ছিলেন, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দুই একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন, আর একজন ইউরোপীয় চিত্রকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন—সে ব্যক্তি তখন প্রতাপচাঁদের একখানি প্রমাণ চিত্রপট চিত্র করিতে নিযুক্ত ছিল।

একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ শয্যা হইতে উঠিয়া খানসামাদের বলিলেন যে, "আজ নূতন মহলে স্নান করিব।" খানসামারা পয়ঃপ্রণালীতে জল পূরিয়া সমুদয়

ফোয়ারা খুলিয়া দিল, বাটীর বাহির হইতে জলের গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল। প্রতাপচাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন, প্রায় প্রহরেক পরে বহির্গত হইলেন। চক্ষু তখন আরক্ত হইয়াছে, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।

সেই দিন অপরাহ্নে রাষ্ট্র হইল, মহারাজ প্রতাপচাঁদের পীড়া হইয়াছে। চিকিৎসকেরা যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান চিকিৎসক প্রতাপ-চাঁদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, তাহার নাম আসগর আলি। পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহারই ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। শেষ, তথাকার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার কুল্‌টার সাহেব আসিয়া দেখিলেন। কোন ব্যবস্থা করিলেন না।

সেই দিবস কি পরদিবস হইবে, প্রতাপচাঁদ বলিলেন, আমায় গঙ্গাযাত্রা কর। তখন পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না, পরে রাজবল্লভ কবিরাজ আসিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন। সুতরাং তাঁহাকে কালনায় লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার সঙ্গে স্বসম্পর্কীয় কেহই গেলেন না। স্ত্রীলোক মাত্রেই নহে, তাঁহার দুই স্ত্রী ছিলেন তাহারা কেহই যান নাই, বোধ হয় তাঁহাদের যাইতে নিষেধ করা হইয়া থাকিবে।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তখন কালনায় ছিলেন। সেখানে পুত্রের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হয় প্রকাশ নাই। কিন্তু ব্যবহারে বোধ হয় তেজচন্দ্র বড় কাতর হন নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইদানীং তিনি প্রতাপচাঁদকে দেখিতে পারিতেন না। রাত্রে যখন পুত্রের মৃত্যু হইল, তখনই তিনি বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর বিবরণ এই মাত্র প্রকাশ আছে যে, রাত্রি দেড়প্রহরের সময় কানাত দ্বারা ঘাট ঘেরিয়া তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা হয়। সে সময় বিস্তর লোক তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহারা সকলে কানাতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল।

মৃত্যুর দুই চারিদিন পরেই রাষ্ট্র হইল প্রতাপচাঁদ পলাইয়াছেন। রাজা তেজচন্দ্র তাহা শুনিলেন, কিন্তু হাঁ না কিছুই বলিলেন না। যে কারণেই হউক প্রতাপচাঁদের সমাজ মন্দির কালনায় তখন প্রস্তুত হইল না। রাজবাটীর রীতি আছে কেহ মরিলে একটী নূতন মন্দিরে তাঁহার অস্থি রক্ষিত হয়। প্রতাপচন্দ্রের সমাজ মন্দির শুনা যায় তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর, জমিদারী লইয়া তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত প্রতাপচাঁদের দুই রাণীর মোকর্দ্দমা বাধিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাণীরা বিষয়াধিকারিণী বলিয়া দাবি করিলেন। কিন্তু শেষ তেজচাঁদেরই বিষয় থাকিল।

কিছু দিন গেলে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল; তেজচন্দ্র পোষ্যপুত্র লইতে অসম্মত হইলেন। কেন অসম্মত তাহার কোন হেতু দর্শাইলেন না। আবার কিছুদিন পরে পোষ্যপুত্রের কথা উত্থাপিত হইল, আবার তিনি অস্বীকৃত হইলেন; এবার বলিলেন যে, আমার প্রতাপ আসিবে, সে অবশ্য আসিবে। তাঁহার আত্মীয়েরা বলিলেন, মহারাজ! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লোকে প্রতাপের অজ্ঞাতবাস কল্পনা করিয়াছে। আমরা আপনার এ সুখের ভ্রম নষ্ট করিতে চাহি না। যদি প্রতাপ ফিরে আসেন ভালই, কিন্তু যদি তিনি না আসেন, বা আসিতে তাহার বিলম্ব হয়, আর ইহার মধ্যে যদি মহারাজের দেহ নাশ হয়, তবে এই সমস্ত বিষয় কোম্পানী বাহাদুর লইবেন। যাহাতে না লইতে পারেন তাহার একটি উপায় করিয়া রাখা আবশ্যক।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর তেজচাঁদ বাহাদুর পোষ্যপুত্র লইতে সম্মত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, পরাণ বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—যে অষ্টম গর্ভের,—সেইটি গ্রহিত হইল। তাহার নাম কুঞ্জবেহারী কি নারায়ণবেহারী এমনি একটি ছিল রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মহাতাপচাঁদ বাহাদুর হইল।

৬

আলোক শা

পঞ্চদশ বৎসর পরে ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিল। তখন বর্দ্ধমান আর পূর্ব্বমত নাই, স্থানে স্থানে ইংরেজ পচন্দ নূতন রাস্তা হইয়াছে, তাহার ধারে বিলাতী ফুলের বন গজাইয়াছে। কৃষ্ণসায়রের পাড় ঝর্ ঝর্ করিতেছে, সেখানে আর জঙ্গল নাই, স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের নাম আরও মনোহর রাখা হইয়াছে। রাজবাটীর বহির্ভাগ পূর্ব্বমত অপরিষ্কার রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অনেক নূতন মহল প্রস্তুত হইয়াছে। পায়রার পাল বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিঁড়িয়াখানা সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিঁড়িয়াখানায় কাক্কা কুমারী প্রভৃতি শাবেক দল সমুদয় মরিয়া গিয়াছে, এখন বিলাতী পক্ষীই অধিক।

সন্ন্যাসী রাজবাটী প্রবেশ করিল, চারিদিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না, সন্ন্যাসীও কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

শেষ সন্ন্যাসী বারদ্বারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বারদ্বারী বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই একটি দ্বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুই এক স্থানের চূণকাম খসিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকিবে মনে করিল, কিন্তু রাজবাটীর জনকতক লোক কি সন্দেহ করিয়া সন্ন্যাসীকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

তাহার কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে প্রবেশ না করিয়া গেটের নিকট বসিয়া থাকিল। সেই গেটের নিকট গোপীনাথ ময়রা পরামাণিক নামক একজন বৃদ্ধ একখানি দোকান করিত, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল, "আমাদের ছোট মহারাজ।" সন্ন্যাসী হাসিল, গোপীনাথ গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর উঠিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। এদিকে বিস্তর লোক আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘেরিল। ছোট মহারাজ আসিয়াছেন, এ কথা সহরের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিল। রাজবাটীর অনেক পুরাতন আমলা ছুটিয়া দেখিতে আসিল। তাহার মধ্যে কুঞ্জবিহারী ঘোষ নামে একজন মুহুরী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়া পরাণ বাবুর মধ্যম পুত্র তারাচাঁদকে বলিল, "বাবু! আর দেখিতে হইবে না, আমাদের ছোট মহারাজ সত্যই।" তারাচাঁদ সে কথা পরাণ বাবুকে বলিলেন, তৎক্ষণাৎ পরাণ বাবু কতকগুলি লাঠিয়াল পাঠাইলেন। লাঠিয়ালেরা সন্ন্যাসীকে দামোদর পার করিয়া দিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে সেই সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ। তিনি সন্ন্যাসীকে মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া হঠাৎ চিনিলেন, এবং বহু যত্ন করিয়া তাঁহাকে রাখিলেন। রাজা ক্ষেত্র-মোহন পরামর্শ দিলেন, যে সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান, মেজেষ্টার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার অবস্থা তাঁহাকে বলুন। মেজেষ্টার সাহেব অভয় দিলে পুলিসের সাহায্য লইয়া বর্দ্ধমানে যাওয়া সহজ হইবে, তখন পরাণ বাবুর লাঠিয়াল আর কিছু করিতে পারিবে না। পরাণ বাবু বিষয় ফিরিয়া না দেন, তখন আদালত আছে।

এই পরামর্শ অনুসারে সন্ন্যাসী বাঁকুড়া যাত্রা করিল। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল না, সঙ্গেও কোন লোক লইল না।

এই সময়ে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলায় জঙ্গলি লোকেরা একটা এমন গোলমাল উপস্থিত করিয়াছিল যে, তাহাদের নিরস্ত করিবার নিমিত্ত মিলিটারী ফৌজ পাঠাইতে হইয়াছিল। এখন সে সকল গোলমাল চুকিয়া

গিয়াছে; তথাপি ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন নামে একজন সাহেব পোলিটিকেল এজেণ্ট হইয়া মানভূমে আসিয়াছেন, তাঁহার অধীন আর একজন আসিষ্টাণ্ট আসিয়াছেন, নাম ক্যাপ্টেন হানিংটান। তাঁহারা উভয়ে বড় সতর্ক, মানভূমে বসিয়া চিলের ন্যায় চারিদিক্ দেখিতেছেন; কোথায় কে বিদ্রোহিতা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, কোথায় দশজন পাঁচজন লোক একত্র হইতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিতেছেন, আর, নোট করিতেছেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট মকরর হওয়ায় বাঁকুড়া ও মানভূমের মেজেষ্টারেরা একটু সতর্ক হইয়াছিলেন, মনে মনে সংকল্প করিয়া থাকিবেন, যে আর ঠকিব না। এবার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব!

এই সময় সন্ন্যাসী বাঁকুড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল, কোথাও বাসা না করিয়া সরকারী সরকিট হউসের নিকট একটি তেঁতুল তলায় গিয়া থাকিল, মেজেষ্টার সাহেবের বাটীতে দেখা করা বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; সন্ন্যাসীবেশে তথায় দেখা হওয়া বড় সম্ভব ছিল না। যে কারণেই হৌক, সন্ন্যাসী সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মনে করিয়া থাকিবেন মেজেষ্টার সাহেব এই পথে হাওয়া খাইতে আসিলেই সাক্ষাৎ হইবে।

প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিয়াছেন এ বার্ত্তা বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজা ক্ষেত্রসিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন, এ কথাও লোকে শুনিল, সুতরাং সকলে নিঃসন্দেহচিত্তে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিল।

মেজেষ্টার এলিয়ট সাহেব দেখিলেন এই এক সময়। এবার আর ঠকা হইবে না। অতএব তৎক্ষণাৎ দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন, যাহারা প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিল, অনেকেই পলাইল, তথাপি তাহাদের মধ্যে প্রায় একশত জন ধরা পড়িল। সকলেই জেলখানায় প্রেরিত হইল। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট গেল যে, একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে ব্যক্তির পাল্লায় বিস্তর লোক ছিল, কেবল তাহার মধ্যে একশত জন ধরা পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী জেলখানায় থাকিলেন।

যাঁহারা প্রতাপচাঁদের প্রত্যাগমনবার্ত্তা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কলিকাতা হইতে একজন ইংরেজ উকীল বাঁকুড়ায় পাঠাইলেন। উকীল সাহেব গিয়া মেজেষ্টর সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের নকল চাহিলেন, মেজেষ্টর সাহেব বলিলেন, "কোন ওয়ারেণ্ট হয় নাই, আমার হুকুমই ওয়ারেণ্ট।" উকীল সাহেব তখন আপনার মক্কেলের অপরাধ কি, জানিতে চাহিলেন, দরখাস্ত

দিয়া বলিলেন, চার্জের নকল দেওয়া হউক। মেজেষ্টার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা মফস্বলে চার্জ লিখি না। তোমার মক্কেলের অপরাধ অবশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা রীতি নহে। সুতরাং উকীল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় আট মাস পরে সন্ন্যাসী হুগলীতে চালান আসিলেন। হুগলীতে কেন আনীত হইলেন তাহার কোন হেতু প্রকাশ নাই। দায়রায় বিচার আরম্ভ হইল। কৌন্সলি টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষ হইয়া হুগলীর আদালতে উপস্থিত হইলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে কোন কথা কহিতে দিলেন না। টার্টন সাহেব নিজামতে দরখাস্ত কবিলেন, নিজামত আদালতও জজ সাহেবের মতে মত দিলেন। সন্ন্যাসি-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন উকীল, কি কাউন্সিল, কি মোক্তার কেহই থাকিল না। জজ সাহেব বিচার করিয়া সন্ন্যাসীকে ছয় মাস কারাবন্ধের আজ্ঞা দিলেন, এবং খালাসের পর চল্লিশ হাজার টাকার পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিতে হুকুম দিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিচারপতি! আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে, কি অপরাধের নিমিত্ত আমি দণ্ড পাইলাম।

বিচারপতি বলিলেন, তোমার নাম আলোক শা। তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছ, রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ। সন্ন্যাসী নিরস্ত হইলেন।

সন্ন্যাসী যথা রীতি ছয় মাস কারাবাস করিয়া চল্লিশ হাজার টাকা পরিমাণে এক বৎসরের নিমিত্ত ফেলজামিন দিয়া খালাস হইলেন। এই মোকর্দ্দমা যখন হয়, তখন এ অঞ্চলের লোক বড় জানিতে পারে নাই। এইজন্য তখন বিশেষ কোন গোল হয় নাই।

৭

কাপ্তেন লিটিলের লড়াই

১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জালরাজা হুগলীর জেলখানা হইতে খালাস হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে রাজা প্রতাপচাঁদের আলাপ বা আত্মীয়তা ছিল, তাঁহারা সকলে আসিয়া জালরাজাকে প্রকৃত রাজা বলিয়া সমাদর করিলেন। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য সকলেই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কয়েক মাস পরে সকলে স্থির করিলেন যে, আপাততঃ কলিকাতায় সম্পত্তির নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করা হউক; তাহার পর মফস্বলের সম্পত্তির নিমিত্ত সুবিধামত মফস্বল আদালতে দরখাস্ত করা যাইবে। এই পরামর্শ হইলে ট্রেজরির দেওয়ান্ বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাক টাকা কর্জ্জ দিলেন। সুপ্রিম কোর্টে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মাহাতাবচাঁদ তখন নাবালক। তাঁহার পূর্ব্ব পিতা পরাণ বাবু কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা জবাব দিবার নিমিত্ত মদনমোহন কর্পূরাকে পাঠাইয়া দিলেন।

জাল রাজা প্রকৃত পক্ষে প্রতাপচাঁদ কি না এই বিষয়ে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা অঞ্চলের অনেক প্রধান ব্যক্তির জোবানবন্দী হইল; সকলেই স্বীকার করিলেন যে বাদি সত্যই রাজা প্রতাপচাঁদ। তার পর বর্দ্ধমান অঞ্চলের সাক্ষ্য আবশ্যক হইল, সুতরাং উকীলেরা পরামর্শ দিলেন যে একবার প্রতাপচাঁদ স্বয়ং সেখানে গেলে ভাল হয়, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের মোকর্দ্দমা প্রমাণিত হইবে।

জাল রাজা বর্দ্ধমান যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কলিকাতা নিবাসী দুই একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন; তাঁহারা স্পষ্টই বলিলেন যে, বর্দ্ধমানে গেলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইবে। জাল রাজাও তাহা বুঝিলেন। শেষ উকীলদের পরামর্শ মত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ডিপুটি গবর্ণর এলেকজাণ্ডর রশ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করা হইল * কিন্তু হ্যালিডে সাহেব তখন সেক্রেটারি, তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। †

---

* *Extract from petition dated 15th February 1838.*

"Your memorialist prays, therefore, that your Honor will be graciously pleased to grant to him (through the proper channel) such means of safeguard to protect his person and life, from any eventual insult or danger, during the time he may be obliged to stay at Burdwan."

†*Reply*.

"The prayer of this petition can not be complied with."

Signed.

Fort William. Fred. Jas. Halliday.

March 5. 1838. *Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.*

দরখাস্ত অসঙ্গত হয় নাই, বর্দ্ধমানে গেলে পাছে কেহ অপমান করে বা অত্যাচার করে এই ভয়ে দরখাস্ত করা হইয়াছিল ; সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ায় অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কেহ ভাবিলেন যে পূর্ব্বে প্রতাপচাঁদ সিবিল সরবন্টদের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়াছিলেন, এখনও গবর্ণমেণ্ট তাহা ভুলেন নাই। কেহ ভাবিলেন, রঞ্জিত সিংহের দেশে প্রতাপচাঁদের সহিত ইংরেজদের একজন জাঁদরেলের সাক্ষাত হওয়ার কথা যে রটনা হইয়াছিল, তবে তাহা সত্য। ইঁহাকে গবর্ণমেণ্ট এখন রঞ্জিতের অনুচর মনে করিয়াছেন, তবে ইঁহার আর রক্ষা নাই।

জালরাজা সে সকল কথা কিছু মনে না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন।* কাল্‌না দিয়া গেলে সুবিধা হয় বোধ করিয়া তিনি সেই পথেই গেলেন। এ অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তি সঙ্গে চলিলেন। সীঁতুরের শ্রীনাথ বাবু, যাঁহাকে লোকে সচরাচর নবাব বাবু বলিত, তিনি অন্য পথে বর্দ্ধমান গেলেন।

জাল রাজা আত্মরক্ষার নিমিত্ত অধিক লোক লইলেন না, যে সকল ভৃত্যবর্গ কলিকাতায় থাকিত, কেবল তাহাদেরই সঙ্গে লইলেন। তথাপি নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত বজরা, চাকরদের নিমিত্ত পানসী, তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, প্রায় ৩০ কি ৪০ খানা নৌকা একত্রে বাহির হইল।

রাজা প্রতাপচাঁদ বর্দ্ধমান যাইতেছেন এ কথা পরদিন গঙ্গার উভয় কূলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কুলবধূ অবধি গঙ্গাতীরে ছুটিয়া দেখিতে আসিল। মাস্তুলে মাস্তুলে রক্তপতাকা উড়িতেছে, নৌকার ছাদে ছাদে তখ্‌মাওয়ালা প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কতই লোক নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া কূল দেখিতেছে। কতই লোক কূল হইতে নৌকা দেখিতেছে। রাজা পিনেসের ভিতরে আছেন, তাহার খড়খড়ি খুলা রহিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধারা বলিতে লাগিল "যাও, বাছা! আপনার ঘরে যাও? কতদিন পথে পথে বেড়ালে, এখন ঘরে যাও।"

নৌকা গমনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। ২রা বৈশাখ † তারিখে তিনি কাল্‌নায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই দুই জন মোক্তারকে বর্দ্ধমানে পাঠাইলেন। তাহারা মেজেষ্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবে যে, প্রতাপচাঁদ কাল্‌নায় পৌঁছিয়াছেন,

* ইংরেজি সন ১৮৩৮ সালের মার্চ্চ মাস।

† ২ রা বৈশাখ ১২৪৫ ইংরেজি ১৩ই এপ্রেল ১৮৩৮।

তাঁহার ইচ্ছা বর্দ্ধমানে আইসেন। কিন্তু হুজুরের অভয় না পাইলে আসিতে সাহস করেন না।

এদিকে গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের মেজেষ্টারকে সংবাদ দিয়াছেন যে জালরাজা বর্দ্ধমানে যাইতেছেন এবং সেই সঙ্গে জালরাজা সম্বন্ধে কি একখানা গোপন মিনিট পাঠাইয়া দিয়াছেন।* মেজেষ্টর সাহেব—ওগিল্‌বি—তিনি তাহা পাঠ করিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এলেকজাণ্ডার নামে একজন পাদ্‌রি কালনায় থাকিতেন; মেজেষ্টর সাহেব প্রথমেই তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন যে তিনি গোপনে জালরাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লেখেন, যে কত লোক সঙ্গে এবং তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে।

পরে একদিন মেজেষ্টর সাহেব ডাক্তার চিক সাহেবের সঙ্গে একত্রে আহারান্তে কুঠি হইতে বহির্গত হইতেছেন এমত সময়ে গেটের নিকট দেখিলেন জালরাজার দুইজন মোক্তার দরখাস্ত লইয়া কালনা হইতে আসিয়াছে। কি দরখাস্ত তাহা তিনি অনুসন্ধান করিলেন না, একেবারে উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মোক্তারের নাম রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল। মোক্তারদের জেলখানায় পাঠাইয়া মেজেষ্টর সাহেব কালনার দারগাকে হুকুম দিলেন যে তথায় জমিয়তবস্ত হইতে দিবে না, যদি জাল রাজা আপনার সঙ্গিদের বরখাস্ত না করে তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

ইতিপূর্ব্বে পরাণবাবু জাল রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া প্যারালাল নামে একজন ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এতদূর পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল যে বাজারের কেহ কোন দ্রব্য জাল রাজাকে বিক্রয় করিতে সাহস করিত না। অধিক মূল্যে যে যাহা বিক্রয় করিত তাহা অতি গোপনে।

কালনার পাদরি এলেকজাণ্ডারের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য প্যারালাল বাবু একজন খৃষ্টানকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সেই খ্রীষ্টান যাহা বলিত তাহাই তিনি মেজেষ্টরকে লিখিতেন, স্বয়ং কোন বিষয় তদন্ত করিতেন না, এ কথা তিনি পরে আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

কালনার দারগা রাজবাটীর অনুগত, তাঁহার নিমিত্ত প্যারালাল বাবুকে কোন কষ্ট করিতে হইল না। দারগা পুনঃ পুনঃ প্যারালালকে জানাইলেন যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ অধীন জীবিত থাকিতে জালরাজা কখন কালনায় পা পাতিতে পারিবে না।

* এই মিনিটের কথা সুপ্রিমকোর্টে জোবানবন্দিতে প্রকাশ পায়।

দারগার নাম মহিবুল্লা। লেখা পড়া তিনি একেবারে জানিতেন না, একজন মুহুরীতে তাঁহার রিপোর্ট লিখিয়া দিত, তিনি কেবল তাহাতে মোহর ছেব্দ করিতেন। প্যারালাল বাবু মুহুরীকে হস্তগত করিলেন।

জালরাজার মোক্তারেরা বর্দ্ধমানে পৌঁছিবা মাত্র জেলখানায় প্রেরিত হইয়াছে এ সংবাদ জালরাজা কিছু মাত্র জানিতে পারেন নাই। সুতরাং "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি" ভাবিয়া কিছু দিন আর চুপ করিয়া নোকায় বসিয়া থাকিয়া একবার কালনায় নামিতে ইচ্ছা করিলেন।

৯ই বৈশাখ তারিখে প্রাতে বেলা ৮ টার সময় নামিবার উদ্যোগ হইল। তাঁহার সঙ্গে নৌকায় তাঞ্জাম ও বাহক ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাথুরিয়া মহল ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। নগরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা আসিতেছেন, আবালবৃদ্ধ সকলে পাথুরিয়া মহল ঘাটের দিকে ছুটিল। প্যারালাল থানার দিকে ছুটিলেন। দারগা তখন অতি ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিতেছিলেন, প্যারালাল গিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ হইল, শীঘ্র আসুন। দারগা পাগড়ি জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন "ভয় কি. এই আমি চলিলাম, কাহার সাধ্য এখানে নৌকা ভিড়ে।" মহিবুল্লা দারগা বাহির হইলেন, সঙ্গে জমাদ্দার, বরকন্দাজ, চৌকিদার প্রভৃতি অনেকে চলিল। তাঁহার ইচ্ছা সদর্পে চলেন, কিন্তু চলিতে তাঁহার কষ্ট হয়। তিনি অতি স্থূলকায় * একটি প্রকাণ্ড মহিষাকার বলিলেই হয়। মহিবুল্লা যথাকালে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাল রাজার নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। অতি ব্যস্ত হইয়া তিনি নৌকার নিকটে গেলেন, আভূমি নতশিরে জাল রাজাকে সেলাম করিয়া যোড়করে দাঁড়াইলেন। রাজা নৌকা হইতে তাঞ্জামে উঠিলেন, একজন ভৃত্য আসিয়া রাজার দক্ষিণ দিকে একখানি তরবারি রাখিয়া গেল। † একজন ছাতি ধরিল, একজন আড়ানি ধরিল, দুইজন চামর করিতে লাগিল, পাঁচ ছয় জন আশা সোটা ধরিল। সম্মুখে নকিব ফুকরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিবুল্লা ফুকারিয়া উঠিলেন—"তফাৎ, তফাত"—আর লোক তাড়াইতে লাগিলেন। তাঞ্জামের দুই পার্শ্বে দুইজন আরদালী তাঞ্জাম ধরিয়া যাইতেছিল, মহিবুল্লা একজনকে সরাইয়া আপনি আরদালী হইয়া তাঞ্জাম ধরিয়া চলিলেন। জালরাজাকে দেখিয়া

* "Mahaboolah, the worthy Darogah of Culna, the constituted authority, who can neither read nor write, nor walk nor run." *Petition to the Nizamut Audalut.*

† বর্দ্ধমানের রাজারা জাতিতে ক্ষত্রিয়, জাতীয় ধর্মানুরোধে হউক, অথবা রাজা বলিয়াই হউক, তরবারি তাঁহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে গণ্য। কিন্তু জালরাজার তাঞ্জামে তরওয়ার থাকায় "drawn sword" বলিয়া পাদরি সাহেব ভয় পাইয়াছিলেন।

গঞ্জের বৃদ্ধ মহাজনেরা চিনিল, তাহারা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা উলু দিতে লাগিল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। নগর প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা নৌকারোহণ করিলেন, সেই সময় কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া আপন আপন পরিচয় দিতে লাগিল, রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক পূর্ব্ব কথা কহিলেন। বৃদ্ধেরা আহ্লাদে চক্ষের জল মুছিয়া ঘরে ফিরিল।

এই ব্যাপারের কথা পাদরি এলাকজাণ্ডার সাহেব আপনার খৃষ্টানের নিকট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মেজেষ্টারকে লিখিলেন যে একশত তরবারধারী আর দুইশত সড়কিওয়ালা লইয়া প্রতাপচাঁদ কালনা প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে। রাজবাটীর প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল। কেবল সুদক্ষ দারগার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। ছয় হাজার কি আট হাজার লোক জমিয়াছিল। যদি প্রতাপচাঁদকে শীঘ্র দমন করা না হয় তবে বোধ হয় একটা দাঙ্গা উপস্থিত হইবে।*

পত্র পাইয়া মেজেষ্টার সাহেব প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তারি জন্য তাঁহার চতুর নাজির আসাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। পরাণ বাবুও এই সুযোগ পাইয়া রাধামোহন সরকারের সঙ্গে বিস্তর লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

কিন্তু মেজেষ্টার যাহার অধীন তিনি জালরাজাকে গ্রেপ্তাব করিতে পবামর্শ দেন নাই, তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, যদি জালরাজা আপনার লোক বিদায় না করে তবে তাহার নিকট হইতে ফেল জামিন লইতে পার।† মেজেষ্টার সাহেব এই আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বে পরওয়ানা জারি কবিয়াছিলেন, জালরাজাও তদনুসারে

---

* My dear sir,—Protap Chund has just gone on board his boat, after parading the whole length of Kalna in a *tonjohn* with a drawn sword in his own hand, attended by upwards of a hundred swordsmen and double that number of stickmen. The concourse was altogether 6 or 8,000. He appeared to be intent on the Rajbarry. But your active Darogah prevented him. The aspect of things, I think, threatens an affray, if he is not checked soon.

I am &c. A. Alexander.

† Extract from superintendent's letter No 400 dated 28th, April 1838.

4th. "The conduct of the claimant of the Burdwan Raj appears to me to be of such a dangerous nature, so insulting to the family in possession, that I think there is every reason to apprehend a serious affray.

লোক বিদায় করিতে চাহিয়াছিলেন, কেবল এইমাত্র ওজর করিয়াছিলেন যে কোন্ কোন্ লোক বিদায় করিবেন তাহা বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু মেজেষ্টার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত নাজিরকে পাঠাইলেন।

কিন্তু নাজিরকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বদিন একটি পল্টন* বৰ্দ্ধমান দিয়া বারাকপুর গিয়াছে। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া তাহার কাপ্তেনকে পত্র লিখিয়া পথে আটক করিলেন। কাপ্তেন সাহেব সিপাহী লইয়া বৈঁচিতে অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। কিছু পরে মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং আর ডাক্তার চিক সাহেব একত্রে বৈঁচিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজার সংবাদের নিমিত্ত ডাক্তার সাহেব কালনার পাদরিকে এক পত্র লিখিলেন, উত্তরে পাদরি ভয় দেখাইলেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব ফৌজ লইয়া তৎক্ষণাৎ কালনা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পল্টন কালনায় পৌঁছিল। কাপ্তেনের নাম লিটিল। তিনি মেজেষ্টার সাহেবের পরামর্শ মতে প্রথমে সিপাহী লইয়া পাদরি সাহেবের কুঠিতে গেলেন, তথায় স্থির হইল যে, মেজেষ্টার একবার নদীর কূলে গিয়া সংবাদ লইয়া আসিবেন তাহার পর ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইবে। ওগিলবি সাহেব পিস্তল হস্তে লইয়া দারগা ও নাজিরের সঙ্গে ঘাটে গেলেন। তথা হইতে কাপ্তেন লিটিলকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে জাল প্রতাপকে গ্রেপ্তার করা কঠিন, অতএব আপনি সসৈন্যে সত্বর আসুন। কাপ্তেন সাহেব হুকুম দিলেন, সিপাহীরা বন্দুকে গুলি গাদিল, তাহার পর গম্ভীর পদচারণে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। সম্মুখে জল কলকল করিয়া ছুটিতেছে, এখানে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না। গঙ্গার মধ্যস্থানে একখানি পিনিস

5th. Considering the tendency of his acts to tumult and riot, I am of opinion, that you will be fully justified in requiring to disband his array, and to behave himself like a good and quiet subject, and on his refusal to obey or evasion of your orders, I think you will be fully justified in calling on him to furnish good security to keep the peace.

6th. It will be necessary previous to the adoption of such a measure to take evidence of his having assembled such a body of men, and of the tendency of their conduct to break the peace."

* A detachment of 3rd Regiment N. I. under command of Captain Little.

নজর করিয়া রহিয়াছে, তৎপশ্চাৎ চারি পাঁচখানি বজরা, তাহার পশ্চাৎ কতকগুলি পানসী আর কিছুই নাই। মাজিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে, নিদ্রা যাইতেছে। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকায় আলোক নিবিয়া গিয়াছে, সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও ঘুমাইতেছে। সিপাহীরা ভাবিতেছে, কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে; এমন সময় কাপ্তেন সাহেব মেজেষ্টারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া "মারো, মারো" বলিয়া চীৎকার করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তল ছুঁড়িলেন। অমনি গুড়্ গুড়্ গুড়্ করিয়া পল্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না, অপরদের মধ্যে কাহার হাত ভাঙ্গিল, কাহার পা ভাঙ্গিল, কাহার দেহ উলটিয়া জলে পড়িল। জাল রাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, পশ্চাতের বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরি চন্দ্র; নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।

এ দিকে যুদ্ধ ফুরাইল, যুদ্ধের পর লুঠ। সুতরাং লুঠ আরম্ভ হইল, সিপাহীরা ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া লইয়া পিনাসে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আসাদ আলি নাজির ও মহিবুল্লা দারগা আপন আপন দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেন। জাল রাজা, রাজা সাজিয়াছেন, কর্জ্জ করিয়া রাজার আসবাব কিনিয়াছিলেন, সোণার আসা, সোণার সোটা, সোণার ছাতি, সোণার আড়ানি, লুঠের মুখে তাহা সকলই অন্তর্হিত হইল।

লুঠ শেষ হইলে পর গ্রেপ্তার আরম্ভ হইল। মাঝিমাল্লা, খানসামা খেজমৎগার, যাহারা গুলিবৃষ্টিতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং জলে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ধরা পড়িল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যায় নাজিরের মন উঠিল না। দারগা নাজির উভয়েই রিপোর্ট করিয়াছেন যে, রাজার সঙ্গে ৭০০ কি ৮০০ লোক; রাজা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে ৩৪২ জন লোক। এখন অল্প লোক চালান দিলে গ্রেপ্তার অসম্পন্ন হয়, সুতরাং গ্রেপ্তারীর আড়ম্বর কিছু বাড়াইতে হইল। নিকটে দুই একখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা ছিল, নাজির সে সকল নৌকা হইতে যাত্রীদের বাহির করিয়া আনিলেন; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাহির হইল, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া ত্যাগ করার আর সময় নাই, সুতরাং তাহারা জাল রাজার সঙ্গী বলিয়া গ্রেপ্তার হইল। ওগিলবি সাহেব ২রা মে (১৮৩৮) তারিখের রোবকারিতে সেই হতভাগ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জবময়ী বেওয়া, সূর্য্যী, গঙ্গামণি, অন্নু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদ্ম গোয়ালিনি, কম্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়াঠাকুরাণী, দাসীঠাকুরাণী ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃদ্ধারা

বর্দ্ধমানে চালান গিয়া প্রায় নয় মাস তথায় আবদ্ধ থাকিল। যেরূপ তখন গবর্ণমেণ্ট ছিল, যেরূপ কর্ম্মচারি ছিল, যেরূপ সমাজ ছিল, তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্তের নিকটে আসিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত।

কালনাগঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার প্রতাপচাঁদকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল তাহারাও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গী হইল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইল। মেজেষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত রোবকারিতে লিখিয়াছেন যে, তারা আর গুণমণি জালরাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নাথু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তারের যোগ্য।

এইরূপে ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হইয়া বর্দ্ধমানের জেলখানায় প্রেরিত হইল। জাল রাজা আর নরহরি চন্দ্র শান্তিপুরের নিকটে ধরা পড়িলেন। কিন্তু জাল রাজাকে বর্দ্ধমানে না পাঠাইয়া হুগলির জেলে পাঠান হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহাকে বর্দ্ধমানে চালান দেওয়া হয়, তিনি ত বর্দ্ধমানেই যাইতেছিলেন, রাজার মত যাইতেন, না হয় অপরাধীর মত গেলেন; যেরূপেই যান, বর্দ্ধমানে যাইতে পারিলেই তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না। তিনি সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া হুগলিতে বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। নরহরিচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলে বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইল। কিন্তু যে জেলায় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল সে জেলায় তাঁহার বিচারের পক্ষে কি আপত্য ছিল তাহা কোন কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই।

জাল রাজা গ্রেপ্তার হইলে পর তাঁহার একজন উকীল সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি—নাম সা (W. D. Shaw)—গ্রেপ্তার হইলেন, তিনি লড়াইয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন না, নিকটে পাইগাছি গ্রামে লায়েল সাহেবের নীলকুঠিতে ছিলেন, প্রাতে তাহা হইতে আসিতেছিলেন, পথে ওগিলবি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। ওকিল সাহেব British born subject প্রভৃতি কত কথাই বলিলেন, মেজেষ্টার সাহেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। গ্রেপ্তারের সময় সা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কি অপরাধ? মেজেষ্টার সাহেব মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "রাজবিদ্রোহিতা! Tresaon!"

মেজেষ্টারের মুখে হঠাৎ যাহা আসিয়াছিল, তাহাই যে তিনি বলিয়াছিলেন এমত নহে। পরে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনার ২৪ মে ১৮৩৯ সালের

৫২৭ নং পত্রে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদের এই বলিয়া উল্লেখ করেন যে "persons accused of being conspirators against the Government, and of resistance to the constituted authorities."

সা সাহেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন এই জনরব শুনিয়া পাইগাছির নীলকর সাহেব তাহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত তাঁহার একজন সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আসামির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে বলিয়া গরীব সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইল, এবং সরকার যে হাতী চড়িয়া আসিয়াছিল, সে হাতীটিও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হইল।

প্রতাপচাঁদের পরম বন্ধু নবাব বাবু সিঙ্গুর হইতে একায়েক বর্দ্ধমানে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সে সংবাদ মেজেষ্টার সাহেব কিরূপে পাইলেন, পাইয়া যথা নিয়মে নবাব বাবুকে জেলে পুরিলেন।

তাহার পর আর কাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন খুঁজিতে লাগিলেন, শেষ সন্ধান পাইলেন যে, বিলকুলির নবাব আনওয়ার আলি, জালরাজার স্বাপক্ষ অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন। সেই সঙ্গে জাহানাবাদের রামদীন্ সিংহ, বল্লালদীঘির হাফেজ ফতে আলিকে গ্রেপ্তার করিতে অনুরোধ করিলেন। * আরও জনকয়েককে গ্রেপ্তার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু পানিহাটির জয়নারায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার কি চেষ্টা হইয়াছিল তাহা কাগজ পত্রে প্রকাশ নাই।

---

* Extract from a letter from the acting magistrate of Burdwan to the magistrate of Hooghly, dated Calcutta 6th May 1838.

"In my recent capture of *soi disant* Rajah of Burdwan, with his armed followers, some hundreds of swords were discovered in his boats. The Sepoys, however, of Captain Little's detachment considering them fair plunder, appropriated to themselves as many as they could carry away. Their camp followers did the same, and my burkundazes and chowkeedars caught the infection, so that there are only now 86 swords forthcoming, of which upwards of 50 were received from the sepoys. * * As Captain Little is today at Hooghly may I request you will join with him, if necessary, in making the necessary search in his camp, and do your best to get possession for me the plundered swords. It is of the greatest importance to get them, as they form such strong evidence in the case."

লড়াই হইল, লুঠ হইল, গ্রেপ্তার হইল, কিন্তু একটা বাকি থাকিল। মেজে-ষ্টরিতে এত্তেলা গিয়াছিল যে, জাল রাজার সঙ্গে পাঁচ সাত শত অস্ত্রধারী আছে; কিন্তু তাহাদের সে অস্ত্র কোথায় গেল? নৌকায় চারি পাঁচখানি তরওয়ার, একটি বন্দুক আর একটি পিস্তল ব্যতীত পাওয়া গেল না। দারগা সাহেব বড়ই গোলে পড়িলেন। আসাদ আলি নির্ভীক পুরুষ, তৎক্ষণাৎ কালনার রাজবাটী হইতে এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৮৬ খানি তরওয়ার সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর মেজেষ্টার সাহেবকে জানাইলেন যে, সিপাহীরা সমস্ত তরওয়ার লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি বহু যত্নে তাহাদের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশ খানা উদ্ধার করিয়াছি। এখনও তাহাদের নিকট এত তরওয়ার আছে যে গাড়ী বোঝাই হইতে পারে। কাপ্তেন লিটিল এই সময় হুগলীতে পৌছিয়াছেন অনুভব করিয়া ওগিলবি সাহেব হুগলির মেজেষ্টারকে পত্র লিখিলেন যে, সিপাহীদের নিকট হইতে তরওয়ারগুলি লইয়া পাঠাইয়া দিবেন; কেন না সেই তরওয়ারগুলিই এ মোকর্দ্দমার প্রধান প্রমাণ।

[ক্রমশঃ]
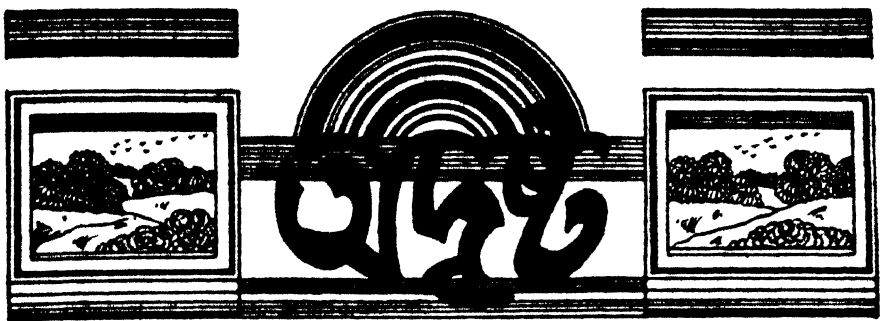
আমি অদৃষ্টবাদী। ভারতবাসী বলিয়াই যে আমি অদৃষ্টবাদী তা নয়। ভারত অদৃষ্টবাদের চিরপ্রসিদ্ধ ভূমি। অদৃষ্টবাদিত্ব ভারতবাসীর ধাতুগত প্রকৃতি। সেকেলে লোকের ত কথাই নাই। এখন যাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান চর্ব্বণ করিতেছেন তাঁহারও, কথায় না হউক কাজে, জ্ঞাতসারে না হউক অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক না হউক অনিচ্ছাপূর্ব্বক, অদৃষ্টবাদী। আমিও সেই জন্য অদৃষ্টবাদী ; কিন্তু শুধু সেই জন্য নয়। আমি অদৃষ্টবাদে যত দর্শন দেখি তদপেক্ষা কবিতা দেখি ; যত জ্ঞান দেখি তদপেক্ষা কর্ম্ম দেখি। কথাটা কিছু বিস্ময়কর, কিছু নূতন রকমের, কিন্তু আমার এই মত। মানুষের সুখ দুঃখের কারণ সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। শাস্ত্রকারেরা বলেন সুখদুঃখ কর্ম্মফল মাত্র এবং অনেকে বলেন যে কর্ম্মফলের নামই অদৃষ্ট। কিন্তু সে অর্থে অদৃষ্ট বড় ভাল জিনিস নয়। অন্ধ যদি কর্ম্মফলে অন্ধ হইয়া থাকে তবে কেন আমি তাহার দুঃখে দুঃখিত হই ? কিন্তু যখন শুনি লোকে বলিতেছে, এই অন্ধের কি অদৃষ্ট !—তখন অদৃষ্টে কর্ম্মফল দেখিতে পাই না। তখন অদৃষ্টে জগতের দুর্ভেদ্য দুঃখ-রহস্য দেখিতে পাই—তখন মানুষকে কি-জানি-কাহার, কি-জানি-কিসের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া অনুভূত করিয়া কাতর হই—তখন মনুষ্যকে এক অসাধারণ অতলস্পর্শ কবিত্বের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়—সেকন্দর বাদশাহ যেমন হোমর পড়িয়া বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন, তেমনি তখন সেই অদ্ভুত কবিত্বে মজিয়া দুঃখীর দুখ মোচনে প্রধাবিত হই ! এ অদৃষ্ট যদি অলীক হয় তবে জানিব যে অলীক মনুষ্যের অলীকত্বের প্রয়োজন আছে।

কথাটা আরো একটু বুঝাইবার চেষ্টা করি। বুঝান বড় কঠিন, কিন্তু চেষ্টা করি। দুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়। এইটা মনুষ্যের প্রকৃতি—মনুষ্য হৃদয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু এই প্রকৃতি, এই ধর্ম্মের মূলে শিক্ষা আছে। তাহার প্রমাণ—অসভ্য মনুষ্য। দুঃখ দেখিলে অসভ্য মনুষ্যের হৃদয় গলে না। মানুষ যত

সভ্য হয়, ততই দুঃখ দেখিলে দুঃখিত হয়। অথবা দুঃখ দেখিয়া মানুষ যত দুঃখিত হয়, তত সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। কোম্‌তের মতে Egoistic প্রবৃত্তির দমন এবং Altruistic প্রবৃত্তির প্রাধান্য লাভের নামই সভ্যতা। সভ্যতার অর্থ শিক্ষা, অতএব দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হওয়ার অর্থও শিক্ষা। শিক্ষার অর্থ—মনের সহিত বাহ্যশক্তির সংযোজনা। সেই সংযোজনার সম্পূর্ণতায় শিক্ষার সম্পূর্ণতা এবং সভ্যতার সম্পূর্ণতা। অদৃষ্টবাদ কি শিক্ষার অন্তর্গত নয়? মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্যকে দুঃখে দুঃখিত করে। কিন্তু বুদ্ধি অনেক সময়ে হৃদয়ের প্রতিকূল হইয়া থাকে। ভারতের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা অনেক সময়ে দরিদ্র এবং আতুরদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন। ইউরোপের আধুনিক কর্ম্মফলবাদীরা* তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখ ত দুঃখ বটে। যে কারণেই হইয়া থাকুক, দুঃখ ত দূর করা চাই, নহিলে দুঃখ যে বাড়িয়া যায়। কিন্তু বল দেখি, যদি দুঃখ আর দুরদৃষ্ট এক বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে দুঃখে দুঃখিত না হইয়া কি থাকা যায়? মানুষকে এক অচিন্তনীয়, অপরিমেয় শক্তির অথবা শক্তি-সমষ্টির, এক অপূর্ব্ব, অতলস্পর্শ কবিত্বের ক্রীড়ার পদার্থ বলিয়া ভাবিলে, মানুষের দুঃখে না কাঁদিয়া, মানুষের দুঃখ না মোচন করিয়া কি থাকা যায়? খেল্‌না ভাঙ্গিলে বালকের কান্নার কি সীমা থাকে? অদৃষ্টবাদী না হইলে মানুষ কি মানুষের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারে? যাহা মানুষকে সরল, সুকোমল, বালকবৎ করিয়া তুলে তাহা অলীক হইলেও কি অমূল্য নয়? অলীক হইলেও কি শিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত নয়?

আর অদৃষ্ট যে অলীক তাই বা কেমন করিয়া বলি? মানুষের সুখ দুঃখের সমস্ত কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি? মানুষ শত সহস্র শক্তি পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। শত সহস্র শক্তিসম্ভূত একটি ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র। তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অসংখ্য বাহ্যশক্তির সহিত সম্পর্কবদ্ধ, কিন্তু তাহার জ্ঞান অল্প, কত শক্তি এবং কি প্রকারের শক্তির সহিত তাহার সম্পর্ক তাহা সে জানে না, তাহার জানিবার উপায়ও অল্প। আধুনিক উদ্ধত বিজ্ঞান এ কথা মানে, কিন্তু মানিয়াও তাহারা ধ্যান করিতে পারে না। এবং সেই জন্যই আধুনিক ইউরোপীয় নীতি-শাস্ত্রে Survival of the fittest প্রভৃতি নৃশংস মতের প্রাদুর্ভাব। আধুনিক Evolution মতানুসারে আজিকার মনুষ্য জগতের বিকাশাবধি যত যুগ অতীত হইয়াছে সেই সমস্ত যুগের ফল বই নয়। কিন্তু কে কবে সেই সকল যুগ বুঝিয়াছে বা বুঝিবে? এবং আজিকার মনুষ্যকেই বা কে কেমন করিয়া বুঝিবে? তবেই

---

*ইউরোপের আধুনিক কর্ম্মফলবাদের কর্ম্মফলের অর্থ ইহজন্মের কর্ম্মফল, ভারতের কর্ম্মফলের অর্থ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান এবং দর্শনানুসারে মানুষে অদৃষ্ট আছে। তথাপি Evolution মতাবলম্বী দার্শনিকেরা যখন মানুষের সুখদুঃখের কথা বলেন তখন কেবল তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের দোষগুণ নির্ণয় করিয়া সমাজকে শিক্ষা দেন এবং রাজপুরুষদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন! তখন তাঁহারা আজিকার মানুষে আজিকার মানুষ বই আর কিছুই দেখিতে পান না! তখন তাঁহাদের মতে জগতে কিছুই অদৃষ্ট থাকে না! ইহার অর্থ এই যে, ইউরোপীয়েরা মানুষকে পড়িতে পারেন, কিন্তু ধ্যান করিতে পারেন না। পদার্থ-বিজ্ঞানের শাসনেই হউক আর তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতির গুণেই হউক, তাঁহারা কোন বিষয়েই 'দুই দু-গুণে চারি' এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি তাঁহাদের কবিবর Tennyson, যিনি De Profundis লিখিয়াছেন, বোধ হয় তিনিও সংসার-ক্ষেত্রে 'দুই দু গুণে চারি' প্রণালী অতিক্রম করিতে পারেন না এবং দুরদৃষ্ট শুভাদৃষ্ট কিছুই বুঝেন না। পুরাকালে দুইটি অসাধারণ প্রতিভাশালী জাতি অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—গ্রীক এবং হিন্দু। কিন্তু দুইটা জাতির অদৃষ্ট ভিন্ন রকমের। হিন্দু অদৃষ্টে যুগ যুগান্তর নিহিত আছে; জল, বায়ু, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অসীম বিশ্ব নিহিত আছে। সে অদৃষ্টের আকার নাই, মূর্ত্তি নাই—কিন্তু সে অদৃষ্টের ধ্যান আছে। সে অদৃষ্ট ব্যক্তি নয়, বিষয়। সে অদৃষ্টের নাম অনন্ত—অসীম ব্রহ্ম—অনাদি ইতিহাস। সকলি সেই অদৃষ্টে আছে; সেই অদৃষ্ট সকলেতেই আছে। সে অদৃষ্ট শুভ এবং অশুভ, দুইই। 'দুই-দু-গুণে চারি' যেমন করিয়া বুঝি, সে অদৃষ্টে তেমন করিয়া বুঝি না বটে; কিন্তু ধ্যানে জানি সেও 'দুই দু-গুণে চারি।' এবং সেই জন্যই তাহাকে অতলস্পর্শ কবিত্ব বলি। যে মহাতত্বের মূলে জ্ঞান আছে, কিন্তু যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, ধ্যানে পাওয়া যায় তাহাকেই প্রকৃত কবিত্ব বলে। গ্রীক অদৃষ্টের সীমা আছে, —দুঃখ তাহার অন্তর্গত, সুখ নয়। সঙ্কীর্ণায়তন গ্রীক-মন হিন্দুর ন্যায় অসীম, অনিশ্চিত এবং অনির্দ্দিষ্টের ধ্যান করিতে পারিত না। তাই সে মনে অদৃষ্ট সীমাবদ্ধ এবং প্রখর-মূর্ত্তি বিশিষ্ট। সে কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রীক কাঁদিত এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশেষে মানুষ হইত। কিন্তু সে মূর্ত্তির কাছে গ্রীক মন্ত্রাহতের ন্যায়—ভয়ে বা শোকে এককালে অভিভূত—ভীষণ অজগর বেষ্টনে আবদ্ধ। ইহাও কবিত্ব। কিন্তু ইহা নাটকের কবিত্ব। হিন্দু অদৃষ্ট মহাকাব্যের কবিত্ব, কেন না গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা ইহার মূলে জ্ঞানের ভাগ বেশী। এই জন্য হিন্দু, অদৃষ্টের খেল্‌না হইয়াও, অদৃষ্টকে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরকন্না করে, গ্রীক কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অদৃষ্টের কঠিন শাসনে শাসিত হয়। এই জন্য ফলাফল সম্বন্ধেও হিন্দু অদৃষ্ট গ্রীক অদৃষ্ট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

দেখিলাম যে অদৃষ্ট মহাকবির কল্পনা, কিন্তু জ্ঞানমূলক। মনুষ্যের সুখদুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অদৃষ্টের আশ্রয় না লইলে চলে না। মানুষ মহাকবির বিকাশ মাত্র। অতএব মানুষ মহাকবির কল্পনা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া আত্মসাধনায় কৃতকার্য্য হইবে? মহাকবির কল্পনায় প্রবেশ করিতে না পারিলে মানুষ কি সভ্য হয়, শিক্ষিত হয়, না মানুষ হয়।

আরো এক কথা। অদৃষ্টের নাম করিয়া যে কাঁদে তার কান্নার মতন কান্না ত পৃথিবীতে আর নাই। কেন না সে কান্না অনন্তের দোহাই দিয়া কান্না। অনন্ত যাহার কারণ অথবা যাহার কারণ অনন্ত, তাহার জন্য কাঁদিবার কোন সঙ্কোচ বা প্রতিবন্ধক হইতে পারে না – তাহার জন্য কাঁদিবার কারণও অনন্ত। হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী—হিন্দুদের মতন কাঁদিতেও কেহ পারে না। কিন্তু হিন্দুরা কি শুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত? তাহা যদি হইত তাহা হইলে হিন্দুপরিবারে এত প্রাণীর সমাবেশ কখনই হইত না। যখন ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রবল ছিল, তখন ইউরোপ দুঃখীর জন্য যত কাঁদিয়াছিল তত আর কখন কাঁদে নাই। কিন্তু তখন ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে অন্তরে অদৃষ্টবাদী ছিল। এইরূপ দেখিবে যেখানে দয়ার সমুদ্র সেইখানেই অদৃষ্টবাদ। ইহার অর্থ কি? বোধ হয় ইহার অর্থ এই যে, অদৃষ্ট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—হৃদয়ের কামনা—দুঃখের সহিত অদৃষ্টের সংযোগ করিতে হৃদয় ভালবাসে এবং সেই সংযোগ করিয়া হৃদয় যত গলে শুধু দুঃখ দেখিয়া তত গলে না। হৃদয়ের গভীরতা অনন্ত, হৃদয়ের ক্ষেত্র অনন্ত-ব্যাপী। এবং সেই জন্য হৃদয় হৃদয়ের পাত্রকে অনন্তে উৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। লীয়রের কষ্ট দেখিয়া আমাদের এত কষ্ট কেন হয়? তাঁহার দুর্ব্বল মনই ত তাঁহার যন্ত্রণার প্রধান কারণ। তবে কেন আমরা তাঁহাকে 'ঠিক হইয়াছে', 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারি না? পারি না কেন—না, এত পাইয়া,—রাজ্য, ধন, জন, রাজসম্মান সব পাইয়া কেবল একটু মানসিক বল পাইলেন না এবং সেই জন্য রাজ্য, ধন, জন, রাজসম্মান, শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন! আবার ওদিকে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের কথা মনে হইলে ভাবি যে, যে এত ভালবাসিতে পারে এবং এত ভালবাসা খুঁজে, সে সব পাইল, কিন্তু একটু সন্তানভাগ্য পাইল না। তখন হৃদয় কাঁদিয়া বলে, লীয়র যদি অদৃষ্টের হাতের—ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির হাতের খেলনা নন, ত সে খেলনা কে? লীয়রের কি দোষ? লীয়র বিশ্বের দুর্ভেদ্য রহস্যের রঙ্গের পদার্থ বই ত নয়? হৃদয়ের এই ভাব এবং সেই জন্য হৃদয় লীয়রের জন্য এত ব্যাকুল। অতএব হৃদয়ে অদৃষ্টের আসন, হৃদয়ে অদৃষ্টের উৎপত্তি, অদৃষ্ট হৃদয়ের পরিপোষক। হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যাহার জন্ম এবং হৃদয়ের যে পুষ্টিসাধন করে সে কি ফেলিয়া

দিবার সামগ্রী ?—সে কি মনুষ্যজাতির, জগতের, বিশ্বের অনন্ত মঙ্গলের কারণ নয় ?

দেখিলাম, অদৃষ্টের জন্ম—জ্ঞানে এবং হৃদয়ে। একা জ্ঞানমূলক বিজ্ঞান কেমন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিবে ? তাই বলি, অদৃষ্টবাদী ভারত যেন ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানের দাম্ভিক কথায় মজিয়া তাহার অমূল্যনিধি অদৃষ্টকে ছাড়িয়া না দেয়। যাহা মানুষকে না মারিয়া রাখে, তাহাই মানুষের জীবনযাত্রার সম্বল। দাম্ভিক বিজ্ঞান দুঃখিকে মরিতে বলে। কিন্তু দুঃখী মরিলে সুখীও কি মরেন না ? যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পাও ততক্ষণই ত তোমার বাঁচিয়া থাকা সার্থক। তাই বলি, ভারত যেন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের ঠাট্টার ভয়ে অদৃষ্টবাদ ছাড়ে না। অদৃষ্টবাদ ছাড়িলে যথার্থই ভারতের দুরদৃষ্ট ঘটিবে। ভারতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে ; মনুষ্যত্ব কমিয়া যাইবে। ভারতে মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খল হইবে। ভারত দুঃখভারে অতল জলে ডুবিবে !

ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচন

ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু না করিলেও নিবৃত্তি নাই—এখন বিস্তর ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তাহার ভাল মন্দ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহাই আমরা সমালোচনা করিতে অনিচ্ছু। ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখকেরা কেবল ঘটনা লেখেন। কিন্তু কেবল ঘটনায় অন্তরস্পর্শ করে না। যতক্ষণ ঘটনার সঙ্গে অন্তরেব একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে না পারা যায় ততক্ষণ ঘটনা বৃথা।

কেবল ঘটনা-লেখক রামায়ণ লিখিতে গেলে হয় ত লিখিবেন :—"রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বিমাতার কৌশলে বনে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সীতা ছিলেন, একটা রাক্ষস আসিয়া সীতাকে হরণ করিল। তখন রাম চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর এবনে ওবনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমত সময় কতকগুলি বানর আসিয়া রামের সহায় হইল। তাহাদের সাহায্যে রাম সমুদ্র বাঁধিলেন, রাক্ষসকে মারিলেন, সীতাকে উদ্ধার করিলেন, অযোধ্যায় আসিলেন। তাহার পর একদিন সীতা সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা সন্দেহ হইল, অমনি রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বনে পাঠাইলেন। বাল্মীকি যদি এই ঘটনাগুলি এখনকার মত ক্ষুদ্র উপন্যাস আকারে লিখিয়া ছাপাইতেন তাহা হইলে তাঁহার রামায়ণের দুর্দ্দশা বটতলার গ্রন্থের মত হইত।

ঘটনা লেখক কেবল যড়যন্ত্রের মত। তাপমান যন্ত্র দাঁড়াইয়া বলিতেছে এই ৮৮ ডিগ্রি উত্তাপ, তাহার পর এই ৮৭ হইল, তাহার পর এই ৯০ হইল তাহার পর এই আবার ৮৮ হইল। ঘটনা লেখক ঠিক তাহাই বলেন, এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পর এই ঘটিল, তাহার পর আবার এই ঘটিল। কেন ঘটিল তাহা বলিব না, কেবল ঘটনা বলিব।

সুতরাং ঘটনালেখকের পাঠক কেবল বালক। বালকেরা ঘটনার উপর ঘটনা চায়, তাহারা এ সংসারে নূতন, ঘটনাও তাহাদের পক্ষে নূতন, তাহারা উপ-

র্য্যুপরি ঘটনা চায়। "তারপর কি হইল? তাহার পর কি হইল?" এই তাহাদর বুলি। রৌদ্রের পর মেঘ করিল, বালকের আনন্দ হইল, তাহার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আরও আনন্দ বাড়িল। কিন্তু তখনই সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা ঘটনা চাই, নতুবা ভাল লাগে না। সুতরাং বালক বলিতে লাগিল "হে, বৃষ্টি! ধরে যা।"

আমরা মোটামুটি বুঝি উপন্যাস লেখকেরা প্রকৃতির পাণ্ডা, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দর্শককে প্রকৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সূত্রগুলি দেখাইতেছেন;—"এই সূত্রে জগৎ বান্ধা, স্পর্শকর, তুমি পবিত্র হইবে। এই সূত্রে স্ত্রী পুরুষ বাঁধা—ইহা আদি সূত্র—বড় মজবুদ। আর এই সূত্র অন্য সূত্রকে টানিতেছে, খুলিতেছে, বাঁধিতেছে—ইহা ভাল করিয়া দেখ, সংসারের অনেক গ্রন্থি এই সূত্রে।"

মনুষ্য হৃদয় গুপ্তসাগর। তাহার শত শত তরঙ্গ অলক্ষ্যে উঠিতেছে, অলক্ষ্যে মিলাইতেছে, আমরা তাহা দেখি না, উপন্যাস লেখক তাহা আপনি দেখিতেছেন, আমাদের দেখাইতেছেন, আর বুঝাইতেছেন যে, এ সংসারের যত ক্রিয়া সকলই এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত। ক্ষুদ্র গল্পে সে তরঙ্গ থাকে না। সুতবাং তাহার ক্রিয়া অসম্পন্ন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

এ সংসারে কতই ঘটনা নিত্য ঘটিয়া থাকে। তাহাব কোনটি কেহ বর্ণন করিলে হয় ত প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও যেন প্রকৃত বোধ হয়। আবার সেই ঘটনা অপর কেহ বর্ণন করিলে হয় ত পূর্ব্ব বর্ণনার মত মনোহারী হয় না, নিত্য যাহা হইতেছে কেবল তাহাই হয়। ইহার হেতু কি? এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল পরিচয় এক্ষণে আমাদের অনাবশ্যক। আমরা কেবল এই মাত্র বলি যে, যে ঘটনাই হউক, হৃদয়ের সঙ্গে তাহা শত সূত্রে আবদ্ধ আছে। তুমি যদি সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ বাদ দিয়া কেবল ঘটনা মাত্র বর্ণন কর, তবে তাহা নীরস ও নিষ্ফল হয়। ক্ষুদ্র গল্পে হৃদয়ের সম্বন্ধ দেখাইবার স্থান থাকে না, তাহাই ক্ষুদ্র গল্প প্রায় অপাঠ্য হয়।

আমরা সম্প্রতি যে কয়েকখানি ক্ষুদ্র গল্প পাইয়াছি তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের এই সকল কথা মনে আসিয়াছিল। বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের লিখিত "গিরিজা" পড়িতে গিয়া প্রথমে আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই—আরম্ভেই ঘটনার উপর ঘটনা—সে ঘটনায় কতক হইয়া গিয়াছে কতক হইতেছে।

গিরিজাকে বসন্তকুমার আর হরকুমার এই দুই জনে ভালবাসেন। দুই জনেই বিবাহ করিতে উদ্যত। গিরিজার পিতা হরকুমারের প্রতি নারাজ, কিন্তু গিরিজা নিজে তাহার প্রতি রাজি। হরকুমার দেখিল, আর উপায় নাই।

সুতরাং প্রেমপীড়িত হইয়া এখনকার মত এক পয়সার গেরি মাটী আর ছ পয়সার শুষ্ক অলাবু আনিয়া এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মচারী সাজিয়া রাত্রে গিরিজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। গিরিজা প্রথমে চিনিতে পারিল না, এখানকার প্রণয় এই রূপ, পাঁচবার উত্তর প্রত্যুত্তরের পর চিনিল ; তখন হস্ত ধরিল, তাহার পর দস্তুরমত কান্দা কাটা আরম্ভ করিল। এ সকল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গিরিজার প্রণয় কতদূর হইয়াছিল তাহা জানি না, হরকুমারের প্রণয় কতদূর ছিল তাহাও জানি না। সুতরাং আমরা ইহাদের কোন পক্ষই হইলাম না, কাহারও কান্নায় কাঁদিলাম না, বরং হাসিলাম, ভাবিলাম "এরা কি জন্য কাঁদে।" গ্রন্থকার পূর্ব্বে গিরিজার সঙ্গে বা হরকুমারের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি স্থাপনা করিয়া দিলে হয় ত আমরা সকল কথা বুঝিতে পারিতাম কিন্তু তাঁহার স্থান সঙ্কীর্ণ, তিনি "তাহার পর কি হইল" এই পরিচয় দিতে আসিয়াছেন, হৃদয়ের সম্বন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন।

কাঁদাকাটার পর গিরিজা হরকুমারের সঙ্গে কুলত্যাগিনী হইল। উভয়ে মুরশিদাবাদে গিয়া উপস্থিত। তথায় কিছুদিন পরে গিরিজার পিতাও নৌকা করিয়া গেলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। কন্যার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি প্রীতমনে হরকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেটা বাহুল্য হইয়াছিল। তাহা আর বড় প্রয়োজন ছিল না। এখনকার নূতন ফেসনের বিবাহ বুঝি আবশ্যক ছিল। যাহাই হউক, তাহার পর তিনি পরলোক যাত্রা করিলেন।

কিছু দিন পরে হরকুমার, যিনি গেরিমাটি কিনিয়া ব্রহ্মচারী সাজিয়াছিলেন, তিনি আর এক জনের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়িলেন। গিরিজা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু হরকুমারের প্রতি পূর্ব্বমত শ্রদ্ধা রাখিলেন। একদিন তিনি হরকুমারের নিমিত্ত মালা গাঁথিতেছেন আর কাঁদিতেছেন, এমত সময় একটি পাগল গীত গাইতে গাইতে আসিল—তাহার সকল গীতগুলি ভাল নহে—তাহা না হউক—গিরিজার অবস্থানুযোগী বটে। গিরিজা তাহাকে চিনিলেন। সে ব্যক্তি পূর্ব্বপরিচিত বসন্ত-প্রেমপাগল হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বের খবর বড় পাই নাই, বসন্ত কিরূপ লোক, তাহা জানি না, কতদূর ভাল বাসিতে পারে কতদূর ভাল বাসিয়াছিল, এ সকল কিছুই জানি না। গ্রন্থকার হঠাৎ বলিয়া দিলেন বসন্ত প্রণয়ে পাগল হইয়াছে, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম ; উপায় নাই।

তাহার পর একদিন রাত্রে গিরিজা একা বসিয়া কাঁদিতেছে এমত সময়ে হরকুমার আসিয়া বলিল "গিরিজা ! তুমি কাঁদিতেছ, আমার সুখের পথে কাঁটা দিতেছ ?" গিরিজা উঠিয়া চক্ষু মুছিল। শেষে হরকুমার বলিল "গিরিজা আমার

একটী অনুরোধ রাখ, আমায় সুখী কর, তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না। তোমার পিত্রালয়ে যাও।" গিরিজা আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। হরকুমার গিরিজাকে একখানি পানসীতে উঠাইয়া দিল তাহার পর দুই একটী কথার পর সরোদনে বলিল "গিরিজা যথেষ্ট হইয়াছে আর তোমার যাইতে হইবে না।" গিরিজা কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া যাইয়া "নাথ—"এই বাক্যটীমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে, এমন সময় নৌকার একটি কাষ্ঠফলক স্খলিত হইবামাত্র গিরিজা গঙ্গার গর্ভে পড়িয়া গেল। আর উঠিল না। হরকুমার দাঁড়াইয়া রহিল। এমত সময় পাগল বসন্ত আসিয়া সেই জলে ঝাঁপ দিল, সেও আর উঠিল না। গল্প ফুরাইল।

গল্পটী মন্দ নহে, কিন্তু যদি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ইহাকে ঠাসিয়া পুরিতে না হইত, তাহা হইলে সুন্দর বলিতাম। আমরা গ্রন্থকারের দোষ দিই না, বরং তাহার প্রশংসাই করি। তিনি এই অল্প আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের সর্ব্বাঙ্গ ঠিক রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যে সুলেখক হইবেন তাহার যথেষ্ট চিহ্ন দেখাইয়াছেন।

নবম বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা
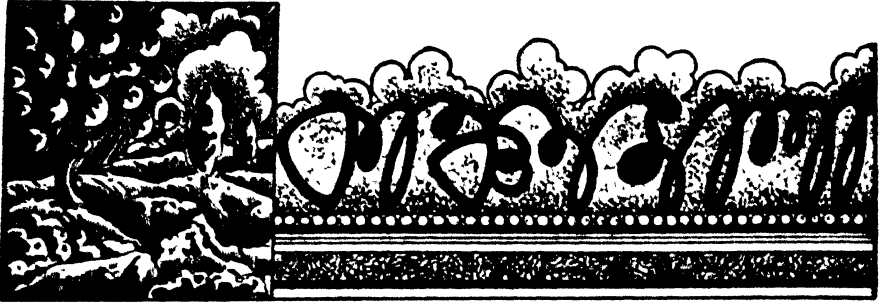
৪র্থ পরিচ্ছেদ

তিষ্যরক্ষা

তিষ্যরক্ষা প্রাতঃকালে কি করিল বলিবার পূর্ব্বে উহার জীবনবৃত্তান্তের পূর্ব্ব কথা বলা আবশ্যক। তিষ্যরক্ষা একজন ক্ষৌরকারের কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও এ বংশের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিষ্যরক্ষা ভূমিষ্ঠ হইলে একজন গণক বলিয়াছিলেন যে সে রাজরাণী হইবে। তিষ্যরক্ষা অতি অল্প বয়সে সে কথা শুনিয়াছিল। তদবধি রাজরাণী হইবার জন্য তাহার বাসনা বড়ই প্রবল হয়। তাহার পিতা তাহাকে সমান ঘরে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সে বলিয়াছিল "রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে শূর্পনখার ন্যায় বাসর ঘরেই বৈধব্যের উপায় করিয়া লইব।"

এই সময়ে, বিন্দুসার-পুত্র অশোক অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স অল্প; অথচ তাঁহার জ্বালায় রাজা, মন্ত্রী, রাণীগণ, প্রজা, বণিক, ব্যবসায়ী, সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজা এরূপ দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে রাজধানী হইতে দূর করিবার অভিপ্রায়ে কীকট দেশের দক্ষিণস্থিত অরণ্যবাসী পিঙ্গলবৎসের নিকট শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। পিঙ্গলবৎস যে কেবল জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন তাহা নয়; তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ তিনি দুর্গম জঙ্গলমধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সন্তান দুর্বৃত্ত হইলে লোকে তাঁহারই নিকট শিক্ষার্থ প্রেরণ করিত।

অশোক তথায় প্রেরিত হইবার অল্প দিন পরেই তিষ্যরক্ষার পিতাও উহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উহাকে সেইখানে প্রেরণ করেন। এইরূপে পিঙ্গলবৎসের গৃহে এই দুই ঘোর দুর্বৃত্ত, নিষ্ঠুর, খলস্বভাব যুবক যুবতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হয়।

অশোকের ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বার বিবাহ হইয়াছিল। পিঙ্গলবৎস গণিয়া বলিয়াছিলেন যে বিন্দুসারের সন্তানগণের মধ্যে অশোকই রাজা হইবে। এই কথা শুনিয়া অবধি পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে অশোককে মুগ্ধ করাই তিষ্যরক্ষার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষা তাদৃশ সুন্দরী ছিল না। শিল্পাদি বিদ্যায়ও তাহার কিছু মাত্র দখল ছিল না। কিন্তু সে যাহা ধরিত তাহা ছাড়িত না। সে সঙ্কল্প করিল যেরূপে হয় অশোককে বিবাহ করিতেই হইবে। সে ষড়যন্ত্র কার্য্যে বাল্যকাল হইতেই বৃহস্পতি; প্রথম হইতেই অশোককে ভুলাইবার জন্য সে নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। অশোক প্রথম হইতেই নাপিতের মেয়ে বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। সুতরাং বিবাহের নামেই তিনি চটিয়া আগুণ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা পণ করিলেন, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াও অশোকের সহিত মিলিত হইবে।

অশোকেরও এ সময় পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ভাল মন্দ, কিছু জ্ঞান ছিল না। সুতরাং নিজ পণ বজায় করিতে তিষ্যরক্ষার বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না। তিনি অচিরাৎ পাপীয়সীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া তিষ্যরক্ষা সর্ব্বপ্রথম মহাবিপদে পড়িল; এ কথা প্রকাশ করিলে অশোক তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবে। অপ্রকাশ থাকিলেও রাজরাণী হওয়া হইবে না। আপনাআপনি প্রকাশ হওয়া অনেক গোল। অতএব পাপীয়সী গোপনে তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। পত্রে জানাইল, "এখানে অনেক দুষ্ট লোক আছে, অধিক দিন রাখিলে আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।"

পত্র পাইয়া ধূর্ত্ত নাপিত বুঝিল। সে তৎক্ষণাৎ পিঙ্গলবৎসের আশ্রমে গিয়া প্রকৃত অবস্থা পিঙ্গলবৎসকে বলিল। আর বলিল, "আমাদের জাতি কুল যাহাতে রক্ষা হয় তাহা আপনি করুন।"

পিঙ্গলবৎস ক্রোধে অন্ধ হইয়া অশোককে ডাকাইলেন, জোর করিয়া তিষ্যরক্ষার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত রাজাকে লিখিয়া বলিলেন—"এরূপ দুর্ব্বৃত্ত কুমারের শিক্ষাদান আমার কর্ম্ম নহে। আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে এখান হইতে লইয়া যান।"

বিন্দুসার উভয়কে রাজধানী লইয়া গেলেন. পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পুত্রবধূকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে অতি দীনভাবে অন্তঃপুর মধ্যে দিন যাপন করিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই আবার রাজপুত্রের অত্যাচারে নগরশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা পুত্রকে আবার রাজধানী হইতে বিদায় করিবার উপায়

চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তক্ষশিলায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ বিদ্রোহী হইয়াছে সংবাদ আসিল। রাজা এই সুযোগে অশোককে সেনাপতি করিয়া তথায় প্রেরণ করিলেন।

তিষ্যরক্ষা অশোকের মহিষী হইল এবং রাজার অন্তঃপুরেও রহিল। কিন্তু সে দেখিল রাজরাণী হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। অশোকের জ্যেষ্ঠ অনেকগুলি ভাই আছে। সেগুলিকে বঞ্চিত করিতে না পারিলে রাজরাণী হওয়া হইবে না। অতএব কি উপায়ে ইহাদিগকে দূর করা যায় সেই চেষ্টায় রহিল। প্রথমতঃ বিহিত বিধানে শাশুড়ী সুভদ্রাঙ্গীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার কাণে গেল নাপিতকন্যা পুত্রবধূ বড়ই সাধুশীলা। অতএব সেই অবধি তাহার আদর বাড়িল, তাহার পরিচর্য্যায় দাসদাসী নিযুক্ত হইল। অন্তঃপুরস্থিত অপর স্ত্রীলোকেরা তাহার শত্রু হইল। সেও রাণীর কাছে বসিয়া নিত্য নিত্য পৌরস্ত্রীগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কাণভারি করিয়া দিতে লাগিল। রাজারও কাণ ক্রমে অন্যান্য পুত্রবধূদের বিরুদ্ধে ভারি হইয়া উঠিল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে জানিল অন্তঃপুরে তিষ্যরক্ষা যা করে তাই হয়।

এই সময়ে রাধগুপ্ত রাজবাড়ীতে প্রথম চাকুরী স্বীকার করিয়াছে। রাধগুপ্ত চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য। ষড়যন্ত্র নির্ম্মাণে, কুটিল রাজনীতিজ্ঞতায়, বিষাদি প্রয়োগে চাণক্যের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু অদ্যাপি লোকে তাহার মর্ম্ম জানিতে পারে নাই। সেও বুঝিয়াছিল যে একটি কোন বিষম গোলযোগ না ঘটিলে সহসা বড় হইতে পারা যাইবে না। সুতরাং সে রাজ্যের মধ্যে একটা বিষম গোলমালের সময় অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল নাপিতানী তিষ্যরক্ষা আমার অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। নাপিতানীও দেখিল রাধগুপ্তকে হাত করিলে রাজরাণী হইবার যোগাড় হইতে পারে। সুতরাং অর্দ্ধপথে মিল হইল। দুজনেই পরস্পর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। দুজনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা গোলযোগ বাধিলে হয়। তাহাদের অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না; শীঘ্রই একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুষীম এই গোলযোগ বাধাইবার হেতু। রাজা অনেক কার্য্যে সুষীমের পরামর্শ লইতেন। সুষীম বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীর ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তিনি অতি লম্পটস্বভাব। তাঁহার লাম্পট্য দোষ হেতুক রাধগুপ্ত ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই তাঁহার প্রতি চটা ছিলেন। এক্ষণে পাটলী-পুত্রস্থ শ্রেষ্ঠিবংশীয় কোন মহিলার প্রতি দারুণ অত্যাচার করায় তাঁহার প্রতি দেশের লোক অতিশয় চটিয়া গেল। এমন কি, সকলে আসিয়া মহারাজের

নিকট উহার নির্ব্বাসনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী, রাধগুপ্ত ও তিষ্যরক্ষা সকলেই এই লোকবিরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে এমনি হইয়া দাঁড়াইল যে রাজপ্রাসাদ মধ্যেও সুষীমের বাস করা দুরূহ হইয়া পড়িল। তখন রাজা অনন্তোপায় হইয়া সুষীমকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করিলেন এবং অশোককে রাজধানী প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন।

মাস মধ্যে অশোক আসিয়া পাটলীপুত্রে পৌঁছিলেন। তিনি পৌঁছিবার দুই তিন দিনের মধ্যেই হঠাৎ রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইল। হঠাৎ মৃত্যুর কারণ নির্ণয় হইল না। নগরবাসীরা কেহ কেহ "বিষ বিষ" বলিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল, কিন্তু কে দিল কেহই জানে না। দুই এক দিনের মধ্যেই নগরবাসিগণ নূতন অভিষেকে মত্ত হইল। পুরাণ রাজার আকস্মিক মৃত্যুর কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। রাধগুপ্ত অশোককে অভিষেক করিলেন; রাধগুপ্ত প্রধান মন্ত্রী হইল। অশোকের প্রধান মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা পাঠরাণী হইয়া সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইলেন।

কিন্তু সাত আট দিনের মধ্যেই অভিষেকের আহ্লাদ ভয়ে পরিণত হইল। সুষীম বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া পাটলীপুত্র অবরোধ করিলেন। অশোকের মন ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা উচিত কি না ভাবিয়া চলৎচিত্ত হইল। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা আসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। রাজার মনের অস্থিরতা দেখিয়া বলিলেন,—

"মহারাজ! আমি আপনার মত অবস্থায় পড়িলে এতদিন ফলে ফুলে বাগানের সমস্ত গাছ কাটিয়া পার করিয়া দিতাম।"

তিষ্যরক্ষা যেরূপ দার্ঢ্য সহকারে বাগানের গাছ কাটিয়া পার করিবার কথা বলিলেন, তাহাতে অশোকের মনে দার্ঢ্য সম্পাদন করিল। তিনিও বলিয়া উঠিলেন,—

"নাপিতানী! এই চলিলাম, বাগানে একটি গাছ থাকিতে কুঠার ত্যাগ করিব না।"

বলিয়া সশস্ত্রে মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধকার্য্যে অশোক বীরাগ্রগণ্য। তাঁহার ভুজবলে সুষীমসেনা পরাজিত হইল। সুষীমও পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহার পর চন্দ্রগুপ্তের বংশীয় গর্ভস্থ শিশুরও প্রাণসংহার করিয়া অশোক বিস্তীর্ণ মগধ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কেবল মাতা সুভদ্রাঙ্গীর

একান্ত অনুরোধে স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বীতাশোককে জীবিত রাখিতে সম্মত হই-লেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বৌদ্ধ মঠে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। বীতাশোক শাক্যভিক্ষু হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ভিক্ষা দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিল।

৩

এইরূপে অশোক রাজা হইলেন, তিষ্যরক্ষা রাজরাণী হইল। সে নাপিত-কন্যা এবং সম্যক বিবাহিতাও নহে, এই জন্য সে পাটরাণী হইতে পারিল না। কিন্তু গণকে সে তো পাটরাণী হইবে বলে নাই ? সুতরাং সেজন্য তাহার মনের ক্ষোভও নাই। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। বাল্যকালাবধি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনরাত্রি চিন্তা করিতেন, যাহার জন্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সকলই অসার বলিয়া বোধ হইত, যাহার জন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠিত হন নাই, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অশোক রাজা হইলেন, তিষ্য রাজরাণী হইল। উভয়েই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির আমোদে কিছু দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে রাজপদ ও রাণীপদ পুরাণ হইয়া উঠিল। উভয়েরই ভাবিবার অবসর হইল।

উভয়েই দেখিলেন যে সব ত হইল, কিন্তু আমার কি হইল। এত কষ্ট করিয়া এত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া এত আত্মীয় বান্ধবের প্রাণনাশ করিয়া এই যে উচ্চপদে আরোহণ করিলাম ইহাতে আমার নিজের কি হইল।

অশোকের "নিজের কি হইল" ইহার অর্থ আমার পরকালের কি হইল। তিষ্যরক্ষার "আমার কি হইল" ইহার অর্থ আমার নারীজন্মের সুখ কই হইল।

অশোকের এই ভাবনার ফল বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রয় ও জগতে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার।

তিষ্যরক্ষার ভাবনার ফল হইল, স্বামীতে তাহার মন উঠিল না। স্বামীর বয়স হইয়াছে, তিনি রাজকার্য্যে ব্যস্ত, আবার তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইলেন। তিষ্যরক্ষা জানিল এ স্বামী হইতে তাহার নারীজন্মের সুখ হইবে না। সুতরাং সে পরপুরুষ সহবাসে নারীজন্মের সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভুবন-মোহন রূপবান কুণাল তাহার নয়নপথের পথিক হইল। কুণালের স্নিগ্ধ শ্যামল উজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। সে কুণালকে পাইবার জন্য বিবিধ বিধানে

চেষ্টা করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালার সুখ তাহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই কুণালকে চখে চখে রাখিতে লাগিল। তাই আজি সন্ধ্যার সময়ে কৃত্রিম শৈলোপরি দাঁড়াইয়া কুণাল ও কাঞ্চনমালার মালা গাঁথা দেখিতেছিল। তাই সে কাঞ্চনমালার মালাগুলি চুরি করিয়া অভিনয় স্থলে মায়বেশী কুণালের পত্নী সাজিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই সে আজ কুঞ্জ মধ্যে এ প্রকার নির্লজ্জভাবে আপনার মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

---

(২)

Isabella does not return to the sisterhood of Saint Clare.

Putting aside from her the dress of religion, and the strict convention rule, she accepts her place as Duchess of Vienna. In this there is no dropping away from her ideal. ... ...She has learned that in the world may be found a discipline more strict, more awful than the discipline of the convent.

Dowden on Measure for Measure.

যাজন

তৈলঙ্গস্বামী, শুকদেব এবং রত্নাকরের কথাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা গিয়াছে যে কেবল ব্রত করিলেই বৈরাগ্য হয় না, এবং পাণ্ডিত্য অভাবেও বৈরাগ্যের পথ-রোধ হয় না। বৈরাগ্য জীবনের অংশ হওয়া আবশ্যক। মন মোহ হইতে এতদূর বিরক্ত হইবে যে যাহাতে স্বভাবতঃ লোকের মোহ উপস্থিত হয় তাহাতে ডুবিলেও বিরাগী মোহাচ্ছন্ন হইবেন না।* বৈরাগ্য মনের শীতবস্ত্র নহে যে ইহাতে মনকে নিরন্তর আবরিত রাখিয়া মোহকর বিষয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। অগ্নিসেবন প্রভাবে শীত সহ্য করা যেরূপ সহজ, তীর্থে বাস করিয়া মোহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাও প্রায় তদনুরূপ। বৈরাগ্য শিখিবার জন্য কখন কিছুকাল লোকালয় ত্যাগ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু সময়বিশেষে নিরালয় হইবার পরিবর্ত্তে যদি নিরন্তর অরণ্যে বাস করিতে হয় তবে বৈরাগ্যের সার্থকতা

*—"The imperial votaress passed on.
In maiden meditation, fancy-free."

কোথায় থাকে ? এরূপ বৈরাগ্য বিরাগীর মনে আশ্রয় করে না। এই মর্কট বৈরাগ্য মর্কটের ন্যায় কেবল জীবনবৃক্ষের শাখাপ্রদেশে বিচরণ করিতে থাকে।

অতঃপর দেখা যাউক যে ভারতবাসীগণ তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় ব্যক্তিকে কি শিখাইয়াছেন। কেবল তৈলঙ্গস্বামী কেন, আমি যে শিক্ষার কথা মনে করিতেছি তাহা তুমি আমিও কিছু কিছু শিখিয়াছি। ভারতবাসীরা মর্কট বৈরাগ্যের সমাদর করেন না। তাঁহারা যে বৈরাগ্য ভালবাসেন তাহা স্থিরচিত্তে বুঝা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ইহার মধ্যে যজন এবং যাজন লইয়া প্রথমতঃ বিচার করা যাউক। যজন দ্বিজমাত্রেরই অধিকৃত, যাজন এক ব্রাহ্মণ বর্ণেরই ব্যবসা। যজন স্বাধীন কার্য্য; যাজন করিতে যজমান কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক। যাজ্ঞিক যজমানকে অনেক বিষয় শিখাইতে পারেন তথাপি উভয়ের স্বরূপ সম্বন্ধ এই মাত্র যে যজমান নিজে যজ্ঞ করিলে যাহা করিতেন, যাজ্ঞিক প্রতিনিধি পদে কেবল তাহাই করিবেন অতএব যাজন করিতে হইলে যাজ্ঞিককে মানিতে হয় আমি যজমানের অধীন। অথচ দেখিতে পাই যাজ্ঞিক যজমানের নিতান্ত পূজনীয়। ইহার মর্ম্ম কি ?

যজমান স্বয়ং যজ্ঞ করিতে সক্ষম অথচ তাহা করেন না, কিঞ্চিৎ দক্ষিণামাত্র দান করিয়া সফলকাম হন। যাজ্ঞিক যজমানের আজ্ঞাধীন এবং দানগ্রাহী, অথচ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। যজমান ইচ্ছা করিলেই যজনকার্য্য হইতে অবসৃত হইতে পারেন। যাজ্ঞিকও ইচ্ছাপূর্ব্বক যাজনে ব্রতী হন। উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও আদান প্রদান হইয়া থাকে। সেই দক্ষিণাই কি এই বন্দোবস্তের মুখ্য বিষয় ? কেহ কেহ তাহাই মনে করে বটে। বাস্তবিক কথাটা বিচারসাপেক্ষ। ব্রাহ্মণের পক্ষে অর্জ্জিত দক্ষিণা, স্বীকৃত কষ্টের সহিত তুল্য মূল্য হইয়াছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না সত্য। কিন্তু কিসে তুল্য মূল্য হইল ! যখন ব্রাহ্মণেরা দ্বিজগণের যাজনবৃত্তি স্বীকার করেন তখন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়াছিলেন, না দারিদ্র্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ আশঙ্কা ছিল না, এবং অন্য কোন কারণবশতঃ যৎসামান্য দক্ষিণাতেই স্বীকৃত কষ্টের পরিশোধ হইল জ্ঞান করিয়াছিলেন। দক্ষিণা যাজনের মূল্য, না অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে বৈরাগ্যের আর একটী প্রমাণ ? অপর কেবল যাজনেই বা বৈরাগ্যের কি লক্ষণ আছে ?

ব্রাহ্মণকে অক্ষম বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ যে কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দক্ষিণার প্রয়াস করিয়াছিলেন এ কথা বলা যায় না। আমি যে

সময়ের কথা মনে করিতেছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক নতুবা স্বরূপ অবস্থা অনুভূত হইবে না। পরশুরাম এক সময়ে ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করার কথাতে অত্যুক্তি থাকিলেও মানিতে হইবে যে ঐ সকল ঘটনার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অপর, ব্রাহ্মণের যুদ্ধব্যবসা বিষয়ক যে নিষেধ এখনও বলবৎ রহিয়াছে তাহার আরম্ভ পরশুরামের সময় হইতে, একথা বলিলে অযথা উক্তি হইবে না। অতএব পরশুরামের অস্ত্রধারণকে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের মধ্যে একটী বিপ্লবকারী ঘটনা মনে কর। ব্রাহ্মণবর্ণ তাহার পূর্ব্ব হইতেই যাজন বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। নতুবা পরশুরামের কার্য্যকে ব্রাহ্মণের পক্ষে অসাধারণ মনে করিবার স্থল দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের যাজন স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাগ এই দুটী ঘটনার মধ্যে পরশুরামের সময়ের বিপ্লব ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ যাজন স্বীকার, পরে ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ, তদনন্তর কেবল যাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং যুদ্ধত্যাগের বন্দোবস্ত। পরশুরামের গল্প এবং ব্রাহ্মণের ব্যবসা বিষয়ক স্মৃতি এতদুভয় হইতে প্রাগুক্ত ক্রম অবধারিত করিতে পারা যায়।

এখন মনে কর যে যাজন স্বীকার এবং যুদ্ধত্যাগে বৈরাগ্য বিষয়ক কি কি লক্ষণ বিদ্যমান আছে। যাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে যাজন স্বীকার অনন্য গতি হইতে পারে। কিন্তু যাহারা ধনুর্ব্বান চ্যুত হয় নাই তাহারা যে ভিক্ষা স্বরূপ দক্ষিণা লাভের চেষ্টা করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ দক্ষিণা বিষয়ক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তৈল বটের লোভ এখন যতই প্রবল হউক প্রথম অবস্থাতে সেরূপ ছিল না। ফলতঃ কুল পুরোহিতের সহিত গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (প্রাচীন পরিষদ ?) যেরূপ সম্বন্ধ এবং দক্ষিণার পরিমাণ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহা দেখিয়া অনুমান হয় এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন অথবা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের বৈরাগ্য বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রাম সম্বন্ধে অনেক স্থানের প্রথানুসারে পুরোহিত উৎপন্ন শস্যের ভাগ পান। অহিন্দুগণ মধ্যেও কোন কোন দেশে উৎপন্নের দশমাংস যাজকের নিয়মিত প্রাপ্য। কিন্তু দক্ষিণা বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কঠিন নিয়ম নাই। যাঁহারা নিয়ম করিয়া অন্য বর্ণকে যাজন হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, তাঁহারা যে এরূপ কোন নিয়ম করিতে কিম্বা উল্লিখিত প্রথা বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেন না, একথা মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ ধান দূর্ব্বা, কিম্বা একটী হরীতকী পাইলেও সন্তুষ্ট। অতএব দক্ষিণা ও যাজনের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণের দারিদ্রের ফল নহে, দারিদ্রের হেতু।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বানপ্রস্থ আশ্রয় নিষিদ্ধ নহে। এক সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ সকল বর্ণই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে বটে। তথাচ

মানিতে হইবে যে বানপ্রস্থ হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতেও সপ্রমাণ হইতেছে যে দারিদ্র্য স্বীকার ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন কার্য্য হইয়াছিল, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগত্যা শ্রেয়ঃ হইয়াছিল এমত বলা যায় না। অতএব পরশুরামের পুর্ব্বে ব্রাহ্মণের যাজন অবলম্বন প্রগাঢ় বৈরাগ্যের প্রমাণ।

এই বৈরাগ্যের সার মর্ম্ম এই মাত্র।—অন্যান্য বর্ণ যজন কার্য্যে অধিকারী হইলেও তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম ছিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আজন্ম-কাল যজন করিয়া যাজন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব যজমানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করাতেই স্বভাবতঃ পুরস্কৃত হইলাম মনে করিয়া দক্ষিণা বিষয়ে এত ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ দাতার অভিরুচিকেই এতদ্বিষয়ের নিয়ামক করাতে ব্রাহ্মণেরা গভীর ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিযাছেন।

শুকদেব, ধ্রুব, রত্নাকর ইত্যাদি বৈরাগ্যের আদর্শ স্বরূপ। উহাতে উপাখ্যানলেখকদিগের রচনা কৌশল যথেষ্ট দেখা যায়। তৈলঙ্গস্বামী সেই আদর্শেরই অনুকরণকারী বটে। মর্কট বৈরাগ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের লাঘব হয় না। কিন্তু যাজনবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের সাক্ষী। এই সাক্ষীতে সন্দেহ করিবার স্থল নাই।

যুদ্ধত্যাগ

ব্রাহ্মণেরা যাজন স্বীকার করিবার কিছু দিন পরে, পরশুরামের সময়ে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধ্যে ঘোরতর বিরোধ হইয়াছিল। ইতিহাসের কথা এই যে, সেই বিরোধে ক্ষত্রিয় বর্ণ পরাজিত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরাই ইতিহাস লেখক। অতএব এই বিরোধে ব্রাহ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে জয়ী হইয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহ করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্য এই যে, জয়লাভ না করিয়া থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণের সামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয় নাই। মনে কর, ব্রাহ্মণেরা পরাজিত রাজপদচ্যুত এবং ক্ষত্রিয়ের নিকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে পরাজয়কারী ক্ষত্রিয় যাজন হইতে নিবারিত হইলেন কাহার দ্বারা? এই নিষেধ বিষয়েত কোন সন্দেহ নাই। অতএব যে দিক হইতে দেখ ব্রাহ্মণের যাজনবৃত্তি বিশেষ মহত্ত্বের লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ হইবে।

পরশুরামের সময় অবধি ব্রাহ্মণ যুদ্ধ কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বীতরাগ হন। আজিকে হিন্দুগণ ভীরু বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে, সুতরাং যুদ্ধত্যাগের গুণ কীর্ত্তন করিতে ভয় হয়। কিন্তু যুদ্ধ সৎকর্ম্ম বলিয়া গণনীয় নহে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত

যুদ্ধ অগত্যা স্বীকার করিতে হয় বটে, তদ্ভিন্ন অরাজকতা দোষ নিবারিত হইতে পারে না। কিন্তু বলপূর্ব্বক এবং নরহত্যা সঙ্কল্প করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ নিমিত্ত যুদ্ধ করা কোন মতেই প্রশংসনীয় নহে। যখন ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ ব্যবসা পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহারা ভীরু বলিয়া পবিগণিত হন নাই। যাঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন তাঁহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ কার্য্যে প্রাণপণ করা কঠিন বোধ হইয়াছিল বলিতে পারি না। ক্রোধ উপস্থিত হইলে সহজেই জীবনের প্রতি মমতা খর্ব্ব হইয়া যায়। অতএব যুদ্ধার্থীর জীবন ত্যাগ সংকল্প সন্ন্যাস অপেক্ষা কঠিন নহে। ক্রোধ, সংহারবৃত্তি, অন্য কি বাহুবলও যুদ্ধের প্রধান উপকরণ নহে। যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সাহস, লোকবল, এবং লোকবল সংগ্রহ করিবার কৌশল। উপস্থিত বিচারে লোক বলের কথা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সন্ন্যাসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও সাহসের অভাব নাই। অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণের ন্যূনতা দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের কঠোর সঙ্কল্প মনে করিলে কখনই ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি না। ফলতঃ যাঁহারা চতুর্থাশ্রম অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই যুদ্ধ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য, ধন এবং গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধকার্য্য হইতে অপসৃত হওয়া সহজ হয় নাই। আর যদি ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াও ব্রাহ্মণেরা এই ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের মহত্ত্ব চিন্তা করিয়া উঠাও কঠিন হয়।

পরশুরামের বৃত্তান্ত কাল্পনিক হইলেও এই কথার অন্যথা হইবে না। পরশুরামের সময়ে না হইলেও কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ যুদ্ধত্যাগ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এবং কেবল একবার ত্যাগ নহে, সেই ত্যাগ হইতে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ এতদ্বিষয়ে একবারে নিস্পৃহ হইয়া আছেন।

এই বৈরাগ্য নিশ্চেষ্টের লক্ষণও বলিতে পারিনা, কেননা যাজন কার্য্যে ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ এত উন্নতি করিয়াছিলেন যে অপর এক সময়ে যুদ্ধার্থী বিশ্বামিত্র শান্তপ্রকৃতি বশিষ্ঠের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, এবং তদনন্তর যুদ্ধব্যবসা ও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

অধ্যাপন

আদ্যকালে ব্রাহ্মণবর্গের মহত্ত্ব তিন বিষয়ে প্রকাশ হয়। যাজন, অধ্যাপন এবং যুদ্ধত্যাগ। ইহার প্রথম ও তৃতীয়টীর মধ্যে সময়ের অগ্র পশ্চাৎ ছিল মনে হয়। এবং এই দুটী বিষয়ের কথাই এতক্ষণ বলিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপনাই বোধ হয়

উভয়ের মূলাধার। যিনি যজন বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাকেই যাজনের ভারার্পণ করা সম্ভবপর মনে হয়। সে যাহা হউক, অধ্যয়ন বিষয়ে সম্যক উৎকর্ষ লাভ না হইলে অধ্যাপন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ সম্ভবে না। অতএব অধ্যাপনের মাহাত্ম্য দেখাইলে আর অধ্যয়নের কথা পৃথক রূপে ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা থাকে না।

যজন এবং যাজন মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাজনে যজমান ও যাজ্ঞিক পরস্পরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। অধ্যাপনাতে কেবল বন্দোবস্ত করিলেই হয় না। ইহার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের কোন ব্যক্তি যদি অধ্যাপনা কার্য্যে সমর্থ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে নিবারিত রাখা সুসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশ স্থলে শিক্ষার্থীকে নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত দুষ্কর। তদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা নিকৃষ্ট বর্ণের নিকটেও যে কখন কোন উপদেশ গ্রহণ করেন নাই এরূপ কথা প্রমাণ করাই অসাধ্য ; এবং মনে করাও সঙ্গত নহে। যাজনের নিদান যজন। যাজকের বিশেষ লক্ষণ যজ্ঞকর্ত্তার প্রতিনিধিত্ব। যজমানের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাঁহার প্রতিনিধি সহজেই সেই কার্য্য অনুসারে যাজন করিতে পারেন। এরূপ স্থলে যাজকের বিশেষ অর্থলাভ না দেখিলে ত্যাগ স্বীকারই মানিতে হয়। অধ্যাপনেও যাজনের ন্যায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার আছে। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপনা করিতে পারিবেন আর কেহ পারিবেন না, সক্ষম হইলেও পারিবেন না এরূপ ব্যবস্থা, ত্যাগ স্বীকারের লক্ষণ নহে। যাজনও ব্রাহ্মণের একচেটিয়া বৃত্তি বটে এবং স্থলবিশেষে যাজন অধ্যাপন উভয় একচেটিয়াই তুল্যরূপে দূষিত হইতে পারে। কিন্তু অধ্যাপনার পথ খোলা থাকিলে যাজন বিষয়েও শিক্ষা দান চলিতে পারে এবং যাজকের একচেটিয়ার দোষ বিমুক্ত হয়। যাজকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে অবরোধ আবশ্যক হয় বটে। কিন্তু পারদর্শী ব্যক্তির অধ্যাপনা জনমাত্রের প্রতি নিষিদ্ধ করিলেও অনন্ত ক্ষতি হয়। ফলতঃ যাঁহারা অনন্যরূপে অধ্যাপনা করিবেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণরূপে পূজিত হইবেন এরূপ নিয়ম হইলে আর এই বন্দোবস্তের বিন্দুমাত্র দোষ থাকিত না। কিন্তু একথা তখন মনে হইবার সময় হয় নাই।

অধ্যাপনার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন। কিন্তু অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কি ? এরূপ প্রশ্ন ইংরাজিতেই ভাল শুনায়। কিন্তু ভারতের চরমকালে এ প্রশ্নও শুনিতে হইয়াছে ! শিক্ষকের সকল যন্ত্রণা সহ্য হয় কিন্তু শিষ্যের মুখে আপনার উপদিষ্ট কথা উপদেশের আকারে শুনিতে হইলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। অধ্যয়নের উদ্দেশ্য অর্থলাভ নহে একথা হিন্দুগণের চির পরিচিত। ইহা বাঙ্গালাতে লোকের বিদিত করিতে হইলে বাচালতা জন্য লজ্জা বোধ হয়।

ইদানী লোকের সংস্কার এইরূপ হইয়াছে যে যজন ও ধর্ম্মালোচনা মনুষ্যের একটা অলঙ্কার বিশেষ। ঘড়ি যেমন পর্ব্ব উপলক্ষে বাহির করিতে হয়, ময়রার দোকানে সন্দেশের মাঝখানে বসাইতে হয়, দেয়ালের গায়ে ছবির সঙ্গে রাখিতে হয়, এবং সোণার শিকলি দিয়া টেঁকে ঝুলাইতে হয়, ধর্ম্মও সেইরূপ হলফ্ পড়িবার সময়ে বিস্মরণ করিতে হয়। সে যাহা হউক আমার এখানকার বক্তব্য কথা এই যে ধর্ম্মালোচনা এবং অধ্যয়ন বিভিন্ন করা এ কালের সূক্ষ্মবুদ্ধি। এই ভেদ অপ্রমাণ করিতে হইলে আমাকে বিষ্ণু বলিয়া একটা নূতন প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। আরও অনেক দোষ ঘটিবে। অতএব সে কথায় কাজ নাই। আমার কলম বলিয়া আমার মতটাই গ্রাহ্য করিলাম।

ধর্ম্মালোচনা ও অধ্যয়নের অভেদ প্রকৃতি স্বীকার করিলে যজন এবং অধ্যাপনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজেই উৎপন্ন হইবে। আর, মাষ্টার মহাশয়েরা রাগ করিবেন না, কিন্তু যদি নির্ভয়ে বলিতে পাই তবে বলিব যে, তাঁহারা এইটা বুঝেন না বলিয়াই এখানকার বংশধরেরা এত কীর্ত্তিমান হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম মতে ধর্ম্মালোচনার সারভাগ বৈরাগ্য। বিদ্যার্থী প্রথম হইতেই ব্রহ্ম-চর্য্যের সঙ্গে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন, এবং অধ্যয়নকালেই উহা প্রগাঢ় হইয়া অধ্যাপকের চরিত্রে আশ্রয় করিবার কথা। অতএব হিন্দুর বৈরাগ্য অধ্যয়ন কাল হইতে আরম্ভিত হইয়া যজন যাজন এবং অধ্যাপন সকল কার্য্যেই ব্যাপ্ত হইত বলিতে হইবে। নব্য সম্প্রদায়ও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য শিখিলে বোধ হয় পরিণামে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। অন্ততঃ নিতান্ত টিকি ওয়ালার সঙ্গে অধঃপাতে যাইবেন না—এ কথার সন্দেহ নাই।

যাজন আর অধ্যাপন পরস্পর সম্বন্ধ। এই পর্য্যন্ত বলিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সাহস হয় না। বোধ হয় অধ্যাপন হইতে যাজনের সূত্রপাত; রাজ্য ও যুদ্ধত্যাগ হইতে উভয়ের প্রাধান্য এবং যাজনের প্রাধান্য হইতে অধ্যাপনার অবনতি হইয়াছে। অধ্যাপনার পুনরুন্নতি ব্যতীত ভারতের মঙ্গল নাই। এই উন্নতি, কৌশলে সুসিদ্ধ হইবে না। দক্ষিণা বাড়াইবার বন্দোবস্ত ইহার সহকারী নহে। অর্থলোভীর অধ্যাপনা—চিনেবাজারের যোগ্য। ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাতে যেটুকু স্বার্থপরতা ছিল মনে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু উহাতে অর্থলোভ ছিল না, এই জন্যই সহস্রবার ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতে ইচ্ছা করে; থানায় পড়িয়া আছে দেখিলেও যজ্ঞোপবীতধারীর সম্মান করিতে ইচ্ছা করে। অধ্যাপনার নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া যাজনের মাহাত্ম্য বুঝা আবশ্যক। লার্ড বিশপের যাজন আর ব্রাহ্মণের যাজনে অনেক প্রভেদ। সন্ন্যাসাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণেরা বৈরাগ্য বিষয়ে যতই অযথা কার্য্য

করুন না কেন, যাজন অধ্যাপন ও যুদ্ধত্যাগ বিষয়ে তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য কখনই ভুলিব না।

এখন একবার আমার বিরুদ্ধ পক্ষের কতকগুলি কথার আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজা প্রজাপালন করেন। প্রজাপালন বলিতে রাজ্যের মধ্যে যে সকল ক্ষতি কি মঙ্গলাভাব ঘটে তাহার প্রতীকার আর রাজ্যের বাহিরের বন্দোবস্ত—যথা যুদ্ধ বাণিজ্যাদি—বিষয়ক সন্ধি। রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবস্থা মধ্যে গুরুতর ভেদ মনে হইতে পারে, কিন্তু এক বিষয়ে উভয়ই সমতুল্য। বাহিরে অধিকার বিস্তার কিম্বা আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার নিগূঢ়পন্থা বলপ্রয়োগ। আর আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তের অন্তিম উপায়ও সেই পদার্থ। বলপ্রয়োগের আতিশয্যে নানা দোষ হয় তাহা সকলেরই স্বীকৃত কথা বটে। কিন্তু উহাতে কিছু মাত্র শুভ নাই ইহা স্বীকার করি না। পিনালকোডের আসল পদার্থটা একেবারে মন্দ বলিতে কাহার সাহস হয়? সত্য, এই আইনের ধারার সংখ্যা এবং দণ্ডের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল এ কথা কেহ বলিবে না। নতুবা সকল অপরাধের দণ্ড ফাঁসি বলিলে আরো সুলভ হইত। তথাচ পিনালকোডের আসল পদার্থ পুলিস। পুলিসের বেটনের মধ্যে সাঙ্গিনের আত্মা। সাঙ্গিনের সম্বন্ধ কেবল পিনালকোডের সঙ্গে নহে। ডিক্রীজারীর নিয়মও ঐ কোডের কনিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং উহাতেও সাঙ্গিন ঝিকমিক্ করে। ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীতে ফৌজ, তোপ, বারুদ, বেটন এবং জেল, অরাজকতা নিবারণের অব্যর্থ সন্ধান। ইহা সমস্তই বলপ্রয়োগের অঙ্গ। ইহাতে যে কোন দোষ থাকে তাহার একমাত্র প্রতীকার পার্লিয়ামেণ্ট আর (স্থল বিশেষ) ক্যাবিনেট। কিন্তু ইহার সমস্তই দোষ এ কথা স্বীকার করি না।

এইরূপ কথার উপরে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বপক্ষ আরো বলিতে পারেন আমাদের দেশের প্রাচীন কালীন ফৌজ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বটে। কিন্তু তখনকার প্রহরী আর এখনকার পুলিসের মধ্যে বোধ হয় বড় ভেদ নাই। কারাগার বলিতে চূণের গুদাম ব্যতীত আর কিছু মনে না হইতে পারে, এবং তাহাতে ইদনীন্তন জেলখানার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন দেখিতেছি আমাদিগের রাজা ছিল, ফৌজ ছিল, পুলিষ ছিল, তখন দেখিতে হইবে যে প্রাচীন জজ, মেজেষ্টর, পুলিষ ইনস্পেক্টর-জেনেরল আদি কি প্রণালীতে পরস্পরের সহযোগীতা করিতেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতার

মূলীভূত কারণ বলপ্রয়োগ ভিন্ন আর কি? এই অনুসন্ধানে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য ধরিয়া এতদ্বিষয় পুরাবৃত্ত স্থির করা সহজ নহে। তথাচ প্রচলিত প্রথা অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে জজ্ মেজেষ্টরের কতক কার্য্য ব্রাহ্মণেরই চতুষ্পাটী হইতে নির্ব্বাহ হয়। আইনের তর্ক টোলেই মীমাংসিত হয়। ক্ষত্রিয় রাজা দণ্ডাজ্ঞা দিলেও চতুষ্পাটী এবং অধ্যাপক মহাশয়দিগের অধিকার যায় না। রাজা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরই আজ্ঞা পালন করিতেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মণই রাজা, ক্ষত্রিয় সেবক মাত্র। ব্রাহ্মণেরা শ্রুতি অধ্যাপন করিতেন, স্মৃতি লিখিতেন, টোলের ব্যবস্থা দিতেন; এবং হাতিবাগান নবদ্বীপ হইয়া অবশেষে কাশী পর্য্যন্ত আপীল হইত। সুতরাং তৈলঙ্গস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তক্তপোষ বাজাইয়াই * রাজ্যের আভ্যন্তরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরশুরাম ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করাইয়াছেন বটে। কিন্তু যেমন গবর্ণর-জেনেরল হইলেই কমাণ্ডর-ইন-চীফের কার্য্য করিতে হয় এমন নহে, অথচ তাঁহাকেও বন্দুক অবলম্বী বলা যাইতে পারে; সেইরূপ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণেরা নিরস্ত্র হইয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের কলমেই সর্ব্বপ্রকার বলপ্রয়োগ প্রবিষ্ট আছে, এবং সেই বলপ্রয়োগদোষ হইতে তৈলঙ্গস্বামীও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অতএব যুদ্ধত্যাগে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য কিছুই নাই।

এই কথাগুলি পূর্ব্বপক্ষের। আমি যে প্রকারে বলিলাম তাহা স্বরূপ হইল কি না বলিতে পারি না। যাঁহারা ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য অস্বীকার করেন তাঁহারা এই প্রণালীতে তর্ক করিতে পারেন। আমি তাহা ভুল মনে করি। পূর্ব্বপক্ষের কথা লিখিতে যদি অযথা উক্তি হইয়া থাকে তবে আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি।

উল্লিখিত তর্কে ভুল এই। চতুষ্পাটী হইতে ব্যবস্থা আইসে সত্য। কিন্তু সেই ব্যবস্থা পালন করাইবার নিমিত্ত উপায়ান্তর আবশ্যক হয়। চতুষ্পাটী অপেক্ষা অধ্যাপকের আদেশ বলবৎ হইতে পারে না। অধ্যাপক স্থল বিশেষে কেবল সাক্ষী, কখন জুরীর অনুরূপ হয়েন। কদাচ মেজেষ্টর কিম্বা ডিক্রীজারীর হাকীমের কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে বলপ্রয়োগ নাই। অপর রাজসন্নিধানে কোন অধ্যাপকের মীমাংসা প্রবল হইবে তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণর-জেনেরল কমাণ্ডর-ইন-চীফকে পদচ্যুত করাইতে পারেন; জজ্ মেজেষ্টরের তো কথাই নাই। ভারতবর্ষীয় রাজা কিম্বা রাজক্ষমতাধারী ব্যক্তিরা অধ্যাপকের অধ্যাপনা বন্ধ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে হিন্দু রাজা, ব্যবস্থাদায়কের

* "তখন স্বামীমহাশয় একটু শব্দ করিলেন" বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১২৮২।

কথা না শুনিলেও তাহার প্রতীকার নাই। কার্য্যত রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ, ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতেন না বটে। কিন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বা ক্ষত্রিয়ের অধীনতা সপ্রমাণিত হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় একত্রে রাজ্য করিতেন বলা যাইতে পারে। এবং কেবল এই বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয়েরা অতি ধীরপ্রকৃতি; ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের মন্দকারী হন নাই। আর উভয়ের এইরূপ ঐক্য হইতে আর একটী কথা বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণেরা অতি সুবোধ ছিলেন; বুদ্ধি এবং প্রকৃতির গুণে বরাবর ক্ষত্রিয়কে বশীভূত রাখিয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বতন বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন, এবং ইদানিন্তন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ে একটু তুলনা করিতে ইচ্ছা করি। ভবশঙ্কর এবং অপর কতিপয় স্মার্ত্ত শ্যামবাবুর বিধবা কন্যার বিবাহের পক্ষে একটী ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন। পরে তদুপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয় এবং ভবশঙ্কর নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথের সহিত বিচারে জয়ী হন; হইয়া শাল পুরস্কার পান। অনন্তর বিদ্যাসাগব মহাশয় এই বিষয়ের প্রস্তাব করিলে ভবশঙ্কর প্রাগুক্ত ব্যবস্থাপত্র সত্ত্বেও তাঁহার মতের বিরোধী হইয়া প্রতিবাদ করেন। * বিদ্যাসাগব প্রাচীন নিয়ম পবিত্যাগ করিয়া ছাপাতে বিচার কবিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতিপক্ষগণের ছাপা বন্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন পূর্ব্বক আইন জারি করান। বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে কিন্তু উহা হিন্দু-সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য হয় নাই। শ্যাম বাবুও ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিবার পরে আর কিছু কবিতে পারেন নাই।

বিজ্ঞানেশ্বব ও জীমূতবাহন দায়বিভাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত নাই। কিন্তু উভয়ে একই শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন, সুতরাং একজনের যে ভুল হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ এখন উভয়ের মতই প্রবল। এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের সাহায্য সত্ত্বেও বিফল প্রয়াস হইয়াছেন। আর ভবশঙ্কর দুপক্ষে গাইয়া দুবারই জয়লাভ করিয়াছেন। বিদ্যা-সাগরমহাশয় যদি জীমূতবাহনের ন্যায় কিম্বা রঘুনন্দনের ন্যায় চাল চালিতে পারিতেন তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে বিফল হইলেও বিধবা-বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বীতা এত প্রবল হইত না। ভবশঙ্কর প্রথম বিচারে জয়ী হওয়াতেও তাঁহার ব্যবস্থা কেন প্রবল হয় নাই তাহা ব্যক্ত নাই। বোধ হয় শ্যামবাবু সমাজপতি ও আপন দলের সহকারীতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে শ্যামবাবু কিম্বা তাঁহার কোন মুরুব্বি যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতেন

---

† বিধবা বিবাহ বিষয়ক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ দেখ।

তবে আর বিধবাপতিগণের একঘরে হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং একবার চলিয়া গেলে প্রথা বন্ধ করাও সহজ হইত না।

আমি বিধবাবিবাহের সপক্ষ নহি। এবং ঐ বিষয়ে কোন দোষ গুণ ধরিতেও চাহি না। উল্লিখিত উদাহরণ হইতে এতদ্দেশের শাসনপ্রণালীর ব্যাখ্যামাত্র করিতেছি। বিদ্যাসাগর ঐ প্রণালী উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রণালীটির নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে শাস্ত্রীয় বিচার হিন্দুগণের সভাতে (পরিষদ ?) ভিন্ন আদালতে কি লেজিসলেটিব কৌন্সিলে হইতে পারে না। হিন্দু ভিন্ন হিন্দুর আইন করিতে পারে না। ভবশঙ্কর যখন প্রথমবার জয়লাভ করেন তখন কেহ মীমাংসক পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু পুরস্কারটা বোধ হয় কোন ধনাঢ্য কায়স্থ দিয়া থাকিবেন। অন্ততঃ বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। বর্ত্তমান কালে এ কথার প্রমাণ দেওয়াও আবশ্যক নহে, এবং পুরস্কর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণব্যবসানুসাবে তিনি এই কার্য্য করেন নাই। ফলতঃ ভবশঙ্কর ও তাঁহার পুরস্কর্ত্তার সাহায্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে সম্ভবতঃ সেই সময়ে হইতে পারিত। তাহাও সন্দেহের স্থল। কেন না অধ্যাপকের ব্যবস্থা গ্রামস্থ যজমানবর্গের সম্মতি ব্যতীত প্রতিপালিত হয় না। ঐ যজমানবর্গকে বশীভূত করা একাকী ব্যবস্থাদাতার কার্য্য নহে। ভবশঙ্করের পুরস্কর্ত্তা পুরস্কার দিলেন বলিয়াই যে গ্রাম্যসম্প্রদায় নিরস্ত হইয়াছিলেন এ কথা সহসা বলা যায় না। তবে নবদ্বীপের বিচারে জয় লাভ করাতে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা বলবৎ হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল এই মাত্র। গ্রাম্যসম্প্রদায় কতকদূর পার্লিয়ামেণ্টের সদৃশ বটে কিন্তু প্রভেদ এই যে, পার্লিয়ামেণ্টকে হস্তগত করিতে পারিলে পাদবি সাহেবেরা কিছুই করিতে পারেন না। গ্লাডষ্টোন যখন পার্লিয়ামেণ্টকে বশীভূত করেন তখন আয়রলণ্ডের প্রটেষ্টাণ্ট পাদরিরা সহজেই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেব বশীভূত করিয়া এবং আইন পাশ করাইয়াও ফল লাভ করিতে পারেন নাই। আর গ্রাম্যসম্প্রদায় ব্যবস্থাদাতার সহিত একমতাবলম্বী না হওয়াতে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিতে হইলে Lords temporal এবং commons স্থলে গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ও Lords spiritual স্থলে ব্যবস্থাদাতাগণকে পৃথকরূপে সম্মত করা আবশ্যক। ভবশঙ্কর যখন ব্রজবিদ্যারত্নকে পরাজিত করেন তখন অনেকগুলি ব্যবস্থাদাতা বিদ্যাসাগরের মতের ন্যায় মত স্বীকার করেন। সেই সময়েই আবার যদি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের দলও বশীভূত হইত তবেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারিত।

ভবশঙ্কর, জজ মেজেষ্টর পুলিষ কিছুই নহেন অথচ জজ মেজেষ্টর আদির অধীনও নহেন। কিন্তু ভবশঙ্কর তৈলঙ্গস্বামীর অধীন। তৈলঙ্গস্বামী একটী অঙ্গুলি নাড়িলে ভবশঙ্করের প্রথম ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হইত, এমন কি, শাল পুরস্কারও গোপন করিতে হইত।

এস্থলে আর একটী দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। দয়ানন্দ সরস্বতী, তৈলঙ্গস্বামী ও বিদ্যাসাগরের মাঝামাঝি আর এক জিনিষ। ইঁহার ক্ষমতাও ঐরূপ মধ্যমশ্রেণীস্থ।

অতএব আমাদিগের শাসনপ্রণালীতে অধ্যাপকের ব্যবস্থা বিষয়ে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাতে ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে কিছু মাত্রও বলপ্রয়োগ হয় না। এবং ঐ ব্যবস্থা যে গ্রাম্যসম্প্রদায় কর্তৃক বলবৎ হইয়া থাকে তাঁহারাও কোন অধ্যাপক বিশেষের অধীন নহেন। অথচ উভয়ের এক বাক্যেই এতদ্দেশের ধর্ম্মশাসন ও রাজশাসন চলিতেছে। বাস্তবিক উভয়েই পরস্পরের অধীন। এবং এই অধীনতাই উভয়ের বৈরাগ্যের সাক্ষী। হিন্দুসমাজের শাসনপ্রণালী অতি সুকৌশলপূর্ণ। উহা এখন অপাত্রে পড়িয়াই অনর্থের কারণ হইয়াছে। বাস্তবিক উহার বিধানমতে সুশিক্ষিত এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের উপরেই সকল দিক রক্ষা করিবার ভার রহিয়াছে। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আসিয়াছেন এবং ইহাতেই হিন্দুধর্ম্ম অন্য সমস্ত ধর্ম্মের বৈরী হইয়াও তাহাদিগের সারগ্রাহী হইতে পারে।

পরশুরাম নামমাত্র ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করেন নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবর্গকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। রাজকার্য্যের বাহ্যিক কি আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে যে যে স্থলে বলপ্রয়োগ করা আবশ্যক—ফৌজ তোপ বারুদ বেটন জেল—সমস্ত হইতে ব্রাহ্মণ বীতরাগ হইয়া আছেন। আর এইরূপ বীতরাগ হইয়া আছেন বলিয়া এখানে বিধবা বিবাহের আইন বহি মাত্র হইয়া আছে। ব্রাহ্মণের এই বৈরাগ্যের সম্মুখে দুর্দ্দান্ত গ্লাডষ্টোনও পরাজিত হইবেন; আয়র্লণ্ডের পাদরির উপরে তিনি যত জোর জোরাবরী করুন না কেন, তৈলঙ্গস্বামীর নিকটে পরাজিত হইতেই হইবে। দুর্ভাগ্য এই যে তৈলঙ্গস্বামী দধিভাণ্ডের বিচার করিতেই ব্যস্ত।

ইংলণ্ডীয় যাজক সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য ইংলিশমান সংবাদপত্রের একটী ধমকানী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

The Pastoral of the Bishop of Bombay on the subject of divorce,—is an extraordinary production.....No ecclesiastic

in India has ever given to the public such a plain declaration that they hold themselves, so far as the ceremonies of the Church are concerned, above the law of the land. We are well aware that as the law of England and India at present stands, it is left optional with any Clergyman to perform the marriage ceremony for a divorced person or not as his scruples may dictate....But Bishop Mylne went much further than this, for, referring to the law as it at present stands, he said:—

"When Parliament sanctioned this (the law about the remarriage of the adulterers), they set Christ on one side altogether. When they made it possible for any wicked woman to run away from her husband and children and be married to the partner of her guilt, they did not even pretend that this concession was sanctioned by our Lord ... Christ calls it adultery. The law of the land calls it marriage. I trust that Christians know which to believe. &c"

This is exactly the style of argument which we hear from the pulpit.....On such matters it is a mere waste of time to argue with a cleric of any persuasion.. ..But the Bishop of Bombay went far beyond mere discussion. ..and if he acts up to his expressed intentions he may find that much as he affects to despise the law he is still not beyond its reach. Towards the conclusion of his Pastoral he is reported to have said:—

"For my own part and duty, I hereby give public intimation that no persons who have contracted a marriage after one of them has been divorced for adultery, and during the lifetime of the wife or husband, can be admitted to the Lord's Table in this Diocese, so long as they continue to live together ; and that no clergyman who performs a marriage

ceremony for a person divorced for adultery, during the lifetime of the former wife or husband can continue to retain my licence to minister in this Diocese."

A few years ago, in England, a person who had been refused admission to the Lord's Table by the Vicar of a parish for an offence which was against the law, brawling in Church, brought an action for damaging his character against the Clergyman, and recovered damages. And should the Bishop of Bombay or any of his Clergy refuse to admit a divorced person, who is legally remarried, to the Lord's Table, they will find that they also have rendered themselves liable in a Court of law.....The Bishop is a paid servant of a State Church as established by law. (৪ঠা আগষ্ট ১৮৮২)

ব্যভিচার সম্বন্ধে টুপীওয়ালা ভায়াদিগের দৌড় এতদূর। সামান্য বিষয়ে যাজকের আজ্ঞা পালন করিতে হইলে বোধ হয় দুটা দশটা খুন হইত। যখন রোমান কাথলিক মতের সঙ্গে স্বয়ং পোপ রসাতল গিয়াছেন তখন আর বিশপ রেভরেণ্ড বাবাজিরা কোথায় লাগেন। কিন্তু ইউরোপীয় প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভুলিতেছেন বলিয়া ধর্ম্ম বিনাশ হইবে না। আর যতদিন ধর্ম্ম থাকিবে ততদিন ধর্ম্ম-শিক্ষকদিগকেও মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। অতএব দোহাই বাবু সাহেবেরা! গরিব ব্রাহ্মণকে পায়ে ঠেলিবেন না। ব্রাহ্মণ ব্যবসাটা অতি অমূল্য পদার্থ।

শ্রী যো
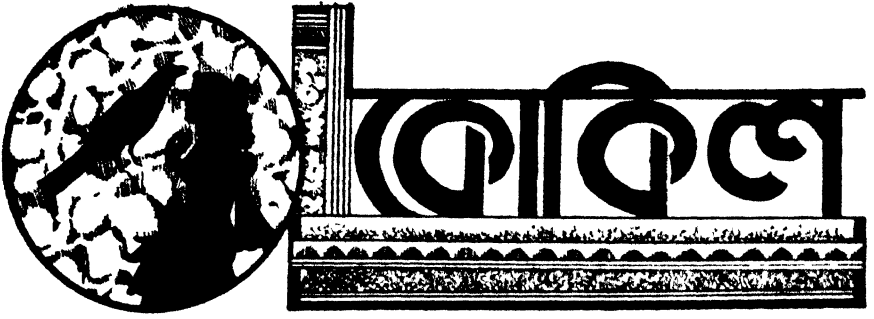
পৃথিবীতে দুঃখ এবং দুর্নামের ভাগই বেশী। মনুষ্যের ইতিহাসে ওয়াশিংটনের সংখ্যা খুব কম; অতিলা এবং জঙ্গিসের সংখ্যার শেষ নাই। কথাটা খারাপ বটে, কিন্তু ইহাতে রাগ বা বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে পৃথিবী প্রবল হইবারই কথা, স্বর্গ সর্ব্বদা কেমন করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে? তবে যে স্বর্গও দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল পৃথিবীর উপর আকাশ আছে বলিয়া। উপরে আকাশ না থাকিলে কাল মেঘে শাদা বিজলী খেলিত না। অতএব পৃথিবীতে যে এত লোক অপযশের ভাগী বলিয়া আপন আপন অদৃষ্টের দোষ দেয় সে বড় একটা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কেহ কেহ আছে যাহারা অনেক গুণের অধিকারী হইয়াও লোকের কাছে যথেষ্টরূপে পরিচিত নয়, যাহাদিগকে লোকে জানে কিন্তু চিনে না। তাহাদের যথার্থ দুরদৃষ্ট। তাহাদের মধ্যে কোকিল প্রধান।

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেননা কোকিল কাল। এ কথা স্বীকার করি যে নানা বর্ণচিত্রিত-সুকোমলপক্ষবিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। তাহাদের কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বালক ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবা ভুলে, কাহারো সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ ভুলে। কোকিল কাল—অতএব কোকিলের সে রকম সৌন্দর্য্য নাই। কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কাল জল সুন্দর, কাল মেঘ সুন্দর, কাল চুল সুন্দর। তবে কাল কোকিল সুন্দর নয় কেন?—কাল কোকিল কুৎসিত কেন? তুমি বলিবে:—কেন তা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, সেই জন্য বলি কাল কোকিল কুৎসিত। আমি বলি,—তুমি নিজে কুৎসিত; সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না, তাই কাল কোকিলকে

কুৎসিত দেখ। দেখ, কাল জল কাল বলিয়া সুন্দর নয়, তাহা হইলে এই যে কাল কালিতে লিখিতেছি ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কাল জলে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কাল জল সুন্দর। তেমনি কাল মেঘ অমৃতবৎ বারিবর্ষণ করিয়া কাল জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর, আর কাল চুল সুন্দরীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। কাল বলিয়া ভাল কেহই নয়। ভাল-র সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। কৃষ্ণ মোহিনীশক্তিরূপী বলিয়াই গোপকন্যারা তাঁহার কাল রূপে এত মুগ্ধ। ছেলে নাড়িছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কাল রঙ্ এত সুন্দর। সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের একটি প্রধান সূত্র এই—যাহা মনের সহিত গাঁথা, মন তাহার দোষটুকুতেই বেশী গুণ দেখে—তাহার যেটুকু কম সুন্দর সেইটুকুতেই বেশী সৌন্দর্য্য দেখে। যাহা সুন্দর নয় তাহাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। যাহা সুন্দর নয় তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর করে তাহাই সৌন্দর্য্য বোধের প্রকৃত ইন্দ্রিয়, কেন না তাহা জগতের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অগাধ সদ্ভাব স্থাপন করে—জগতের কদর্য্যতা নাশ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। সে ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, মন অথবা হৃদয়। কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর দেখি? তুমি বলিবে কিছুই ত নাই, তাহা হইলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটা মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

অনেক দিনাবধি কোকিল কবিদিগের সম্পত্তি। তাঁহারা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলা খেলাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখী। তাঁহারা কোকিলের কণ্ঠে একরাশি বিরহের বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিষম হাড়জ্বালানে পাখী করিয়া তুলিয়াছেন। আর সেই জন্যই আজিকাল বঙ্গীয় নব্য কবিদিগের মধ্যে যিনি কোকিলের নাম করেন তাঁহার ভাগ্যে বিধাতা উপহাস ভিন্ন আর কিছুই লেখেন না। এটি নব্য কবির দুরদৃষ্ট নয়; কোকিলের দুরদৃষ্ট। কবিরা বলেন যে কোকিলের স্বরে বিষ বই আর কিছুই নাই—যে মধু আছে তাহাও বিষমাখা। কোকিলের স্বর শুনিলে কেবল বিরহকাতরতা বৃদ্ধি হয় অথবা আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক হয়, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। এ কথা সত্য কি না আমি জানি না। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বই কি আর কিছুই নাই? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতোৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশূন্য, গ্লানি-শূন্য, সরল, নির্ম্মল, সুকোমল বালক, সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ

নিশিতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু উ কু-উ* করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে, আর তাহাকে ধরে কে? কোকিলের স্বরে বিষ কই? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে প্রদীপ্ত করিল; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিতদিঙ্‌মণ্ডলকে হাসাইয়া তুলিল; কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল; সমস্ত শিরায় রক্ত স্রোত ছুটাইয়া দিল; সর্ব্ব শরীরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-তাড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্বর্গীয় ঐন্দ্রজালিকের নিশ্বাস। আবার বালককে ছাড়িয়া বালসূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগণপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিত ভাবে একটু একটু অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে। ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কাণের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 'আর্' 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল —তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল ফুটিল বোধ হইতেছে। এমন সময় যেন সমস্ত ফোটনোন্মুখী পৃথিবীখানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল, আর একেবারে বনে পাখী পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্ব্বদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙ্গা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারি দিক ফরসা হইয়া গেল। কাল কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল। কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত! সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়! কোকিলের সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতোৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনি কেহ কখন বুঝিয়াছে কি না?

* কোকিল কুহু বলে না, কুউ বলে। কবিদিগের কু-হর হ কোকিলের নয়, বোধ হয় কবি মহাশয়দিগের হুহু বিশেষের হ।

† অধ্যাপক Monier Williams বিলাতী nightingale-এর সহিত তুলনা করিয়া আমাদের কোকিলের নিন্দা করিয়াছেন। আমি কখনও বিলাতেও যাই নাই, nightingale-এর গানও শুনি নাই। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে Monier Williams কখনও কোকিলের স্বর যাহাকে প্রকৃত শুনা বলে সেমন করিয়া শুনেন নাই। যদি তেমন করিয়া শুনিতেন তাহা হইলে তাহার নিন্দা করিতে পারিতেন না। যে স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট এবং স্ফূর্ত্তি ধ্বনিত হয়, সে স্বর কি তুলনায় হারে? না তাহার অপেক্ষা ভাল স্বর থাকা সম্ভব?

অসার, পরান্নভোজী, সম্মুখপ্রিয় চাটুকারকে লোকে 'বসন্তের কোকিল' বলিয়া গালি দেয়। লোকে কোকিলকে বুঝে না বলিয়াই এইরূপ গালি দেয়। এটা কোকিলের দুরদৃষ্ট নয় ত কি ? বসন্তে কাননের কি অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছে ! শীতের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের নবীন আলোকে চারিদিক ফুট্ ফুট্ করিতেছে। বিমল আকাশে কাননটি বেড়িয়া বেড়িয়া ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী সজীব দূর্ব্বাদলে আবৃত। তদুপরি নানাবর্ণশোভিত পতঙ্গ আনন্দে লাফাইয়া বেড়াইতেছে। বৃক্ষলতা নূতন সাজে সাজিয়া সরোবরের স্বচ্ছ জলে আপন আপন শোভা দেখিতেছে। নীলোজ্জ্বল আকাশ সমস্ত কাননটিকে অপূর্ব্ব আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, আলো, জল, আকাশ, পৃথিবী—সব ফুটিয়াছে। ফুটিয়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত হর্ষ, এই সমস্ত উল্লাস, এই সমস্ত স্ফোট—আকাশ এবং পৃথিবীর এই সমস্ত সঙ্গীতময় স্ফূর্ত্তি যেন ঐ কোকিলের প্রাণে প্রবেশ করিয়া তাহার কু-উ স্বরে অপূর্ব্বতানে নির্গত হইতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, পশু, পক্ষী, আকাশ, পৃথিবী,—আজিকার অপূর্ব্ব জগতের অপূর্ব্ব, উন্নত, পূর্ণবিকাশিত প্রাণ ঐ তরঙ্গিনী সদৃশ কু-উ ধ্বনিতে নির্গত হইতেছে—গলিয়া দিগ্ দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আজ বসন্ত—আজ জগতের এক দিন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত,—পৃথিবী পর্য্যায়ক্রমে এই কয়টি ঋতু ভোগ করিয়াছে। এই কয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপাদানে যে সকল গূঢ় পরিবর্ত্তন করিয়াছে বসন্ত ঋতু তাহার চরমফল। দশ মাস ধরিয়া পৃথিবী আজিকার অপূর্ব্ব বিকাশের দিকে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল। আজ সেই গতি চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই চরম সীমা অথবা সেই চরম বিকাশের নাম বসন্ত। বসন্তের কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই চরম বিকাশ স্বররূপে নির্গত হইতেছে। বসন্তের কোকিল নিন্দার পাত্র নয়। বসন্তের কোকিলের কু-উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি—অপূর্ব্ব বিকাশের অপূর্ব্ব বিজ্ঞাপনী ! কোকিল জগতের চরম স্ফূর্ত্তির গীত গায় বলিয়া জগতের চরমবিকাশরূপ বসন্তের পাখী। জগতে যত কিছু অপূর্ব্ব স্ফোট, অপূর্ব্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা, হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর, বীরশ্রেষ্ঠ নাপোলিয়, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর—সকলই এক একটি অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। বসন্তের কোকিল, তুমি বিকাশ গীত গাও, উন্নতির সঙ্গীত শুনাও, তথাপি তোমাকে কেহ এপর্য্যন্ত চিনিল না ! ভারতবাসী তোমাকে যে দিন চিনিবে, যে দিন তোমার অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির মর্ম্ম বুঝিবে এবং মর্ম্মে মজিবে, সেই দিন ভারতের উন্নতির সূত্রপাত হইবে, জীবন-

সঙ্গীতের প্রথম তান শুনা যাইবে। এক তানাত্মক শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ কাহাকে বলে ভারতবাসী সেই দিন বুঝিয়া তাহার অতুল সৌন্দর্য্য অধিকার করিবার জন্য উন্মত্ত হইবে। সেই দিন বসন্তের কোকিলকে নিন্দা না করিয়া ভারতবাসী বসন্তের কোকিল হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। বসন্তের কোকিলকে কেহ কখন বুঝিয়াছে কি?

আবার কোকিলের একটা পঞ্চম আছে। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় বনের ভিতর একটা কু-উ-র উপর আর একটা কু-উ চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরো চড়িয়া উঠিল, তার উপর আর একটা কু-উ আরো চড়িয়া উঠিল। শেষে আরো কত চড়িয়া উঠিল ঠিক করিতে পারিলাম না। শিশুর পর বালক, বালকের পর যুবা, যুবার পর সুযোগ্য মানুষ। অগ্নির পর বায়ু, বায়ুর পর জল, জলের পর জমি, জমির পর মৎস্য, মৎস্যের পর সরীসৃপ, সরীসৃপের পর পশু, পশুর পর মনুষ্য। উন্নতির উপর উন্নতি, তার উপর আরো উন্নতি, তার উপর আরও উন্নতি। বিকাশের পর বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ, তার পর আরো বিকাশ। ক্ষুদ্র জগতের উপর বড় জগৎ, তার উপরে আরো বড় জগৎ, তার উপর আরো বড় জগৎ। ইহাই কোকিলের পঞ্চস্বরে ব্যক্ত হইতেছে, সুমধুর শব্দে ধ্বনিত হইতেছে, অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে নিনাদিত হইতেছে। উন্নতির পর উন্নতি, বিকাশের পর বিকাশ—ইহাই ত সঙ্গীতের তানের-উপর তান—সে তানের-উপর-তান কোকিলের পঞ্চম ভিন্ন আর কোথাও শুনা যায় না। কোকিলের পঞ্চম কে কবে বুঝিয়াছে? কোকিলের পঞ্চমের মর্ম্মে মজিতে না পারিলে, ভারতের উন্নতির পর উন্নতি, তার পর আরো উন্নতি, অবশেষে মানুষের প্রাপ্য চরম উন্নতি কখনই হইবে না। প্রার্থনা করি ভারত যেন কোকিলের ন্যায়, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গীতময় কল্পনার ন্যায়, পঞ্চমে উঠিতে সক্ষম হয়! প্রার্থনা করি আমাদের কোকিলকে আমরা যেন চিনিতে পারি! আমরা যেন কোকিলের পঞ্চমের ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তমে ফুটিয়া উঠি! আমরা যেন সেই সুমধুর গগনভেদী পঞ্চমের ন্যায় জগৎভরা সঙ্গীত হইয়া পড়ি!

নগরে কেহ কোকিলের কু-উ ধ্বনি শুনিয়াছ? প্রকাণ্ড জনপদ—বিস্তীর্ণ রাজধানী। রাজধানীতে অসংখ্য পল্লী; প্রত্যেক পল্লীতে অসংখ্য রাজবর্ত্ম; প্রত্যেক রাজবর্ত্মে অসংখ্য বাড়ী; প্রতেক বাড়ীতে অসংখ্য মনুষ্য। নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ। অসংখ্য গাড়ী ঘর্ঘরশব্দে চলিয়া যাইতেছে; অসংখ্য অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে; অসংখ্য কল বিষম শব্দে মানুষকে বধির করিয়া দিতেছে। পথে ভিখারী চীৎকার করিতেছে; পণ্যবিক্রেতা হাঁকিতেছে; যানবাহকেরা গোলমাল

করিতেছে; কেহ গান ধরিয়া উঠিতেছে। কোথাও বালক কাঁদিতেছে, প্রহরী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, শববাহক হরি হরি ধ্বনি করিতেছে। মানুষ গাড়ীর উপর পড়িতেছে, গাড়ী মানুষের উপর পড়িতেছে, মানুষ মানুষের ঘাড়ে পড়িতেছে। সমস্তই কোলাহল, সমস্তই গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা, সমস্তই অনিয়ম—কবির Chaos। এই Chaos, এই গোলমাল, বিশৃঙ্খলতার ভিতর কি শুনিলাম?—কু-উ! এখন বুঝিলাম ও কু-উ কি। অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে; চারিদিকে উল্কাপাত হইতেছে; সহসা ধূমকেতু দেখা দিতেছে, সহসা কোথায় চলিয়া যাইতেছে; সহসা নক্ষত্র নিবিতেছে, সহসা খসিয়া পড়িতেছে;—কি বিশাল বিশৃঙ্খলতা! রাজা ভিখারী হইতেছে, ভিখারী রাজা হইতেছে; প্রেমিক পিশাচ হইতেছে, পিশাচ প্রেমিক হইতেছে; দুরাত্মা মহাত্মা হইতেছে, মাহাত্মা দুরাত্মা হইতেছে—কি বিষম রহস্য, কি বিকট বিশৃঙ্খলতা! পর্ব্বত সমুদ্রে ডুবিতেছে, সমুদ্র পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; জনপদ অরণ্য হইয়া যাইতেছে, অরণ্য জনপদে পরিণত হইতেছে; এক প্রকার জীব অদৃশ্য হইতেছে, আর এক প্রকার জীব দৃষ্টিপথে আসিতেছে! কিছুই বুঝা যায় না, যেন সব গোলমাল, সমস্তই বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ঐ বিসৃঙ্খলতাময় নগরের কোলাহলভেদী কু-উ ধ্বনি এই ভাবে মন ভরিয়া দিতেছে যে বিশ্বের সমস্ত বিশৃঙ্খলতার মূলে ঐরূপ একটী কু-উ ধ্বনি আছে, যাহা অনিয়ম বলিয়া অবাক্ হইয়া দেখি তাহার অন্তরালে ঐ অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনির ন্যায় একটী অমৃতময় সঙ্গীতধ্বনি অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, প্রলয়ের তুফানের তলে মধ্যরাত্রির সুগভীর শান্তির সমতানে সুমধুর কু-উ ধ্বনি হইতেছে। যে সঙ্গীত, যে কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিলে মানুষের মন, মানুষের আত্মা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, নগরবাসী কাল কোকিলের কণ্ঠ হইতে সেই সঙ্গীত, সেই কবিত্ব নিঃসৃত হইতেছে। কোকিলের কু-উ স্বরে বিরহের বিষ নাই—তাহাতে কেবল ব্রহ্মাণ্ডের কবিত্বমূলক দুর্ভেদ্য রহস্যের অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি আছে। কোকিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মরূপ সঙ্গীত বা কবিত্বের কাল কবি। অতএব, ভারতসন্তানগণ, কোকিলের কাছে দীক্ষিত হও। কোকিল তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু বুঝিতে পার আর নাই পার, ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিও, নহিলে তোমরা মানুষ হইবে না, বিশৃঙ্খল হইয়া বিনষ্ট হইবে। কোকিল তোমাদিগকে ইহাও শিক্ষা দিতেছে যে তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর বিষম বিশৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু সে বিশৃঙ্খলতার মূলেও অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্ব আছে। তোমরা যখন সেই বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত বা কবিত্বে তোমাদের সমস্ত দেহ, প্রাণ, মন, আত্মা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি পুরাইতে পারিবে, তখনই

তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের স্ফূর্ত্তি (Culture) সম্পূর্ণ হইবে—তোমরা মানুষ হইবে ; তার আগে নয়। বসন্তের হাড়জ্বালানে কুৎসিত কোকিলকে গুরু করিয়া তাহাব শিষ্য হইতে পারিবে নাকি ? কাল কোকিল যে কবিত্বের কবি তোমরাও কি সেই কবিত্বের কবি হইতে পারিবে না ? না বলিও না, তাহা হইলে তোমাদের বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবে। ব্যাস-বাল্মীকিরূপ কু-উ ধ্বনির প্রতিধ্বনি বলিয়া কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।

৮
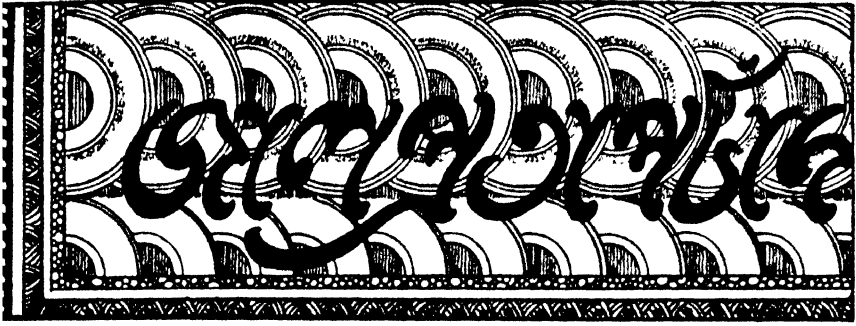
ওগলবি সাহেব আসামী

কাপ্তেন লিটিল সাহেবের যুদ্ধের পর কলিকাতার ইংরেজি কাগজে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা প্রকাশ হইল। ৮ই মে তারিখের হরকরা লিখিলেন যে, সিপাহীদের বুঝিবার দোষে কয়জন লোক আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু "The arrangements and proceedings of this officer (Captain Little) reflect equal credit on his judgement and humanity!" শেষ কথাটি বড় ঠিক।

জালরাজা সম্বন্ধে তাঁহরা কেহ কটু বলিলেন, কেহ রসিকতা করিলেন। কোরিয়ার (Courier) পত্রের সম্পাদক লিখিলেন, "There is a good chance of his closing eventful career, *an exalted character*. হরকরা তাহার টীকা করিয়া বুঝাইলেন যে, "exalted situation অর্থে বুঝিতে হইবে উর্দ্ধে ঝুলন। জালরাজা শেষে উর্দ্ধে ফাঁসি কাঠে ঝুলিবেন।" লোকে ভাবিল বিচার বটে! খুন করিল কোম্পানীর সিপাহী, ফাঁসি যাইবে জালরাজা।

এই সময় কে একজন, সম্পাদকদের ধমক দিয়া, হরকরায় লিখিলেন, আমি বিশেষ জানি, সে রাত্রে নৌকার নর্দ্দামা দিয়া রক্ত গড়াইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিল —ঘুমন্ত লোকের রক্ত—তোমরা তাহা ভুলিয়া কেবল কাপ্তেনের প্রশংসা করিতেছ, মেজরের প্রশংসা করিতেছ, এই ঘটনা যদি আজি ইংলণ্ডে হইত, তাহা হইলে সেখানকার সম্পাদকগণ কি বলিতেন? এই পত্রের পর সম্পাদকদের সুর একটু যেন ফিরিল, তদারকের নিমিত্ত তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ডেপুটি গবর্ণর রস সাহেবের আসন একটু টলিল, তিনি তদারকের হুকুম দিলেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তখন মেজেষ্টারদিগের উপর

একজন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নাম স্মিথ সাহেব। তদারকের ভার সুতরাং তাঁহার উপরেই পড়িল। কিন্তু তিনি অতি প্রধান পদস্থ ব্যক্তি। যখনই কিছু তদারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি একাল পর্য্যন্ত মেজেষ্টারকে তাহার ভার দিয়া আসিয়াছেন। এবারও তাহাই দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টার ওগলবি আপনার অপরাধের তদারক আপনি করিতে বসিলেন।

এদিকে কলিকাতায় জয়নারায়ণ চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি এফিডেবিড করিয়া সা সাহেবের খালাসের নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টের (writ of Habeas Corpus) পরওয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু সে পরোয়ানা ওগলবি সাহেব গ্রাহ্য করিলেন না। যতক্ষণ কথা হইতেছিল বাঙ্গালির রক্ত নৌকার নর্দ্দামা দিয়া গড়াইয়াছে, ততক্ষণ ওগলবি সাহেবের ন্যায় মেজেষ্টারের নিমিত্ত কোন ইংরেজের ভয় হয় নাই। আর যাই প্রকাশ হইল যে, সুপ্রিমকোর্টের পরওয়ানা এই মেজেষ্টার গ্রাহ্য করেন নাই, আর অমনি হরকরা লিখিলেন যে, তবে আমাদের আর রক্ষা নাই। "The British inhabitants of Bengal will now look with intense anxiety to the course which Sir Edward Ryan may adopt on this occasion. On him will depend in a great measure the degree of protection for life and property and freedom Europeans *not in the service* may expect. If it be once ruled that a Company's servant can hold a writ of *habeas corpus* at arm's length, no man is safe."

কিছুদিন পরে মেজেষ্টার সাহেব জামিন লইয়া সা সাহেবকে খালাস দিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই সা সাহেব ওগলবির নামে বেআইনি কয়েদ রাখার জন্য নালিশ করিলেন। এই মোকর্দ্দমার এজাহারে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সুপ্রিমকোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলি মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মফস্বলের অরাজকতা সম্বন্ধে সকলে একবাক্য হইলেন। সকলেই বলিলেন যে, ওগলবির নামে খুনের নালিস আনা উচিত, কিন্তু শেষ স্থির হইল যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কি করেন তাহা দেখিয়া পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মীমাংসা করা যাইবে। পুলিসে যে জোবানবন্দী হইয়াছিল, কৌন্সলিরা তাহার নকল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন।

স্মিথ সাহেব দেখিলেন যে, গতিক বড় ভাল নহে, সুতরাং বর্দ্ধমানে গিয়া কি একটা রিপোর্ট করিলেন। আমরা তাহা দেখি নাই, কিন্তু সেই রিপোর্ট পাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কিছুদিনের নিমিত্ত ওগলবি সাহেবকে সস্পেণ্ড করিলেন। বোধ হয় তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি ও কৌন্সলির দল সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা উদ্যোগ করিয়া ওগলবির নামে খুনের নালিস উপস্থিত করাইলেন।

এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে শাক্ত আর বৈষ্ণবে যেরূপ এই সময় দলাদলি ছিল, এদেশে ইংরেজদের মধ্যে কোম্পানীর চাকর আর অপর দলে প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সাহেবেরা কোম্পানীর চিহ্নিত চাকর (covenanted servants) তাঁহাদের অহঙ্কার ছিল যে আমরা এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা, আর কোন সাহেব আমাদের সমকক্ষ নহে। সুপ্রিম কোর্টের উকিল কৌন্সলিরা কোন মোকদ্দমায় মফস্বল আদালতে আসিলে এই হর্ত্তা কর্ত্তাদের যথেচ্ছাচারিতার কিছু ব্যাঘাত হইত, এবং তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধিও ধরা পড়িত, সুতরাং তাঁহারা কৌন্সলিদের চুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কোম্পানির কোন কোন জজ, আপন আপন নির্ভীকতা অথবা যথেচ্ছা ক্ষমতা দর্শাইবার জন্য কৌন্সলিকে কখন কখন তুচ্ছ করিতেন, তাঁহার মক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতেন, আইনকানন কিছু মানিতেন না, দেখিতেন না, শুনিতেন না। সুতরাং কৌন্সলিরা চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু অশ্রদ্ধা করিতেন। অপর সাহেবেরাও বিশেষ সম্ভ্রম পাইতেন না বলিয়া চিহ্নিত চাকরদের প্রতি একটু বিরক্ত ছিলেন।

এই দলাদলির ফল কতকটা এই সময় ফলিযাছিল। এ দলাদলি না থাকিলে, ওগলবি সাহেব হয় ত সা সাহেবকে কয়েদ করিতেন না, তাহা না করিলে হয় ত কালনার হত্যাকাণ্ড কৌন্সলিদের অস্পর্শ করিত না। কালনার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু তদারক হইয়াছিল, তাহা কেবল কৌন্সলিদের উদ্যোগে। ওগলবি সাহেব যে খুনের নিমিত্ত আসামী হইয়াছিলেন তাহাও ইহাদের যত্নে। নতুবা এই হত্যাকাণ্ড হয় ত গবর্ণমেণ্ট শুনিতেও পাইতেন না।

ওগলবি সাহেবকে কলিকাতার মেজেষ্টার ওহনলন সাহেব দুইলক্ষ টাকার জামিন লইয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন। বিচার সুপ্রিম কোর্টের জজ, সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ১৩ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইল। জুরি সকলেই ইংরেজ, কেবল একজন বাঙ্গালি ছিলেন, আসামীর কৌন্সলি তাঁহার প্রতি আপত্তি করায় আর একজন ইংরেজ মনোনীত হইলেন।

আসামী ওগলবি আসিলেন। আর তাঁহার সে তেজ সে দাম্ভিকতা নাই, মুখখানি শুকাইয়াছে, বড় দুর্ব্বল। পীড়া হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বসিতে একখানি কেদারা দেওয়া হইল। তাঁহার পক্ষ কৌন্সলি প্রিন্সেপ্। ফরিয়াদীর পক্ষে কৌন্সলি লঙবিল ক্লার্ক। ফরিয়াদীর পক্ষ সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

একজন সাক্ষী জালরাজা। তাঁহাকে দুইজন সার্জন আর মেজেষ্টার সাহেব স্বয়ং সঙ্গে করিয়া আলিপুরের জেলে দিয়া আসিয়াছিলেন। আলিপুর হইতে

তাঁহাকে সার্জনের পাহারায় আদালতে আনা হয়। জোবানবন্দীতে তিনি বলেন :—কালনায় একদিন রাত্রে বন্দুকের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল। তারা-চাঁদ চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া বলিল, আমায় গুলি লাগিয়াছে। এই শুনিয়াই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি পালাইতেছি জানিতে পারিয়া সিপাহীরা জলে গুলী মারিতে লাগিল। বন্দুকের আলোক দপ করিয়া উঠে আর আমি ডুব মারি, গুলি আমার চারিদিকে পড়িতে লাগিল। নৌকায় আমার সঙ্গে ১০ কি ১৫ খানা তরওয়ার, তিনটি কি চারিটি বন্দুক, একটি পিস্তল, দুইটি কি তিনটি বর্ষা ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয়দের সঙ্গে অসদ্ভাব হইয়াছিল তাহাই আমি পলাইয়াছিলাম, আমি মরি নাই। পীড়ার ভান করিয়াছিলাম। সে সকল অনেক কথা।

জয়নারায়ণচন্দ্র বলিলেন, আমি সা সাহেবের কেরাণী, রাত্রে যখন সিপাহীরা গুলি করে আমি তখন নৌকায় নিদ্রিত ছিলাম। তাহার পর সকালে কলিকাতায় পলাইয়া আসি। নৌকাযাত্রীদের সঙ্গে তরওয়ার রাখিতে হয়।

ভিকা সিংহ বলিলেন, আমি ৩ নং পল্টনের সুবাদার। গুলি করিবার পূর্ব্বে মারো মারো হুকুম শুনিয়াছি, সে হুকুম কে দিয়াছিলেন বলিতে পারি না, সাহেবেরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখান হইতে এ হুকুম দেওয়া হয়।

এল, এ, মেকলিন বলিলেন, আমি ঐ পল্টনের এনসাইন। কাপ্তেন লিটিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রতাপকে যেরূপে পারি, জীবিত হউক বা মৃত হউক, গ্রেপ্তার করিব কি না। ওগলবি তাহাতে বলেন, হাঁ যেমন করে পার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

বাবু তিওয়ারী বলিলেন, গুলি করিবার পূর্ব্বে মেজেষ্টার সাহেব মারো মারো বলেন, একবার গুলি করা বন্ধ হইলে পর যখন বুঝা গেল রাজা সাঁতার দিয়া পলাইতেছে, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "ওস্কো গুলীসে মারো।" আবার গুলী আরম্ভ হইল। সকল সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল, পাদরী সাহেবও গুলী করিয়াছেন আমি দেখিয়াছি। মেজেষ্টার সাহেব প্রথম গুলী করেন।

খোদা বকস হাবিলদার বলে, গুলি করিতে আমি পাদরীকে দেখি নাই। হয় ত তিনি গুলী করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মেজেষ্টার মারো মারো হুকুম দিয়াছেন তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

কাপ্তেন লিটিল বলিলেন, গুলি করিতে কেহ হুকুম দেয় নাই। সিপাহীরা ভুলে গুলি করিয়াছে, ওগলবি সাহেব গুলী করিতে হুকুম দিয়াছেন এমত আমি শুনি নাই। তিনি, কি ডাক্তার সাহেব, কি পাদরী সাহেব কেহ গুলি করেন নাই। প্রতাপের সঙ্গে তিনশত জন যোদ্ধৃ (fighting men) ছিল।

প্রতাপকে ধরিয়া আমার তাঁবুতে রাখিলে পর দুই প্রহর হইতে অস্ত পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার লোক জমিয়াছিল। তাহারা রাজাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে নাই, তবে একটু রুক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিল।

ডাক্তার চিক বলিলেন, বর্দ্ধমানের জজ আমাকে ও ওগলবিকে এক একটা করিয়া পিস্তল নিজ হাতে গুলি পুরিয়া দিয়াছিলেন। গুলি করিবার সময় মেজে-ষ্টার আমার নিকট হইতে দূরে ছিলেন, সুতরাং তিনি কি বলিয়াছেন না বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনি নাই। পাদরী এলেকজাণ্ডার পূর্ব্বে পল্টনে গোরা ছিলেন।

এইরূপে অনেকে সাক্ষী দিলেন সকল লিখিবার স্থান নাই। বাদীর সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। আসামি ওগলবি আপনার জবাব স্বরূপ এক-খানি বর্ণনা পত্র লিখিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেন। হুগলির মেজেষ্টার সামুওয়াল সাহেব আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করিলেন। এই জবাবে আসামী ওগলবি জানাইলেন যে, আমি নির্দ্দোষী। কালনায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল সিপাহীদের দোষে। আমি পল্টন লইয়া গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা কেবল ভয় দেখাইবার নিমিত্ত। সকলেই জানেন মেজেষ্টারের কার্য্য কি গুরুতর। সকলেই জানেন পরাণ বাবুর কার্য্যদোষে লোকে রাজপরিবারের উপর কতদূর বিরক্ত। এ সময় লোকে জালরাজার পক্ষ হইয়া একটা গোলমাল বাধাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জালবাজা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আমি পাইয়াছিলাম, তাহা দাখিল করা হইয়াছে। আর ওপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে আমি স্বয়ং গুলি করিয়াছি এবং "মারো মারো" বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার চীক সাহেব ও কাপ্তেন সাহেবের জোবানবন্দীর পর আমার আর কিছু বলা বাহুল্য। যাহাই হউক যদি কেহ আমাকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি নিদ্রিত লোকদের সিপাহী দ্বারা হত্যা করাইতে পারি, তাহা হইলে যে দণ্ড বিধান হইবে, আমি শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।*

তাহার পর আসামীর সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। আসাদ আলি নাজির আর মহিবুল্লা দারগা ভিন্ন আর যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই কালনায় উপস্থিত ছিলেন না। এই সকল সাক্ষীর জোবানবন্দী শেষ হইলে পর সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব জুরিদের চার্জ দিলেন।

জুরিরা বলিলেন, ওগলবি সাহেব নির্দ্দোষী।

জজ সাহেব ওগলবি সাহেবকে খালাস দিলেন, খালাস দিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন যে, "You now stand quite free from all charges and

* উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা জবাবের অনুবাদ নহে, কেবল স্থূল মর্ম্ম মাত্র।

imputations, and if there has been a little error of judgment, you are still most clearly proved to have had no participation whatever in the act itself, which resulted so fatally, and to have been acted throughout by no feeling or motive, other than becomes a gentleman."

সংবাদ পত্রের সম্পাদকের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে, কাপ্তেন লিটিলকে আসামী না করা ভুল হইয়াছিল।

৯

সামুয়েল সাহেবের উদ্যোগ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জালরাজা গ্রেপ্তার হইয়া হুগলি প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার কি দুরবস্থা করা হইয়াছিল তাহা বলা হয় নাই, বলিতেও ইচ্ছা নাই। তবে এই মাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, জালরাজা আর তাঁহার সঙ্গি রাজা নরহরিচন্দ্রকে দুইখানি মলিন ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া পুলিশ দ্বারা দুই চারিবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। কিন্তু কে তাহা দেখিবে, গ্রামে কেহই ছিল না। দোকান বন্ধ, হাট বন্ধ, পথে লোকজন আর চলে না, বৃদ্ধা ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত কুঁড়ে ফেলিয়া পলাইয়াছিল।

সিপাহী সঙ্গে দিয়া সেই ক্ষুদ্র বস্ত্র পরাইয়া জালরাজাকে পদব্রজে হুগলি পাঠান হইল। কিন্তু প্রতাপ পথে কি আহার করিবে, বোধ হয় ভুলক্রমে তাহার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে নিরাহারে পথ চলিতে হইল। যেখানে সিপাহীরা অন্নপাক করিত, জালরাজা সেইখানে বসিয়া আপনার হাতকড়ি নাড়িতেন, আর দেখিতেন। একদিন একটি সিপাহীর দয়া হইল, সে ব্যক্তি আপনার পয়সায় দুটি চাল আনিয়া দিল, জালরাজা সেদিন অতি গুরুতর আহার করিলেন।

জালরাজা নসরাই নামক স্থানে পৌঁছিলে বিস্তর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। হরকরার সম্পাদক বলেন আট দশ হাজার লোকের ন্যূন নহে। আমরা শুনিয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক প্রতাপের নিমিত্ত অঞ্চলে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়াছিল, দরিদ্রেরা পয়সা আনিয়াছিল, ভিখারিণীরা চাল আনিয়াছিল। তখনও বাঙ্গালা দয়ায় পূর্ণ। আমাদের বহুকালের শিক্ষার ফল এই দয়া। সহস্র পুরুষ ধরিয়া ভক্তি আর দয়া বাঙ্গালায় অভ্যাস হইয়াছিল। মুসলমানের সংস্পর্শে

এই সহস্র পুরুষ অর্জ্জিত রত্ন লোপ পায় নাই ; বরং সংসর্গপ্রাবল্যে দয়া মুসলমান-দের মজ্জাগত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সংস্পর্শে আমরা অনেক মূলধন হারাইয়াছি। আমরা এখন বলিতে অভ্যাস করিয়াছি দয়া a weakness। ভক্তি a weakness। স্নেহ a weakness। সুতরাং যাহা দয়ার বিপরীত, যাহা স্নেহের বিপরীত, যাহা ভক্তির বিপরীত তাহাকে বলি strength of mind। আবার যদি কখন আরও অদৃষ্ট পোড়ে, যদি এই গরুর পাল হস্তান্তর হয়, তখন হয়ত বলিতে অভ্যাস কবিব সত্যবাদ বেওকুফি ; মিথ্যাবাদ সিয়াস্তামি ; পরদ্রব্য হরণ কর্ত্তব্য কার্য্য, কেন না তাহাতে কখন কখন লাভ আছে।

সে সকল দুঃখেব কথা যাক। যাহারা প্রতাপের নিমিত্ত খাদ্য বা পয়সা আনিয়াছিল তাহারা কেহই প্রতাপকে দিতে পারিল না। সিপাহীদের তাড়নায় কেহ তাঁহাব নিকট আসিতেও পারিল না।

৫ই মে তাবিখে জালবাজা হুগলীতে পৌছিলেন। তথাকার জেলখানায় একটী ক্ষুদ্র ঘরে রক্ষিত হইলেন। একখানি কম্বল পাইলেন, সেখানি নূতন কি পুরাতন, কি অন্য কয়েদির ব্যবহৃত, তাহা আমবা নিশ্চয় বলিতে পারি না ; তবে সংবাদপত্রে কে একজন লিখিয়াছিলেন যে কম্বলখানি নূতন নিশ্চয়ই।

এই সময়ে হুগলীতে সেমুয়াল সাহেব মেজেষ্টাব। তিনি ইহার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে মেজেষ্টরি কবিয়াছিলেন। যখন জালরাজা সন্ন্যাসীবেশে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন তখন তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময় তিনি জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল কথাই পবাণ বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং সেই অবধি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল জালরাজা একজন ভয়ানক জুয়াচোর। এক্ষণে হুগলীতে তাহাকে আপন হাতে পাইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেই জন্য এখানে সেখানে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কথিত আছে তিনি এই নিমিত্ত পরাণ বাবুকে এক পত্র লেখেন। সে পত্রের নকলের জন্য লেষ্টার সাহেবের নিকট জালরাজা দবখাস্ত করেন, নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু সামুয়াল সাহেব তাহা দিতে দেন নাই। তিনি দিনকতকের নিমিত্ত অনুপস্থিত ছিলেন। লেষ্টার সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেন।

সামুয়েল সাহেব শুনিয়াছিলেন, গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলিয়া একজন পাকা জুয়াচোর ছিল। চার পাঁচ বৎসর অবধি সে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল এক্ষণে সেই ব্যক্তি এই জালরাজা সাজিয়াছে। অতএব তাহার সনাক্তের জন্য তিনি নদীয়ার মেজেষ্টার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন।

হালকেট সাহেব কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর কতকগুলি প্রতিবাসী পাঠাইয়া দিলেন। সামুয়েল সাহেব তাহাদের সঙ্গে লইয়া জেলখানায় গেলেন। তাহারা জালরাজাকে দেখিয়া ভাল সেনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং সামুয়াল সাহেব বড় চটিয়া গেলেন। জোবানবন্দি না লইয়া তাহাদের ফেরত পাঠাইলেন। আবার হালকেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন। এবার হালকেট সাহেব আপনার নাজীর পেস্কার সেরেস্তাদার প্রভৃতি বিস্তর আমলা পাঠাইয়া দিলেন। আপনিও একদিন নিজে আসিয়াছিলেন।

সামুয়েল সাহেব আর একখানি পত্র বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে লেখেন। তাঁহার কতদূর চেষ্টা ছিল তাহা বুঝা যাইবে বলিয়া আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রাজা বৈদ্যনাথের জোবানবন্দী হইয়া গেলে পর এই পত্রখানি লেখা হয়।

Hoogly, Sep 4, 1838.

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore, who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhery, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a weak or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly

E. A. Samuells.

সামুয়েল সাহেব বিস্তর সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন, তাহাদের জোবানবন্দী হইত কিন্তু তিনি তাহা সাক্ষীদের পড়িয়া শুনাইতেন না। তখন সে প্রথা ছিল না। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন যে, সাক্ষীরা যাহা বলিত, তাহা অবিকল লেখা হইত না। তাঁহারা আরও বলিতেন, কোন কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী জালরাজার অসাক্ষাতে লওয়া হইত।

হরকরা সম্পাদক একজন রিপোর্টার পাঠাইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন সামুয়েল সাহেব তাহার রিপোর্ট সংশোধন করিয়া হুগলি কালেজের অধ্যাপক সদরলাণ্ড সাহেবের দ্বারা তাহা হরকরায় পাঠাইতেন। জালরাজার উকিলেরা বলিতেন, হরকরায় যে জোবানবন্দী প্রকাশ হয়, তাহা প্রকৃত নহে, তাহা কেবল মেজেষ্টার সাহেবের মনগড়া। ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়াছিল, নিজামতে দরখাস্তও হইয়াছিল। সামুয়েল সাহেব বলেন, সদরলাণ্ড সাহেবকে তিনি তাঁহার ইয়াদদাস্ত দিতেন মাত্র আর কিছু নহে। *

যাহাদের জালরাজার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা তাহারাই ফরিয়াদির সাক্ষী সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দী প্রথমে ছাপা হইতে লাগিল। হরকরা হইতে তাহা সমাচারদর্পণে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইতে লাগিল। সামুয়েল সাহেব সেই জোবানবন্দী সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে সপ্তাহে কতকগুলি করিয়া সমাচারদর্পণ থানায় পাঠাইয়া দিতেন, থানার দারগারা তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যখন দায়রায় জালরাজার সাপক্ষ

---

* এই অপবাদের উত্তরে সামুয়েল সাহেব সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, A silly reporter was deputed by the publisher of that paper (Hurkura) to Hooghly, for the purpose of reporting the proceedings in my Court. The reports which he furnished, however, were so exceedingly incorrect that Mr. Sutherland, now principal of the Hooghly College, who resides with me, and who had formerly been connected with the Hurkura press, requested me to furnish him with my notes, in order that he might correct these reports before they were forwarded. To this, of course, I could have no objection, and the reports which appeared from that time, forward in the Hurkura, were the only reports which gave a tolerable idea of the evidence which was given in court. That there were many inaccuracies even in these, is very probable, as Mr. Sutherland's leisure was not such as to enable him, in most instances, to give more than a general correction.

সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল, তখন আর সেরূপ থানায় থানায় সমাচার-দর্পণ পাঠান হইল না। প্রথম জোবানবন্দী পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল যে জালরাজা সত্যই জাল, সুতরাং সামুয়েল সাহেবকে এই বিষয়ে লোকে দোষী করিত। তিনি বলেন যে লোকের মনে একটা অসঙ্গত ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সমাচারদর্পণ আমি দারগা ও জমিদারদিগকে পাঠাইয়া দিতাম। তাহা কোন অন্যায় অভিপ্রায়ে করি নাই।

১০

দায়রা সোপর্দ্দ

সামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে জালরাজার মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। সেই দিন এজলাসে বসিয়া জালরাজাকে বলিলেন, তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্রের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামি করা হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া অনেকে অবাক্ হইলেন। হরিবোল হরি! কালনার জমিয়তবস্ত তবে কোন কাজের কথা নহে। তাহা কেবল ছল মাত্র। প্রতাপ-চাঁদের নাম ব্যবহার করাই তবে মূল অপরাধ। এই গুরুতর অপরাধের আবার জামিন নাই। খুনের মোকর্দ্দমায় ওগলবি সাহেবের জামিন লওয়া হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার অপরাধে জামিন লওয়া হইতে পারিল না। খুন অপেক্ষা ইহা গুরুতর অপরাধ। এ অপরাধের নিমিত্ত চারি মাস ধরিয়া হাজতে রাখা হইল।

সামুয়েল সাহেব জালরাজার এই গুরুতর অপরাধ প্রকাশ করিলে জালরাজার উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ফরিয়াদি? মেজেষ্টর উত্তর করিলেন "গবর্ণমেণ্ট ফরিয়াদি।" আবার সকলে অবাক্ হইল। প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি, তাহারা কেহ নালিস করিল না, পরাণ বাবু নালিস করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের কেন এত গরজ পড়িল? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না, সুতরাং নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী আরম্ভ হইল।

চিনারি সাহেব দ্বারা প্রতাপচাঁদ নিজের যে প্রমাণ চিত্রপট লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানি বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে আনীত হইয়া এজলাসের পার্শ্বে এক ঘরে রাখা হইল। চিনারি সাহেব একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন,

তিনি রাজা প্রতাপচাঁদের ছবি লিখিতেছেন এ কথা সাহেব মহলে সকলে শুনিয়াছিলেন। অনেকে সেই ছবি দেখিতে চিনারি সাহেবের বাটী যাইতেন। ছবিখানি বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইয়াছিল। প্রতাপচাঁদ চিনারি সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের দেহ যেমন লম্বা, পটের দেহ যেন ঠিক সেই পরিমাণে লম্বা হয়, দৈর্ঘ্যতায় যেন কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকে। পট ঝুলাইবার স্থানানুরোধে বা তাহার দূরতা অনুসারে চিত্রকরেরা দৈর্ঘ্যতার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, প্রতাপ সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই চিত্রপট হুগলির মেজেষ্টরিতে আনীত হইল। অনেকেই বুঝিলেন ছবিখানি এ এ মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী—নির্লোভী নিরপেক্ষ সাক্ষী—কথা কহে না, কাহারও মুখ চাহে না। পার্শ্বের ঘরে দাঁড়াইয়া, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া ছবি কি বলিল, জজ, মেজেষ্টার তাহা কি বুঝিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত ক্রমে লেখা যাইতেছে।*

গবর্ণমেণ্ট আপনার চাকরদের সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেক্রেটরি প্রিন্সেপ একজন সাক্ষী, সদর দেওয়ানীর জজ হাচিনসন একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটাল একজন সাক্ষী। ঐরাবতী নামক জাহাজ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষীদের মহা সমারোহে হুগলি পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপনার জাহাজে করিয়া আর একদিন আসিলেন। এইরূপে ঘটার আর সীমা রহিল না। তিন বিষয়ে সাক্ষী লওয়া হইল। প্রথমত, জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত, প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে, তৃতীয়ত, জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল এই সম্বন্ধে। কেবল ফরিয়াদির পক্ষ এই তিন বিষয়ের প্রমাণ লইয়া সামুয়েল সাহেব জালরাজাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। কিন্তু সোপর্দ্দের সময় একটি চার্জ বাড়াইয়া দিলেন—কালনার জমিয়তবস্ত। এ বিষয়ে কোন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহার চার্জ হইল।

সামুয়েল সাহেব বর্দ্ধমান হইতে প্রায় সকল আসামীকে আনাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেবল সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

প্রথম, জালরাজা। দ্বিতীয়, মোক্তার রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল, যিনি বর্দ্ধমানে মেজেষ্টারের গেটের নিকট গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তৃতীয়, হাফেজ ফতে উল্লা।

*Some curious evidence transpired concerning the "portrait" that novel mute witness. * * The prosecution certainly seem to have unwittingly subpoenaed, in this portrait, a rather *hostile witness.* * * * Long odds in favor of the Rajah and no takers. Prawn Babu is quite a dark horse, however ; and may prove a winner—*Hurkura 5th September* 1838.

চতুর্থ, সাগরচন্দ্র ধর। পঞ্চম, কালীপ্রসাদ সিংহ। ষষ্ঠ, জুমন খাঁ। সপ্তম, রাজা নরহরি চন্দ্র।

কালনা হইতে জালবাজাকে পদব্রজে হুগলি আনা হইয়াছিল, কিন্তু জেল হইতে তাঁহাকে নিত্য পাল্কী করিয়া কাছারি লইয়া যাওয়া হইত। লোকের এত জনতা হইয়াছিল যে তাহাতে সামুয়েল সাহেবের মত মেজেষ্টারও আসামীকে হাঁটাইতে সাহস করেন নাই। জেল হইতে কাছারি পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বের ছাদে স্ত্রীলোকেরা, গাছে পুরুষেরা বসিয়া থাকিত—কতক্ষণে রাজা যাইবেন। কাছারির চতুষ্পার্শ্বের ত কথাই নাই। কত লোক পিয়াদার পোষাক পরিয়া সাক্ষীর জোবানবন্দী বলিয়া বেড়াইত আর পয়সা উপার্জ্জন করিত।

১১

দায়রার বিচার

এ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত ২০শে নবেম্বর দিন ধার্য্য ছিল, এবং সাক্ষীদিগকে সেই দিনে উপস্থিত হইতে আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু কি গতিকে বলা যায় না, তাহার পূর্ব্বদিনে মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। সাক্ষীরা আইসে নাই, কিন্তু অপর কার্য্য হইল। জজ সাহেবের নাম কার্টিস।

গবর্ণমেণ্ট, প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে বিগনেল নামে একজনকে পাঁচশত টাকা বেতনে ডিপুটি লিগল রিমেম্ব্রেন্সার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিগনেল সাহেব বড় বুদ্ধিমান, হ্যালিডে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীত। তাঁহাকে এই মোকর্দ্দমায় দায়রায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত হ্যালিডে সাহেব পাঠাইয়া দিলেন। তিনি এই ১৯শে তারিখে আসিয়া উপস্থিত হন।

সেই দিন পত্রের দ্বারা কৌন্সলি মর্টন সাহেব জালরাজার পক্ষ সমর্থন করিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেব সে পত্র পাইয়া ফরিয়াদির উকিল বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুমতি দেওয়া যাইবে কি? বিগনেল উত্তর করিলেন যে, এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে গবর্ণমেণ্ট নিষেধ করিয়াছেন। জজ সাহেব তখন মর্টন সাহেবকে অনুমতি পাঠাইলেন, তাহার পরেই মর্টন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল।

আসামীর কৌন্সলি জজ সাহেবকে জানাইলেন যে, আসামী শারীরিক কিছু অসুস্থ, অতএব ইঁহাকে বসিবার আসন দিতে অনুমতি করিলে ভাল হয়। জজ সাহেব কেদারা দিতে হুকুম দিলেন।

ফৌজদারি হইতে এই মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যে রোবকারি আসিয়াছিল, তাহা মনসারাম দেওয়ানজি ১১টার সময় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেড়টার সময় তাহা পড়া শেষ হইল। তাহার পর সাক্ষীর জোবানবন্দী যাহা মেজেষ্টার পাঠাইয়াছেন, তাহাও দেওয়ানজি মহাশয় পড়িতে আরম্ভ করিলেন জজ সাহেব বলিলেন, এখানে জোবানবন্দী লওয়া হইবে, সুতরাং সাবেক জোবানবন্দী আর পড়া অনাবশ্যক। বিগনল সাহেব তাহাতে সম্মতি দিলেন, দেওয়ানজি শ্রীযুক্ত মনসারাম মহাশয় বলিলেন, তাহা হইতে পারে না; এ সমুদয় পাঠ করা আবশ্যক। ফৌজদারির সমুদয় কাগজ পত্র না পড়িলে আসামীদের ফেরেবি কিরূপে বুঝা যাইবে। জজ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না, দেওয়ানজির যাহা ইচ্ছা তাহা সমুদয় পড়িয়া শুনাইলেন।

তাহার পর চার্জ্জ পড়া হইল। [১] আলক সা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে। [২] সেই নাম ব্যবহার করিয়া ত্রেজরির দেওয়ান্ রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাহার টাকা লইয়াছে ও [৩] বেআইনিরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়তবস্ত করিয়াছে।

আসামী নিরপরাধী বলিয়া জবাব দিল।

সে দিবস আর কোন কার্য্য হইল না।

এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১শে নবেম্বর) সেই সম্বন্ধে কথা উঠিল। জজ সাহেব বলিলেন যে জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত, আমার বোধ হয় এই মোকর্দ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিংবা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই, সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম আমি তাহাই করিতে বাধ্য।

আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন, তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী, তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইল। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন ক্ষতি, সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। জাল-রাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে, ফৌজদারী

আদালতের সাক্ষী অন্য মোকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সাক্ষীদের এ মোকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষ এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক। ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন। জজ সাহব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল, সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জালরাজা এখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল তাহা অবশ্য রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানীতে দাখিল করিয়া থাকিবেন, সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নিলাম করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পথ খরচ পাঠান হউক। এ প্রার্থনায় কেহ উত্তর দিলেন না। কমিসন দ্বারা তাঁহার জোবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল। জজ সাহেব বলিলেন, কমিসন বাঙ্গালি সাক্ষীর পক্ষ হইতে পারে, ইংরেজের পক্ষে নহে।

কোম্পানীর পক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত, যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী অনুপস্থিত হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে। কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্য এরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না, কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করা হইত না। যাঁহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বরং জজ সাহেব তাঁহাদের কটূক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে "গাধা" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষার তালিকায় ছিল, তিনি নিত্য হুগলীতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জালরাজার উকিল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "যেরূপ দেখিতেছি সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমিদারি বিষয় আশয় সমুদয় এই জেলায়, শেষ কি বিপদে পড়িব?" এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে উপস্থিত হইলেন না।

২০শে নবেম্বর হইতে সাক্ষী জোবানবন্দী আরম্ভ হইল। ফরিয়াদির পক্ষ যে সকল সাক্ষীরা মেজেষ্টরীতে জোবানবন্দী দিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার দায়রায় জোবানবন্দী দিলেন কিন্তু কিছু সংক্ষেপে। আমরা সেই জন্য মেজেষ্টরীতে যে জোবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল নিম্নে তাহারই স্থূল মর্ম্ম লিখিলাম। দায়রায় অতিরিক্ত কেহ কিছু বলিয়া থাকিলে তাহাও উল্লেখ করিলাম। আসামীর সাক্ষী সম্বন্ধে যে জোবানবন্দী নিম্নে দেওয়া হইল তাহা দায়রায় লওয়া হইয়াছিল।

প্রতাপচাঁদ, সত্য কি জাল ?

গবর্ণমেণ্টের সাক্ষী

ট্রাওয়ার সাহেব (*C. T. Trower*) বলিলেন, আমি ১৮০৮ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলাম। প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনিতাম। অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে, কিন্তু এই আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। যতদূর আমার স্মরণ হয়, তাহাতে এ ব্যক্তিকে কোন মতেই প্রতাপ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এ ব্যক্তির চক্ষু কাল। ডাক্তার হ্যালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। একবার প্রতাপের উরুস্তম্ভ হয়, হ্যালিডে তাহা অস্ত্র করেন। কিন্তু সেই হ্যালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ। হ্যালিডে এখন কাশীতে আছেন। এই সাক্ষী দায়রায় বলিলেন যে আসামি কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।

প্রিন্সেপ সাহেব (*H. T. Prinsep*, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি) বলিলেন, আমি প্রতাপকে চিনিতাম, ১৯ বৎসর কি ২০ বৎসর যাহাকে দেখি নাই তাহার আকৃতি আমার সেইরূপ স্মরণ আছে। আসামীকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া বোধ হয় না। (I should say that he was not Protap Chunder) প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই। প্রতাপের নাক চোখ কিরূপ ছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। দায়রায় বলেন যে জেনেরল আলার্ড ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে তাঁহার অনেক দিন হইল একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।

প্যাটল সাহেব (*James Pattle*, বোর্ডের মেম্বর) বলিলেন, ১৮১৩ সালে আমি কলিকাতায় যাই। প্রতাপ আমার সহিত দেখা করিতে সেখানে যাইতেন, কয়বার গিয়াছিলেন স্মরণ নাই। যে ছবি দেখিলাম, তাহা যদি প্রতাপের হয়, তবে প্রতাপের আকৃতি আমার আর কিছু মাত্র স্মরণ নাই। ঐ ছবির সঙ্গে আসামীর কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না।

হাচিনসন সাহেব (*Mr. Hutchinson*) বলিলেন, আমি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের একটীং জজ ছিলাম। আসামীকে আমি

চিনি না। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। এ ব্যক্তি অনেক লম্বা ও স্থূলকায়। ইহার সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই। তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক মেলে। প্রতাপের মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার কোল্টারের নিকট শুনিয়াছিলাম, প্রতাপের জ্বর হইয়াছিল। দায়রায় এই সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

বিচর সাহেব (*John Becher*) বলিলেন, আমি একজন হাউসওয়ালা। আমি প্রতাপকে চিনিতাম। তাঁহার আকৃতি আমার কিছু স্মরণ নাই। ছবি দেখিয়াও তাহাব আকৃতি আমাব স্মবণ হইল না। তবে এই ছবির সঙ্গে আসামীব সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম ছবিব প্রতাপ আব আসামী প্রতাপ একইরূপ লম্বা। দায়বায় অনুপস্থিত।

ওবারবেক সাহেব (*D. A. Overbeck*) বলিলেন, আমি এক্ষণে চুচুড়ায় থাকি। দিনামারেব আমলে আমি চুচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না। (তাহার পর অপর ঘবে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন) এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্ব্বপবিচিত ছোট বাজা। ছবিব আকৃতি আব আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ। দায়বায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি, আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম, আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহগনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল, তিনি ঊর্দ্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত, এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোব কমিয়াছে। এরূপ দাগ কাহার চক্ষে আব কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি একবার গবর্ণর জেনারেলের একজন এজেন্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচন্দ্রকে লেখায় তিনি উত্তর করেন, আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই। এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলিলেন, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল, তিনি ওয়াটর্লুর যুদ্ধের পর একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্ত বাবুর বাটীতে ছিলেন, সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসের রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাঁতি কি বেনের বাড়ী যান নাই,

তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন। রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটী যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না, এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগলবির মোকদ্দমায় যখন এ আসামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম, ঐ সময় আমাকে এ ব্যক্তি চিনিয়াছিল, কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই। ওয়াটর্লু লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পাবে। মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিযা আনিয়াছে। আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। (চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী বিনা সওয়ালে বলিলেন) দায়রায় আসিয়া বলিলেন যে, প্রতাপের ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয় ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বলিলেন, প্রতাপের সঙ্গে আমার দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, একবার গবর্ণর জেনরলের দরবারে, আর একবার একটা বিবাহ বাটীতে। সেখানে প্রতাপ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ নহে। আমি কাহারও নিকট বলি নাই যে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। (রাজা বৈদ্যনাথ আদালতের বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলা দিয়াছিল, এ সাক্ষীকে আর দায়রায় তলব হয় নাই, বরং তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্ত দণ্ড দিবার পরামর্শ হইয়াছিল।)

হারক্লটস সাহেব (*Gregory Herclots*) বলিলেন, আমি হুগলীর সদর আমিন ছিলাম। দুই তিনবার প্রতাপকে দেখিয়াছি, এখন দেখিলে বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারি। এই আসামী প্রতাপ নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া তাহা বলিতে পারি না। দায়রায় বলিলেন, এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।

রাধাকৃষ্ণ বসাক বলিলেন, আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত তাহা হিসাব নিকাশ না করিয়া বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি, ইহাকে আমি নিজে চিনিতাম না। কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ। গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হালিডে আমার নিকট

বলিয়াছেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। এই সকল লোকে বলায় তবে আমি টাকা দিয়াছি। তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ড* আমায় বলিয়াছেন, তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে আলাহাবাদে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই, আরও অনেকে দিয়াছেন, দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন। দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন যে, রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলীর জেলে দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম, সেখানে ডাক্তার হালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রাধামোহন সরকার, যাঁহার সঙ্গে পরাণ বাবু এক দল লাঠিয়াল কালনায় পাঠাইয়াছিলেন, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলিলেন যে, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে এই আসামীর বিস্তর প্রভেদ। প্রতাপচাঁদ দেখিতে বিক্রমাদিত্যের মত ছিলেন, আর এ লোকটা দেখিতে যেন ভিকে হাড়ি। এ লোকটার হাত পা বড়, শরীর লম্বা, বর্ণ কাল, ছবির সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। আমি এখন রাজবাটীর দেবত্তর মহলের মোক্তার। আগা আব্বাস নামে কোন মোগল কস্মিন্‌কালে প্রতাপচাঁদের চাকর ছিল না।

বসন্তলাল বাবু বলিলেন, আসামীকে আমি চিনি না। ইহাকে একবার বাঁকুড়ার মেজেষ্টারীতে দেখিয়াছিলাম, তখন ইহার দাড়ি ছিল। এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ নহে। আমি এক্ষণে রাজবাটীর খাস দপ্তরে কর্ম্ম করি। পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদ আমার নাতিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। দায়রায় বলিলেন, আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা লম্বা, বয়স অল্প। বাঙ্গলা ১১৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন।

মোহনলাল বাবু বলিলেন, আমি রাজবাটীর হাতীশালার দারগা। এই আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। দায়রায় বলিলেন, রাজা প্রতাপের সঙ্গে আসামীর, বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে, গঠনে, কি কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই।

ভৈরবনাথ বাবু বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে দুই তিনবার দেখিয়াছি, এ আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজবাটী হইতে তঙ্খা পাই। দায়রায় বলিলেন, আমি পরাণ বাবুর ভগিনী বিবাহ করিয়াছি, পরাণ বাবুও আমার ভগিনী বিবাহ করিয়াছেন।

*জেনেরল এলার্ড মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

নন্দলাল বাবু বলিলেন, আসামী প্রতাপচাঁদ নহে। আমি রাজসরকারে কর্ম্ম করি। দাররায় বলিলেন, পরাণ বাবু আমার কুটুম্ব।

এইরূপে আর কয়েকজন জোবানবন্দী দিলেন, তাঁহারা রাজবাটীর সাক্ষী।

আসামীর সাক্ষী

ডাক্তার স্কট সাহেব [*Robert Scott, 37th Madras Native Infantry*] বলিলেন, আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম, আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম, তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্ন মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহার গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া সোড হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘাব দাগ করিতে পাবে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামে। আর প্রতাপেব মত ইহাব হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপেব মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইহার অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহার বসিবার ভঙ্গি। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিল না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিল, আর অভ্যাস নাই। তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্বের কথা দুই একটা আসামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আর কোন সাহেবের নাম বলিতে পারিল না। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিল একটা পিস্তল লইয়া পথে পথে কুক্কুর মারিয়া বেড়াইতে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর কবিল, বুলার সাহেব রঘু বাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন, রঘু বাবু বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরে বিষের কথা বলিয়াছিলে। এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ মেদেরা মদ খাইতেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিল আমি আর মদ খাই না, তবে ব্রাণ্ডি ভালবাসি। আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে

ট্রাওয়ার (Trower) সাহেব থাকিতেন, আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সে দিন আমি তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না; তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।

রিডলি [John Ridley] বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম, আমি ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদের মত। আমি ইহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইনি সে সকল কথার যথার্থ উত্তর দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনার নিকট কখন কিছু আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম কি না? আসামী বলিলেন যে, একবার একটি সোণার ঘড়ি বিক্রয় করিযাছিলে। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজবাটীর সিপাহীদের সঙ্গে প্রোবিনসাল্ সিপাহীদের যে বিবাদ হয়, তাহা কিরূপে মিটিযাছিল? তাহাতে আসামী বলেন, রেবিনিউ বোর্ড হুকুম দেন যে, রাজবাটীর সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরিবে, তাহাতেই সে বিবাদ ভঞ্জন হয। এ সকল প্রকৃত কথা।

বিবি ডেবিয়াট কিটিং বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম, আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। আমার বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন আমি ইহাকে অনেকবার আমার পিতার বাটীতে ও অন্যত্র দেখিয়াছি।

বিবি সফিয়া ক্রেন বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম, আসামী নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।

জন মার্শাল বলিলেন, আমি ৭১ নং সিপাহী পল্টনের ব্রিবেট মেজর। আসামী প্রতাপচাঁদ কি না তাহা আমি জানি না, তবে ২০ বৎসর কি ততোধিক হইল, ইহার সঙ্গে ওবারবেক সাহেবের বাটীতে ও অন্যত্রে আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ছিল। ইহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। ইহার অন্য কোন নাম যদি তখন শুনিয়া থাকি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কতবার ইহাকে দেখিয়াছি, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয় ১৮২০ সালের পর আর আমি ইহাকে দেখি নাই। তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমার সময় সুপ্রিম কোর্টে ইহাকে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই তখন স্মরণ হইল যে, এ ব্যক্তি আমার আলাপী, কোথায় দেখিয়াছি। স্মরণ করিবার নিমিত্ত ইহার মুখের ছবি আমি আমার প্যানটুলেনে আঁকিয়া লইলাম, সেই ছবি ইংলিসম্যান কাগজে প্রকাশ হয়। তখন আমার বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তি জুয়াচোর, ইহাকে আমি পশ্চিমে কোথায় দেখিয়া থাকিব। তাহার পর গত কল্য ওবারবেক সাহেবের বাটীতে আহার করিতে করিতে এই ব্যক্তির কথা উপস্থিত হয়, তিনি ছোট

রাজার সংক্রান্ত দুই একটি ঘটনা বলিলেন, আমার তখন সকল স্মরণ হইল, ছোট রাজাকে মনে পড়িল। আসামী বর্দ্ধমানের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেছে, আমি তাহা জানিতাম, কিন্তু চুচুড়ায় যাঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম, তিনিই যে বর্দ্ধমানের রাজা তাহা আমি জানিতাম না।

ফ্রানসুয়া সুলিমান, সাং চন্দননগর, জাতি ফরাসিস, বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে চিনি, আমি সর্ব্বদাই চুচুড়ায় যাইতাম, সেখানে প্রতাপচাঁদকে দেখিয়াছি। একবার নীলকুঠী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আট দশবার যাতায়াত করিয়াছিলাম। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। অদ্য আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে ইনি চিনিতে পারিলেন এবং নীলকুঠি বিক্রয় সম্বন্ধে কথা বলিলেন।

হাজি আবু তালেব, চুচুড়ার একজন মোগল, সওয়াল মতে বলিলেন, আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে চিনিতাম। আসগর আলি নামে একজন হাকিম তাঁহার বাটীতে থাকিত, আমি রাজবাটীতে গিয়া সেই আসগর আলির নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখিতাম। সুতরাং প্রতাপচাঁদকে বিলক্ষণ চিনিতাম। কিছুকাল পরে আমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিয়া শুনিলাম, রাজা মরিয়াছেন, কিন্তু আসগর আলি এবং অন্যান্য লোক আমায় বলেন যে, রাজা মরেন নাই, পলাইয়াছেন। এই আসামী সেই রাজা। আমি পূর্ব্বে রাজার চক্ষে যে দাগ দেখিয়াছিলাম, আসামীর চক্ষে সেই দাগ দেখিয়াছি।

ডাক্তার জুলিযান নইটার্ড, সাং ফরাসডাঙ্গা, ফরাসি ভাষায় জোবানবন্দী দিলেন :—আমার বয়স ৭৯ বৎসর। আমি এখনও ভাল দেখিতে পাই। এই আসামীকে চিনি, ইনি বর্দ্ধমানের রাজা, ইহার নাম স্মরণ নাই, ইঁহাকে আমরা ছোট রাজা বলিতাম। আমি সেদিন জেলখানায় ইঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, আসামী আমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল।

ফ্রেডারিক থিয়ার্শ বলিলেন, আমি ফরাসডাঙ্গার মেজেষ্টার, আমি নিজে আসামীকে চিনি না, সেদিন আমি ডাক্তার নইটার্ড সাহেবের সঙ্গে জেলখানায় গিয়াছিলাম। ডাক্তারকে আসামী দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল। আমি জেনারেল এলার্ডকে চিনি, তিনি এখন লাহোরে আছেন। তিনি একদিন জেলখানায় আসামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। জেলখানা হইতে ফিরিয়া গেলে তাঁহার সহিত এই আসামী সংক্রান্ত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন যে, এই আসামীকে তিনি লাহোরে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। জেনারেল এলার্ড বোধ হয়, ১৮৩৫ সালে বিলাত যান, ১৮৩৭ সালে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর আমার সহিত কথা হয়।

গোলকচন্দ্র ঘোষ, সাং সালিখা, বলিলেন, আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজী পড়াইয়াছিলাম, তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তাঁহাকে আমি চিনি, এই আসামী ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন এ কথা শুনিয়াছিলাম, আবার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।

গোপীমোহন পরামাণিক বলিল, আমি জাতিতে ময়রা, আমার বয়স ৮৬ বৎসর, গোলাপবাগের গেটের কাছে আমার দোকান আছে। এই আসামীদের মধ্যে আমি কেবল মহারাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরকে চিনি। যখন ইনি বর্দ্ধমানে প্রথম ফিরিয়া আসিলেন, আমি ইহাকে গোলাপবাগে দেখিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ছোট মহারাজ মরেন নাই, মৃত্যুর ভান করিয়া পলাইয়াছিলেন, তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন।

রামধন বাগ্দী বলিল, আমি পলতার ঘাটমাঝি। এই আসামী মহারাজকে চিনি, ষোল সতর বৎসর ধরিয়া আমি তেলিনীপাড়ার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাউলের মাঝি ছিলাম। ভদ্রেশ্বরে রামধন বাবুর একখানি বাগান ও বৈঠকখানা ছিল, সেইখানে মহারাজ মধ্যে মধ্যে যাইতেন, একরাত কি একদিন সেখানে থাকিতেন আমি দেখিয়াছি।

আমীরউদ্দিন আমেদ বলিলেন, আমার নিবাস চুচুড়া। আমি প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। আমি চুচুড়ার রাজবাটীতে মুন্সি কালাম উদ্দিনের নিকট প্রায় দশ বৎসর অধ্যয়ন করি। তাহার পর ইসাবেল নামে মৃত বুড়া রাজার ফরাসিস বিবি আপন পুত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজবাটীতে রাখেন। প্রতাপচাঁদ চুচুড়ায় আসিলেই আমি দেখিতে পাইতাম। আসামী সেই প্রতাপচাঁদ।

আগা আব্বাস, যে ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত, সেই ব্যক্তি বলিল, এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ডেবিড হেয়ার সাহেব (*David Hare*) বলিলেন, আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে ছয় সাত বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি, সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে একবার এ দিকে একবার ও দিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষত ছবির বামদিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে, আসামীর চিবুক ও নিম্ন ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম

দেখিলাম, তখন তাঁহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে লম্বা নহে, ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় দুই এক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল, আমাকে বলিলেন যে, "তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দুরবীন লইয়া গিয়াছিলে আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি"—এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীন প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে আসামীকে দেখিয়াছিলাম, ইহার মুখের উপরভাগ দেখিয়াই বোধ হইয়াছিল, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু তখন ইহার দাড়ি ছিল বলিয়া ভাল চিনিতে পারি নাই, তাহার পর ওগলবির মোকর্দ্দমায় ইহাকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিতে দেখি, দেখিয়াই ইহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরব শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।

রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বলিলেন, আমার পিতার নাম মহারাজা চৈতন সিংহ, নিবাস বিষ্ণুপুর। তেজচাঁদ বাহাদুরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, আমি বর্দ্ধমানে সর্ব্বদা যাইতাম, এক একবার গিয়া দুইমাস করিয়া থাকিতাম। আসামী নিশ্চয়ই রাজা প্রতাপচাঁদ। আমি প্রতাপের পলায়ন বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম। সাত আট বৎসর হইল একজন পাঠান আমাকে বলিয়াছিল যে, রঞ্জিত সিংহের পুত্র খড়ক সিংহ আর প্রতাপচাঁদ উভয়কে এক হাতীতে চড়িয়া যাইতে সে দেখিয়াছে। আসামী তিন বৎসর হইল, একবার আমার বাটীতে গিয়াছিল, আমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে তিন মাস রাখি, সেই জন্য বাঁকুড়ার মেজেষ্টার আমাকে দেড় বৎসর আটক রাখেন, আর বিস্তর আপমান করেন।

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুরের রাজগোষ্ঠী, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ।

হাকিম আলি উল্লা বলিলেন, আমি আসামীকে চিনি, ইনি প্রতাপচাঁদ, পূর্ব্বে ইহার চিকিৎসা আমি করিয়াছি। আসগর আলি ইহার বেতনভোগী হাকিম ছিলেন। তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া শুনিয়াছিলাম যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, পলাইয়াছেন।

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বলিলেন, আসামী আমার সাবেক মুনিব প্রতাপচাঁদ, ইনি যখন প্রথম গোলাপবাগে আসেন, আমি উঁহাকে দেখিয়া চিনিয়াছিলাম এবং পরাণ বাবুর পুত্র তারাচাঁদকে বলিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার রাজবাটীর চাকুরি যায়।

আসামীর পক্ষে এইরূপ আরও কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গেল। প্রতাপচাঁদের পিসি তোতাকুমারী, আর তাঁহার দুই স্ত্রী সপিনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও বক্তৃতা আলোচনা করিয়া জজ সাহেব আসামীর বিরুদ্ধে আর কাজি সাহেব আসামীর সাপক্ষে রায় দিলেন। সে কথা পরে সবিশেষ বলা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

১। লক্ষ্মণাবতী

যাহা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশ বলিয়া পরিচিত, মুসলমানেরা আসিবার আগে, তাহা কতকগুলি ক্ষুদ্রতর রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌড় বা লক্ষণাবতী তাহার মধ্যে একটী রাজ্য। এইরূপ আর কয়েকটী রাজ্য ছিল। উত্তর বাঙ্গালায় কামরূপ বা রঙ্গপুরের রাজাদিগের অধিকার ছিল। পশ্চিমে, যাহা এক্ষণকার মানভূম ও বাঁকুড়া প্রদেশ, তাহা পঞ্চকোটি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ; বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশেও তাঁহাদিগের অধিকার ছিল বোধ হয়। আধুনিক মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অধিকাংশ উড়িষ্যাধিপতির অধীন ছিল। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাঁহারা ইংরেজের অধীনস্থ হইতে ঘৃণা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব্ব পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িয়ার অধীন ছিলেন। দক্ষিণে বরিশাল জেলা ও যশোহরের পূর্ব্বাংশ, চন্দ্রদ্বীপের রাজার রাজ্যান্তর্গত। তৎপূর্ব্বে ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি প্রদেশ ত্রিপুরারাজ্য ভুক্ত। চট্টগ্রামে "মগের মুলুক।"

এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। তথাপি গৌড়ের কিছু প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্যের একটা কারণ, গৌড়রাজ্য সকলের মধ্যবর্ত্তী; এবং লক্ষণ সেন, ও বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রবলপ্রতাপ রাজগণের রাজ্যকালে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! লক্ষ্মণ সেন ও বল্লাল সেনের সময়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এমতও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। মিথিলা ইহাদের করতলস্থ ছিল—বারাণসী পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষ দশায় এ গৌরবের কিছুই ছিল না। তবে সে গৌরবের স্মৃতি ছিল—পূর্ব্ব সৌষ্ঠবের ভগ্নাংশ ছিল। আর ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই রাজ্য মধ্য-দেশের

অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া, মগধ কান্যকুব্জাদি মধ্যদেশী সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সহিত ইহার অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এইখানেই আর্য্য-জাতীয়দিগের অধিকতর ভরাভর ছিল। কাজেই বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য, প্রভৃতি সভ্যতার উপাদান সকল বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা লক্ষ্মণাবতীতে অধিকতর প্রচুর ছিল।

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের শেষাবস্থায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক ভাগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী; কেবল মধ্য বাঙ্গালা, অর্থাৎ এখন যাহা মালদহ, মুরশীদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত, তাহাই লক্ষ্মণাবতী-পতির অধিকৃত ছিল। আর পূর্ব্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, সুবর্ণগ্রামের অধিকারভুক্ত ছিল। সেখানেও সেন রাজা রাজ্য করিতেন।

অতএব এক কালে গৌড়রাজ্য যত বড়ই থাকুক না কেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময়ে তাহা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রাচীন গৌরবে বড়, নহিলে আর বড় কিছুতেই নহে। এখন সেই রাজ্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ অক্ষম শাসনকর্ত্তার হস্তে, মুসলমানের জন্য সুপক্ক ফলের ন্যায় ঝুলিতেছিল।

এই সকল রাজ্যগুলিকে আর্য্যভূমি বলা একটু অত্যুক্তি। আজিও বাঙ্গালা আর্য্যভূমি নহে। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক অনার্য্যবংশ সম্ভূত। ভারতবর্ষের অন্যত্র যাহা হইয়াছে বাঙ্গালাতেও তাহা হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই সমাজের উচ্চস্তর সকল আর্য্যবংশীয়, সমাজের নিম্নস্তর সকল অনার্য্যবংশীয়। কোথাও কম, কোথাও বেশী। কোথাও, অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে, আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আর্য্য ভাষা গ্রহণ করে নাই। দাক্ষিণাবর্ত্তে ঐরূপ। কোথাও, ঐ অনার্য্যগণ, আর্য্যদিগের বশীভূত হইয়া, আর্য্য প্রভুদিগের সমাজভুক্ত হইয়া, আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আর্য্য ভাষাও গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় সেইরূপ। আর্য্যেরা বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী আর্য্য নহে।

যদি এখন এই অবস্থা, তবে সেন রাজ্যের শেষাবস্থাতেও এইরূপ ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। বরং এখন, কালসহকারে জাতীয় সম্মিলন পূর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়াছে। তখন আর্য্য ও অনার্য্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল, ইহাই অনুমেয়। বাঙ্গালার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে, ক্ষীণা-লোকে দেখিতে পাই, নানাজাতি চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে। আগে কোলবংশ। অন্ধকারে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের কৃষ্ণকায় দেশব্যাপক দেখা যায়। তার পর, দ্রাবিড়ী অনার্য্যেরা আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিম হইতে তাহাদিগকে

ঠেলিতেছে। তার পর আর্য্যদিগের আবির্ভাব। বাঙ্গালায় আর্য্যেরা কখন আসেন, তাহার নিরূপণ অতি কঠিন। যখনই আসুন, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যের সংখ্যা অল্প সন্দেহ নাই। এখনকার বাঙ্গালী আর্য্যদিগের মধ্যে সংখ্যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থই অধিক; এই ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে অল্পাংশ ভিন্ন সকলের পূর্ব্বপুরুষেরা আদিশূরের সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। অতএব আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যসংখ্যা অল্প ছিল। ঐতিহাসিক প্রভাতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্যময়; এই বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক বাঙ্গালার অনার্য্যগণ প্রথমে আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল থাকিলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু পালবংশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। সেনরাজারা পৌরাণিকধর্ম্ম স্থাপিত করিলেন। পৌরাণিকধর্ম্ম বৈষম্যময়—ইহার হাতে সমাজকর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইলে সমীকরণ কার্য্য আর তত নির্ব্বিঘ্ন রহিল না। জনসমূহমধ্যে একজাতীয়ত্ব জন্মিল না। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মুসলমান আসিলেই, সেই সমাজের একভাগ—অর্দ্ধেক ভাগ বলিলেও বলা যায়—মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিজিতের সমাজ ত্যাগ করিয়া জেতৃগণের সমাজে গেল। জাতীয় বন্ধন ছিল না।

অতএব দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালায় আসিল, তখন বাঙ্গালা একেবারে বন্ধনশূন্য। কতকগুলি অনতিবৃহৎ রাজ্য—রাজ্যে রাজ্যে কোন বন্ধন নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি—জাতিতে জাতিতে কোন আচ্ছেদনীয় বন্ধন নাই। যাহা ছিল, তাহাও ভিতরে ঘুনেধরা। এই ভিন্ন ভিন্ন অনতিবৃহৎ রাজ্যগণের মধ্যে কোনটিও একতা সম্পন্ন নহে—কোনটি আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্যের মত নিরেট গড়নের নয়। এই সকল রাজ্যের ভিতর আবার করদ রাজারা ছিলেন। বৃহত্তর রাজ্যের রাজা তাহাদের উপর সার্ব্বভৌম ছিলেন। মধ্যকালের ইউরোপে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বার্গণ্ডি বা নর্ম্মাণ্ডির অধিপতির যে সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ সুজারাইনের * সঙ্গে বাসালের † যে সম্বন্ধ, সার্ব্বভৌমের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রাজাদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল। ইহারা সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন, সার্ব্বভৌমকে কদাচিৎ কর দিতেন, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য যোগাইতেন। তার পর তাঁরাই রাজা—তাঁহারাই প্রজাপালক—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, রাজভাগের অধিকারী। এরূপ সার্ব্বভৌমের বাহু বড় দুর্ব্বল। অধীনস্থ রাজগণের সাহায্য সকল সময়ে পাওয়া যায় না। কখন তাহারা জুটিতে পারিল না—কখন অনিচ্ছুক—কখনও শত্রুপক্ষ। এইরূপ অধীনস্থ রাজগণকে কাবু করিয়াই

* Suzerain. † Vassal.

ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সকল বলবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছে। গৌড়ে তাহা হয় নাই—গৌড়েশ্বর সার্ব্বভৌম অনায়াসপরাজিত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজগণ হইতে একটা বিশেষ সুফল জন্মিল। সার্ব্বভৌম পরাজিত হইলেন বটে—মুসলমান তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজারা বজায় রহিলেন। তাঁহারা যেমন সেনরাজাকে মানিতেন, মুসলমান সুলতানকেও সেইরূপ মানিতে লাগিলেন—কিন্তু প্রকৃত রাজশাসন তাঁহাদেরই হাতে রহিল। যে অর্থে এখন বাঙ্গালা পরাধীন, পাঠানদিগের সময়ে সে অর্থে পরাধীন হইল না। আকবর শাহের সময়েও ইহারা এমন প্রবল ছিলেন, যে তাঁহারা প্রয়োজনমতে অতি বিশাল অশ্বারোহী ও পদাতি যুদ্ধপোত বাহির করিতে পারিতেন। এখনও ইহাদের উচ্ছেদ হয় নাই—তবে ইংরেজের আমলে ইহারা জমীদার মাত্র—আর কোন শক্তি নাই।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয় সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা "তাকরাত নাছিরি" নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে। ঐ গ্রন্থের প্রণেতা আবু ওমর মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন জর্জাতি—অথবা সংক্ষেপতঃ মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন। তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারার্থ এই।—

"৫৯৯ হেজিরা-অব্দে (ইং ১২০২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদেরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, যে পুরাণে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তুর্কিয়েরা বাঙ্গালা জয় করিবে। অতএব মহারাজ নিজ ধনসম্পত্তি, পৌরজন, ও রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোন নির্ব্বিঘ্ন ও দূরবর্ত্তী প্রদেশে লইয়া যান যে, সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের কোন শঙ্কা না থাকে।

"এই কথা শুনিয়া, রাজা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে পুরুষ বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল—হাঁ আছে আর সে বর্ণন, বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত আছে, তাহারই অনুরূপী।

"রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ, এবং নবদ্বীপের পক্ষবাদী। তিনি ব্রাহ্মণ-দিগের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার কোন উপায়ও করিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গ এবং যত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই আপন আপন পৌরজন ও ধনসম্পত্তি "জগন্নাথ প্রদেশে" (উড়িষ্যায়) অথবা গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল।

"৬০০ হেজিরা অব্দে, [ইং ১২০৩।৪] মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সম্বাদ পাইয়া গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বেহার হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন যে, তাঁহার আগমন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

"নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে তাঁহারা রাজদূত; নবদ্বীপাধিপতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অসি নিষ্কাষিতপূর্ব্বক রাজানুচরবর্গকে বধ করিতে লাগিল।

"রাজা লাছমনীয়া * তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের আর্ত্তনাদ শুনিয়া, খড়কীদ্বার দিয়া, পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন।

"মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল। তাহারা কতকগুলি হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগব ও পুরী অধিকাব কবিল। বাজা এই সংবাদ শুনিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন; এবং অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মানুশীলনে নিয়োগ করা স্থির করিয়া জগন্নাথে চলিয়া গেলেন। পবে শ্রীমন্দিবের সন্নিকটে মৃত্যুলাভ করিয়াছিলেন।

"রাজার পলায়নের পর বখ্‌তিয়ার সৈন্যের দ্বারা নগর লুঠ করাইলেন—আপনি কেবল হস্তীগুলি এবং রাজভাণ্ডারস্থ দ্রব্যজাত রাখিলেন। তাহার পর তিনি নির্ব্বিবাদে লক্ষ্মণাবতী গমন করিলেন।"

এই সকল কথার কিছু পবে লেখা আছে যে বখ্‌তিয়ার এক বৎসরে বাঙ্গালাজয় সম্পন্ন কবিলেন।

এই বৃত্তান্ত কতদূর সমূলক, তাহার বিচাব পশ্চাৎ করিতেছি। কিন্তু সমূলক হোক আর অমূলক হোক, এই লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্থূলবুদ্ধি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণ রটাইয়াছেন, যে সপ্তদশ অশ্বাবোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। অল্প বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যে এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রথমতঃ, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন কোথায় লিখিয়াছেন? উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে

* বোধ হয়, ইহারও নাম লক্ষ্মণসেন ছিল।

কেবল ইহাই লেখা আছে, যে সপ্তদশ অশ্বারোহী মিথ্যা ছল করিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিয়াছিল। ছিচ্‌কে চোরে সচরাচর এরূপ ছল করিয়া সকলেরই পুরী প্রবেশ করিয়া থাকে—তাহাদিগকে কেহ রাজ্যবিজেতা বলে না। এই সতের জন জুয়াচোর রাজপুরী অধিকার করিতে পারে নাই—তাহা মিন্‌হাজ উদ্দীনের কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। কেন না, মিনহাজউদ্দীন লিখিতেছেন, যে অবশিষ্ট মুসলমান সেনা তৎপশ্চাৎ আসিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিয়াছিল। অতএব রাজ্যজয় দূরে থাক্, নগর জয় দূরে থাক্, রাজপুরীখানিও সেই সপ্তদশ চোরে জয় করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ রাজা পলাইয়াছিলেন বটে--তাঁহার মুখ রাখিবার জন্য নাবিক রণপণ্ডিত ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌স্ উদাহরণ আছেন—কিন্তু সমস্ত সৈন্য না আসিলে যখন রাজপুরী অধিকৃত হয় নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, যে রাজা পলাইলে পরেও পুরী রক্ষকেরা যুদ্ধ করিয়া সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে পারে নাই—কেবল তাহারা মার্শমান প্রভৃতি স্থূলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বখ্‌তিয়ার সমস্ত সৈন্য লইয়া পুরী ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল, ইহা মীনহাজউদ্দীন নিজেই লিখিয়াছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী পদার্পণ করিয়াই দেশ জয় করা দূরে থাক্, সমস্ত মুসলমান সেনা এক বৎসরের কমে রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ, একবৎসরে সমস্ত মুসলমান সেনা লইয়া বখ্‌তিয়ার যাহা জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা নহে—লক্ষ্মণাবতী। বাঙ্গালা যে নয় দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, বখতিয়ার তাহার মধ্যে একটি মাত্র জয় করিয়াই কেবল ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার জয়কর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি নিজে জীবিত কালে বাঙ্গালায় আর কোন অংশ জয় করিতে পারেন নাই। কামরূপ জয় করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামরূপরাজের নিকট হইতে ব্যাঘ্রতাড়িত শৃগালপালের ন্যায় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলন। পাঠানবংশে কেহই সমস্ত বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। মোগলেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন কোন প্রদেশ তাঁহাদেরও অবিদিত ছিল—যথা কুচবিহার ও বিষ্ণুপুর। কেবল ইংরেজই প্রকৃতার্থে বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন —সপ্তদশ চোর বাঙ্গালা জয় করে নাই।

তারপর আমার বক্তব্য এই যে, আদৌ মিন্‌হাজউদ্দীনের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ। যে ইতিহাস লেখে সে-ই সত্য

লেখে না। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যাকথা লেখে, কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা লেখে। মিন্‌হাজউদ্দীনের ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা লিখিবার সম্ভাবনা কি না, তাহা পরে বিবেচনা করিব। আগে দেখি অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা আছে কি না। বাঙ্গালা জয়ের বৃত্তান্ত মীন্‌হাজউদ্দীন কিসে জানিলেন? যে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু, মিন্‌হাজউদ্দীন স্বয়ং বাঙ্গালা জয় দেখেন নাই; তিনি সে সময়ের লোক নহেন। তিনি বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে নিজ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। স্বয়ং না দেখুন, ঘটনার সমকালিক লোক না হৌন, কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার কথা মানি। কিন্তু মিন্‌হাজউদ্দীন কোন বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লেখেন নাই। নাই হৌক—যদি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানি। তাঁহারও সেই দাবিদাওয়া—বিশ্বাসের উপর তাঁহার অন্য দাবিদাওয়া নাই। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালায় মাস কত বাস করিয়া লোকের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা বাঙ্গালার জয় বৃত্তান্ত জানিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কবে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন? তাহার ঠিকানা করা যায়। ইং ১২৪৪ সালে, তৈমুর খাঁ ও তোঘন খাঁ নামক দুইজন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে পড়া যায়, মিন্‌হাজউদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রফা করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালা জয়ের ৫০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠানেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতকগুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধেই সবাই মরিবে এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে, যে বখ্‌তিয়ার কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ জয় করিতে আসেন। অতএব তাঁহার সহচর যোদ্ধৃবর্গ, আর ৪০ বৎসরের মধ্যে সহজেই—কেবল মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই—স্বর্গারোহণ করাই সম্ভব। তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও সত্তর আশী বৎসরের বুড়া দুই চারিজনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতাদিগকে প্রতিবৎসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে ইহা বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক, যে চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাঁচিয়াছিল। যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কতদূর বিশ্বাস করা উচিত? যদি কেহ বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্র। বাঙ্গালা জয়ের গল্পটা তাহাদের একচেটে মহল—কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তারপর বুড়া বয়সে

কিছু গাল-গল্পের শ্রীবৃদ্ধি—মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তারপর, গল্পটার বিষয় আপনাদের মরদানি—সেই বহুকাল অন্তর্হিত জোয়ানগির বাহাদুরি। তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শত্রুপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা। সেই বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি না বাড়াইয়া, মিন্‌হাজউদ্দীনকে সত্য কথা বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হোক—আমি এমন বিশ্বাস করিব না। আজিকার দিনে আমাদের চক্ষের উপর যে সকল ঘটনা হইতেছে, তাহাতে জাতীয় গৌরবের সম্বন্ধ থাকিলে, তাহারই সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা যায় না। সত্যাভিমানী কৃতবিদ্য, বড় সভ্য, জাতিদিগের মধ্যে যাহা কোটি কোটি চক্ষের উপর হইতেছে, তাহাই সত্যমিথ্যা জানা যায় না। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে কে জিতিল তাহা আজিও জানিতে পারিলাম না। ইংরেজ বলে আমাদের ওয়েলিংটন জিতিয়াছে। জর্ম্মান বলে আমাদের ব্লূচর জিতিয়াছে। ফরাশী বলে কেহ জেতে নাই; আমাদেরই কুলাঙ্গার বুর্মো ও গ্রুশির বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা হারিয়াছি। আইলোর লড়াই নাপোলেয়ন জিতিল কি হারিল তাহা ইতিহাস আজিও ঠিক বলে না। তুলুসের যুদ্ধে ইংরেজ জিতিল, কি ফরাশী জিতিল, তাহা লইয়া ঘোর বিবাদ। বিদেশ দূরে থাক, যে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক অন্ধকারের কথার আন্দোলন করিতেছি, সেই বাঙ্গালার ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নে আইস। পলাসির যুদ্ধ ইংরেজের আমলে হইয়াছে। ইংরেজ বিজেতারা—যাহারা স্বয়ং লড়াই করিয়াছিলেন—তাহারা নিজে সে যুদ্ধ সম্বন্ধে, চিঠিপত্র, রিপোর্ট, ডেস্পাচ, করেস্পণ্ডেন্স, মেময়ের, ইতিহাস—এইরূপ বহুতর লিখিয়াছেন। সেই মূলের উপর নিশান গাড়িয়া, ইংরেজি ইতিহাস বলে যে, তিনশত ইংরেজ জনকত তেলাঙ্গার সাহায্যে পঞ্চাশ হাজার নবাবী ফৌজ পরাজয় করিয়াছিল—ইহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর আর এক এডিশ্যন্। সৌভাগ্যক্রমে, এইখানে একজন ইংরেজের পক্ষবাদী মুসলমান ইংরেজের মাধ্যাহ্ন সূর্য্যের কাছে একটি মুস্কিল আসানের চেরাগ জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় স্থূল বৃত্তান্ত এই জানা যায়, যে পলাসিতে যেটুকু যুদ্ধ হইয়াছিল, সেটুকু ইংরেজের হার হইয়াছিল। বেগোছ দেখিয়া ক্লাইব মীরজাফরকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে এ আবার কি? সত্যকার লড়াইয়ের ত কথা ছিল না। শুনিয়া মীরজাফর নবাবকে বলিলেন যে, আজ বেলা গিয়াছে, আজ আর যুদ্ধে কাজ নাই—ফৌজ ফিরিয়া আসুক। নবাবের ফৌজ ফিরিল। তখন ক্লাইব পিছন হইতে তাহাদের উপর গোটাকত কামান দাগিলেন। পলাসির লড়াই ফতে হইল। সেও আজ ১২৫ বৎসরের কথা। পঞ্জাবের লড়াই আজিও চল্লিশ বৎসর হয় নাই—পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেরই সে কথা মনে থাকিতে পারে। ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে মুদকীর লড়াইয়ে,

ফিরোজসহরের লড়াইয়ে, চিলিয়ান্‌ওয়ালার লড়াইয়ে ইংরেজের জয় হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজি ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারা জানেন যে সে বৃত্তান্ত কি।

যদি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নে, যদি সত্যনিষ্ঠ কৃতবিদ্য জাতির মধ্যে, যদি কোটি দর্শকের চক্ষুর উপর, যদি এই লেখালেখি, দেখাদেখির মধ্যে, যদি এই সম্বাদপত্র, পত্রপ্রেরক, সমালোচক বাজারের মধ্যে, ছাপাখানা, ডাকঘর, স্বজাতি, ভিন্নজাতির সাক্ষাৎকার এইরূপ ইতিহাস চলে, তবে সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘোরান্ধকারে, বাঙ্গালার ন্যায় ইতিহাসশূন্য স্থানে, অশীতিপর গালগল্পপরায়ণ, আত্মগরিমায় অন্ধ, বাঙ্গালির দ্বেষক জন দুই বুড়া মুসলমানের কথায় বিশ্বাস কি ?

মনে কর, যেন তাহারা সত্য কথাই মিন্‌হাজউদ্দিনকে বলিয়াছিল, তাহা হইলেও মিন্‌হাজ্‌উদ্দিন যে সত্য কথা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক কি ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন জাতিই মিথ্যা কথা দ্বারা স্বজাতির গৌরব বাড়াইতে ক্রটি করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা এই সব সময়ে কখনই সত্য লেখেন না। যেখানে হিন্দুদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা হয় হিন্দুদিগের কীর্ত্তি একেবারে গোপন করিয়াছেন, নয় যেখানে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেখানে মিথ্যা রচনা করিয়া জাতীয় গৌরব বাড়াইয়াছেন। হিন্দুদিগের কীর্ত্তি যে তাঁহারা সচরাচর গোপন করেন, তাহার তিনটি উদাহরণ দিব।

প্রথম উদাহরণ, রাজপুতানা। রাজপুতানা, মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট। তাহার চারিপাশে মুসলমান রাজ্য। মুসলমানেরা ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিল, কিন্তু মাঝখানে এই রাজপুতমণ্ডল মুসলমান রাজ্যের বহির্ভূত রহিল। রাজপুতানা অধিকার করিতে মুসলমানেরা যত্নের ক্রটি কিছুই করে নাই। পাঠানরাজার শ্রেষ্ঠ আলাউদ্দীন, মোগল বাদশাহার শ্রেষ্ঠ আকবর ; আরও যে পারিয়াছে সেই পুনঃ পুনঃ রাজপুতানা আক্রমণ করিয়াছে। অনেকবার মুসলমানের রণজয় হইয়াছে ; যতবার রণজয় হইয়াছে, ততবার ক্ষুদ্র রাজপুত-রাজগণ আবার স্বাধীন হইয়াছে, আবার মুসলমানকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহা সামান্য বীরত্বের পরিচয় নহে। সসাগরা ভারতেশ্বরগণ ক্ষুদ্র রাজপুত-রাজগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত না হইলে, কখন এ ফল ফলে নাই—মুসলমান শক্তি থাকিতে কখন কোন দেশ ছাড়ে নাই। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা রাজপুতানায় মুসলমানের জয়েরই পরিচয় দিয়াছেন—মুসলমানের পরাজয়ের একছত্রও কেহ কোথাও লেখেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, রাজপুতানার ইতিহাস

রাজপুতে লিখিয়া রাখিয়াছিল। রাজপুতের ঘর হইতে সেই ইতিহাস বাহির করিয়া একজন ইংরেজ তাহা প্রচার করিয়াছেন। কর্ণেল টডের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান সম্রাট ক্ষুদ্র রাজপুত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছেন। সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না তাহা সত্য না হইলে শেষ পর্য্যন্ত রাজপুতানা স্বাধীন থাকিত না। অথচ রাজপুতদিগের এই অলৌকিক কীর্ত্তির বিন্দুবিসর্গ মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা প্রচার করেন নাই। যে যুদ্ধ রাজপুতানার মারাথন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহা রাজপুতানার থার্ম্মপিলি, মুসলমানেরা তাহার কথা মুখে আনেন না।

দ্বিতীয় উদাহরণ, দাক্ষিণাত্যে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানেরা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই চারিশত বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা মুসলমানদিগের সঙ্গে বিবাদ করিযাছিল। সেই হিন্দুদিগের কয়টা কথা মুসলমানেবা লিখিয়া রাখিয়াছেন? সেই হিন্দুদিগেব মুখোজ্জলকারী মহারাজাধিবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়েব কথা, একজন ইংরেজ-লেখক হইতে উদ্ধৃত কবিতেছি।

"The commencement of the sixteenth century discloses the allies fighting rather unsuccessfully against the great Hindu monarch of the south, who at that time founded a power which threatened to sweep the Mahomedans into the sea. The heroism and policy of Krishna Raya still live in the songs of Southern India. The popular legends love to relate how he carried his victorious arms from Ceylon to the mountains of Thibet, and sober history recognises in him the last breakwater which Hindu valor opposed to Mussulman conquest. In this great national struggle the Orissa monarch fought on the unpatriotic side. But his perfidy failed to yield safety. The southern monarch crushed the unholy alliance, and the Orissa king found himself compelled to give up his daughter in marriage to the last of the Hindu heroes. . . . We may pass over with a smile the legendary expeditions of their hero-monarch from Ceylon to Thibet; but the Portuguese historians attest his greatness,

and all India, from the Narbudda downwards, acknowledge his sway."*

হণ্টর সাহেব একটি নোটে পর্ত্তুগিস ইতিহাসবেত্তাদের কথা লিখিয়াছেন, "They mention Krishna Raya's siege of Rachol, near Bombay, with an army of 35,000 horse and 733,000 foot. A Mahommedan force which advanced to relieve the city was defeated, and had to accept as the degrading terms of peace, the acknowledgment of Krishna Raya as the Lord Paramount of Kanara, and the kissing of his feet." pp. 8-9.

পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট লক্ষ সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, ভারতবর্ষের মুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদণ্ড স্বরূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে? আমি ফারসি জানি না, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহাবা কৃষ্ণরাযের নামও করেন নাই। এ সকল নাম করিয়া তাঁহাবা লেখনীকে পাপগ্রস্ত কবেন না। সের শাহা বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহাব ইতিহাস লেখকেরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না—রাজা গণেশ বাঙ্গালা জয় কবিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছত্র লিখিলেন।

তৃতীয় উদাহরণ—উড়িষ্যা। পরের রাজ্য বিশেষ হিন্দুরাজ্য দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে হইবে, ইহা মুসলমানদিগের অলঙ্ঘ্য ব্রত ছিল। পাঠানেরা বাঙ্গালায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া, সীমান্তস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যের প্রতি যে লোভ করেন নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালায় স্থির হইয়াই, পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাড়ে তিনশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। যে উড়িয়ারা, এখন একজন বাঙ্গালির ধমকে কাঁদিয়া ফেলে, সে উড়িয়ারা তখন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিল। বাঙ্গালাজয়ের পর প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীমধ্যে বাঙ্গালার পাঠানেরা চারিবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; চারিবারই উড়িয়া খণ্ডাইত-দিগের অস্ত্রাঘাতের জ্বালায় প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই সকল যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই এমত নহে। কিন্তু তাঁহারা যাহা লেখেন তাহাতে এই বুঝিতে হয় যে, মুসলমান সেনাপতিরা উড়িষ্যা জয় করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জয় করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার নূতন রকমের যুদ্ধ বটে; ইহা কেবল মুসলমান লেখকদিগের কাছেই শুনিতে পাই। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে মুসলমানকৃত ভারত জয়ের বৃত্তান্ত সমালোচনা করিয়া, এই

* Hunter's Orissa, Vol II, pp. 7-9.

পলায়নতৎপর বিজেতৃবর্গের কীর্ত্তি-কলাপের পরিচয় দিব। বসরার খলিফাগণের সেনাপতি সম্প্রদায় হইতে ঘোরীর সাহাবুদ্দীন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ধরিয়া কেবল ভারতবর্ষ জয় করিয়া পলাইতেন। শেষ যেবার শিকায় ছিঁড়িল, সেবার আর পলাইলেন না!

সে যাই হউক, উড়িয়াদিগের সঙ্গে পাঠানদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ পরিচয় দিয়া, এ বিষয়ে এখন ক্ষান্ত হইব। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তোঘন খাঁ নামে একজন উগ্রস্বভাব তাতার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তোঘন সসৈন্যে উড়িষ্যাজয়ে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। লোকে তাঁহাকে লাঙ্গুলীয় নরসিংহ বলিত; কেন, তাহা জানি না। কিন্তু এই লাঙ্গুলীয়ের নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। তিনিই কোনার্কের অদ্ভুত সূর্য্যমন্দির প্রস্তুত করেন—জগতে অতুল্য কীর্ত্তি। তিনি শাহাজাঁহার মত নির্ম্মাত ছিলেন; তাঁহার অপেক্ষা রণপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তে তাতারের বর্ব্বর এরূপ প্রহার প্রাপ্ত হইলেন যে, সসৈন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু লাঙ্গুলীয় ছাড়িবার পাত্র নহে—সৈন্য লইয়া খাঁ সাহেবের পিছু পিছু ছুটিল। উড়িয়া সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বীরভূমের রাজধানী নগরে মুসলমানদের এক আড্ডা ছিল—একভাগ গিয়া বীরভূম জয় করিয়া নগর অধিকৃত করিল। আর একভাগ গৌড়ে গিয়া রাজধানী অধিকৃত করিল। তোঘন ফাঁপরে পড়িয়া দিল্লীর বাদশাহের কাছে নালিস করিলেন। দিল্লীশ্বর গৌড় পুনর্জ্জয়ের জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। শুনিয়া নরসিংহ দেব হাতির উপর লুঠের মাল বোঝাই করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লইয়া বড় গোলে পড়িলেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন? বুদ্ধি খরচ করিয়া লিখিলেন, জঙ্গীস্ খাঁ তাঁহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাজপুরের লাঙ্গুলীয় পৃথিবী প্রমথনকারী জঙ্গীস্ খাঁ হইয়া গেল—উড়িষ্যার খণ্ডাইতেরা মোগলসেনা হইয়া গেল। আর বাকি কি?

এই ত মুসলমানি ইতিহাস। মীনহাজউদ্দীনও সেই গোষ্ঠী। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না। বখ্‌তিয়ারের কামরূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে মিনহাজউদ্দিন উপন্যাসলেখক—ইতিহাসলেখক নহেন। ইহা হইতে পারে, তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা জয়ের বিবরণ সত্য—হইতে পারে মিথ্যা। কোন দিক ঠিক করিয়া বলা যায় না। ইহা নিশ্চিত যে লক্ষণাবতী বিজিত হইয়াছিল।

আর সে সময়ে লক্ষণাবতীর যে অবস্থা, তাহার পর্য্যালোচনায় ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, লক্ষণাবতী সহজে বিজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে সময়ে সামাজিক ঐক্য ছিল না। শাসনকর্ত্তৃগণ আর্য্য—প্রজাগণ অনার্য্য। সাধারণ প্রজার পক্ষে মুসলমান যেমন পর, আর্য্যেরাও তেমনি পর। এ অবস্থায় আর্য্যের জন্য যে অনার্য্যেরা মুসলমানের বিরোধী হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বরং সাম্যময় ইস্‌লাম, বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্ম্মের অপেক্ষা তাহাদের কাছে আদরণীয়—নীচ জাতি বলিয়া আর্য্যের কাছে তাহারা ঘৃণিত—মুসলমান নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই জন্যই মুসলমান জয়ের পর অর্দ্ধেক অনার্য্য হিন্দু ইস্‌লামের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয়, লক্ষণাবতী তখন এক বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য রাজার হাতে পড়িয়াছিল। রাজা রাজ্যরক্ষণে অক্ষম; আর কে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবে? ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজ্য রাজার, তিনি রক্ষা করিতে হয় করিবেন, না হয় পরে লইবে, প্রজার, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা ভারতকলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য মুসলমানেরা শীঘ্র অধিকার করিতে পারেন নাই—সে সকল রাজ্যে সেন রাজার মত অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ পায়েন নাই। তৃতীয়, লক্ষণাবতীতে—বাঙ্গালার অধিকাংশ রাজ্যে, তখন যুদ্ধব্যবসায়ী কোন সম্প্রদায় ছিল না পড়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় বাঙ্গালায় আসে নাই। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় না থাকুক, রাজপুত ছিল। সেই জন্য পশ্চিম ভারত অধিকার করিতে মুসলমানদিগকে সাত শত বৎসর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। লক্ষণাবতীতে তাহা ছিল না—লক্ষণাবতী এক বৎসরে অধিকৃত হইল।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে লক্ষণাবতীর সেই অবস্থা তুলনা করিয়া দেখা যাউক। দেখিতেছি বাঙ্গালার সেই অবস্থা আজিও আছে। তখন যেমন আর্য্যে অনার্য্যে অনৈক্য ছিল, এখনও সেইরূপ হিন্দু মুসলমানে অনৈক্য আছে। তখন যেমন যুদ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল না - এখনও নাই। রাজা এখন খুব যুদ্ধতৎপর বটে, কিন্তু ইংরেজ গেলে কি হইবে? যে পারিবে সেই আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবে। বাঙ্গালীর উচিত ইংরেজের সৈন্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা।

ম খণ্ড
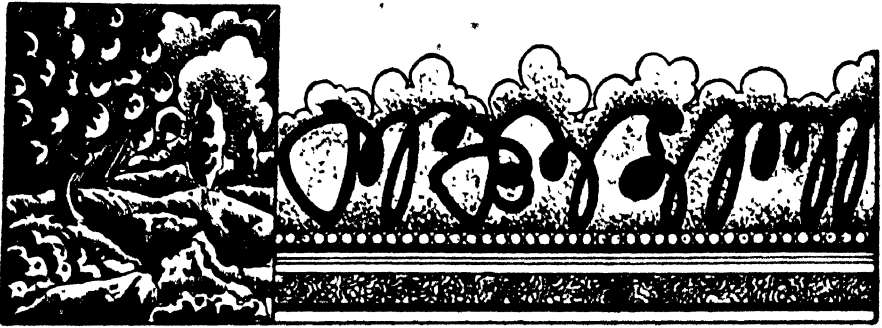
১

কুণাল ও কাঞ্চন গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুজনেরই মনে ভয়ানক আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্রই বিপদ হইবে, কিন্তু দুইজনেরই ভরসা হইয়াছে যে, উহার পরিণাম সদ্ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বড় শুভকর হইবে। তাঁহারা সমস্ত পথ কাটাইয়া কাঞ্চনকুটীরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র দ্বারের উপর হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র পতিত হইল, তাহাতে এই লেখা আছে,—

"তোমায় আজি আমার বিশেষ প্রয়োজন, একবার তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও—অভিনয়াস্তে তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

কুণাল দেখিলেন, পাটরাণী পবিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর। তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কাঞ্চনকে বলিলেন,—

"কাঞ্চন! পাটরাণী আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

কাঞ্চন বলিলেন, "এত রাত্রে পাটরাণী ডাকিবেন কেন?"

"যখন ডাকিয়াছেন, তখন তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য"—বলিয়া কুণাল তিষ্যরক্ষার কুঞ্জাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাঞ্চন ভাবিলেন, রাজবাড়ীতে কেবল ভয়ভাবনা আর বিচ্ছেদ ও অধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা বনে বনে ভ্রমণ ভাল না কি? ভাবিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কুণালও দ্রুতপদে কুঞ্জ মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

২

তিষ্যরক্ষাই বাস্তবিক যত নষ্টের গোড়া। সে পরিষ্যরক্ষিতার গৃহ হইতে ঐ পত্রখানি চুরি করিয়াছিল, গোপনীয় পত্র বলিয়া তাহাতে শিরোনাম ছিল না। চুরি করিয়া সে নিজেই পত্রখানি কুণালের দ্বারের চৌকাঠে লাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, অভিনয়ের পর এই উপায়ে আবার কুণালকে কুঞ্জ মধ্যে পাইবে; এবং সেই সুযোগে আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির সুবিধা করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের এক বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অভিনয় শেষ হইলে রাজা বলিলেন,—"তিষ্যরক্ষে প্রেয়সি! আজি দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তুমি আমায় বড় সন্তুষ্ট করিয়াছ। আজি আমি তোমার মহলেই রাত্রিযাপন করিব।"

তিষ্যরক্ষা মুখে মহা আনন্দসহকারে বলিল, "মহারাজ! দাসীর প্রতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি অনুগ্রহ হইতে পারে।"

কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কি উপায়ে বৃদ্ধ রাজাকে শীঘ্র ঘুম পাড়াইয়া নিজের পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শীঘ্র পলায়ন করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন, "আমি তোমার গৃহে যাইব শুনিয়া হঠাৎ এমন অন্য-মনস্ক হইলে কেন?"

দুষ্টবুদ্ধি তিষ্যরক্ষা অমনি বলিল, "মহারাজ! আমার ইচ্ছা ছিল অদ্যরাত্রে শয়ন করিব না। বহুকাল অসদ্ধর্ম্মে কাটাইয়াছি, কখন বৌদ্ধ দেবায়তন দেখি নাই, তাই মনে করিতেছিলাম, দীক্ষা লইয়া একবার রাজপ্রাসাদের ও নগরের মঠগুলি নমস্কার করিয়া আসি।"

রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"প্রেয়সি! তুমি অত্যন্ত সাধু সঙ্কল্প করিয়াছ। অতএব আমি আর তোমার মহলে যাইব না, আমি নিজ মহলেই যাই।"

তিষ্যরক্ষা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল—"স্বামিন! দেবদর্শন অপেক্ষা স্বামিপাদদর্শন অধিক বাঞ্ছনীয়। অতএব আপনি যদি আজি আমার মহলে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে অতি সত্বর দেবদর্শন সমাপন করিয়া স্বামিপাদ দর্শন করিব, তাহাতে অনেক পাপ বিনষ্ট হইবে এবং সদ্ধর্ম্ম গ্রহণের বিশেষ অধিকারী হইব।"

রাজা মহা আহ্লাদিত চিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং শতমুখে তিষ্যরক্ষার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

৩

কোনরূপে রাজাকে শয়ন করাইয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি কুঞ্জের মধ্যে উপস্থিত হইল। দেখিল, কুণাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তিষ্যরক্ষা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিষ্যরক্ষাকে দেখিয়া কুণালের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তবে তুমিই কি চক্র করিয়া আমাকে এখানে আনাইয়াছ?"

তিষ্যরক্ষা হাসিতে হাসিতে কহিল—"হাঁ, আনাইয়াছি। আমি পারিষ্যরক্ষিতার পত্রখানি চুরি করিয়া তোমার দ্বারে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। উহা গোপনীয় পত্র, উহাতে শিরোনামা ছিল না বলিয়া আমার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি তোমার জন্য এত করিতেছি, তোমার মন কি কিছুতেই বিচলিত হয় না? এইমাত্র বৃদ্ধ পতিকে বঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট আসিতেছি, তুমি এত কঠিন কেন?"

কুণাল অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিয়া তথা হইতে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তিষ্যরক্ষা দৌড়িয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল,— "যখন তুমি আসিয়াছ, যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তোমায় আমার কতকগুলি কথা শুনিতে হইবে। নহিলে আমি ছাড়িব না, এখনি চীৎকার করিয়া উঠিয়া মহারাজের নিদ্রা ভঙ্গ করিব।"

কুণাল বড় বিপদে পড়িলেন। উহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও যাইতে পারেন না, অথচ রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতেছে, বলিলেন,—"বল, কিন্তু আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—"আচ্ছা শুন, রাজার উপর আমার প্রভাব দেখিলে তো? এক মুহূর্ত্তে আমি রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়াছি। তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে আমি তাহাই দেওয়াইতে পারিব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। যদি না হও, আমি রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার কাঞ্চনমালার সর্ব্বনাশ করিব।"

কুণাল বলিলেন,—"সে যাহা করিবার করিও, এখন আমায় ছাড়িয়া দেও।"

তিষ্যরক্ষা বলিল,—"তবে জানিও, রাজপুরী মধ্যে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

কুণাল বলিলেন,—"থাক, তাহাতে আমার কিছু ক্ষতি নাই। তোমার আর কিছু বলিবার আছে ?"

"না, কিন্তু আর একদিন তোমায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।"

"সে যখন হইবার তখন হইবে, এখন আমায় পথ ছাড়িয়া দেও।"

এমন সময় দূরে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তিষ্যরক্ষা বুঝিল, পরিষ্যরক্ষিতা এই কুঞ্জে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া একটী নিবিড় লতার মধ্যে প্রবেশ করিল, কুণালকে বলিল,—"তুমি পলাও।"

৪

পরিষ্যরক্ষিতা লতাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আজি কি কি ঘটনা হইল ?"

ব্রাহ্মণ সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত কবিল। তিষ্যবক্ষা "বৌদ্ধ হইয়াছে" শুনিয়াই পাটরাণী শিহরিয়া উঠিযা বলিলেন,—"সে কি" সে যে আমাব ডান্ হাত।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহার অভিপ্রায় তো বুঝিতে পাবিলাম না।"

পাটরাণী বলিলেন,—"তবে তো কাহাকেও বিশ্বাস নাই ? আমাদেব কাজকর্ম্ম অতি গোপনে করিতে হইবে। তুমি কি পরামর্শ বল ?"

ব্রা। "গোপন তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কিসে এ বিধর্ম্ম স্রোতঃ রোধ হয় ?"

পা। "দেবতারা নিজেই রক্ষা করিবেন। কিন্তু আপাততঃ কি করিলে লোকের মন ফিরান যায়।"

ব্রা। "যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ প্রবল সেইখানে সেইখানেই বিদ্রোহ হইবে।"

পা। "কিন্তু অশোক রাজার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে কি ?"

ব্রা। "সকলে একত্র হইলে কি হয় বলা যায় না। কিন্তু সকলের একত্র হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। ব্রাহ্মণেরা যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান !"

পা। "বিদ্রোহের কথায় আমাদের কাজ নাই। অন্য কিছু উপায় আছে বলিতে পার ?"

ব্রা। "এক উপায় আছে। আমরা বোধিদ্রুমটি লুকাইয়া ফেলি। তাহার পর দিন দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিব যে, বিধর্ম্মীদের বটগাছ দেবতারা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন।"

"কিন্তু তাহা কি প্রকারে করিবেন? সেখানে অনেক পাহারা আছে।"

"সে ভার আমার। বৃক্ষ অদৃশ্য হইলে লোকে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবে এবং বিধর্ম্মীদের মুখে চুনকালী পড়িবে।"

এই প্রস্তাবে উভয়ে সম্মত হইয়া দণ্ড দুই রাত্রি থাকিতে উভয়ে ফিরিয়া গেল। উভয়ে দিব্য করিয়া গেল কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিবে না। তাহার পর প্রয়োজন হয় নগরমধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামও লাগাইয়া দিবে। কিন্তু এই দুজন ছাড়া আর কাহারও কাণে উঠিবে না।

তিষ্যরক্ষা বনান্তরালে বসিয়া সমস্ত শুনিল। শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—"আর কাজ নাই।"

আবার,—"যদি অভীষ্টই সিদ্ধ না হইল তবে জীবনেরই প্রয়োজন কি?"

এইরূপ কুণালের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিষ্যরক্ষিতা ও ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল। তখন পাপীয়সী ভাবিল,—"এই পরিষ্যরক্ষিতাকে তাড়াইয়া পাটরাণী হইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পাটরাণী হইলে, পরিষ্যরক্ষিতা অপেক্ষা আমার অনেক অধিক ক্ষমতা হইবে। যদি পাটরাণী হইতে পারি, কুণালকে আয়ত্ত করিবার অনেক সুবিধা হইবে। আমি পাটরাণী হইলে, আমিই রাজা, আমিই মন্ত্রী, এবং আমিই সেনাপতি হইব। তখন আর একবার দেখিব।

পরিষ্যরক্ষিতার সর্ব্বনাশ করিয়া পাটরাণী হইবে আপাততঃ ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল। সে কিছুকালের মত কুণালকে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মন বাঁধিল।

৫

কুণাল নিজগৃহে ফিরিয়া দ্বার খুলিলেন। খুলিয়াই দেখিলেন, কাঞ্চনমালা স্বপ্নে কাঁদিয়া বলিতেছে,—"তুমি কোথায় নাথ! তুমি কোথায় নাথ!"

কুণাল শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, কাঞ্চনের শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন কোন বিষম স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কুণাল আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"এই যে কাঞ্চন, আমি এসেছি।"

কাঞ্চন কাঁদিয়া বলিল,—"ওকি, তুমি যে পথ দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যে অন্ধ হইয়াছ?

কুণাল আবার বলিল,—

"কই কাঞ্চন, আমার ত দিব্য চক্ষু রহিয়াছে?"

"না, না, তুমি অন্ধ হইয়াছ বই কি? চল, এখানে আর কাজ নাই। ঐ দেখ, ভগবান ডাকিতেছেন। আমি লাঠি ধরি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এস। আস্তে আস্তে! নহিলে উঁচট খাইয়া পড়িবে।"

কুণাল দেখিলেন, কাঞ্চনমালা বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছে। উহার অনাবৃত শ্বেতবক্ষ তরঙ্গাভিহত গঙ্গাসলিলের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি আস্তে আস্তে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া উহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন,—"সমস্ত দিন উৎকণ্ঠার পর একটু ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গাব কি?"

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নের কষ্ট নিবারণ হইল না। কাঞ্চন বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। উহার বুক আরও ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তখন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে উহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কাঞ্চনের একটু সুস্থ বোধ হইল। কিন্তু তখনও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"নাথ! করিলে কি? এ যে শেষ রাত্রের স্বপ্ন?"

কুণাল বলিলেন,—"তা হোক্, তুমি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা কর।"

বলিয়া উভয়েই শয়ন করিলেন। কুণাল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সহজেই ঘুম আসিল। কিন্তু কাঞ্চন অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। তাহার প্রাণ হুহু করিতে লাগিল। বার বার প্রাণনাথকে স্পর্শ করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভয় ও উদ্বেগ দূর হইল না।

৬ষ্ঠ খণ্ড

১

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা আপন মহলে আসিয়া জুটিল। দেখিল, মহারাজের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সে আর নিজে ঘুমাইল না। রাজার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল। পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি জাগরণে নিজের এক একবার ঢুলুনী আসিতে লাগিল, অতি-কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া রাজার নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একবার অঞ্চল পাতিয়া রাজার পাদপ্রান্তে শয়ন করিল। আবার উঠিয়া

বাতাস করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা তাঁহার পদসেবা করিতেছে; উঠিয়াই রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখনও ঘুমাও নাই!"

"না মহারাজ, আমার আর ঘুমাইবার যো নাই।"

"সে কি, যো নাই কেন? তুমি বুঝি এই ঠাকুর দেখিয়া আসিতেছ।"

"না মহারাজ, আমার ঠাকুর দেখিতে যাওয়া হয় নাই।"

"আমি তো দেখিলাম, তুমি বাহির হইয়া গেলে?"

"গিয়াছিলাম বটে; তখনই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।"

"আসিতে হইয়াছে! ইচ্ছাপূর্ব্বক আইসো নাই?"

"না মহারাজ, সে কথায় কাজ নাই"—বলিয়া তিষ্যরক্ষা তাড়াতাড়ি স্বহস্তে রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ সুগন্ধি বারি আনিয়া দিল, এবং তাঁহার মুখাদি প্রক্ষালনের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রাত্রে কি স্বপ্ন দেখিয়া রাজার মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তিষ্যরক্ষার কথায় তাঁহার মন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—

"তুমি বল, কেন তোমায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে?"

"সে অতি সামান্য কারণ, আমি ভয় পাইয়াছিলাম।"

"না না, তুমি গোপন করিতেছ। ঠিক করিয়া বল কি হইয়াছে।"

"কিছু নয়," বলিয়া তিষ্যরক্ষা আবার রাজার মুখ প্রক্ষালনার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজা আবার তাহাকে ধরিয়া বলিলেন,—"না বলিলে আমি ছাড়িব না; তোমায় বলিতেই হইবে।"

"সত্যই মহারাজ, আমায় ভয় লাগিয়াছিল।"

"কিসের জন্য ভয় লাগিল?"

"মহারাজ, আমি মহল হইতে বাহির হইয়া আমার বাগানের সীমা পার হইতে না হইতেই দেখি, আমারই কুঞ্জমধ্যে জনকতক লোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। আমার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহার পর দেখি, দুই তিনজন লোক আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। মহারাজ এখানে একাকী শয়ন করিয়া আছেন, সুতরাং আমার বড় ভয় হইল। আমি ঘুরিয়া অন্যপথে বাড়ীমধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলাম, দেখিলাম সকল পথেই দুই একজন, লোক।

হঠাৎ কতকগুলা শুষ্ক পাতা আমার পায়ে লাগিল। তাহার মধ্যে একটা কি ঠাণ্ডা জিনিষ বোধ করিলাম, আস্তে আস্তে তুলিলাম ; তুলিয়া দেখি ছোরা। তখন আর আমার সন্দেহ রহিল না। ভয়ে প্রাণ হাঁপাইতে লাগিল। ভাবিলাম, মহারাজ আমার মহলে একা শয়ন করিয়া আছেন।"

"অঁ্যা, শুষ্ক পাতার মধ্যে ছোরা পেলে!"

"তাই পাইয়াই তো আমার আরো ভয় হইল; আমি একটু থতমত খাইয়া রহিলাম। শেষ ভাবিলাম, মহারাজ একাকী শুইয়া রহিয়াছেন, আমার কোথায়ও যাওয়া উচিত নয়।"

"তোমার কি বোধ হয়, আমারই উপর তাহাদের রাগ?"

"কেমন করিয়া জানিব মহারাজ? আমি তো সেই ছোরা সহায় করিয়া, সাহসে ভর করিয়া দরজার দিকে দৌড়িলাম। যাহারা আমার বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, তাহারা আমায় তাড়া করিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা ফেলিয়া হুড়্কা দিলাম। সে শব্দ কি আপনি শুনিতে পান নাই?"

রাজাও স্বপ্নে কি একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন,—"ঝনাৎ শব্দ শুনি নাই, একটা কি হড়্ হড়্ হড়্ হড়্ শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আপনি হুড়কা দিবার শব্দ শুনিয়াছিলেন।"

রাজা অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন,—"হবে।"

তিষ্যরক্ষা আবার তাঁহার মুখ প্রক্ষালনাদির উদ্যোগ করিতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন রাজা সম্বিৎ হইলেন, তিষ্যরক্ষাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"কে কে লোক আসিয়াছিল, কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি?

"না মহারাজ, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই।"

"তাহাদের বেশ কিরূপ ছিল?"

"একে আমার ভয়ে ধাঁদা লাগিয়াছিল, তাহার পর জ্যোৎস্নালোকে সবই চক্চকে দেখাইতেছিল।"

"কয়েকজন লোককে এদিক ওদিক দিয়া আসিতে দেখিলে, কে কোন্ দিক দিয়া আসিল মনে হয়?"

"দুই একজন লোক কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া আসিয়াছিল।"

"কাঞ্চনকুটীরের দিক দিয়া! ব্যাপারখানা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যা হোক্, তুমি আমায় ডাক নাই কেন?"

"প্রথমে দরজা দিয়াই তো খানিকক্ষণ অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আসিয়া দেখিয়া গেলাম, মহারাজ নিদ্রাগত আছেন, বাড়ীর ভিতরে কোন গোলযোগ নাই। একবার ভাবিলাম, মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ করি; আবার ভাবিলাম, ছাদের উপর হইতে দেখিয়া আসি, বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখিলে মহারাজকে জাগাইব।"

"তুমি ছাদে উঠিয়াছিলে? কিছু দেখিতে পাইয়াছ?"

"কিছুই না।"

"একবারে কিছু না? এত লোক সব তবে কোথায় গেল?"

"কেবল বোধ হইল যেন দুজন একজন লোক পাটরাণীর মহলের কাছ দিয়া কোথায় গেল।"

"পাটরাণীর মহলের দিক্ দিয়া গেল, না মহলে গেল?"

"ঠিক বলিতে পারিতেছিনা; সেই পর্য্যন্তই গেল, তারপর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।"

"আমার একটা বড় সন্দেহ হইতেছে।"

"আমি তো মহারাজ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, রাত্রে আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

মহারাজ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ভয়ের তো খুবই কারণ আছে দেখিতেছি," বলিয়া মহারাজ সত্বর রাধগুপ্তকে ডাকাইয়া তাহাকে এই ব্যাপারের তথ্য অনুসন্ধানের ভার দিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিষ্যরক্ষা আপত্তি করিল যে, তাহার মহলে বসিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান না হয়। রাজা তাহার সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

২

রাজা চলিয়া গেলে, রাধগুপ্ত রাণীকে ইঙ্গিত করিয়া একটু নিভৃত স্থানে গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ আবার কি খেলা খেলিতেছ?"

"বুঝিতেছ না কি?"

"কার মাথা খেতে হবে?"

"পরিষ্যরক্ষিতার প্রথম, আর কুণালের যদি পারি।"

"পরিষ্যরক্ষিতার কি অপরাধ? পাটরাণী হবার সখ হয়েছে না কি?"

"কণ্টক দূর করাই ভাল ?"

"কুণালের উপর অত্যাচার কেন ?"

"রাজা বৌদ্ধ হইয়া অবধি উহার উপর বড় ভক্তি, উহাঁকে বিদায় করা প্রয়োজন।"

"আবার তক্ষশীলায় না কি ?"

"বিম্বিসার বংশের কোন্ ছেলে তক্ষশীলার জল না খেয়েছে ?"

"বুঝিলাম। আপাততঃ তবে কুণাল আর পবিষ্যরক্ষিতাকে ধরে আস্তে হচ্ছে ?"

"শুধু তাই নয়, আর জনকত লোক যারা পড়লেই কথাটা বুঝতে পারে, আর কিছুতেই ডরায় না, এমন চার পাঁচজন লোকও সেই সঙ্গে।"

৩

রাধগুপ্ত অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল,—"কিছুই তো ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

রাজা অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর কিছুই সন্ধান পাইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার বাড়ীর মধ্যে আমার দ্বারদেশে কতকগুলা লোক জমায়েত হইল, তোমরা ইহার কিছুই সন্ধান করিতে পারিলে না ? তোমাদের মত মন্ত্রী লইয়া রাজ্য করা বিড়ম্বনামাত্র।"

রাধগুপ্ত অবনতবদনে অধোমুখে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, আমি তো কিছুই সন্ধান পাইলাম না, কিন্তু আপনি সত্বরই সন্ধান পাইতে পারেন। যাহারা জমায়েত হইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ কাঞ্চন-কুটীরের দিকে, কেহ কেহ পাটরাণীর মহলের দিকে গিয়াছে। আপনি ইহাদের কাহাকেও যদি আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, অনেক সংবাদ পাইতে পারেন। আমি উহাদের ভৃত্য কঞ্চুকীবর্গকে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা কেহই কিছু বলে না।"

"বলে না, তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে হইবে। কঞ্চুকী! শীঘ্র যাইয়া কুণাল ও পরিষ্যরক্ষিতাকে কহ যে রাজা অশোক আপনাদের স্মরণ করিতেছেন।"

কঞ্চুকী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা গত রাত্রের ঘটনাবলীর বিষয় কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা রাজার ভয় ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন।

৪

কঞ্চুকী কাঞ্চন-কুটীরে প্রবেশ করিবামাত্র টিকটিকি "টিক্ টিক্ টিক্" শব্দ করিয়া উঠিল, বামভাগে কাক সকল "আকা আকা আকা" করিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠিল, আর মৎস্যাহারক গৃধ্রের মুখচ্যুত রক্তবিন্দু কাঞ্চনের সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন কুণালের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নেত্রনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই কঞ্চুকীকে দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন যমদূত; তিনি ত্বরায় কুণালের পার্শ্বে যাইয়া লুকাইলেন। কঞ্চুকী কুণালকে রাজাদেশ বিজ্ঞাপন করিল। কাঞ্চন শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইল। কুণালও একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কুণাল উৎকণ্ঠিতচিত্তে রাজসমীপে যাইতে লাগিলেন, কাঞ্চন পথপানে তাকাইয়া রহিল। কুণাল নয়নের অন্তরাল হইলে সে বসিয়া পড়িল, ভাবিল "বুঝি আর দেখা হইবে না।"

৫

কুণাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠিত ভাব বিশুষ্কমুখ দেখিয়া রাজারও বিস্ময় ও ত্রাস হইল। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কালি কতকগুলি লোক কোন গুপ্ত অভিপ্রায়ে এই বাড়ীর বাগানে জমায়েত হইয়াছিল, তাহাদের হাতে অস্ত্রাদিও ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তোমার বাড়ীর দিকে বা দিক্ দিয়া গিয়াছে। তাহারা কে তুমি জান?"

"না মহারাজ, আমি নিজেই তিষ্যরক্ষা দেবীর কুঞ্জে কালি আসিয়াছিলাম।"

"তুমি?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"সশস্ত্রে?"

"যে বেশে অভিনয়ে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়াছিলাম সেই বেশে।"

"তুমি তবে অভিনয়ান্তে নিজ গৃহে যাও নাই?"

"গিয়াছিলাম, তথায় এক পত্র পাইলাম।

"পত্র কাহার?"

"হস্তাক্ষরে বোধ হইল পরিষ্যরক্ষিতার।"

"পরিষ্যরক্ষিতার?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

মন্ত্রী বলিল "যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, তিনি সদ্ধর্ম্মের বড়ই দ্বেষবতী।"

এমন সময়ে প্রতিহারী পরিষ্যরক্ষিতার আগমন সংবাদ রাজার গোচর করিল, রাজা যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবী! আপনি কল্য কুণালকে তিষ্যরক্ষার কুঞ্জে আসিতে বলিয়াছিলেন?"

"কুণালকে? কই না।"

রাজা মন্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। মন্ত্রী কুণালকে বলিলেন, "কই সে পত্র?"

"কোথায় ফেলিয়াছি মনে নাই,—"

মন্ত্রী বলিল, "ওরূপ কথায় এখানে হইবে না, স্বরূপ বল। রাজার নিদ্রাগৃহের নীচে সশস্ত্রে লোক আসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তোমার পত্র।"

রাজা বলিলেন, "একি কুণাল, তোমার পিতার যাহারা সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, তাহাদের আজি বিচার হইবে, তুমি কোথায় আগ্রহসহকারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সন্ধান করিয়া দিবে, না তুমিই তাহাদের প্রশ্রয় দিতেছ।"

কু। আমি নির্দ্দোষ, আমি কাহাকেও প্রশ্রয় দিতেছি না; কিন্তু আপনি তো আমার সব কথা শুনিলেন না।

রা। এ বিষয়ে তোমার কি কথা থাকিতে পারে তাহা আমি জানি না।

কু। কথাটি এই, পত্রখানি যদিও পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর, কিন্তু সেখানি তিষ্যরক্ষা পাঠাইয়াছেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাহার প্রমাণ?"

কু। তিষ্যরক্ষা ঠাকুরাণী কাল আমাকে তাহা কুঞ্জগৃহে বলিয়াছেন।

রা। তবে তিষ্যরক্ষার সহিত কাল তোমার কুঞ্জগৃহে সাক্ষাৎ হইয়াছিল!!

কু। হইয়াছিল।

রাজা বিরক্তভাবে তিষ্যরক্ষার মুখপানে চাহিলেন। তিষ্যরক্ষার মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে বলিল—"মহারাজ! ভয়ে আপনাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি নাই। আমি বৌদ্ধ দেবায়তন দর্শনের সঙ্গী কুণালকেই স্থির করিয়াছিলাম, এবং উহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন,—"পরিষ্যরক্ষিতার হস্তাক্ষর কোথা হইতে আসিল?"

তিষ্যরক্ষা অম্লানমুখে বলিল—"উনি বিনা স্বাক্ষর, বিনা শিরোনামা অনেক পত্র প্রত্যহ পাঠাইয়া থাকেন।"

পরিষ্যরক্ষিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"মহারাজ, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি, আপনি বৌদ্ধ হইয়া অবধি আমার প্রতি আপনি বিরূপ হইয়াছেন, কুচক্রী লোকে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। মহারাজ, আপনি বিচারকর্ত্তা, সুবিচার করুন, আমার আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।" বলিয়া ব্যস্তভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুণাল কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা, মন্ত্রী ও তিষ্যরক্ষা কিয়ৎক্ষণ পরস্পর চাহাচাহি করিতে লাগিল। তিষ্যরক্ষা বলিল, "আরো আছে টের পাবেন।"

রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে পরিষ্যরক্ষিতাই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা কহিবার পূর্ব্বেই নগরমধ্যে মহা কোলাহল-ধ্বনি হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড দাঙ্গা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সকলে ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। গিয়া দেখিলেন, কুক্কুটারাম ভস্মীভূত হইতেছে। রাজা তিষ্যরক্ষার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এও কি উহার কাণ্ড না কি ?"

তিষ্যরক্ষা বলিল "বিচারে যাহা হয় করিবেন, আমার কোন কথায় কাজ নাই।"

রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীর প্রতি পরিষ্যরক্ষিতার ঘর ঘেরাও করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং কুণাল সমভিব্যাহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণার্থ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৬

এরূপ মহামারীর সময় তিষ্যরক্ষা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে পুরুষের বেশ ধারণ করিল, দশ বার জন সৈনিক সংগ্রহ করিল, করিয়া একবারে দাঙ্গা হাঙ্গামাস্থল ভেদ করিয়া মহামাত্য ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ দাঙ্গা হাঙ্গামা সমস্ত বাধাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, যেন কিছুই জানে না। তিষ্যরক্ষা হঠাৎ সশস্ত্র লোক সঙ্গে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মহামাত্য একটু ব্যস্ত হইলেন। তখন তিষ্যরক্ষা বলিল,—"আমার পুরুষের বেশ দেখিতেছ, আমি পুরুষ নহি, আমার

নাম তিষ্যরক্ষা। আমার কুঞ্জে বসিয়া পাটরাণীর সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহা শুনিয়াছি। তুমিই এই দাঙ্গা হাঙ্গামের মূল আমি জানি, এবং রাজাকে বলিয়াছি। তুমি যদি প্রাণ চাও, গাছটী কোথায় দেখাইয়া দেও। যদি দেখাইয়া দেও তোমায় নির্ব্বিবাদে নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। যদি না দেও তবে এখনি তোমায় রাজার নিকট লইয়া যাইব। লইয়া গিয়া তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াইব। জান, বৌদ্ধ রাজার দেশে ব্রাহ্মণ আর অবধ্য নয়।"

ব্রাহ্মণ ভয়ে ত্রাসে শঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একটি কথাও কহিতে পারিল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে একটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখাইয়া দিল। তিষ্যরক্ষা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মণের কথা ফুটিল। ইতিপূর্ব্বেই পরিষ্যরক্ষিতার কি দশা হইয়াছে তিষ্যরক্ষা তাহাকে শুনাইয়াছিল। সে করযোড়ে নানা প্রকার বিশ্লিষ্ট বাক্যপরম্পরা সৃজন করিয়া তিষ্যরক্ষার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

তিষ্যরক্ষা তাহাকে গঙ্গাতীরে শপথ করাইয়া লইল, যে "অদ্যাবধি আমি যা বলিব তুমি তাহাই করিবে।"

শপথ শেষ হইলে তিষ্যরক্ষা বলিল,—"কুঞ্জরকর্ণ, তুমি তক্ষশীলায় যাও। তোমায় আমার বিস্তর প্রয়োজন আছে। আমি প্রাণপণে তোমার ভাল করিব।"

কুঞ্জরকর্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তিষ্যরক্ষা স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

৭

অশোক ও কুণালের প্রতাপে দাঙ্গা হঙ্গাম শীঘ্রই শমিত হইল। কুক্কুটারামের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের কি ঘোর অপযশ! ব্রাহ্মণদের দেবতা কি জাগ্রত! নাস্তিকদের সেই বটগাছ দেবতারা হরণ করিয়াছেন। তাহা আর পাওয়া গেল না। রাজা অশোক, কুণাল, উপগুপ্ত প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিষণ্ণবদনে, অনাহারে, যেখানে বৃক্ষ ছিল, তাহার চারি দিকে বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে তিষ্যরক্ষা মহারাজের সংবাদ লইবার জন্য বার বার লোক পাঠাইতে লাগিল। রাজা আসিলেন না। তিষ্যরক্ষা রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইল। রাজা সম্মত হইলে, তিনি বোধিমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় অন্যলোকেও যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, তিনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষা কহিল,—'মহারাজ! ভগবান অবলোকিতেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়াছেন। আমি এখনি ঋদ্ধিবলে * সেই বোধিবৃক্ষ দেবভবন হইতে পুনরানয়ন করিব। আপনারা আর কিয়ৎক্ষণ কোন মঠায়তনে গিয়া ধ্যানমগ্ন থাকুন।"

তিষ্যরক্ষা যেখানে বৃক্ষ ছিল সেইখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইল, বোধিবৃক্ষ অল্পে অল্পে উঠিতে লাগিল। ভূখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বোধিদ্রুম স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে তিষ্যরক্ষার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে যথা স্থানে স্থাপিত হইল। দেবপূজকদিগের মুখ কালিমাবর্ণ হইল। বৌদ্ধদিগের জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

অশোকাদি বৌদ্ধমণ্ডলী তিষ্যরক্ষাব চারিদিকে দাঁড়াইয়া তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপগুপ্ত এই সভাস্থলে তিষ্যরক্ষাকে অর্হৎ কবিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং আর্হতী দীক্ষা দিয়া আপনার জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী তখন ঋদ্ধিমতী পতিপরায়ণা ধর্ম্মানুরাগিণী, রমণীকুলললামভূতা কামিনীকে সদ্ধর্ম্ম বিদ্বেষিণী, পতিপ্রাণহারিণী, ষড়যন্ত্রকারিণী পরিষ্যরক্ষিতার পরিবর্ত্তে পাটরাণী কবিবাব প্রস্তাব কবিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থির হইল তিষ্যরক্ষা পাটরাণী হইবেন, এবং পরিষ্যরক্ষিতা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের দুর্গে অবরুদ্ধ হইবেন।

৮

এই জয়োল্লাসের মধ্যে তিষ্যরক্ষা পুনঃ পুনঃ কুণালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিলেন কুণালের মুখে সেই ঘৃণা, সেই অবজ্ঞা ও সেই

৯

এই ব্যাপারের দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই তিষ্যরক্ষার অভিষেক হইল। তিষ্যরক্ষা অন্যান্য পাটরাণীদের ন্যায় কেবলমাত্র অন্তঃপুরের কর্ত্রী হইলেন না। তিনি সাম্রাজ্যেব অধীশ্বরী হইলেন। যে সকল আজ্ঞা বাহির হইত তাহা অশোক ও তিষ্যরক্ষা এই উভয়ের নামে বাহির হইত। মন্ত্রী-সভায়ও তিষ্যরক্ষা রাজার বামে বসিতেন। রাজাও এই অবধি ষড়যন্ত্রের ভয়ে তিষ্যরক্ষার মহল ত্যাগ করিতেন না। সুতরাং এই অবধি তিষ্যরক্ষাই প্রকৃতপক্ষে মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় অন্তঃপুর চলিত, মন্ত্রী সভা চলিত এবং রাজা অশোকও চলিতেন। কিন্তু তিষ্যরক্ষা সর্ব্বদাই ভাবিতেন,—

"আমার উদ্দেশ্য কি করিয়া সিদ্ধ করিব।"

---

* অলৌকিক কার্য্যকরণের ক্ষমতার নাম ঋদ্ধি।
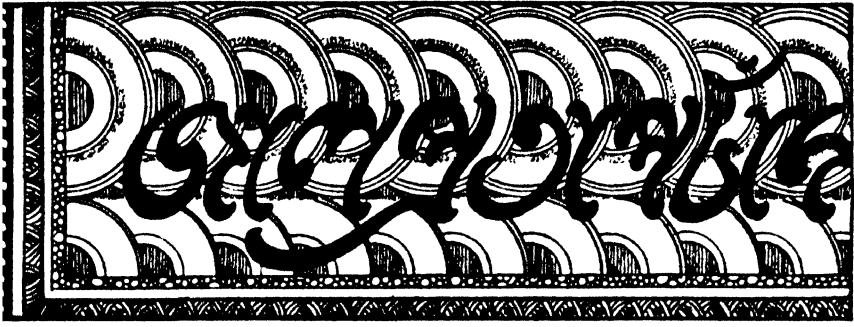
গত সংখ্যায় স্থানাভাব প্রযুক্ত জালরাজার সেনাক্ত সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় নাই। এখন তাহা বলিতে গেলে বোধ হয় সংলগ্ন হইবে না। তথাপি একটি কথা উল্লেখ করি।

উভয় পক্ষের জোবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে একদিন রাজা প্রতাপচাঁদের মাতুল হঠাৎ আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিয়া উঠিলেন, ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন। ইঁহার জোবানবন্দী লওয়া হউক। কিন্তু জালরাজার উকিল তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, সেনাক্তসম্বন্ধে যে প্রমাণ আমরা দিয়াছি, এ মোকর্দ্দমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, আর প্রমাণ দিব না। জালরাজা তাহাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলে, উকিল সাহেব তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত ফৌজদারি মোকদ্দমায় দেওয়ানির প্রমাণ অনাবশ্যক, যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহাই অতিরিক্ত হইয়াছে। আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আর পাঁচ হাজার সাক্ষী আপনাকে সেনাক্ত করিলেও জজ সাহেবের মত ফিরিবে না। আপনি প্রতাপচাঁদ কি না, এ কথার বিচার দেওয়ানি আদালতে ভিন্ন এখানে হইবে না। এখানে সে বিচার হইলেও কোন ফল দর্শিবে না, এখানকার বিচারে আপনি রাজত্ব পাইবেন না, আপনাকে আবার দেওয়ানিতে নালিস করিতে হইবে। তবে এখন সকল প্রমাণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি?

সা সাহেব এখানে ভুলিলেন। তিনি জানিতেন যে, গুটীকতক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী একত্র হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জালরাজাকে আসামী ভিন্ন কখন কোন মোকর্দ্দমায় ফরিযাদি হইতে দেওয়া হইবে না; এবং সেই পরামর্শ অনুসারে জালরাজাকে ফৌজদারিতে আসামী করা হইয়াছিল, এ কথা সা সাহেব নিজে লিখিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অন্য লোকে দেওয়ানি আদালতে যেরূপে নালিস করে, জালরাজাও সেইরূপ

নালিস করিতে পাইবেন। তাঁহার এ প্রত্যাশা অসঙ্গত! জালরাজার পক্ষে দেওয়ানির দ্বার অভাবনীয় ঘটনায় রোধ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলা যাইবে। আপাততঃ এ মোকর্দ্দমায় অন্য প্রমাণ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রকৃত কি না

প্রতাপচাঁদের মৃত্যু প্রমাণ করিবার নিমিত্ত রাজবাটীর সাক্ষী রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দবাবু, ভৈরববাবু প্রভৃতি পনরজন জোবানবন্দী দিলেন। তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর বেতনভোগি এবং পরাণ বাবুর আত্মীয় কুটুম্ব। তাঁহারা কে কি বলিলেন, আনুপুর্ব্বীক সে পরিচয় দেওয়া অনর্থক। মোট কথা, তাঁহারা সকলেই এইরূপ বলিলেন যে ১২২৭ সালের ২১শে পৌষ রাত্র দেড় প্রহরের সময় কালনার রাজবাটী হইতে প্রতাপচাঁদকে পালকী করিয়া গঙ্গাযাত্রা করা হয়, রাত্র তখন বড় অন্ধকার। পৌষমাসের রাত্রে বড় শীত। গঙ্গাতীরে সেই শীতে প্রতাপ-চাঁদকে রাখায় তাঁহার কম্প আসিল, কাজেই তাঁহাকে তাবুর ভিতর লইয়া যাইতে হইল, তাঁবু সেই স্থানে জলের ধারেই পূর্ব্বে খাটান হইয়াছিল। তাহার পর তথায় গীতাপাঠ আরম্ভ হইল। এদিকে প্রতাপচাঁদ পালঙ্কে শুইয়া হাতী ঘোড়া ধন ধান্য দান করিতে লাগিলেন। দান করা হইলে পর তাঁহাকে অন্তর্জ্জলি করা গেল, তাঁহার পা মোহন বাবু জলে ডুবাইয়া ধরেন। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হইলে ঘাসিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করেন, বাবলা ও চন্দনকাষ্ঠে প্রতাপের শবদাহ হয়। সেই সময়ে ঘাটে দশ বারটা মসাল জ্বালা ছিল।

এই সকল বৃত্তান্ত সাক্ষীরা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। কিন্তু তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু কোন্ তারিখে বা কোন্ সময়ে হয়, তাহা সাক্ষীরা অনেকেই বলিতে পারিলেন না। অথচ প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর পরে তেজচাঁদের মৃত্যু হয়। কেহ বলিলেন, তাহা স্মরণ নাই, কেহ বলিলেন বধুরাণীদের মোকর্দ্দমায় এই সকল বিষয়ে আমি সাক্ষী দিয়াছিলাম তাহাতেই প্রতাপচাঁদের মৃত্যু-বৃত্তান্ত আমার স্মরণ আছে। তেজচাঁদের মৃত্যু স্মরণ রাখিবার সেরূপ কোন কারণ ঘটে নাই। সাক্ষীরা এইরূপ নানা হেতু দর্শাইলেন।

কিন্তু এই সকল জোবানবন্দীতে জজ সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তিনি আপনার রায়ে লিখিলেন :—

"The proof here is of the strongest description of the testimony of the fact; viz. the deposition of the witnesses

(fifteen in number) named in the margin, who have sworn positively to the death and cremation, and who are consistent in their narrative of the attendant particulars, their testimony would appear to be conclusive."

বিশ বৎসরের ঘটনা পোনের জন সাক্ষীতে বর্ণনা করিল, অথচ কেহ কাহার সহিত কোন অংশে অনৈক্য হইল না। কি কাষ্ঠ দ্বারা শবদাহ করা হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত সাক্ষীরা একই রূপ বলিয়াছিল, কোন অংশে অনৈক্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জোবানবন্দীর প্রতি জজ সাহেবের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

জাল রাজা জজকে বলিলেন, পরাণের আত্মীয় কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও ত কুটুম্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই। কেবল পরাণের চাকর, পরাণের কুটুম্ব, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত আর কি কেহ ছিল না? জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

জালরাজা স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছামতে হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, যে কোন পীড়া আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ চন্দ্রাংশে বুঝিতে পারিবে না।

পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে জালরাজার কথা কতদূর গ্রাহ্য তাহা বলা যায় না। তবে বড় বড় ডাক্তার ও বিজ্ঞানবিদের মধ্যে দুই একজন বলেন যে মৃত্যু অনুকরণ তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ডাক্তার চেনি সাহেব বলেন, যে একসময় কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড বড় পীড়িত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কর্ণেল সাহেবকে দুইবার করিয়া দেখিতে যাইতেন। একদিন কর্ণেল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, যে "কতকদিন হইতে আমার কেমন একটা হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, আমায় বুঝাইয়া দাও। আমি দেখিতেছি যে আমি মনে করিলে মরিতে পারি, আবার চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারি।" সেস্থানে আর একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম বেনার্ড এবং একজন এপথিকারি ছিলেন তাঁহার নাম স্ক্রাইন। এই কয়জনে কর্ণেল সাহেবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কতকটা অবিশ্বাসও করিলেন। কিন্তু কর্ণেল সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবার নিমিত্ত জেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবেরা একে একে কর্ণেল সাহেবের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। নাড়ী বেশ পরিষ্কার তবে একটু ক্ষীণ।

তাঁহারা পরস্পর বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহাও সহজমত টিপ্ টিপ্ করিতেছে। তাহার পর কর্ণেল সাহেব চিৎ হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ডাক্তার চেনি সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নাড়ী টিপিয়া ধরিলেন, ডাক্তাব বেনার্ড বুকে হাত দিয়া থাকিলেন। আর স্ক্রাইন সাহেব একখানি পরিষ্কার দর্পণ নাসার নিকট ধরিয়া রহিলেন। ক্রমে নাড়ী যাইতে লাগিল, শেষ একেবারে পাওয়া গেল না। হৃদিচালনা স্থগিত হইল, নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্থির হইয়া গেল। যে দর্পণ নাসাগ্রে ধরা হইয়াছিল, তাহাতে আব নিশ্বাসের ঘাম লাগিল না। তাহার পর ডাক্তারেরা একে একে সকলেই নাড়ী দেখিলেন, সকলেই বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, সকলেই দর্পন ধরিয়া দেখিলেন, জীবিতের চিহ্ন কেহই কিছু পাইলেন না। তখন তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কাতর্কি কবিলেন, এ সময়েব মধ্যে কর্ণেল সাহেবের আর চেতন হইল না। শেষ তাঁহারা সিদ্ধান্ত কবিলেন যে কর্ণেল সাহেব নিশ্চয়ই মবিয়াছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। তাহাব পব তাঁহাবা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ কবিতেছেন, এমত সময়ে কর্ণেল সাহেবের শবীর একটু নড়িল। ডাক্তারেরা নাড়ী দেখিলেন, নাড়ী হইয়াছে। বুক দেখিলেন, বুকের গতি আবম্ভ হইয়াছে। নাসায় হাত দিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে। শেষ কর্ণেল সাহেব ধীবে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারেব৷ অবাক্ হইয়া থাকিলেন। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথচ মৃত্যু যে নিশ্চয়ই হইয়াছিল সে বিষয় তাঁহাদেব আব কোন সন্দেহ থাকিল না*।

---

* ডাক্তার চেনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Colonel Townsend told us, he had sent for us to give him some account of an odd sensation he had for some time observed and felt in himself · which was, that composing himself, he could *die* or expire when he pleased, and yet by an effort or some how, he could come to life again, which it seems he had sometimes tried before he had sent for us. We heard this with surprise, but as it was not to be accounted for from now common principles, we could hardly believe the fact as he related it much less give any account of it : unless he should please to make the experiment before us, which we were unwilling he should do, lest, in his weak condition, he might carry it too far. He continued to talk very distinctly and sensibly above a quarter of an hour about this (to him) surprising sensation and insisted so much on our seeing the trial made, that we were at last forced to comply. We all three felt his pulse first : it was distinct, tho' small and *threedy* : and his heart had its usual beating. He composed himself on his back, and lay in a still posture some time :

এরূপ আরও দুই চারিটি ঘটনার কথা শুনা যায়। ডাক্তার টানার সাহেব লিখিয়াছেন যে, দেহের উপর মনের একাধিপত্য অতি অসাধারণ, এ সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার প্রমাণ আছে। যথা সেল্‌সাস সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, যে একজন পাদরি যখনই ইচ্ছা করিতেন তখনই আপনার সংজ্ঞাকে স্বতন্ত্র করিয়া আপনি জ্ঞানশূন্য ও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেন।*

শুনা যায় দেহ হইতে জীবাত্মাকে ইচ্ছামত স্বতন্ত্র করিবার পদ্ধতি আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। অনেকে বলেন যোগীদের মধ্যে সে

while I held his right hand, Dr. Baynard laid his hand on his heart, and Mr. Skrine held a clean looking glass to his mouth. I found his pulse sink gradually till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor Mr Skrine the least soil of breath on the bright mirror he held to his mouth; then each of us by turns examined his arm, heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and unaccountable, and finding he still continued in that condition, we began to conclude that he had indeed carried the experiment too far, and at last were satisfied he was actually dead, and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By nine o'clock in the morning in autumn, as we were going away, we observed some motion about the body, and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning; he began to breathe gently and speak softly: we were all astonished to the last degree at this unexpected change, and after some further conversation with him, and among ourselves, went away fully satisfied as to all the particulars of this fact, but confounded and puzzled and not able to form any rational scheme that might account for it"—*Quoted by T. H. Tanner in his Practice of Medicine.*

* This influence of the will over even the involuntary muscles is sometimes extraordinary, as many remarkable cases attest. Thus Celsus speaks of a priest who could separate himself from his senses when he chose, and lie like a man void of life and sense. Carden used to boast of being able to do the same. But the most surprising example of this kind is the well known case of Colonel Townsend related by Dr. George Cheyne. *T. H. Tanner's Practice of Medicine 6t, Edi, Vol. I, page 500.*

পদ্ধতির চর্চ্চা অদ্যাপিও বিলক্ষণ প্রচলিত। এ কথা কতদূর সত্য আমরা তাহা জানি না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না।

জালরাজার পীড়ার ভাণ সম্বন্ধে উকিল সা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি বলেন যে, প্রথমে আমার সংস্কার হইয়াছিল, যে এ ব্যক্তি সত্যই জাল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে সংস্কার যায়, ক্রমে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে বুঝিলাম, যে ইনি প্রতাপচাঁদ নিশ্চয়ই। কিন্তু মৃত্যুর ভাণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে পরে একদিন সে সন্দেহের কথা হুগলীর জেলখানায় জালরাজাকে বলিলে, জালরাজা হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, "এ পরীক্ষা অতি সহজ। তুমি ডাক্তার সাহেবকে এখনই আসিতে লেখ, আমি এখনই একটা পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি।" তখন ডাক্তার ওয়াইজ (Dr Wise) সাহেব হুগলীর সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। তাঁহাকে পত্র লেখায় তিনি তৎক্ষণাৎ জেলখানায় আসিলেন এবং জালরাজাকে দেখিয়া রিপোর্ট করিলেন, যে "জালরাজার বড় জ্বর হইয়াছে এবং পা ফুলিয়াছে, বোধ হয় তাঁহার গোদ হইবে। আপাততঃ তিনি কিছু দিন আদালতে যাইতে পারিবেন না।" এ কথা প্রকৃত হইলে পীড়ার ভাণ করিবার ক্ষমতা জালরাজার ছিল বলিয়া বোধ হইলে হইতে পারে।

সে কথা সত্য মিথ্যা যাই হউক, ডাক্তার সাহেবের এই রিপোর্ট উপলক্ষ করিয়া সা সাহেব জজ সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে জামিন লইয়া জালরাজাকে খালাস দেওয়া হয়, এবং আপাততঃ তাঁহাকে একখানি চারপাই আর একখানি গাত্রবস্ত্র দেওয়া হয়। জজ সাহেব কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিগনেল সাহেব বলিলেন যে, জেলের আসামীর জন্য এ সকল সরঞ্জাম দিবার কোন বিধি আইনে নাই। তবে যদি একান্ত তাহা আবশ্যক হয় তাহা হইলে ডাক্তার সাহেব আসামীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন। জজ কার্টিস সাহেব বিগনেল সাহেবের অমতে কোন হুকুম দিতে সাহস করিতেন না, তথাপি তিনি বলিলেন, যে এ বিষয়ের দরখাস্ত করিলে বিবেচনা করা যাইবে। আর জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে নিজামতে দরখাস্ত করা হউক। সা সাহেব সেই মত দুই আদালতে দুই দরখাস্ত করিলেন। কার্টিস সাহেব চারপাই দিলেন এবং নিজামত আদালত হইতে হুকুম হইল, যে জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়ার আপত্তি নাই। কিন্তু জজ কার্টিস সাহেব নিজামতের সে হুকুম তামিল করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, এ অঞ্চলের লোকেরা জালরাজার জন্য যেরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল এখন আর তত নাই। এ সময়ে তাহারা জালরাজাকে পাইলে আবার সেইরূপ মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং

জালরাজাকে ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। নিজামত আদালত কাজেই সেই মতে মত দিলেন।

রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রমাণ দেওয়া হইলে জালরাজা তাহা খণ্ডন করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা না করিয়া কেবল এইমাত্র দেখাইলেন যে, এই সময় রটনা হইয়াছিল যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, অজ্ঞাতবাস গিয়াছেন। জালরাজার উকিলেরা বলেন যে, যে স্থলে বড় বড় লোকে বলিতেছে আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ, সে স্থলে মৃত্যুর প্রমাণ অন্যথা করিবার আর প্রয়োজন কি? কিন্তু সে কথার বিপরীতে জজ সাহেব বলিলেন, যে যখন প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হওয়া স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে, তখন তাঁহাকে কেহ সেনাক্ত করিলে আর কি হইবে?

জালরাজা আপনাব মৃত্যু রটনাব হেতু এইরূপ বলেন :—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী আমাব পরম শত্রু ছিলেন, আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি দুইবাব আহাবেব সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবাব আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই ; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মবে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষ তাঁহারা আমার পিতার মন ভার করিয়া দিলেন। তাহার আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না।

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, 'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অসক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস। কিন্তু এরূপ ভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে তুমি মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই ; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীরউদ্দিন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতামহাশয় পরাণেব অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম, কেবল পলাইলে হইবে না, যেরূপ ব্যবস্থাপত্র সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি সকলে জানা

আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভাণ করিয়া কালনায় গেলাম, কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বলিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষ অন্তর্জলি করিল। অন্তর্জলির পর যখন রাজবাটীর লোকেরা শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সেই সময় আমি জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

এদিকে রটনাও হইয়াছিল রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। সুতরাং লোকের বিশ্বাস হইয়া পড়ে যে প্রতাপ পলাইয়াছেন।

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা মুসলমানের সরা মতে হইত, সুতরাং সরার ব্যবস্থার নিমিত্ত একজন করিয়া কাজি বিচারাসনে বসিতেন। হুগলীর কাজি জালরাজাকে বলিলেন, তুমি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলে বলিতেছ, এখন আমি শুনিতে চাই, যে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি কোন্ কোন স্থানে ছিলে, এবং কি করিতে? জালরাজা সে পরিচয় দিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার উকিল তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, প্রমাণ ব্যতীত সে পরিচয় কোন মতে গ্রাহ্য হইবে না, এবং প্রমাণেরও আর সময় নাই। জালরাজা তাহা শুনিলেন না, তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন, যে আগামী কল্য আমি এ বিষয়ের একখানি লিখিত ফর্দ্দ দিব।

মোকর্দ্দমার শেষে তিনি একদিন সেই ফর্দ্দ আর তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দাখিল করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল।

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে আদিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় এক বৎসর থাকি। তাহার পর যোগেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বানেশনাথ মহাদেবের নিকট একবৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদ্রিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাজ, জ্বালামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পাঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষ কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার

সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল, যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেইস্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। তখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম, তাঁহারা একস্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহার সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যেদিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি।* এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায়। আমি সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না; মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই, তাহার পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্তসম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্তে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দান পত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত ধন, এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না? আমি পীড়িত হইয়া ত অনেক দিন ছিলাম, আমার বাক্‌রোধ হয় নাই। আমায় গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম; যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল?

আর এক কথা। আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্লেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয়, কিন্তু মাথায় কেহ ছোটও হয় না, কেহ বড়ও হয়

---

* রাজা প্রতাপচাঁদেরও এইরূপ ইয়াদাস্ত বহি রাখা অভ্যাস ছিল। তিনি যে সময়ে যাহা করিতেন, তাহা নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। অনেকে বলেন, যে তাঁহার সেই ইয়াদাস্ত বহি জালরাজা কোনরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতাপচাঁদের সমুদায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ঘটনা তিনি বলিতে পারিতেন। কেহ বলে, সে ইয়াদাস্ত বহি রাজবাটীতেই ছিল, মোকর্দ্দমার সময় তাহা আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল।

না। সেই ছবির সঙ্গে আমায় মাপিয়া দেখা হইয়াছে, চুল পরিমাণে ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই।

'এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী কি না

এই মোকর্দ্দমার প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যশোর জেলা নিবাসী শ্যামলাল তেওয়ারি নামে একজন ব্রাহ্মণ গোয়াড়িতে আসিয়া একখানি কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে সেই প্রতিমা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার দিন যাপন হইতে থাকে। লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী বলিত। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণলাল, মধ্যম রূপলাল, সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরলাল। ইহাদের মধ্যে পৈতৃক ব্যবসায়ে কৃষ্ণলালের একেবারে অনুরাগ ছিল না, তিনি চাকুরী করিবেন, এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা জুটে নাই, তিনি কেবল উমেদারি করিয়া বেড়াইতেন। তথাকার পাদরী ডিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন, কৃষ্ণলাল তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ একবার করিয়া গিয়া সেলাম করিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে পাদরি সাহেব একখানি সুপারিস চিঠি তথাকার মেজেষ্টার সাহেবকে দেন। সেই সময় শান্তিপুরের দারগাগিরি খালি ছিল। চিঠি পাইবামাত্র মেজেষ্টার সাহেব কৃষ্ণলালকে সেই দারগাগিরি দিলেন। কিন্তু একদিন পরে আবার পরওয়ানা ফিরাইয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে পাদরী সাহেবকে লিখিলেন, যে কৃষ্ণলালের চরিত্র অতি মন্দ; আর তাহার একজন খুড়া ডাকাইত। সুতরাং উহাকে আমি চাকুরি দিতে পারিলাম না। পাদরী সাহেব পত্র পাইয়া কৃষ্ণলালকে বলিলেন যে তুমি আর কখনও আমার কুঠিতে আসিও না। সেই অবধি কৃষ্ণলালের উমেদারি করা ফুরাইল।

সাক্ষীরা বলেন, কৃষ্ণলাল তাহার পর ব্রহ্মচারী সাজিয়া এখানে ওখানে বুজরুকি দেখাইয়া দিনপাত করিতেন। দুই একবার বর্দ্ধমানেও গিয়াছিলেন।

পরাণ বাবু মনে করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণলাল, এই জালরাজা সাজিয়াছে। যখন জালরাজা বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন, তখন পরাণ বাবু তাঁহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পাদরি ডিয়ার সাহেবের নিকটেও লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য সাক্ষী জুটাইয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল প্রমাণ তখন আদালতে বড় গ্রাহ্য হয় নাই। সেবার জালরাজা আলক সা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। এবার খোদ মেজেষ্টার সামুয়েল

সাহেব এ বিষয়ে উদ্যোগী, সুতরাং সাক্ষী অনেক জুটিয়াছিল। সেই সকল সাক্ষী দ্বারা জানা গেল যে, কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল, তাহার এক পায়ে ছয়টি আঙ্গুল ছিল, আর বয়সে কৃষ্ণলাল রাজা প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা দশ বার বৎসরের ছোট ছিল। জালরাজার মুখে বসন্তের দাগ ছিল না, তাঁহার কোন পায়েও ছয়টা অঙ্গুলি ছিল না।

এই মোকর্দ্দমার চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলাল নিরুদ্দেশ হন। কেহ বলে তাঁহার মৃত্যু হয়, কেহ বলে তিনি ২৪ পরগণায় কয়েদ হন। তাঁহার দুই সহোদরের অগ্র পশ্চাৎ লোকান্তর হয়। এই সময় শ্যামলালেরও মৃত্যু হয়, সুতরাং শ্যামলালের ত্যক্ত সম্পত্তি লাওয়ারিস বলিয়া আদালতে জব্দ থাকে। গোয়াড়ির সাক্ষীরা কিরূপ সেনাক্ত করিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লেখা গেল।

ফকিরচাঁদ তেওয়ারি, নিবাস যশোহর। বলিল, আসামী আমার ভাগিনা কৃষ্ণলাল। আমি ইহাকে ৮ বৎসর দেখি নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র তেওয়ারি বলিল, আসামী কৃষ্ণলাল আমার পিসিপুত্র। যখন ইহার ১৫।১৬ বৎসর বয়স তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখি নাই।

গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারি বলিল, এই আসামী আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। ইহার বয়স এখন ৩৬ বৎসর হইবে। আমার ভগিনীপতি বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি তিনি মরিয়াছেন। ইদানীং আমি কালনায় থাকি, উমেদারী করি। কৃষ্ণলালের পায়ের অঙ্গুল পাঁচটা কি ছয়টা তাহা আমি বলিতে পারি না।

রামচন্দ্র বিশ্বাস, আবকারীর খুচরা দোকানদার। বলিল, আমি আসামীকে চিনি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। আমরা এক পাঠশালায় লিখিয়াছি। (রাজা প্রতাপচাঁদের পৃষ্ঠে ঘোড়ার কামড়ের যে দাগ ছিল, সেইরূপ আসামীর পৃষ্ঠে একটা দাগ থাকায় সাক্ষীকে মেজেষ্টরীতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে কোন দাগ ছিল কি না। সাক্ষী তাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে, হাঁ, বিলক্ষণ দাগ ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠের কোন্ অংশে সে দাগ ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষী ইতস্তত করিতেছে, এমত সময়ে সেরেস্তাদার মোনসারাম আপনার পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। জালরাজার উকিল তাহা মেজেষ্টরকে দেখাইয়া দিলেন। সুতরাং মেজেষ্টার সাহেব মোনসারামের দশ টাকা জরিমানা করিতে বাধ্য হইলেন।)

পাল খ্রীষ্টান বলিল, এই আসামী কৃষ্ণলাল বটে, আমি ইহাকে গোয়াড়িতে ১৮৩৪ সালে দেখিয়াছি। ইহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করিয়াছি। ইহার পিতার

নাম শ্যামলাল। হুগলীর জেলখানায় আসামীকে সেনাক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠান হয় ; তখন আমি যদিও ইহাকে চিনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই। সেনাক্তর নিমিত্ত দশ দিন সময় লইয়াছিলাম। জেরায় বলিল, গত রাত্রে মাণিকসিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে সেরেস্তাদার মনসারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সত্য, আমি তাঁহার নিকট পথখরচা চাহিয়াছিলাম, তিনি জজ সাহেবের নিকট চাহিতে বলিয়াছিলেন।

মহেশ পণ্ডিত নামে একজন খ্রীষ্টান জোবানবন্দীতে বলিলেন, এই আসামীকে আমি গোয়াড়িতে ও বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি, ইহার নাম কৃষ্ণলাল। জেরায় বলেন, আমি যখন মেজেষ্টাব ও ডাক্তাব সাহেবেব সঙ্গে জেলখানায় গিয়া এই আসামীকে দেখি, তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল কি না তাহা আমি দশ দিন পরে বলিব। আমি বর্দ্ধমানে থাকি, আমার নিবাস ঐ জেলাব অন্তর্গত রায়না গ্রামে।

গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইহার সঙ্গে এক পাঠশালায় লিখিযাছি। ইহাকে গত ১৫।১৬ বৎসবের মধ্যে কেবল দুই তিন বার দেখিযাছিলাম। কৃষ্ণলালেব মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না বলিতে পাবি না।

রামচাঁদ মিত্র বলিলেন, আমি বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর মুহুরি। এই আসামী কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি। এ বাক্তি মধ্যে মধ্যে আমার তৈলমাড়ুযের বাসায় গিয়া থাকিত। যখন ঐ ব্যক্তি বর্দ্ধমানে শেষে গিয়া প্রচার করে যে আমি ছোট রাজা, তখন আমি কাহাকেও ইহার পরিচয় দিই নাই, কেবল ইহাকে গোপনে তিরস্কার করিযাছিলাম। কিন্তু সে তিরস্কার এ ব্যক্তি শুনে নাই।

ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী পেস্কার। এই আসামীকে চিনি, ইনি কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খ্রীষ্টান) বলিলেন, এই আসামী কৃষ্ণলাল। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহাপুরুষ সাজিয়াছিলেন, আমি ইঁহার চেলা হইয়াছিলাম। ইঁহার সঙ্গে শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, মশাগ্রাম, বর্দ্ধমান, বরানগর প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়াইযাছি। আমি ইঁহার পাদকজল পর্য্যন্ত খাইয়াছি। আমি তখন ইঁহাকে দেবতা মনে করিতাম। যখন ইনি বর্দ্ধমানের রাজা হইবার কল্পনা করেন, তখন আমি ইঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমি ও ইঁহার ভ্রাতা গৌরলাল মশাগ্রামে থাকিলাম, কৃষ্ণলাল বর্দ্ধমানে গেলেন, আসামী সেখান হইতে পলাইয়া বিষ্ণুপুরে যান। আমরা সে সংবাদ পাইয়া তথায় যাই। তাহার পর আমরা একসঙ্গে বাঁকুড়ায়

যাইতেছিলাম, এলিয়ট সাহেব আমাদের বলগমা ঘাঁটিতে গ্রেপ্তার করেন।* গৌরলাল পলাইয়াছিল, আমি ধরা পড়িয়াছিলাম। তিন মাস জেল খাটি। জেলখানায় কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে খালাসের অন্য উপায় না দেখিয়া মেজেষ্টারের নিকট কৃষ্ণলালের প্রকৃত পরিচয় বলিয়াছিলাম, তিনি আমার এজেহাব লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খালাস দেন নাই। তখন আমার নাম কৃপানন্দ ছিল। আমি কৃষ্ণলালের চেলা হইয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ। আমি খালাস হইলে পর পাদরি হিল সাহেব আমায় খ্রীষ্টান করিয়াছেন, আমি সেই অবধি আর মিথ্যা কথা বলি না। আমার পূর্ব্ব চরিত্রের পরিচয় পাদরি সাহেবকে লিখিয়া দিয়াছি, তিনি তাহা বিলাতে ছাপাইতে পাঠাইয়াছেন। কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টি অঙ্গুলি তাহা বলিতে পারি না। (বাঁকুড়ার মোকর্দ্দমায় এই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।)

প্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী নাজির। এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে এই ব্যক্তি কৃষ্ণলাল। কেন না, ইনি রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল।

নীলকমল ঘোষ বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার ফৌজদারী সেরেস্তাদার। এই আসামী কৃষ্ণলালের মত, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, আমি নদীয়া জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদার। এই আসামীকে কৃষ্ণলাল বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কৃষ্ণলালের পিতা শ্যামলাল গত বৎসর মরিয়াছে। কেহ তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি দাবি করে নাই। কৃষ্ণলালের মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।

হরচন্দ্র হাজরা বলিলেন, আমি নদীয়া জজ আদালতের উকিল, এই আসামী গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল, ইহাকে আমি চিনি, তবে ইহাকে আট বৎসর দেখি নাই।

ব্রজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, কৃষ্ণলালকে আমি বিলক্ষণ চিনি, সে আমার নিকট অনেক দিন ধরিয়া উমেদার ছিল। এই আসামীর সহিত সে কৃষ্ণলালের বিস্তর প্রভেদ।

---

* এলিয়ট সাহেব কমিসনর হইয়া যখন বাঁকুড়ায় যান, তখন একদিন তথাকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, যে এই তেঁতুলতলায় জালরাজাকে আমি গ্রেপ্তার করি। যখন তিনি এই কথা বলেন, তখন লেখক নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী যাহা বলিলেন সুতরাং তাহার সহিত এলিয়ট সাহেবের কথা মিলে না।

মুন্সি মকিম বলিলেন, কৃষ্ণলালকে আমার ভাল স্মরণ নাই। এই আসামী সে কৃষ্ণলাল নহে। আমি শুনিয়াছি কৃষ্ণলাল মরিয়াছে।

পাদরি ডিয়ার সাহেব (Revd. W. J. Deere) বলিলেন, আমি এখন কৃষ্ণনগরে থাকি, পূর্ব্বে কিছুদিন বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি কৃষ্ণলালকে ভাল চিনি। তাহার পিতা শ্যামলাল, কৃষ্ণলালের চাকুরির নিমিত্ত আমায় অনুরোধ করে। কৃষ্ণলাল প্রত্যহ আমার বাটীতে আসিত। ব্যাটি সাহেবকে কৃষ্ণলালের নিমিত্ত আমি একখানি পত্র দিই। ব্যাটি সাহেব তাহাকে চাকুরি দেন নাই। ১৮৩৬ সালে বর্দ্ধমানের পরাণ বাবু আমার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা আমায় বলে যে, একবার হুগলী গিয়া জালরাজাকে সেনাক্ত করিতে হইবে। তাহারা আমায় পথ খরচ বলিয়া টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহা লই নাই। আমি তাহাদের বলিলাম, যদি তোমরা কৃষ্ণলালের সন্ধান চাও তাহা হইলে আমি এখনই সন্ধান দিতে পারি। এই বলিয়া গোয়াড়িতে কৃষ্ণলালের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলাম। লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্যামলাল ব্রহ্মচারী বলিলেন, কৃষ্ণলালকে টাকার নিমিত্ত শিষ্যবাটীতে পাঠাইয়াছেন, দশ বার দিনের মধ্যে সে আসিবে, আসিলে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। তাহার পর সে না আসায়, প্রায় পনর দিবস পরে আবার শ্যামলালের নিকট লোক পাঠাইলাম। সেবার শ্যামলাল বলিলেন যে, কৃষ্ণলালকে যদি পাদরি সাহেবের এতই দরকার থাকে তবে যেন তিনি নিজে তাহাকে তল্লাস করিয়া লন। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে। আমি তাহাকে ছয় বৎসর দেখি নাই। এই ব্যক্তি যদি কৃষ্ণলাল হয়, তবে ছয় বৎসরে ইহার অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উর্দ্ধমুখী ছিল, আসামীর নাসাগ্র নিম্নমুখী। ১৮১১ সালে আমি শুনিয়াছিলাম, যে রাজা প্রতাপচাঁদ এদেশে বিদ্রোহ উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত রঞ্জিতসিংহের নিকট গিয়াছেন।

গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আমি কৃষ্ণলালকে বিলক্ষণ চিনিতাম, সে ব্যক্তি যখন উমেদারী করিত, তখন ডিক্ সাহেবের কাছারীতে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাহার পিতা শ্যামলালকে চিনিতাম। কৃষ্ণলালের আকৃতি এই আসামীর মত ছিল না।

কৃষ্ণমোহন সরকার (এই সাক্ষী জোবানবন্দী দিবার সময় জজ সাহেব বলিলেন, আমি এই সাক্ষীকে চিনি, ইনি ভাল লোক, ভদ্র এবং সত্যবাদী) সওয়াল মতে বলিলেন, আমি গোয়াড়িতে ওকালতি করি, আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, এই আসামীকে কৃষ্ণলালের মত বোধ হয় না।

রামধন খ্রীষ্টান বলিলেন, আমি এই আসামীকে চিনি না, ইহাকে কখন দেখি নাই। আমি কৃষ্ণলালকে চিনিতাম, তাহার সহিত ইহার কিছু আদল আইসে বটে; কিন্তু এ ব্যক্তি সে নহে। কৃষ্ণলাল ইহার অপেক্ষা লম্বা ও গৌরবর্ণ। কৃষ্ণলালের নাসাগ্র উন্নত ছিল, এ ব্যক্তির তাহা নহে আর তাহার চক্ষু ছোট ছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, আমি এখন উত্তরপাড়ায় থাকি। পূর্ব্বে টোল দারগা ছিলাম, কৃষ্ণলাল আমার নিকট মধ্যে মধ্যে আসিত। এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, তাহার মুখ লম্বা ছিল, আর তাহার মুখে দাগ ছিল।

গোয়াড়ির অন্য অন্য যে সকল লোকেরা মেজেষ্টরিতে বলিয়াছিল যে এই আসামী কৃষ্ণলাল নহে, দায়রায় তাহাদের জোবানবন্দী লওয়া হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহাদের কথা আর উল্লেখ করিলাম না।

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি দেখিয়া কাজি সাহেব রায় দিলেন যে আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নহে। কৃষ্ণলালের আত্মীয় উল্লেখে যাহারা জোবানবন্দী দিয়াছে তাহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাণকৃষ্ণ খ্রীষ্টানের কথাও সেইরূপ। সে বলে, যে সে তিন চারি বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ সে জানে না যে কৃষ্ণলালের পায়ে কয়টা অঙ্গুলি ছিল।*

জজ সাহেবও কতকটা বুঝিয়াছিলেন যে, জালরাজা যে কৃষ্ণলাল এ কথা ভাল প্রমাণ হয় নাই, তথাপি তিনি রায়ে লিখিলেন যে এ কথা একপ্রকার প্রমাণ হইয়াছে। আরও বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ও তাঁহার শব দাহ যখন বিশেষরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন এই আসামী কৃষ্ণলাল প্রমাণ না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।†

কালনায় জমিয়তবস্ত হইয়াছিল কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ মেজেষ্টরীতে লওয়া হয় নাই। দায়রায়ও এ বিষয়ে প্রথমতঃ বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। স্বয়ং জজ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, কালনার জমিয়তবস্ত অতি সামান্য ব্যাপার। তথাপি কয়েকজন সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়া হইল। নাজির আসাদ আলি আর দারগা মহিবুল্লা প্রধান সাক্ষী। তাঁহারা অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু কালনার

---

* প্রাণকৃষ্ণ জোবানবন্দীতে বলিয়াছিল, যে কৃষ্ণলালের পাদকজল সে খাইত।

† "Combining all their testimonies I cannot avoid the conclusion that the prisoner's identity is sufficiently established by a preponder-

চৌকিদারেরা সামান্য চাকর, কি বলা আবশ্যক, কি বলা অনাবশ্যক, তাহা কিছুই বুঝিল না; সুতবাং তাহারা অনেকেই অম্লান বদনে বলিল, কালনায় কোন জমিয়তবস্ত হয় নাই।

জজ সাহেব রায়ে লিখিলেন, যে কালনার জমিয়তবস্ত প্রমাণ হইয়াছে।

"This charge, I view, is substantiated by the evidence of Mahaboollah Darogah and other Police officers, and by that of Assad Ali, the Burdwan Foujdari Nazir; but there is, I conceive, no proof of an affray or actual breach of the peace. I should say the only facts proved are, *first*, that the prisoner No. 1, the *soi-disant* Rajah, did not disperse his armed followers on receiving orders from the Police officer to that effect, after the Darogah had explained to him the nature of the purwanah or orders issued from the Burdwan Magistrate, requiring him to disperse his armed followers. *Secondly*, that the prisoner No. 1 persisted in landing with a drawn sword in his hand, and visiting the

---

ance of evidence above whatever has deen adduced to impeach it. Evidence in such a matter cannot be expected to amount to absolute demonstration. Some dimness, and it may be doubt, will obscure the recital now of details which occured at a remote date. But circumstances considered, I look upon the proofs as being on the whole satisfactory. It is true that in the main point the Law-Officer rejects the evidence on the grounds that there are several descrepancies, which I admit, in the averments made by the witnesses who swears to the prisoner's identity with Kristo Lal. * * For the reasons which I have stated above, it appears to me, the identity is established by tolerably good, or I may say, sufficient evidence, although it may not be so satisfactory and decisive as the testimony to the Rajah's death. But I have a remark to make on this subject. After the prosecutor had proved the death and cremation of Rajah Protab Chunder, it was, I think, in no way incumbent on him to show who the prisoner really is. So long as the death, cremation, and non identity remain, as I regard them firmly established, it would have been a matter of no moment to the case had he failed to prove that the prisoner is Kristo Lal." *Extract from No 3 of the Calender for Sept. 1838.*

shrine of Lalji Thakur at Culna; in the progress to which place, attended by a part of his followers, he ordered some of his people to disarm the two sepoys on guard at the burying ground of the Burdwan Rajah, but, on the remonstrance of the Darogah, he, at last, desisted from this foolish freak; after which, the *soi disant* Rajah and his people returned to the boats."

জজ সাহেব যাহাই বলুন, আপিলে এ কথা রক্ষা হয় নাই। সে পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে।

দায়রার হুকুম

সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেল। আসামীর পক্ষ সকল সাক্ষী হাজির হইলেন না। প্রতাপচাঁদের রাণীরা জোবানবন্দী দিয়াছিলেন, এবং জালরাজাকে তাঁহারা সেনাক্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র রটনা আছে। কিন্তু বাস্তবিক সে রটনা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে বলিযাছি, জালরাজা তাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন, কিন্তু আদালতে আসিয়া সাক্ষ্য দিতে তাঁহারা অস্বীকার করেন। জজ সাহেব তাহাতে বলেন যে, তাঁহারা চুঁচুড়ার রাজবাটীতে আসিলে, কমিসন্ দ্বারা তাঁহাদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবে। তাহাতেও রাণীরা সম্মত হইলেন না। সুতরাং জালরাজা আর কোন চেষ্টা করিলেন না। তাহার কিছুদিন পরে রাণীরা হঠাৎ দরখাস্ত করিয়া পাঠাইলেন, যে আমরা সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছি। এবার জালরাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন, আমি রাণীদের সাক্ষ্য চাহি না। ইহার হেতু কেহ বুঝিতে পারিল না। লোকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, এ সকল বুঝি কৃষ্ণ রাধার মান কেলি। যখন জালরাজা উপযাচক হইয়াছিলেন, তখন রাণীরা মাথা নাড়িলেন; আবার যাই জালরাজা মান করিলেন, আর তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না, আপনারা সাধিয়া সাক্ষ্য দিতে চাহিলেন।

লোকে যে যাহাই বলুক, আমরা শুনিয়াছি, যে রাণীরা সপিনা পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে "আসামীকে যদি বাস্তবিক আমরা ছোট মহারাজ বলিয়া চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে যে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। এবং হয় ত সেই কারণে জজ সাহেবও আমা-

দের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব?"

এদিকে যখন জালরাজা শুনিলেন যে, রাণীরা জোবানবন্দী দিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি সা সাহেবকে বলিলেন যে "কাহার দ্বারা এ দরখাস্ত আসিয়াছে, এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" সা সাহেব তদন্ত করিয়া জানিলেন যে পরাণ বাবুর লোক এই দরখাস্ত আনিয়াছে, এবং পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে। জালরাজা উকীলকে বলিলেন যে, এবার পরাণের অনুরোধে রাণীরা সাক্ষী দিতে সম্মত হইয়াছেন। সে অনুরোধের অর্থ, যে তাঁহারা আমাকে সেনাক্ত না করেন। কিন্তু কি জানি? স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙ্গি? তাঁহারা এখন সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না। জালরাজার কথামত রাণীদের এত্রা করা হইল। কিন্তু জজ সাহেব বিপরীত ভাবিলেন. তিনি বিবেচনা করিলেন যে, আসামী নিশ্চয়ই জাল, তাহাই সে ভয় পাইয়াছে। রাণীরা কখনই মিথ্যা বলিবে না, এ কথা আসামী এখন বুঝিয়াছে।

অন্য সকল সাক্ষীদের জোবানবন্দী হইয়া গেলে উভয় পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কিন্তু বক্তৃতা মুখে হইল না, লিখিত দাখিল হইল। তাহার পর কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেনাক্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন না করা হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু জজ সাহেব অন্যপ্রকার বিবেচনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং প্রতাপের নামধারণ জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপে উভয়ের মত অনৈক্য হইল। উভয়ের রায় "মওয়াফেক্" না হইলে তখনকার আইন অনুসারে জজ সাহেব নিজে দণ্ড দিতে পারিতেন না, তাঁহাকে নিজামতে রিপোর্ট করিতে হইত। সেই জন্য জজ সাহেব নিজামতকে জানাইলেন, এবং সেই সঙ্গে লিখিলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, একটি ব্যতীত তাহা সমুদয়

প্রমাণ হইয়াছে। অতএব তাহাকে পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয়, ন্যূনকল্পে তিন বৎসর।

অন্য আসামীদের প্রতি হুকুম

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আসামীশ্রেণীতে কালনায় ২৯৪ জন গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলিকে তাহাদের সামিল করা হয়। সেই সকল লোকের মধ্যে কেবল ৩১০ জনকে হুগলিতে পাঠান হইয়াছিল। হুগলির মেজেষ্টার সামুয়েল সাহেব তাহাদের সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বাকি ৩০৩ জনের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পান নাই, অথচ তাহাদের খালাসও দেন নাই। তাহাদিগকে তিনি জেলখানায় রাখিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকাল গেল, বর্ষা গেল, তাহার পর শীত পড়িল; তাহাদের গাত্রবস্ত্র নাই। তিনশত লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া সহজ কথা নহে; সুতরাং সেদিকে আর কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। আসামীরা একে একে মরিতে আরম্ভ করিল। জালরাজা আপনার উকীলদের বিস্তর অনুরোধ করিলেন যে, এই হতভাগাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু চেষ্টা কর। সা সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, এই তিনশত লোকের জন্য গাত্রবস্ত্র কে দিবে? জালরাজা বলিলেন, আমি আর দেখিতে পারি না, তোমরা না কর, আমি নিজে দরখাস্ত করিব। শেষ সা সাহেব দরখাস্ত লিখিতে সম্মত হইলেন। জালরাজা লিখাইলেন, "হতভাগাদের এইমাত্র অপরাধ যে, তাহারা আমাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। যদি আমি সত্যই জাল হই, তবে আমিই তাহাদের ঠকাইয়াছি, আমিই দণ্ডের যোগ্য। তাহারা ঠকিয়াছে, তাহাদের অপরাধ নাই। তাহাদের খালাস দেওয়া হউক, অন্ততঃ গাত্রবস্ত্র দেওয়া হউক।*

---

* "Their whole crime consisted in believing me to be Raja Protap Chand. If I am an impostor, as alleged, I am guilty of having deceived them, and I may therefore be liable to punishment. Of these persons only six have been thought criminal enough to be sent for trial before you, and the others have been in custody for a period of nearly seven months without knowing the crime which they are alleged to have committed, without being confronted with any of the witnesses for the prosecution, and without having been brought to trial. Of the remainder, thirteen are dead,—two more I understand are at the point of death, and twentytwo are in the hospital. I am also informed that several of these in hospital have not sufficient clothes to cover their bodies." *Extract from petition dated 30th November 1838.*"

দরখাস্তের ফল কতক ফলিল। ১৪০ জন খালাস পাইল, কিন্তু সাত মাসের পর খালাস পাইল। তাহাদের বিপক্ষে একজন সাক্ষীরও সাক্ষ্য লওয়া হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না; অথচ তাহারা সাত মাস কারাবদ্ধ ছিল। তাহাদের খালাস দিবার সময় কেবল একখানি করিয়া মুচলকা দস্তখত করাইয়া লওয়া হইল। তাহাদের আর কোন বিচার হইল না। বাকি ১৬৩ জন জেলে থাকিল, তাহার মধ্যে কতক লোক সেইখানেই মরিয়া গেল।

বে-আইনি কয়েদ রাখার নিমিত্ত সা সাহেব যে ওগলবি সাহেবের নামে নালিশ উপস্থিত করেন, তাহার বিচার সুপ্রিম কোর্টে ৯ই জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয়। সেই মোকর্দ্দমায় হুগলির মেজেষ্টার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে এই সকল আসামীদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যে ৩১০ জনের মধ্যে আমি ছয় মাসের পর ১৪০ জনকে খালাস দিয়াছি; আর বাকি ১৫০ কি ১৬০ জন বিচারের নিমিত্ত জেলখানায় অদ্যাপি আবদ্ধ আছে। যে ১৪০ জনের কথা বলিলাম, আমি তাহাদের বিচার করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ওগলবি সাহেব বর্দ্ধমানে তাহাদের এজাহার লইয়া আমার নিকট দণ্ডের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহাদের ছয় মাস পরে ছাড়িয়া দিয়াছি। আদালতে তাহাদের আনি নাই। আমার আদালতঘর বড় ক্ষুদ্র, এত লোক সেখানে ধরিতে পারে না বলিয়া আদালতে তাহাদের হাজির হইতে দিই নাই। সা সাহেব তাহাদের মোক্তার ছিলেন বলিয়া তাহাদের উপস্থিত হইবার আবশ্যকও হয় নাই। সা সাহেব তাহাদের পক্ষ হইতে কোন মোক্তারনামা দাখিল করেন নাই, আমিও দাখিল করিতে দিই নাই। সা সাহেব নিজে আসামী, সুতরাং তিনি মোক্তার হইবার অধিকারী নহেন।

এ বিচারপদ্ধতি শুনিয়া সুপ্রিম কোর্টের অনেকে হাসিলেন। বোধ হয় সামুয়েল সাহেব তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, ইহারা তবে বিচার কাহাকে বলে? তিনি তখন বলিলেন "What do you mean by a trial? There certainly has been no regular trial of those prisoners whom I released, nor of those who, I have said, are now awaiting their sentence; those whom I released I considered less criminal than the others, and I thought the punishment they had already undergone was sufficient—they had been in prison six months—Yes! certainly without having any regular trial or sentence passed on them. By Regulation I cannot try after six months' imprisonment.

আরও হাসি পড়িয়া গেল। যাহারা ছয় মাসের অধিক কাল জেলে থাকে, তাহাদের বিচার করিতে আইনে নিষেধ! সেই জন্য মেজেষ্টার বাহাদুর তাহাদের বিচার করেন নাই, জেলে রাখিয়াছিলেন! যাহাদের বিচার নিষেধ, তাহাদের জেলে রাখিতে আইনে নিষেধ নাই! ছয় মাস ছেড়ে নয় মাস তাহারা জেলে আছে, আরও থাকিবে, তাহাতে আইনের আপত্তি নাই। আইনের আপত্তি কেবল বিচার সম্বন্ধে। ছয় মাসের পর খবরদার যেন আর বিচার না হয়, ছয় মাসের পর যত দিন ইচ্ছা জেলে রাখ, কিন্তু বিচার করিও না। ইহা কোম্পানীর আইন।

যে সকল আসামীদের কথা বলা হইতেছিল, তাহারা কতদিন পরে খালাস পাইল তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, জালরাজার মোকর্দ্দমার পর মেজেষ্টার সাহেবের অবকাশ হইলে তাহাদের খালাস দেওয়া হইয়া থাকিবে। সামান্য লোকদের জেলে রাখা তখন সামান্য ব্যাপার বলিয়া মেজেষ্টরদের বোধ ছিল। গরিব দুঃখীরা কে খালাস পাইল কি না পাইল, তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে কাহার সাহস হইত না! "চাচা আপন বাঁচা" এই তখনকার প্রচলিত বুলি ছিল। তদ্ব্যতীত সকল দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ মেজেষ্টারদের একেবারে ছিল না। তখন ডিপুটি মেজেষ্টার ছিল না, সবডিবিসন ছিল না, সকল কার্য্যই মেজেষ্টারকে নিজে করিতে হইত। সুতরাং কোন কার্য্যই হইয়া উঠিত না, অনেকটা আমলাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহাই দেওয়ান মনসারাম মিত্রের অসম্ভব প্রভুত্ব হইয়াছিল। তিনি মনে করিলে এই আসামীদের খালাস দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার এ সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার কোন হেতু উপস্থিত হয় নাই।

দায়রায় সাতজন আসামী সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জালরাজার পক্ষে জজ সাহেব যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অপর ছয়জন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ ছিল না, মেজেষ্টার সাহেবও কোন প্রমাণ নিজে লন নাই, দায়রায়ও কোন প্রমাণ পাঠান নাই; সুতরাং জজ সাহেব তাহাদের খালাস দিলেন।*

---

* এই ছয় জনের মধ্যে হরধামের রাজা রায় নরহরিচন্দ্র একজন আসামী ছিলেন। তিনি খালাস হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র বলিয়া তাঁহার বংশাভিমান কিছু অতিরিক্ত ছিল, এমন কি তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্র অপেক্ষা আপনাকে সম্ভ্রান্ত মনে করিতেন। রাজা গিরীশচন্দ্রও তাঁহার প্রতি কতকটা জ্ঞাতি বৈরিতা দর্শাইতেন। একবার কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে নরহরিচন্দ্রের দুর্দ্দশা অনুকরণ করিয়া একটা যাত্রায় "সং" দেওয়া হয়। তাহাতে নরহরিচন্দ্র আরও অপমানিত মনে করেন।

এই ছয়জনকে কেন দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল, ইহার হেতু ঠিক বুঝা যায় না। ইহারা জালরাজার সঙ্গে ছিল সত্য, কিন্তু আরও অনেকে ত সেই সঙ্গে ছিল, তাহাদের সকলকে সোপর্দ্দ কেন করা হইল না, কেবল এই ছয়জনকে কেন সোপর্দ্দ করা হইল, তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক করিয়াছিলেন। জালরাজার উকিল সা সাহেব উপহাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সাত সংখ্যা শুভপ্রদ, তাহাই সাতজনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

৩

বৌদ্ধবিদ্রোহ

পরশুরামের সময় হইতে শাক্যসিংহ পর্য্যন্ত কতদিন তাহার কিছুই স্থির নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপলক্ষের কথা প্রায়ই আমি বুঝিতে পারি না, এবং তাঁহারা যে সকল তারিখ স্থির করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতেও সম্মত নহি। তাঁহারা এতদ্দেশের পুরাবৃত্তকে বাইবেললিখিত পুরাবৃত্ত অপেক্ষা গৌণ ভিন্ন মনে করিতে পারেন না। বাইবেলের মত ধরিতে হইলে মনুষ্যজাতির বয়ঃক্রম ৬০০০ বৎসরের অধিক নহে। সুতরাং ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশের পুরাবৃত্ত বিষয়ে যে কিছু আলোচনা করেন তাহাতে ঐ ৬০০০ বৎসরের কথা ছাড়িতে পারেন না। ফলতঃ তাঁহাদিগের মধ্যেই আবার এই মতের যথেষ্ট প্রতিবাদ শুনিতে পাই। সত্য বটে, এরূপ একটী সূত্র ধরিয়া না চলিলে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া এতদ্দেশের শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদি সমস্তই যে ঐ মিয়াদের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া মতিস্থির করিতে হইবে, এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এতদ্বিষয়ে আর একটী হাস্যজনক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইংরাজী কবি চসরের সময় হইতে সেক্সপিয়রের সময় পর্য্যন্ত এত বৎসরের মধ্যে ইংরাজি ভাষার এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত ও বেদের সংস্কৃত পরস্পর তুলনা করিয়া স্থির করা গেল যে, দুইএর মধ্যে এত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার এতদিন অগ্রে ঋগ্বেদ রচনা হইয়াছিল। এ হিসাবটী লিখিতে সহজ; কেবল একটু দোষ এই যে, তিনটা সুপারির মূল্য যদি এক পয়সা হয় তবে এক কান্দি মর্ত্তমান কলার মূল্য কত হইবে তাহার কোন

স্থিরতা নাই। আর জ্যোতিষ ধরিয়া যে হিসাবে বেদের সময় নির্ণয় হয়, তাহার কথা জ্যোতির্ব্বেত্তারাই বলিতে পারেন। আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়া রাখিয়াছি, যে বেদের কথা ইংরাজি ভাষাতে বুঝিয়া সমালোচনা করা ধৃষ্টতা ভিন্ন নহে। একথাটী আমার নহে; দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট এই শিক্ষাটী লাভ করিয়াছি। অতএব ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে কাল নির্ণয় করা কিম্বা কালনির্ণয়ের সমালোচন করা সর্ব্বপ্রকারেই আমার সাধ্যাতীত।

পরন্তু ভারতবর্ষের ঘটনাবিশেষের পারম্পর্য্য স্থির করিতে পারিলেও অনেক মঙ্গল হয়। অর্থাৎ শাক্যসিংহ এবং পরশুরাম অমুক তারিখে দেহত্যাগ করেন এপ্রকার সূক্ষ্ম কালনির্ণয়ের অভাবে যদি এ পর্য্যন্তও অবধারণ করা যায় যে—অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে বা উভয় ঘটনা সমসাময়িক—অথবা প্রথমটি অগ্রবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়টি অল্প কি অধিক পরবর্ত্তী, কি কেবল পরবর্ত্তী,—তাহা হইলেও ভাল হয়। এ প্রকার আন্দাজ করা নিতান্ত অসাধ্য মনে হয় না; এবং এরূপ আন্দাজি কথা একেবারে অকর্ম্মণ্যও নহে। কেন না, যে সময় পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা অন্য দেশের সহিত মিশ্রিত হন নাই, সে সময় উপলক্ষে ভারত এবং অ-ভারত মধ্যে সমসাময়িক সম্বন্ধ না জানিতে পারিলে ক্ষতি নাই। যাহারা এক পাঠশালায় পড়ে, তাহাদিগের মধ্যেই বিদ্যা ও বয়ঃক্রমের পরিচয় লইয়া পরস্পরের ন্যূনাতিরেক স্থির করা আবশ্যক হয়। কেন না, উভয়ের তুলনা দ্বারা ছাত্রগণের বুদ্ধির তারতম্য ও শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ কতক বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন পাঠশালার ছাত্র মধ্যে কেহ এক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্ত্তী ও অন্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়া প্রকাশ হইলে এতাদৃশ কোন ফল লাভ হয় না। ভারত এবং ইউরোপের সমসাময়িক উন্নতির তুলনা করা ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর। ব্যাস ও বাল্মীকির সময় সূক্ষ্মরূপে স্থির করিতে পারিলে একটী লাভ এই যে, বুঝা যাইবে তখন ইউরোপীয়েরা কি অবস্থায় ছিলেন; সে সময়ে কাহারা শ্রেষ্ঠ কাহারা নিকৃষ্ট ছিল, এবং এত বৎসরের মধ্যে কোথায় কত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারে পরস্পরের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ স্থির হইলেও কাহারও ন্যূনাতিরেক স্থির হইবে না।—এক সময়ে ভারতে অন্নকষ্ট ছিল না বলিয়া কোন বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে এবং কোন বিষয়ে হয়তো ঐ কষ্ট অভাবে দুর্ব্বুদ্ধিও ঘটিয়াছে; আর, সেই সময়ে ইউরোপীয়েরা অন্নাভাবে নিতান্ত কাতর ছিলেন, কিম্বা সময়ান্তে অন্নকষ্টের অভিজ্ঞতা সহকারে অমুক অমুক বিষয়ে ভারতবাসিগণ অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন—পুরাবৃত্ত শাস্ত্রে এরূপ সমসাময়িক সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলে এমন কোন অসাধারণ উপকার দেখিতে পাই না।

ভারতের পুরাবৃত্তের তারিখ স্থির করিতে পারিলে লাভ হইত না এমন নয়। যে লাভ হইত তাহা অন্য প্রকারের। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বুঝা যাইত, যে যখন অমুক ঘটনার পরে অমুক ঘটনা হইয়াছে, তখন তদুভয়মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। অথবা অমুক অমুক বিষয়ে লোকের বুদ্ধির ভ্রম বা চৈতন্য প্রযুক্তই পরে এই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। লোকে বিবেচনা করিয়া এক সময়ে যে কোন প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে, না বুঝিয়া সেই প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তন করিলে আবার তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে· যেখানে বিবেচনার ত্রুটী হইয়াছে সেখানে ধারাবহন ত্যাগ করিলে দোষ হইতে পারে না, বরং লাভ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এরূপ উপপত্তির নিমিত্তে ঘটনাসমূহের তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্য্য নির্ণীত হইলেও অনেক সুবিধা হইতে পারে।

কালপ্রবাহে নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও রূপান্তর করা আবশ্যক হইবে ; ইহাতে বিচিত্র কি ? প্রাচীন কালে এতদ্দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা হয় নাই, এবং তদ্বিষয়ক বুদ্ধিও অপরিণত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র সংক্রান্ত ঘটনাদির মধ্যে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা নির্দ্ধারিত করাতেই ইউরোপের এত উন্নতি হইয়াছে। অতএব ভারতপুরাবৃত্তের ঘটনাবলীর তারিখ অভাবে কেবল পারম্পর্য্য বুঝিতে পারিলেও ঐরূপ লাভ দর্শিবে। এবং এতদ্দেশের অবস্থা অনুসারে বিজ্ঞান শাস্ত্রোক্ত মতে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা ধরিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা—বিজ্ঞান শাস্ত্রের এই বিধান। অবস্থা বুঝিতে পারিলে ব্যবস্থার বিষয়ে মতভেদের স্থল স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য স্থিরীকৃত হইলে অন্ততঃ একটি লাভ হইবে। ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে সকল উপদেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গুণেই ভারতবাসীরা ক্রমশঃ নানা বিষয়ে বৈরাগ্য শিখিয়াছেন। এই শিক্ষার পারম্পর্য্য স্থির হইলে অতীত ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক ভাবী বিধান স্থির করা যাইবে। সংসার আশ্রম হইতে বীতরাগ হইয়াই সন্ন্যাস অবলম্বনের অভিলাষ জন্মিয়াছিল, এবং সন্ন্যাসের পরিচয় হইতে স্বার্থানুরাগবিহীন শ্রমের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইগুলি স্থির হইলে পরিশেষে পরিশ্রমই বৈরাগ্যের প্রধান উপায় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

পরশুরামের সময়ে ব্রাহ্মণদিগের যুদ্ধত্যাগ এবং শাক্যসিংহের সময়ে বৌদ্ধমতের সূত্রপাত হয়। এই দুই সময়ের মধ্যের সামাজিক ব্যাপার,—বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিরোধ এবং শ্রুতি রচনার সমাপ্তি ও স্মৃতি রচনার প্রারম্ভ,—এইগুলি

অনুমান হয়। কেবল স্মৃতি কেন, এই সময়ে দর্শনশাস্ত্রেরও অন্ততঃ কতক উন্নতি হইয়া থাকিবে।

ইদানীন্তন ইউরোপীয় সমালোচকেরা বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া এতই বিব্রত হইয়াছেন যে, উহার পূর্ব্বের ও পরের ঘটনার প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। অনেকের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের, মনের সংস্কার যে, হিন্দুধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণদিগের ক্রূর বুদ্ধির ফল মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট বৌদ্ধমত অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইয়াছে। শত্রুর শত্রু মিত্রপদেই অভিষিক্ত হয়। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহার বিচার পৃথকরূপে নিষ্পন্ন করা আবশ্যক হইযাছে। ভরসা কবি, নব্য সম্প্রদায়েব মধ্যে যাঁহারা ইংরেজি ও সংস্কৃতভাষাতে ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা পালিভাষার অনুশীলন করিয়া এই বিচারে ব্রতী হইবেন।

শাক্যসিংহেব উপদেশ অন্ততঃ কতক পবিমাণে যে ব্রাহ্মণগণের শিক্ষা হইতে উৎপন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই। আব বৌদ্ধগণও এতদ্দেশ হইতে দূবীকৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতেই ব্রাহ্মণের ক্রূরতা প্রতীত হয না। বরং বৌদ্ধমতের দোষ এবং ব্রাহ্মণদিগেব উপদেশেব প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে। ভারতবাসীরা বৈদিকধর্ম্মেব প্রতি অধিকতব সমাদর না করিলে এত বড় প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষয় হইবে কেন? এবং যে সমস্ত লক্ষণবশতঃ সেই পবিত্যক্ত বৈদিকধর্ম্ম আবাব লোকের নিকটে এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা কখনই সর্ব্বতোভাবে নিন্দার বিষয় হইতে পারে না।

প্রবাদ আছে যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতাবলম্বীগণকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী তীর্থ পুনঃসংস্থাপন করেন। অতএব পরশুরাম হইতে শাক্যসিংহের সময় পর্য্যন্ত বৈদিক সময় এবং শাক্যসিংহ হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সময় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ ও বেদের বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু আমরা বেদ ও ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্য বৌদ্ধদিগের বিদ্রোহ নাম দিয়াছি। ফলতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণেব কথা ছাড়িয়া হিন্দুগণের মতে বিচার করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্রোহস্বরূপ বলিয়া সহজেই অনুভব হইবে।*

---

* শাক্যসিংহ কুল ও গোত্র বিষয়ক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী গোপা, দণ্ডপানি শাক্যের দুহিতা। অতএব বিবাহটা সগোত্রেই হইয়াছিল। ঐতিহাসিক রহস্য ২ ভাগ ৫৫, ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

শাক্যসিংহ হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত যে সকল ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা হইয়াছে, তাহাতে এই সময়টীই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এই সময়ে ভারতবর্ষ নানা ধর্ম্মে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। যখন বিপ্লব উপস্থিত হয় তখনই পুরাবৃত্তের ঘটনা বৃদ্ধি হয়। এবং উহার বিপরীত অবস্থাই প্রকৃত প্রস্তাবে মাঙ্গলিক। শান্তির সময়েই বাস্তবিক লোকের চরিত্র সংস্কার হইয়া থাকে। এইরূপ মাঙ্গলিক ঘটনা পরশুরামকৃত বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, অর্থাৎ বৈদিক সময়েই ঘটিয়া থাকিবে। ঐ বিপ্লবের পরে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ ঘটিয়াছিল; ইহার মর্ম্ম এইরূপ বোধ হয় যে, ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মবলের তুলনায় বাহুবলের ন্যূনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রকার লোক-সংস্কার সামান্য উন্নতির লক্ষণ নহে। এই উপাখ্যানের প্রতি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ করিলে আরও বোধ হইবে যে, নিরস্ত্র অহিংসক ব্যক্তির প্রতি বলবান লোভ-পরবশ ব্যক্তি অত্যাচার আরম্ভ করিলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির পক্ষেই সকলে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বামিত্রও পরিশেষে এই কথা বুঝিয়া বিপ্রধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বিশ্বামিত্রের সহিত শাক্যসিংহের তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহা-চরণ করেন, আর বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিপ্র-বৃত্তি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। শাক্যসিংহ নিজে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধরাজা অজাতশত্রু এবং অশোক, বৌদ্ধসঙ্গম এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণের উপরেও আধিপত্য করেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী ভোট রাজ্যে ধর্ম্মরাজা এখনও দেবরাজ নামক পিউলো বা সুবাদারের উপরের কর্ত্তৃত্ব করিতে-ছেন। আর জাপানের মিকাডো এবং চীনের সম্রাটের কর্ত্তৃত্বও ঐরূপ। * ফলতঃ বৌদ্ধমতে যাজন, অধ্যাপন আদি বিপ্রধর্ম্ম ক্ষত্রবৃত্তির সহিত বিভিন্ন থাকে নাই। বৌদ্ধেরা শ্রুতি, স্মৃতির অবমাননা করাতেই ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তির বিঘ্ন হয়। নন্দরাজার সময় উপলক্ষ্য করিয়া বৃহৎকথার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, যে সামবেদের আবৃত্তি শুনিয়া শৃগালের রব ভ্রম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি উচ্ছেদ করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ কথা মনে করিতে পারি না। যাজনবৃত্তি রাজ-কার্য্য হইতে বিভিন্ন হওয়াতে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। শাক্যসিংহের বিদ্রোহের মূল কথা প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদের হনন। বিশ্বামিত্র কখনই উল্লিখিত বৃত্তিভেদের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং

* Beat's Fah Hian PP. XXV, 42. &c.

কার্য্যের দ্বারা তিনি বিপ্রবৃত্তির সম্মান বর্দ্ধন করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন মনে হয়। বিশ্বামিত্রের সময়েও ব্রাহ্মণেরা শাক্যসিংহের সময়ের অনুরূপ হইয়া নব্যবিধানের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রতি ব্রাহ্মণের বৈরিতার নিদর্শন এইমাত্র আছে যে, তিনি ব্রহ্মর্ষির সমান এবং সপ্তর্ষির মধ্যে একজন হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গকে দোষ দেওয়া অসঙ্গত। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি উভয় পদই ক্ষত্রিয় বর্ণের আয়ত্তের মধ্যে বটে। কেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণটী নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু এই স্বল্প স্বার্থপরতাটীও বিবর্জ্জিত হইতে পারিলে ব্রাহ্মণেরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিতেন। মনুষ্যের নিকট এতদূর প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। প্রত্যুত ব্রাহ্মণেরা বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি করাতেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, শাক্যসিংহও ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিতেন।

বেণ, নিমি ইত্যাদি রাজাদিগের বৃত্তান্ত জানি না, সুতরাং তাঁহারা শাক্যসিংহের শ্রেণীতে গণনীয় কি না তাহাও বলা যায় না। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ইহারা শীঘ্রই শাসিত হইয়াছিলেন আর বৌদ্ধদিগকে শাসন করিতে করিতে ভারত যবন হস্তে নিপতিত হইয়াছেন। শাক্যসিংহের খ্যাতি এতদিনের পরে জগৎ বিস্তীর্ণ হইতেছে। আমি উঁহার বিরোধী নহি। বেণের সময়ে কোন সদনুষ্ঠান শুনা যায় না। শাক্যসিংহের মহৎ কীর্ত্তি অদ্যাপি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিতেছি। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যসমগ্রকে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ বলাতে পাঠক এমন মনে করিবেন না যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমাদিগের কোন উপকার হয় নাই।

কংস ও জরাসন্ধের সহিত বৌদ্ধ পুরাবৃত্তের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু কংসারী এবং কাল যবনতাড়িত দ্বারিকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ উপলক্ষেই ভগবদ্গীতা রচনা হইয়াছিল। যবন আলেকজন্দরের পূর্ব্বে বৌদ্ধবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং কৃষ্ণোপাসনা মূলক ভগবদ্গীতাতে বৌদ্ধদিগের কথা স্পষ্ট না থাকিলেও উক্ত মতের, অথবা, স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বিপ্রধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা মাত্রের, প্রতিবাদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাক্যসিংহের সময়ে বোধ হয় বেদাধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেক দোষ ঘটিয়া থাকিবে। এই জন্য তিনি বেদের শিক্ষা এবং ব্রহ্মর্ষি পদপ্রাপ্তির কামনা পরিত্যাগ করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে যে সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণপদ ধারণ করিতেন, তাঁহাদের যতই ত্রুটি হইয়া থাকুক,

তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদায় এবং সেই পদের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? একজন রাজা যদি অত্যাচার করেন তবে সকল রাজাই কি দোষী হইবেন ? এবং রাজপদ মাত্রই কি উন্মূলনের যোগ্য হইতে পারে ?

বিশেষতঃ একটী কথা স্মরণ করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণপদ এবং ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হইতেই যুদ্ধ নিবারিত হয় এবং এই শুভ ঘটনা হেতুই শাক্য বিশ্বামিত্রাদি ধর্ম্মালোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও যে আপন পদবিষয়ক যুক্তির সার কথা সম্যকরূপে বুঝিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদ সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট শুনা যাইত। গীতাকার নিষ্কাম কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগের তুলনা করিয়া কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "যুদ্ধ ধর্ম্ম এবং অহিংসা ধর্ম্ম উভয়ই সমান, কিন্তু সম্যক অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়স্কর।" ৩ অঃ ৩৫। এস্থলে গীতাকার অনায়াসে বলিতে পারিতেন যে, উভয় ধর্ম্ম সমান বটে, অথচ যুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না থাকিলে অহিংসা বা বিপ্রধর্ম্ম রক্ষা হয় না; আর একাধারে উভয় ধর্ম্ম ধারণ করাও অসাধ্য। অতএব ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতে বিপ্রধর্ম্ম ক্ষত্রধর্ম্ম উভয়েরই বিঘ্ন হইবে। আশ্চর্য্য এই যে, শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম্মের পোষকতা করিতে গিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, উভয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান "এককালে একপুরুষ কর্ত্তৃক সম্ভব হয় না," (বেদান্তবাগীশের ভগবদ্গীতা ৪০ পৃষ্ঠা) তথাচ বলিতে পারেন নাই যে, একের রক্ষার্থে দ্বিতীয়ের রক্ষণ অপরিহার্য্য। অতএব ব্রাহ্মণেরা কার্য্যে বিপ্রধর্ম্ম ও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রভেদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিগূঢ় যুক্তি পরিষ্কাররূপে স্থির করিতে পারেন নাই। তথাচ তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ হইতে যে ক্ষতি উৎপন্ন হইয়াছে শাক্যসিংহকেই তাহার মূলীভূত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আমরা বুঝি আর না বুঝি, আমাদিগের কার্য্যফলের দোষ গুণ আমাদিগের উপরেই বর্ত্তিবে।

শাক্যসিংহ যে ধর্ম্ম প্রণয়ন করেন তাহা যুদ্ধবৃত্তির পোষক নহে। এবং বৌদ্ধগণ যখন যাজনকার্য্য ও ক্ষত্রবৃত্তির বিভেদ উঠাইয়া দেন, তখন তাঁহারাও যে এতদ্বিষয়ের সমধিক বিচার করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না। বাস্তবিক বিপ্রধর্ম্ম, অর্থাৎ যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ, যুদ্ধধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন হওয়াতেই দেশের মঙ্গল হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় পক্ষই নিগূঢ় কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভুলিয়া অসঙ্গত কার্য্যের দ্বারা তাঁহাদিগের বংশাবলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা করাতেই প্রাগুক্ত বৃত্তিভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ব্রাহ্মণেরা যাজন অধ্যাপনের সম্বন্ধ ও মাহাত্ম্য না বুঝিয়া যজন এবং তপস্যার প্রতি অযথা মনঃসংযোগ করাতেই এত

বিপত্তি ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের যুক্তি এবং তদ্বিষয়ে বৌদ্ধের ভ্রম স্ব স্ব সম্প্রদায়ের দোষ গুণ জ্ঞাপক নহে, কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বিশেষের ফল, এবং পরবর্ত্তী ঘটনা বিশেষের কারণ মাত্র। সেই সকল ঘটনার অশুভকব ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভকর ভাগ রক্ষা করাই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। যাজন বৃত্তির পার্থক্য রক্ষা ও বৌদ্ধগণের উপদেশ পালন, উভয়ই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু বিপ্রবৃত্তি হরণান্তে বৌদ্ধেরা যে বৃত্তিভেদের লোপ চেষ্টা করেন তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর বৌদ্ধবিদ্রোহের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার আলোচনা কবা যাউক। যাহাকে ইতিপূর্ব্বে বৈদিক সময় বলিয়াছি, ঐ সময়ে ভাবতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবোধই প্রবল হইয়াছিল। এবং এই বিরোধে উভয় পক্ষ নিরস্ত হওয়াতেই বিপ্রধর্ম্ম এবং ক্ষত্রধর্ম্মেব বিভেদ সংস্থাপিত হয়। এই ঘটনাটী নিতান্ত অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহাব সত্তার বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃ এতাদৃশ বিবোধে এক পক্ষের সম্পূর্ণ পরাজয় হওয়াই সম্ভবপব। এবং এরূপ পরাজয় হইতে, হয় যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের একাধিপত্য ঘটিবে, নচেৎ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের অনন্য প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবাব কথা। ধর্ম্মব্যবসাটী প্রধান হইলে যুদ্ধব্যবসায় যে উঠিয়া যাইত এমত নহে, কেবল যাজ্ঞিকেব আদেশ ব্যতীত কোন যুদ্ধ হইতে পাবিত না। ব্রাহ্মণদিগকে প্রথম হইতে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে তাঁহারা যুদ্ধ-কলুষস্পৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ মুসলমান বাদসাহের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। যে দেশেই হউক যাজ্ঞিক সম্প্রদায় এইরূপে যুদ্ধকাম হইলে তাঁহাবা ধর্ম্মালোচনা বিষয়ে স্বভাবতঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটান। সুতবাং পরিশেষে আবার যুদ্ধব্যবসায়ীরা উৎপীড়িত এবং বিদ্রোহী হইয়া যাজ্ঞিকদিগকে শাসিত কবিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে শাক্যসিংহ রাজসুখ ভোগেও সন্তুষ্ট হন নাই। না হইয়া বিপ্রবর্ণের তপস্যাবৃত্তির জন্য আকিঞ্চন করিলেন। এবং এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের আত্যন্তিক এবং বিকৃত ভাব উৎপাদন করিলেন।

ফলতঃ যাজ্ঞিক এবং যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের বিরোধ ঘটিলে অগত্যা উভয় পক্ষকেই বাহুবলের উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বাহুবল দ্বারা এই বিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে ধর্ম্মোপদেষ্টা অপেক্ষা অস্ত্রধারীগণের জয়লাভই যে অধিকতর সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপে যাঁহারা পোপের ধর্ম্মশাসন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা অগত্যা যুদ্ধব্যবসায়ীগণের একান্ত অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় এই প্রণালী অবলম্বন করাতে ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ জাতির মধ্যে ধর্ম্মশাসন কত হীনবল হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই বিভাগের বিশপের দুরদৃষ্ট উপলক্ষে দেখান গিয়াছে।

যুদ্ধব্যবসায়ীদিগের প্রাধান্য হইতে ধর্ম্মালোচনের বিঘ্ন হয় বটে, কিন্তু রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং সৎপরামর্শের বল, বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা সত্বর প্রতিপন্ন হইবার নহে। বাহুবল দ্বারা লোককে বশীভূত করা অপেক্ষাকৃত সহজ; এই জন্য তাহা হইতে যে সকল উন্নতি হয় তাহা যুদ্ধব্যবসায়ীর প্রাধান্য হইতেই লব্ধ হয়। আর যুদ্ধব্যবসার উন্নতি হইতে আজ্ঞাদান ও আজ্ঞাপালন বিষয়ক বন্দোবস্ত লোকের অভ্যস্ত ও হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সকল উন্নতি দূরে থাকুক, বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণের বিদ্রোহিতা করিয়াও স্বকীয় ধর্ম্মের কয়েকটি ক্ষতি নিবারণ করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধরাজ্যের সময়ে অনেক উন্নতি হয়, কিন্তু বৃত্তিং সাঙ্কর্য্য হইতে মহা ক্ষতি হইয়াছে।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্য করিতে পাইলে একছত্র স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন। একছত্র স্থাপন করিতে পারিলে রাজ্যস্থ লোক সমূহের একতা এবং তন্নিবন্ধন নানাবিধ উন্নতি লাভ হয়। কিন্তু যুদ্ধকার্য্যে দক্ষ হইলেই যে একছত্র স্থাপন করিতে পারা যায় এমত নহে। বাহুবলে রাজ্যাধিকার হইতে পারে, কিন্তু একছত্র স্থাপনার্থ লোকের মন বশীভূত করা আবশ্যক। সে কৌশল, সকল যুদ্ধব্যবসায়ীর আয়ত্ত হয় না। মুসলমানেরা একসময়ে অনেকদূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজ্যের একতা স্থাপিত হয় নাই। সেকেন্দর সাও বিস্তর রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। বৌদ্ধগণ গন্ধার, (কাণ্ডাহার) তাম্রলিপ্ত (তমলুক), এবং সিংহল পর্য্যন্ত একছত্র স্থাপন করিয়া থাকিবেন। এবং স্তূপ গুহা বিহার আদিতে অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রাজকার্য্যের ভাল বন্দোবস্ত কোথাও করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ শাসনের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিলে বৌদ্ধশাসনে, ভারত, তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, যেখানে বল সর্ব্বত্র কেবল সম্রাট, রাজা, তালুকদার, বা সুবেদার মাত্রের শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই যাজ্ঞিকগণের উপরে কর্তৃত্বপরায়ণ। ইঁহাদের দ্বারা কোথাও প্রকৃতিবর্গের মহত্ত্ব কিম্বা সহযোগীতার পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। কোথাও মতভেদ নিবৃত্তিকরণের উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। চাণক্যের বুদ্ধি-নৈপুণ্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া একবারও বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা মনে হয় না। বররুচির সদর্প কথা—পাঁচজনের ঐক্য অভাবে দুইজনের ঐক্যেই রাজ্য রক্ষা হইতে পারে—মনে হইলে কেবল হাসি পায়। (মুদ্রারাক্ষস, বৃহৎ কথা দেখ।) একছত্রের বন্দোবস্ত, রাজধর্ম্ম ও রাজনীতির অঙ্গ। তাহা সহজে বোধগম্য হইলে বর্ত্তমান সময়ে আত্মশাসন লইয়া এত

আড়ম্বর শুনা যাইত না। এ কথাটী অপ্রাসঙ্গিক। কেবল মূল বিষয়ের অর্থজ্ঞাপনার্থে ইহার নাম করিলাম।

একছত্র স্থাপন বিষয়ে রোমকেরা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, সমগ্র ইউরোপ এখন বিভিন্ন রাজার অধীন হইলেও নানা বিষয়ে এক মতাবলম্বী। রোমের শিক্ষা এখনও ইউরোপের সর্ব্বত্র সজীব রহিয়াছে। রোমের আইন, রোমেব শাসনপ্রণালী, রোমের বন্দোবস্ত ব্যতীত ইউরোপীয়েরা আর কিছুই বুঝেন না। হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়া ইউরোপীয়দিগের এত তাক্ লাগিবার এক কারণ এই যে, রোমের ব্যবস্থার সহিত সমস্ত মিলাইতেও পারেন না, আর অব্যবস্থা বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর আমাদিগেব দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের রাজধর্ম্মে রাজ্যের বন্দোবস্তের বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ নাই; আর সন্ন্যাসধর্ম্মে কেবল সংসাব উচ্ছৃঙ্খল করিবার ব্যবস্থাই দেখা যায়। উভয় ধর্ম্মের সহযোগিতা বৌদ্ধবিদ্রোহের পূর্ব্বে কিয়ৎ পবিমাণে ছিল। তাহার পরে রাজধর্ম্ম বিষয়ে ভাবতেব যাবপব নাই ক্ষতি হইযাছে। এবং বাজধর্ম্মের অবনতি হইতে বৈরাগ্য বিষয়ে কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে।

ইংরাজেরা ভাই করিয়া থাকেন যে, ভাবতবর্ষে আমরা রোমকদিগের ন্যায় রাজ্য করিতেছি। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। যদি ইংরাজ প্রকৃতিতে রোমকদিগের অনুকরণ করিবার ক্ষমতাও দেখা যাইত, তাহা হইলে এ কথা বলিতাম না। রোমবাজ্যে বিদেশীয় প্রজাগণ গর্ব্ব করিয়া বলিত আমরা "রোমান"। এক সময়ে ইহুদী সেণ্ট পল্ "আমি রোমান" বলিয়া ঘোর বিপত্তি হইতে উদ্ধার পান। কিন্তু এখানে হুইট্‌লি ষ্টোক্স ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইন সংশোধন করিবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝা যায় যে, ইংরাজদিগের প্রজা বশীভূত করিবার ক্ষমতা কত অল্প। ইংরাজজাতির মধ্যে স্বগণের ঐক্য সাধন কৌশল অতি উৎকৃষ্ট। বোধ হয় ঐ কৌশল এত ভাল বলিয়াই অন্য জাতি বা জিত প্রজাবর্গের সহিত ঐক্য সাধনের ক্ষমতা এত অল্প। ফলতঃ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা, যেখানে যেখানে ইংরাজেরা পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমগ্র প্রজাবর্গকে উৎসন্ন দিয়াছেন। আর ভারতবর্ষেও যদি ঐরূপে কৃতকার্য্য না হইতে পারেন, সে কেবল ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবেন তাহা মনে করিবার পথ বড় দেখি না। ইংরাজিভাষাজ্ঞ ভারতবাসীরা মনে করিয়া থাকেন, আমরা সাহেবের মত হইতেছি। ইহা সত্য হউক না হউক, আমাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণের ক্ষতি এবং দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে বটে। আমার সংস্কার অনু-

সারে এই কথা বলিলাম, যদি ভুল হয় তবে পরম সুখলাভ করিব। আমার কথার এক প্রমাণ এই যে, বৌদ্ধেরাও এইরূপ ক্ষতি করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক যুদ্ধব্যবসায়ীরা প্রাধান্য লাভ করিলে যে সকল মঙ্গল সম্ভাবিত হয়, ভারতবর্ষে তাহা ঘটিতে পারে নাই। পরশুরামের সময়ে ক্ষত্রিয়-দিগের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় না হইয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন দ্বারা ব্যবসার ভেদ হইয়া গেল ও স্ব স্ব ব্যবসাতে উভয়েই প্রধান হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা যাজন অধ্যাপনাদিতে ব্রাহ্মণের অধীন, এবং যুদ্ধধর্ম্মে উচ্চতর পদে আরূঢ় হইলেন। ইহাতে রাজ্য-বিস্তারের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া থাকিবে। মনু লিখিত রাজধর্ম্ম পাঠ করিলে এই সংস্কার প্রগাঢ় হয়।

যুদ্ধবিষয়ে রাজধর্ম্মের সার কথা এই যে, যুদ্ধের সময় পলায়নপরায়ণ হইও না। এ কথা যদি রাক্ষস অসুরাদির সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে ব্যক্ত হওয়া মনে করা যায় তবেই সঙ্গত হয়। কেন না, মনু অথবা হিন্দুধর্ম্মানুসারে অন্যায় যুদ্ধ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মনুর মতে জয়লব্ধ রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গের প্রতি এবং পরাজিত রাজপুরুষগণের প্রতিও অত্যাচার চলে না। এরূপ স্থলে যেখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের বাস ছিল তাহার মধ্যে রাজারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি ফল লাভ করিবেন দেখিতে পাই না। সত্য বটে, মুসলমানদিগের পূর্ব্বে হিন্দুরা পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু ইহার হেতু এরূপ হইতে পারে যে বৌদ্ধগণকে শাসিত করিবার নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিষয়ক নিষেধ শিথিল করিয়া দেন ; অনন্তর যুদ্ধ বৃদ্ধি হইয়া ভারতের সমস্ত অনর্থ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও যে বৌদ্ধবিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই এ কথা বলিবার পথ সঙ্কীর্ণ।

বৈদিক সময়ে রাজসূয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের উপলক্ষ ব্যতীত বিভিন্ন রাজগণ একচ্ছত্রের অধীন হইতেন না। আর ঐ সকল যজ্ঞের সময়েও করদ রাজারা যে নিতান্ত প্রজাগণের সমান হইতেন এমতও নহে। বাস্তবিক ভারতবর্ষের নানা রাজারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পরস্পরের সমকক্ষতা করিতেন তন্মধ্যে কোন রাজ্য বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধন লাভ করিলে, তথাকার রাজা যজ্ঞাদির দ্বারা প্রাধান্য স্থাপন করিতেন। এবং দুর্ব্বল রাজাগণ চক্রবর্ত্তী রাজার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সমকক্ষ দুর্ব্বৃত্ত রাজাগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। এতদ্ভিন্ন জয়লাভ করিয়া কোন রাজ্যে ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, কি রাজা কি হাকিম পরিবর্ত্তন, কিম্বা আইনের রূপান্তর করা, হিন্দুরাজাদিগের রীতি ছিল না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে

দেশাচার এবং শাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল প্রভেদ ছিল, এবং দেশ দেশান্তরের লোকমধ্যে যে বৈরভাব ছিল তাহারও কোন ব্যত্যয় হয় নাই। কেবল ব্রাহ্মণেরাই বোধ হয় বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করণান্তে পরস্পরের সহিত বাদানুবাদ এবং দিগ্বিজয়াদি করিতেন; এবং এইরূপ দিগ্বিজয় হইতেই বোধ হয় বিভিন্ন রাজ্যের ব্রাহ্মণমধ্যে একতা সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ বৈদিক সময়ে ক্ষত্রবৃত্তি ও বিপ্রবৃত্তি মধ্যে ভেদ সংস্থাপিত এবং সর্ব্বত্র যুদ্ধবিষয়ে বৈরাগ্য প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগেরই বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, অন্যবর্ণের মধ্যে তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অধীন থাকাতে তাঁহাদিগের কোমল গুণ সকল কতক অভ্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বার্থপরতার দমন হেতু রাজধর্ম্ম, উচ্চাভিলাষ, প্রজাশাসন আদি গুণের উন্নতি হয় নাই। তাঁহারা বলপ্রয়োগে বীতরাগ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করাও আবশ্যক—তাহা তাঁহারা শিখেন নাই। যে কৌশলে ইংরাজেরা ভারতবাসিগণকে কুহকিত করিয়াছেন তাহার কিছুই তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের বিরোধ বুঝিবার নিমিত্ত য়িহুদী জাতি, গ্রীস ও রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত, এবং পোপের শাসন বুঝিয়া তুলনা করা আবশ্যক। য়িহুদিদিগের প্রথম যাজ্ঞিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) মুসা, এবং এব্রেহাম স্বয়ং জগদীশ্বরের দোহাই দিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করেন বটে, কিন্তু শিষ্যবর্গকে চল্লিশ বৎসর বনে ভ্রমণ করাইয়া যুদ্ধবিদ্যা ও সৈনিক বন্দোবস্ত শিখাইয়া দিয়াছিলেন। মুসার পরে যে সকল প্রধান যাজ্ঞিক এবং রাজা হইয়াছিলেন, তাহারা ধর্ম্ম এব যুদ্ধ উভয় বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতেন। ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, বিপ্রধর্ম্ম এবং যুদ্ধধর্ম্ম একত্রে ধারণ করা অসাধ্য। পরে যখন যীশুখ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রকার বল প্রয়োগের দোষ দেখাইয়া নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তখন যাজ্ঞিকেরাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে বধ করাইয়াছিল। ভারতবর্ষের দধীচি মুনির কথা আর য়িহুদীদিগের যীশুখ্রীষ্টকে হত্যা করিবার বৃত্তান্ত একত্রে মনে করিলে অনেক চৈতন্য লাভ হয়।*

যীশুখ্রীষ্টের সময়ের পূর্ব্বে রোম গ্রীসেও যাজন এবং যুদ্ধবৃত্তির বিরোধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তথায় য়িহুদিদের ন্যায়, যুদ্ধাভিলাষী যাজ্ঞিকেরা প্রাধান্য লাভ করেন নাই। রোম গ্রীসে যাজন-অপহরণকারী যুদ্ধার্থিগণেরই প্রাধান্য সংস্থাপিত

---

* যীশু খ্রীষ্ট এবং জন্-দি-ব্যাপটিষ্ট উভয়ে পরস্পরের সহকারী ছিলেন। এসিন্ নামক সম্প্রদায়ের জন্ একজন ছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের বিষয়েও সেই ভাবের দুই একটা কথা পাওয়া যায়। এসিনেরা বানপ্রস্থ ছিলেন মনে হয়, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে জাত্যন্তর করিবার নিয়ম নিতান্ত হিন্দুগণেরই অনুরূপ ছিল।

হয়। পরে খ্রীষ্টানধর্ম্ম রোমের সম্রাটগণ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে, রোমের প্রাধান্য যতদূর বিস্তৃত ছিল সেই পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্মও বিস্তার করে। এবং তখন রোমের সম্রাটেরা বৌদ্ধগণের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেও ক্যাথলিক্ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইল না, রাজা ও যাজ্ঞিকের ভেদ হইল না। অথবা যাজ্ঞিকেরা রাজা হইলেন না। রাজাই প্রধান যাজ্ঞিক হইলেন। পরে কন্সটান্টিনোপল্ সহরে রাজধানী হইলে ক্যাথলিক্ এবং গ্রিকচর্চ্চ সম্বন্ধীয় ভেদের প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে যাজন কার্য্যে রোম সম্রাটের যে আধিপত্য ছিল তাহা গ্রীকচর্চ্চ এবং রুসিয়াধিপতিতে প্রকাশ হয়। রাজধর্ম্ম বিষয়ে রোমের আধিপত্য কিছু দিন পরে বিনষ্ট হয়। অসভ্যগণ রোমরাজ্য ছারখার করিয়া নানা স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করে। কিন্তু সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করাতে রোমনগরস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী যাজ্ঞিক প্রধানেরা ক্রমশঃ রাজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশপের পদে যাজন কার্য্যের স্বতন্ত্রতা সংস্থাপন করেন।

পরে ফরাসী সম্রাট সার্লেমেন, উপাসনা বিষয়ে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ন্যায় হইয়া যাজ্ঞিকদিগের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেন, এবং ইহাতেই ইউরোপ কতক পরিমাণে নিরস্ত্র থাকিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত শান্তিসুখ লাভ করেন। সপ্তম গ্রেগরী নামক পোপ ইউরোপীয় রাজাগণকে যেরূপে কৌশলদ্বারা শাসিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়শাসন বিষয়ে তাহার অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। যাঁহারা কেবল হ্যালামের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সপ্তম গ্রেগরীকে অতি দুর্দ্দান্ত লোভী এবং অধার্ম্মিক যাজ্ঞিক মনে করিতে পারেন। কিন্তু এখন অনেকেই বুঝিতেছেন যে, প্রটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বীরা ক্রোধান্ধ হইয়াই প্রাগুক্ত যাজ্ঞিক প্রধানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন নাই। আমি ব্রাহ্মণবর্ণকে সপ্তম গ্রেগরী অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিতে চাহি না। প্রতিপক্ষেরা এপর্য্যন্ত স্বীকার করিলেই যথেষ্ট যে, শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ভাঙ্গিয়া যেরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, ইউরোপে লুথর কর্ত্তৃক সেইরূপ বিপ্লব হইয়াছে, এবং ধর্ম্মালোচনা এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধে তজ্জনিত বিশৃঙ্খলা এখনও চলিতেছে। আমাদিগের গবর্ণর জেনরেল্ এখানকার লর্ড বিশপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইংলণ্ডেশ্বরী, আর্চ বিশপ অফ্ ক্যাণ্টবররীর নিয়োগকর্ত্রী। ডিজ্রেলির মন্ত্রীত্বের সময়ে ইংরাজ বিশপেরা কাবুলযুদ্ধে জয়লাভ জন্য যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত ছিলেন ; পরে মন্ত্রি-পরিবর্ত্তন হইলে গ্ল্যাডষ্টোনের অনুচর যাজ্ঞিকেরা কাবুলে যুদ্ধ না করিতে হয়, তজ্জন্যও বোধ হয় ঈশ্বরের সমীপে স্তোত্র পাঠ করিতেও সক্ষম হইয়া থাকিবেন। আবার এখন ঈজিপ্ত রাজ্যাধিকার করিবার জন্য কতই না ধুম হইতেছে। পুরাকালের ব্রাহ্মণদিগের দোষ ছিল না একথা বলি না।

দোষহীন লোক অন্বেষণ করাই ভ্রম। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা রাজাজ্ঞার অধীন ছিলেন না এবং জিগীষার কলুষস্পৃষ্ট হইতেন না। এস্থলে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা মনে করা অসঙ্গত। শাক্যসিংহেব বিদ্রোহ দমনার্থে ব্রাহ্মণেরা কি কৌশল করিয়াছিলেন, এবং যবনাধিকাব না হইলে কি করিতেন তাহা বিচাবসাপেক্ষ। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ীর অনধীন হওয়াতেই ব্রাহ্মণেবা যে উন্নতি লাভ কবিয়াছিলেন তাহাব দৃষ্টান্তস্থল সপ্তম গ্রেগরীর যাজকতা, এইমাত্র বলিলাম।

(ক্রমশঃ)
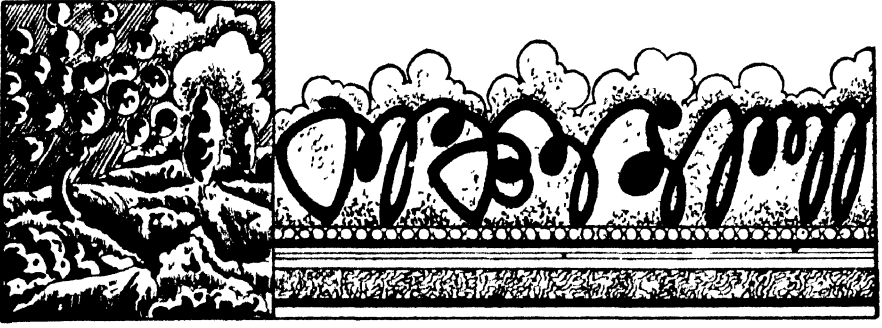
৭ম খণ্ড

তিষ্যরক্ষার রাজ্যাভিষেকে বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাজবাড়ী মধ্যে একটি ধর্ম্মসভা স্থাপিত হইল। ভগবান্ উপগুপ্ত তাহার সভাপতি হইলেন। মহারাজা অশোক, কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও রাধগুপ্ত উহার প্রধান সভ্য হইলেন। বোধিবৃক্ষের অলৌকিক আবির্ভাব অবধি বৌদ্ধগণ তিষ্যরক্ষাকে "ঋদ্ধিমতী" বলিয়া ডাকিত। এই সভার মধ্যে রাজা ও উপগুপ্ত আপন আপন উপাসনাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। মন্ত্রী রাজকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারাদির ভার তিষ্যরক্ষা ও কুণালের উপর অর্পিত ছিল। তিষ্যরক্ষা কুণালকে সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিত; রাজা বা উপগুপ্তের সহিত কুণালের মতান্তর হইলেই কুণালের পক্ষ সমর্থন করিত; যাহাতে সদ্ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে দেশে দেশে অর্হৎগণ প্রেরিত হয়, যাহাতে "ভিক্ষুকদের" সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে "শ্রমণদিগের" বিদ্যোন্নতি হয়, যাহাতে "শ্রাবক" সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হয়, যাহাতে বহুসংখ্যক মঠ স্থাপিত হয়, যাহাতে "চৈত্য"সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের লীলাভূমি সকলের সমুচিত সম্মান হয়, যাহাতে বাৎসরিক বিজ্ঞান সভার উন্নতি হয়, যাহাতে চিকিৎসালয় ও পশু-চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হয়, যাহাতে বুদ্ধদেবের নখ কেশাদি সুসংরক্ষিত হয়, যাহাতে "দন্তযাত্রাদি" উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে ধর্ম্মের সঙ্ঘের ও বুদ্ধের প্রতি লোকের মন আকর্ষিত হয় সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে কুণালকে সাহায্য করিত। যাহাতে তাহার প্রতি কুণালের শ্রদ্ধা জন্মে, তদ্বিষয়ে সে কিছু ক্রটি করিত না।

২

কাঞ্চনমালা এই সভার কেহই নহেন। তিনি সভায় আসিতেন; কুণাল, তিষ্যরক্ষা ও উপগুপ্তের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন। কিন্তু তিনি রাজবাটীতে

প্রায় থাকিতেন না। তিনি দিবারাত্রি হীনবেশে নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন, "ভিক্ষুকদিগকে" ভিক্ষা দিতেন, বালক বালিকাদিগের সহিত মিলিয়া সদ্ধর্ম্মে তাহাদের মতি লওয়াইতেন। যে দিন উপগুপ্ত কুক্কুটারামে বসিয়া বৌদ্ধ-মণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, সে দিন অবহিতচিত্তে ভক্তিভাবে সেই উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরদিবস গোষ্ঠে গোষ্ঠে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী, সেই উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেন। যাহারা সদ্ধর্ম্মবিদ্বেষী তাহাদের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। তাহাদের বিপদ হইলে, তাহাদের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের পীড়া হইলে, তিনি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। প্রত্যহই সংঘভোজন করাইতেন। প্রত্যহ স্বহস্তে দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। যেখানে শোক, যেখানে পীড়া, যেখানে দ্বন্দ্ব, যেখানে দুঃখ, কাঞ্চনমালা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কাহাকেও পর ভাবিতেন না। পরদুঃখ নিবারণে কাতর হইতেন না। পরের সুখে তাঁহার সুখ, পরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। ধর্ম্মালয়, চিকিৎসালয়, মঠায়তন প্রভৃতি স্থানে তিনি সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেন। এমন কি, তিনি পরের জন্য একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া উঠিলেন। রাজা কাঞ্চনমালার ধর্ম্মাচরণে এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে, কোষাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কাঞ্চন যখনই যাহা চাহিবেন, তখনই বিনা আপত্তিতে তাহা প্রদান করা হয়। কাঞ্চনের প্রবর্ত্তনায় রাজা ও কুণাল, এমন কি তিষ্যরক্ষাও নগর পরিভ্রমণার্থ বাহির হইতেন এবং আধিব্যাধিপীড়িতদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। লোকে কাঞ্চনমালাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। যেন নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, আর্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তি নিবারণের জন্য, এবং আপামর সাধারণ লোকের নির্ব্বাণ-প্রদানের জন্য ভগবান "অবলোকিতেশ্বর" রমণীবেশে পাটলীপুত্র নগরে ভ্রমণ করিতেছেন।

৩

এইরূপে বৎসরাবধি কাটিয়া গেল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পাটলীপুত্র নগরে সদ্ধর্ম্মবিরোধী লোক রহিল না। সব পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তিষ্যরক্ষার মন ফিরিল না। কুণালকে ভুলাইবার জন্য তিষ্যরক্ষা অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু দেখিল কুণাল অটল। সুতরাং তিষ্যরক্ষা আর সাহস করিয়া আপন মনের কথা তাঁহার নিকট পাড়িতে পারিল না। এইরূপে সম্বৎসর কাটিয়া গেল—তিষ্যরক্ষা নানা ছলে কুণালের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিবার চেষ্টা পাইত। কখন নিজ মহলে, কখন কাঞ্চন কুটীরে, কখন গঙ্গাতীরে, কখন উদ্যানমধ্যে, কখন কুঞ্জবনেও উঁহার সহিত পরামর্শ করিতে যাইত, কিন্তু

ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কেবল একদিন কুণালকে এক নিভৃত স্থানে পাইয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"কুণাল, তুমি কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ?"

কাঞ্চনমালার সংঘভোজনে উপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া কুণাল সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। এই অবধি নির্জ্জনে পরামর্শের প্রস্তাব হইলে কুণাল আর সম্মত হইতেন না। দৈবাৎ নির্জ্জনে তিষ্যরক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুণাল অন্যপথে চলিয়া যাইতেন।

৪

একদিন তিষ্যরক্ষা অশোক রাজার প্রাচীন রাজপ্রাসাদে অর্থাৎ অশোকের পূর্ব্বকার কেলিগৃহে গমন করিয়া তাহার একটি প্রকোষ্ঠ নানাবিধ বিলাস-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ করিল। তথায় কতকগুলি কদর্য্য চিত্রপট ছিল, তাহাতে গৃহটি সাজাইল। নিজে নানাবিধ বেশভূষা করিল, এবং সেই অবস্থায় প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র দ্বারা কুণালকে ডাকাইয়া পাঠাইল।

কুণাল এবার আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সম্রাটের প্রকাশ্য আজ্ঞাপত্র লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি উঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ কাঞ্চনমালা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল, এবং নানাপ্রকারে জেদ করিতে লাগিল, "আজি তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।" কুণাল তাহাকে আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন, কিন্তু কাঞ্চনমালা আজি প্রবোধ মানিল না। সে আজি বড় অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। "কেন" "কি বৃত্তান্ত" কিছুই বলে না, হয় ত নিজেই জানে না যে তাহার এত ব্যাকুলতা কেন ? কিন্তু কোন মতেই কুণালকে যাইতে দিতে চাহে না। কুণাল নানারূপে কাঞ্চনমালাকে ভুলাইতে লাগিলেন, শেষ বলিলেন,—"কাঞ্চন, কুক্কুটারামের পশ্চিমদিকে আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে যে ব্রাহ্মণ সন্তানটি পীড়িত হইয়াছিল এতক্ষণ হয় ত সে মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মুমূর্ষু দশায় দেখিয়া আসিয়াছি। সে অনেকক্ষণ হইয়াছে। তুমি যাও, গিয়া তাহার পিতাকে সান্ত্বনা কর।"

কাঞ্চন আগ্রহসহকারে বলিল,—"আমি যাই, তুমি কোথাও অনেকক্ষণ থাকিও না, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইও," বলিয়াই প্রস্থান করিল।

৫

কুণালের মাথার উপর "কা কা কা" করিয়া কাক ডাকিয়া উঠিল। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা ভয়ানক সাপ তাঁহার রাস্তা পার

হইয়া গেল। দূরে শিবাগণ বিকটশব্দ করিয়া উঠিল। কুণাল ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, অন্তঃপুর বিলাসদ্রব্যে পরিপূর্ণ। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষ গমন করিয়া তিনি শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বরাবর দেখিয়া আসিয়াছেন, কক্ষভিত্তিতে অশ্লীল আলেখ্য ঝুলিতেছে। কিন্তু শয়নদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, ভিত্তিসমূহে কতকগুলা অতি জঘন্য আলেখ্য; চারি ভিত্তিরই ঠিক মধ্যস্থানে পরস্পর সম্মুখীন চারিখানি প্রকাণ্ড দর্পণ। গৃহমধ্যস্থলে খট্টোপরে অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা বিচিত্র অঙ্গরাগে বিভূষিত। দর্পনে তাহার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব, তাহার প্রতিবিম্ব, আবার প্রতিবিম্ব, অনন্ত, অসংখ্য, অর্দ্ধবিবসনা তিষ্যরক্ষা দেখা যাইতেছে। ইহা দেখিয়াই কুণাল ফিরিলেন, তিষ্যরক্ষা তখন সেই আলুথালু অবস্থাতেই দৌড়াইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া লুণ্ঠিত হইল। আপন অনাবৃত হৃদয় কুণালের পদপ্রান্তে ফেলিয়া পদদ্বয় বেড়িয়া ধরিল। সর্পে পদবেষ্টন করিয়া ধরিলে লোকে যেমন পা ছুঁড়িয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, কুণাল তিষ্যরক্ষাকে তদ্রূপ ফেলিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। আর ফিরিয়াও চাহিলেন না।

৬

বহুক্ষণ পরে তিষ্যরক্ষার চৈতন্য হইল। সে ফণিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। চুল গুছাইল। যে পথে কুণাল গিয়াছে, সেই দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ।" পরে মাটীতে পা ঘসিয়া বলিল, "যদি ওই চোখ—একদিন এমনি করিয়া পদতলে দলিত করিতে পারি, তবেই আমি তিষ্যরক্ষা।"

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত। সু-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটীতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জান?

প্রসন্ন উত্তর করিল—কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে?

আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এইত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের পর একটা নূতন পাখী কেন?

প্র। নূতন পুরাতন আবার কি? আমি ত আর কখন পাখী পুষি নাই।

আ। সে কি প্রসন্ন! আর কখন পাখী পোষ নাই কি? আমিই যে তোমার খাঁচার পাখী—তোমার ঐ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্ষীরোদশয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমগ্ন। ঐ ক্ষীরাধার ভাণ্ড আমার অনন্তশয্যারূপী খাঁচা। আমি ঐ খাঁচার ক্ষীরপায়ী পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখী কেন?

প্র। দেখিলাম পাখীটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটীতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল; তাই পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম।

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি? সে ত ঘোর অত্যাচারী! পিনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্?

প্র। অমন কথা বল না! ওর কিছু নাই বলিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা! যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে—আমরা মেয়েমানুষ এই ত বুঝি।

প্রসন্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম—তবে বুঝি ওই পাখীটাকে তোর যথা সর্ব্বস্ব দিবি? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিব?

প্র। ও কি রকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বল্‌ছি?

আ। নয়ই বা কেন? ঐ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাক্‌ব না Huxley সাহেবের protoplasm খেয়ে থাক্‌ব?

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে।

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।

প্র। সে আবার কি?

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধর্ম্মই করিলাম না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি?

প্র। কেন, তুমিই ত সেদিন কত দান ধর্ম্মের কথা, কত তোমান্‌টি মটবস্তুঁটির কথা বল্‌ছিলে?

আ। সে পরকে শেখাবার জন্য।

প্র। ও মা সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা, পাপ পুণ্য পরের বেলা!

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিস্ নাই। তা সে সব কথা যাক্। পাখীটাকে ছেড়ে দে।

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পার্‌ব না।

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্ম্ম নয়?

এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল—কি, বামণ, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর? তোমার মতন দুর্ম্মুখ ত ভূ-ভরতে নাই! তোমার কাছে আবার মানুষ আসে?

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে

বলিলাম—আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল—আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্চি, যে দিন তুমি পাখীকে পোষমানাতে পার্‌বে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের কেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব।

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুবে বেরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। O what a fall was there!

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার ত একটি পয়সাও নাই ; তবে কি বলিয়া পাখী কিনিতে আসিলাম? কিছু অবসন্ন হইলাম ; কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কিন্তু তাহারা কেহই ত লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, কিছুই অনুভব করে না? তবে আমিই কেন লজ্জিত হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি এমন সময় একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটী এইরূপ—Plateetud, Plateetud, Plateetud। বারম্বার এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়িতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলা মুর্গী জবাই করিতেছে—রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে এবং বিষম যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এক একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোক্‌রাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া Platectud, Pateetud করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাড়িতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে?

গৃ-স্বা। হাঁ, আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেই জন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক খাবে, আর এই বিপদ?

আ। আমি একটা ঔষধ দিতেছি; জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে?

গৃ-স্বা। আপনি কি চান?

আ। ঐ পাখীটা।

গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়া যান।

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? যে আফিঙ্গ দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পরিশূন্য সংসারবিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? কিন্তু না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুজিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ করিলাম কি? উপকার করিয়া মূল্য স্বরূপ পাখীটা লইলাম? কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়েরা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না? উকিল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াক্কেলের নিকট হইতে fee লয়েন না? রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম?

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখীর দাঁড়টা সাম্‌নে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখীটা বলিতেছে—আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার। তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা?

পা আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ তুয়া কাকা। তোমাদিগকে uncleship শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা?

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে।

আ। আগে কোথায় থাক্‌তে?

পা। সে অনেক কথা। শুনিবে কি?

আ। শুনিব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চ্চা করিয়া খুব সস্তাদরে নাম কিন্‌চে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে পারি।

পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল?

আ। সে পরের কথা। আগে শুনি।

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল।

আ। শূকরকে পাঁকাল মাছ মনে করিল কেমন করে?

পা। শূকর পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাঁটে। এতএব শূকর এবং পাঁকাল মাছ এক।

আমার Whately's Logic জানা ছিল, ফস্ করে বলিলাম—ওটা যে fallacy of undistributed middle হল।

পা। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle! ও ত logic-এর কথা? Antiquities-এর সহিত Logic-এর সম্পর্ক কি? দিন কতক Anti-quities চর্চ্চা কর, Weber সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট্‌কাবে না, ও রকম খট্‌কা হবে না। দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায় বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। Plateetud; Plateetud.

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল?

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোক হইল কেমন করিয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতীর মুণ্ড হইল কেমন করিয়া? হিমালয় পর্ব্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া? এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্ত্বের বেলা এত খট্‌কা কেন? দেখ পুরাণ আর পুরাতত্ত্ব একই জিনিষ। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। একত্বের কি চমৎকার প্রমাণ দেখ

দেখি ! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটু প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় ভেদে ঘটিয়াছে।

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি ?

পা। আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে ? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তা জান ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় Webor সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আ। কোবিদবর ! বলিয়া যান্ !

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল— আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।

আ। আবার সেই রকম fallacy হল না ?

পা দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ত্ব, ইহাতে fallacy কোন ক্রমেই হইতে পাবে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম।

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না।

পা। ওঃ ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সুহৃৎ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবে শুন। যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন এমনি আমাদের লেজ মুচ্ড়াইয়া দিয়াছিল যে লেজগুলা একেবারে চেপ্টা হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় এই রকম করিয়া সমস্ত সিংহকুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়" ; ভাগ্য বলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভবনা দেখিলাম, সেখানে বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ

করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud।

আ। এদেশেও কি বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছ?

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়।

আ। নয় কেন?

পা। এখানে এত বেশী খাই যে শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব।

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল?

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি—ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে ঐরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে। অতএব আমি পক্ষীরূপে একটি পশু। Plateetud, Plateetud।

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপ্‌শস্‌ হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি ও Plateetud, Plateetud কর?

পা। এদেশে আসা অবধি আমি Plateetud বলিতে বড ভালবাসি।

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি?

পা। আছে বৈ কি। কথাটা Plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আ। বুঝিয়াছি, তুমি Plantain খাইতে ভালবাস বলিয়া সর্ব্বদা Plateetud, Plateetud কর।

পা। তা নয়। আমি এদেশের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুগুলার ভাগ্যে Plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের edification-এর জন্য Plateetud, বলি। বুঝ্‌লে?

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী!

পা। তার প্রমাণ ঐ নীচে দেখ।

দেখিলাম দাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল্‌ কিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ও সব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই?

পা। উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু ইহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ঐ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলা-ঠেলি করিয়া ঐ দুধটুকু খাইতে আসিল। আমার ডাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নই?

আ। শুধু উপকারক? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় উদরসর্ব্বস্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ঐ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি উহারা কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন?

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট স্বজাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে?

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃষাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটা গুলাকে অনুগ্রহ কর?

পা। দেখ, আমি প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। Plateetud।

আ। ওরা কি দানা পেতে কিছু ভালবাসে?

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত?

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে?

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাকিব।

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট?

পা। এখানে তো মুর্গী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা

ঠোক্‌রাইতে পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব ? আমাকে ছাড়িয়া দেও—আমি তোমাকে সর্ব্বদা আফিঙ্গ সরবরাহ করিব—plateetud।

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না—আমার একটু জিদ্ আছে।

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল—কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে ? ঐ দেখ তোমার পাখী কট্ করে শিকলি কেটে উড়ে গেল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—কে ও, প্রসন্নময়ি, কি মনে করে ?

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল।

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। ঐ ঝাঁটা গাছটা দিয়া ঐ বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও ত।

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল।
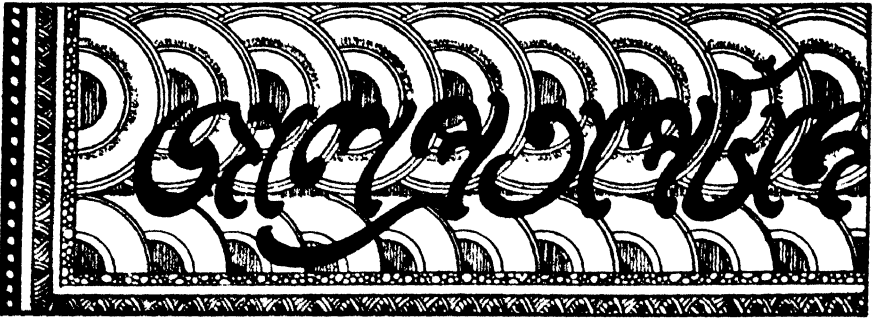
ওগিলবি সাহেব আবার আসামী

একবার ওগিলবি সাহেব খুনের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়াছিলেন। আবার তিনি আর এক মোকর্দ্দমায় আসামী হইলেন। এবার তাহাতে জালরাজার কিছু উপকার হইয়াছিল; এই জন্য সেই মোকর্দ্দমার সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কালনার হত্যাকাণ্ডের পরদিবস জালরাজার উকিল সা সাহেব পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় বর্দ্ধমানের মেজেষ্টার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ রাখেন। সেই বেআইনি কয়েদের বিচার এতদিনের পর ৯ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হইল। এবার চীফ্ জষ্টিস্ সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব স্বয়ং বিচার করিতে বসিলেন। ওগিলবি সাহেবের কপাল ভাঙ্গিল। জজ রায়ান উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জুরিদের চার্জ দিলেন। জুরিরা ওগিলবি সাহেবকে অপরাধী করিলেন। চীফ্ জষ্টিস্ তাঁহার দুই হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। সেই সময় জজ সাহেব ধীরে ধীরে যাহা বলিলেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"James Balfour Ogilvy—it is my painful duty to pass the sentence of this Court upon you. You have been found guilty of false imprisonment of the prosecutor Mr Shaw. (The learned judge then recapitulated the facts of the case). The Darbgah, a most important witness, as to the acts of Shaw and the necessity for his restraint, was not called by either party,—why, I cannot understand, as he certainly could have given the best evidence as to what took place, and whether Mr. Shaw was party to any disturbance or breach of the peace. But I must say that there is not a tittle of evidence to show

that Mr Shaw was guilty of sedition, or any other offence whatever. It is in evidence, that he knew only of one perwanah being served on Pertaup * at Culna, and, I must say, that his conduct on that occasion appears to me to have been judicious, regular and proper. He made his client write a letter offering submission to the order of the authorities, and it was delivered to the Nazir that night. Mr. Shaw so far from committing any improper acts, gave the best advice as to how to get rid of the assembly, by telling the Nazir to point out who of the followers should be sent away. The treatment of Mr. Shaw after his arrest was certainly exceedingly harsh, and is without justification either in law or in fact, and he was made to undergo by you most unwarrantable and most unjustifiable imprisonment. The Court will not however cause you to suffer imprisonment, because, we must suppose, that you have been actuated by motives arising from erroneous information and a mistaken zeal, but ardently wish to preserve peace and good order in your district (the letters from Mr. Alexander the missionary and Captain Harrington were then read). It is probable that these letters excited considerable alarm in your mind, and after the unfortunate affray in the morning you may have imagined it necessary to arrest Mr. Shaw, but those letters should have led you to enquire into matters before you proceeded to act as you have acted. It appears that there was no disturbance whatever when the affray took place, nor had there been any for a considerable

* চীফ্ জষ্টীস সার্ এডওয়ার্ড রায়াণ সাহেব অম্লানবদনে "প্রতাপচাঁদের মোকর্দ্দমা" "প্রতাপচাঁদের গ্রেপ্তার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর জজ মেজেষ্টারগণ প্রতাপচাঁদ নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। জোবানবন্দীতে হউক, রায়ে হউক, যেখানে প্রতাপচাঁদের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা soi disant Rajah প্রভৃতি শব্দ বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কেবল "জালরাজা" বলিয়া আসিতেছি।

time before the event took place. But the Court believing, that you acted upon erroneous information, although rashly and unjustifiably, will give you in your sentence the benefit of that consideration, which they on that account extend towards you. Such conduct cannot however be lightly passed over. Liberty is dear to all ; you have deprived the prosecutor of his with very unnecessary and very considerable harshness. It will also serve as a warning to others who may at any future time be placed in situations similar in nature to yours. The sentence of the Court therefore is, that you pay a fine to the Queen of two thousand Rupees, upon payment of which, you be discharged.

জরিমানার হুকুম দিবার সময় আসামীকে বায়ান সাহেব বলিলেন, তোমায় কয়েদ দিলাম না, কারণ তুমি ভ্রমে পড়িয়া মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া এই অকার্য্য করিয়াছ।

কয়েদের কথা উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর মেজেষ্টার অত্যাচার করিলে কেহ যে দণ্ড দিবার আছে, ইহা লোকে জানিত না। মহারাণীর আদালতে আর কোম্পানীর আদালতে যে কি প্রভেদ তাহা লোকে এখন বুঝিতে পারিল। তাহাদের কতক ভরসা হইল। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। সে সকল পরিচয় দেওয়া এক্ষণে অপ্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে কোম্পানী বাহাদুরের চক্ষে এগিলবি সাহেব দাগি হইলেন না। তিনি ফৌজদারীতে দণ্ড পাইয়াছেন বলিয়া মেজেষ্টরির আসনে বসিবার অযোগ্য হইলেন না, একটীন্ মেজেষ্টার ছিলেন, শীঘ্র পাকা হইলেন।

নিজামত আদালতের হুকুম

এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল রাজা সম্বন্ধে যে এস্রেমেজাজ করিয়াছিলেন তাহা নিজামত আদালতে পেষ হইল। জজেরা বড় গোলে পড়িলেন, ভাবিতে লাগিলেন আসামীকে কি বলিয়া দণ্ড দেওয়া যায়। কালনায় জমিয়তবন্ত হওয়ার অপরাধে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এত দিন কয়েদ রাখা হইয়াছে, অথচ সেখানে কোন গোলযোগ হয় নাই। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, কালনায় কোন গোলযোগ হয় নাই। এ বিচারের পর কালনার

জমিয়তবস্ত বলিয়া দণ্ড দেওয়া ভাল দেখায় না। অন্য অপরাধে দণ্ড দিতে গেলে রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন অপরাধ নাই। অন্যের নাম গ্রহণ করাই বা কি এমন গুরুতর অপরাধ। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির নাম ধরায় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কেহ সে জন্য নালিশ উপস্থিত করে নাই। তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য! এই সময় নিজামতের কাজি সাহেব তাঁহাদের উদ্ধার করিলেন। তিনি ফতওয়া দিলেন যে, আত্ম উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজেরা তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হুকুম দিলেন যে, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলক সা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাবাস। আর প্রকাশ থাকে যে অন্যান্য চার্জ্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল।

অন্যান্য অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া জালরাজা দরখাস্ত করিলেন, যে নানা অপরাধ আমার শিরে আরোপ করিয়া মেজেষ্টারেরা আমাকে এমনই গোলে ফেলিয়াছিলেন যে তাহা অপ্রমাণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় তাঁহারা জেলে পুরিয়া আমায় নিশ্চেষ্ট করিয়াছিলেন। আমি কোথায়ও যাইতে পারি নাই, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জেলে বদ্ধ থাকিয়া আমি কিরূপে এত বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিব। এক্ষণে যে সকল অভিযোগ হইতে হুজুর আদালত আমায় মুক্ত দিয়াছেন, বাকি যে অপরাধটি আমার স্কন্ধে রাখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন আমি নিরপরাধী, আমি অন্যের নাম ব্যবহার করি নাই। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ। নিম্ন আদালতে আমি এ বিষয়ে সকল প্রমাণ দিই নাই। দিবার প্রয়োজন আছে এমতও বিবেচনা করি নাই। আমি প্রতাপচাদ হইলেও হইতে পারি মাত্র এই সন্দেহ ফৌজদারী হাকিমের মনে উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিলেই অব্যাহতি পাইব এই মনে করিয়া আমি প্রমাণ দিয়াছিলাম। ফৌজদারী হইতে অব্যাহতি পাওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ অন্য কেহ নহি, এরূপ প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে প্রয়োজন বলিয়া আমার তখন বিশ্বাস ছিল। বিশেষতঃ, আমার উকিলেরা আমায় বুঝাইয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা কোম্পানীর আইনানুসারে অথবা হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কোন অপরাধই নহে। এই জন্য এই সম্বন্ধে একপ্রকার আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখন আমার ত্রুটী হইয়াছে বুঝিতেছি, তাহা মার্জ্জনা করুন, আমার বাকি প্রমাণ গ্রহণ করুন,

তাহার পর আমার প্রতি যে আজ্ঞা দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবে।

কিন্তু নিজামত আদালত এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। জজেরা বলিলেন, যে দরখাস্তকারী যখন নিম্ন আদালতে আপনিই ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রমাণ দেয় নাই, তখন আর এখানে সে বিষয়ের কোন ওজর শুনা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ রাজা প্রতাপচাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং আর পুনর্ব্বিচারের কোন হেতু দেখা যায় না।

এই হুকুমের পর জালরাজার পক্ষ হইতে আর এক দরখাস্ত দাখিল হইল। দরখাস্তখানি বোধ হয় বড় রাগ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই—"দরখাস্তকারীর এক্ষণে জানিবার প্রার্থনা যে কোন্ আইন অনুসারে তাহার হাজার টাকা জরিমানা করা হইয়াছে? কোন্ আইন বা বিধি অনুসারে হুগলীর জজ এ মোকর্দ্দমা হজুর আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন? এবং হুজুর আদালতের কাজি যে ফতওয়া দিয়াছেন, যে আত্ম উপকারার্থ মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা দণ্ডার্হ, তাহা তিনি কোথা পাইয়াছেন, কোন্ মুসলমানি গ্রন্থে দেখিয়াছেন। দরখাস্তকারী এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান মৌলবিদের দ্বারা বিশেষরূপে তদন্ত করাইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা অপরাধ বলিয়া কোন গ্রন্থে তাঁহারা পান নাই।"

নিজামত আদালত তাহাতে হুকুম দিলেন যে, এ সম্বন্ধে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর কোন কথা শুনা যাইতে পারে না।

ভবিষ্যতে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ বলিয়া কোন দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা যাইবে না। কেন না বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে।* এই হুকুম সর্ব্বনাশের মূল হইল।

---

* নিজামতের এই সকল হুকুম জজ (W. Braddon) ব্রাডন সাহেব এবং (C. Tucker) টকর সাহেব একত্রে দিয়াছিলেন। শেষ হুকুমটী এইরূপ লিখিত হয়—

The Court further remark, that as they have judicially pronounced the petitioner not to be the Moharajah Protaub Chand, they cannot in future, receive any petitions or applications from him under that name and title.—*Extract from order dated 19th July 1839.*

জালরাজার সর্ব্বনাশ

এই হুকুমটী শুনিতে সামান্য, কিন্তু পরিণামে অতি গুরুতর হইয়া পড়িল। ওগিলবি সামুয়েল যাহা করিতে না পারিয়াছিলেন, নিজামতের এই হুকুমটী তাহা করিয়াছিল। "বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, জালবাজা প্রতাপচাঁদ নহে, সুতরাং প্রতাপচাঁদ বলিয়া তিনি কোন দরখাস্ত করিলে আর তাহা গ্রহণ করা যাইবে না"—এই কথায় জালরাজার পক্ষে সকল দ্বার পাতক রোধ হইল। তিনি দেওয়ানীতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া রাজত্ব দাবি করিলে তাঁহার আর্জি দাখিল হইবে না, এবং প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আবার তিনি দণ্ড পাইবেন। সুতরাং আর কোন আদালতে তিনি বিচারপ্রার্থী হইতে পাইলেন না; আপিল পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপচাঁদ বলিয়া যে ব্যক্তি আপনার বিষয় কোন আদালতে দাবি করিতে আসিযাছে, সে ব্যক্তি আর্জিতে আলক সা বা কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দরখস্ত করিতে পাবে না। কবিলে সেইখানেই তাহার দাবী শেষ হইবে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের ধারণা হইল যে, জাল-রাজার পক্ষে দেওযানী আদালতেব দ্বাব রোধ কবিবাব জন্য জজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টেব কোন চতুব সেক্রেটরি এই কৌশল তাঁহাদের শিখাইয়া দিয়াছেন।

এই কৌশলেব পর জালবাজা কপাল ঠুকিয়া আব এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না, নামের পবিবর্ত্তে লিখিলেন, The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shah, alias Rajah Protap Chand, alias Kistolall Brohmocharee.

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত কোন কোন অংশেব মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।—

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলক্ সা বলিয়া কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিযা দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে এখনও স্থির হয় নাই যে, ভবিষ্যতে আদালত হইতে তাহাব কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানী আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রে তাহার পূর্ব্বপরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বেআদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর আদালতের কি ক্ষতি হইবে।"

২। –"হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা (is a crime unknown to the English Law, as well as to the codes of Law of civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law (wide and sweeping as it is) কি বিলাতে কি এদেশে কেহ জানিত না—অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে, কেন না মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড কখন হয় নাই।"

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফস্বল আদালতে নালিশ করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।"

৪। "এখন তাহার মানস যে একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপিল করে, অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

এই প্রার্থিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল কি না তাহা আমরা কোন কাগজ পত্রে পাইলাম না। বোধ হয় দেওয়া হয় নাই, সুতরাং বিলাতেও আপিল হয় নাই।

এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিশ করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহারা জালরাজাকে মোকর্দ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল, তাহারা সকলেই বুঝিল যে, গবর্ণমেণ্ট যে কোন কৌশলে হউক এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না। সুতরাং তাহারা হাত গুটাইল। জালরাজার আশা ভরসা সকল ফুরাইল। বিলাতে আপিল হইল না. তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, আবার সেই সন্ন্যাসী হইলেন।

সাধারণের বিচার

জজ সাহেবেরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালিরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া জালরাজা সম্বন্ধে এক প্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। যে যাহা জানিত না, এই মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তাহা সকলেই জানিয়াছিল। সুতরাং সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ এ বিষয়ে আর

কণামাত্র সন্দেহ নাই। কেহ বলিল, "যদি এই ব্যক্তি সত্যই জাল হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন? তিনি সামান্য জুয়াচোরের নিমিত্ত রাজবাটীর পূর্ব্ব সঞ্চিত সমুদয় ধন ব্যয় করিবেন কেন?*" কেহ বলিল, "যদি এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ না হইবে, তবে গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া

---

* যে সময় প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা চলিতেছিল সে সময় পরাণ বাবু বর্দ্ধমানের রাজসংক্রান্ত অধিকাংশ জমিদারীর খাজনা নিয়মিত সময় মধ্যে দিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সকল জমিদারী বিক্রয় না করিয়া তাহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন আনিবার জন্য দুইজন সুদক্ষ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কমিসনর নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধমানে পাঠান। লোকে বুঝিল যে, পরাণ বাবু এই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাজবাটীর সমুদয় আয় ও সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি জমিদারীর খাজনা দিতে পারেন নাই, এবং বোধ হয় সেই জন্য বিস্তর ঘুসের কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল। এমন কি, ওগিলবি সাহেব খুনি মোকর্দ্দমা সময় বম্বে নগরে আপনার সহোদরকে পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "লোকে বলে আমি তিন লক্ষ টাকা ঘুস লইয়াছি।" পত্রখানি বম্বের সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, সম্প্রতি আমরা তাহা দেখিতে পাইয়াছি, ইচ্ছা ছিল, পত্রখানি সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত কেবল কতকাংশ নিম্নে দিলাম। আমরা কলিকাতার সংবাদ পত্র দেখিয়া লিখিয়াছিলাম, যে ডিপুটী গবর্ণর রাস সাহেব ওগিলবিকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি বস্তুতঃ তাহা নহে। কলিকাতায় আসিবার জন্য ওগিলবি সাহেবকে কিছু দিনের নিমিত্ত অবসর দেওয়া হইয়াছিল, তিনি যথা নিয়ম এই সাবকাশের সময়ে সম্পূর্ণ বেতন পাইয়াছিলেন।—

"The lawyers of Calcutta are the natural and inveterate enemies of our service, the whole of the profession was up in arms against me They knew not of course the rights of the story, for that was an official secret. (এই কথাটি বাঙ্গালিরা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন) * * * Besides this, all those Zemindars who were to join the pretender, and all who have lent him money (and he had contrived to raise enormous sums) have also deeply vowed to be revenged upon me, for all their schemes and hopes of all plunder have been defeated; and these are the party who pay the expense of the proceedings against me, whilst the lawyers conduct them some of them positively acting without a fee, contrary to all professional rule and precedent, the only reward they seek is to crush me if possible. It was by no means sufficient with them to vilify me in the papers as man was never before abused, but they would hang me if they could; and accordingly are trying to prove me guilty of murder. * * The public have been taught to believe that I fired upon unresisting sleeping innocents. * * * The papers have it that I am suspended but that is not the case

আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মোকর্দ্দমা চালাইবেন কেন, মেজেষ্টারদের গোপনে পত্র লিখিবেন কেন, এবং এ সম্বন্ধে নানা অন্যায় কৌশল করিবেন কেন, অবশ্য এ ব্যক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ভয় হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে জানিতেন, যে প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রঞ্জিতসিংহের সঙ্গে মিলিয়াছেন। রঞ্জিতের স্বাপক্ষ ব্যক্তি এখন বাঙ্গালার মধ্যে বসিয়া অতুল ধন সম্পত্তি অধিকার করিলে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাই গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার চাতুরী করিয়া প্রতাপচাঁদকে বঞ্চিত করিলেন।"

এইরূপে যে ব্যক্তি, যে কারণেই জালরাজাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া স্থির করুন, তাঁহারা এই ঘটনা আপন আপন ধর্ম্ম বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া একপ্রকার তৃপ্তিলাভ করিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মভীত, তাঁহারা ভাবিলেন, "ধর্ম্ম আছেন, প্রতাপ-চাঁদ মহাপাপ করিযাছিল, সে যদি আবার রাজত্ব পাইত, তাহা হইলে বলিতাম, ধর্ম্ম মিথ্যা।" আর একদল ভাবিলেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা, কেন না, যথাশাস্ত্র চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম্ম মিথ্যা।"

কেহ বলিল, অদৃষ্টই মূল। সকলই অদৃষ্ট দোষে ঘটে। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহাও অদৃষ্ট হেতু। তিনি যে আর রাজ্য পাইলেন না তাহাও অদৃষ্ট দোষে। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যদি

I am required to attend in Calcutta pending this business, but I continue to draw my salary and the Deputy Governor tells me that Govt. express no opinion one way or the other, I understand that but for a blunder the case would have been dropped long ago. To show you the spirit that is working against me I must tell you that I had notices of actions for damages in fourteen civil actions with which I was threatened, one case of false imprisonment, one of contempt of Court, and one of murder. They tried also to get up a case of bribery and corruption, swearing I had taken a considera-tion of three lacs of Rupees; and I was also accused of subornation of perjury. Finding they could make out no case, they have given up all but two—contempt of the Supreme Court and murder; and these they only persevere in to keep up the odium against me and the agitation while the trial of Mr Shaw and the pretender is pending. My being in difficulty gives great weight to them as it cows all the witnesses who have to give evidence for the prosecution. • • এই শেষ কথা ওগিলবি মেজেষ্টার হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। জালরাজার সম্বন্ধে এ কথা আরও কত বলবৎ।

কোম্পানী বাহাদুর মনে করিতেন তবুও প্রতাপচাঁদকে রাজ্য দেওয়াইতে পারিতেন না। প্রতাপের অদৃষ্টে না থাকিলে কোম্পানীর মনে এ কথা আসিবেই বা কেন ?"

যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা খাঁটি হিন্দু, তাঁহারা ভাবিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, পূর্ব্বজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকে বঞ্চিত করিয়া থাকিবেন, তাহাই আপনি বঞ্চিত হইলেন।"

এইরূপে সকলে এক একটা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের বড় পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঝিলেন "কেনা সাহেবেরা" পরাণ বাবুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন। তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়, প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া থাকেন। কেহ কোন নূতন সাহেবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইনি কাহার সাহেব ?" অর্থাৎ কাহার ক্রীত। যাঁহার "কেনা সাহেব" থাকিত, তাহার সম্মান বঙ্গসমাজে অতুল হইত। তিনি মনে করিলে শত্রুর প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতেন, "কেনা সাহেব" তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিত। সাহেব ক্রয় করার পদ্ধতির মধ্যে এইমাত্র একটু বিশেষ ছিল যে, সাহেব ক্রয় করিতে বাজারে যাইতে হইত না, যে সাহেবেরা বিক্রীত হইবেন, তাঁহারা আপনারাই বাটীতে আসিয়া শৃঙ্খল গলায় পরিয়া যাইতেন। তখন সাহেবদের সংসারে বিস্তর ব্যয় ছিল, একে তাঁহাদের বিলাতিদ্রব্যাদি এদেশে অতি দুর্ম্মূল্য ছিল, তাহাতে আবার তাঁহারা এক একটি ক্ষুদ্র নবাবের মত ধুমধামে থাকিতেন। তাঁহারা কোম্পানীর নিকট যে বেতন পাইতেন, তাহাতে সকল দিক কুলাইতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহারা কেহ কেহ বাটী হইতে টাকা আনাইতেন, কেহ কেহ বা এদেশে কর্জ্জ করিতেন। কিন্তু কর্জ্জ দুই চারিশত পরিমানে নহে, একেবারে পঞ্চাশ হাজার, আশী হাজার, লক্ষ এইরূপ পরিমাণে লওয়া হইত। যাঁহার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়, তাঁহার কর্জ্জ পরিশোধ করা অসাধ্য, এ কথা খাতক মহাজন উভয়ে জানিতেন, অথচ কর্জ্জ আদান প্রদান হইত। যিনি কর্জ্জ লইতেন, তিনি জানিতেন উপকার করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। যিনি কর্জ্জ দিতেন, তিনি জানিতেন আমি সময়ে সময়ে বিপদ উদ্ধার হইব। তখন লোকের বিপদ পদে পদে ঘটিত। বাঙ্গালির মধ্যে আত্মীয়তা শত্রুতা উভয়ই তখন গুরুতর ছিল। এখন আর সে আত্মীয়তা নাই, সে শত্রুতাও নাই, বাঙ্গালি সমাজের স্রোত কিছু মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে একজন "কেনা সাহেব" সহায় থাকিলে বড় উপকার হইত। তাহাই ধনবানেরা বহু অর্থ কর্জ্জ দিয়া অর্থাৎ বহু অর্থ ক্ষতি করিয়া সাহেব ক্রয়

করিতেন। অন্য উপায়ে কেহ কোন গুরুতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবিত, এ ব্যক্তি "কেনা সাহেব" দ্বারা উদ্ধার হইয়াছে! এক্ষণকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা তখনকার সাহেবদের ক্ষমতা অনেক অংশে অধিক ছিল, তাঁহারা স্বাপক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, যখনই যাহা মনে করিতেন, তখনই তাহা করিতে পারিতেন, তাহা আইনি হউক, বে-আইনি হউক, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, তাঁহারা অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতেন। এখনকার ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সেরূপ প্রবৃত্তি থাকিলেও ধরাধরির ভয়ে তাহা পারেন না; এখন ধরাধরির ভয়; প্রকাশের ভয়, নালিশের ভয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুঝি দেশী সংবাদ পত্র ইহার মূল হেতু।

"কেনা" সাহেবের কৌশলে জাল রাজার দণ্ড হইয়াছে, এ কথা যাঁহারা না বলিলেন, তাঁহারা সকল দোষ গবর্ণমেণ্টের শিরে সমর্পণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট চাতুরী যে করিয়াছেন, অকার্য্য করিয়াছেন, অবিচার করিয়াছেন, অধর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিতে লাগিলেন। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, যাঁহারা কর্ম্মফলবাদী, যিনি যে বাদী হউন, সকলেই এ বিষয়ে একবাক্যে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিলেন। প্রতাপচাঁদ পাপী, প্রতাপচাঁদের অদৃষ্টের দোষ এ কথা সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে এই অত্যাচার হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকিল না। সুতরাং কোম্পানীর প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিল: পাদরিদের প্রতি লোকের ভক্তি না হউক, একরূপ শ্রদ্ধা জন্মিতেছিল, তাঁহারা সত্যবাদী, এ কথা সকলেই বলিত, সে শ্রদ্ধা আর বড় থাকিল না। কালনায় যে পাদরি ছিলেন, যিনি এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বে লোকে যে সংখ্যায় খ্রীষ্টান হইতেছিল সে সংখ্যার যেন হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইবার একটু সূচনা দেখা দিল। অন্যের মোকর্দ্দমা ক্রয় করিয়া লওয়ার রীতি বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও একটু হ্রাস পাইল। সম্প্রতি মেকলি সাহেব পিনাল কোডের খসড়া করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে আর দুই একটি ধারা সন্নিবেশিত হইল। এবং সেই সঙ্গে কার্য্যবিধি আইনের সূত্রপাত হইল।

বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির সম্বন্ধ

অনেকে বলেন, এই মোকর্দ্দমার পর বর্দ্ধমানের রাজার সহিত বাঙ্গালির সম্বন্ধ একেবারে ছেদ হয়। তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হউক, কতক অংশে বটে। পরাণ বাবুর প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে পুরুষানুক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরা বর্দ্ধমানের রাজাকে আমাদের রাজা বলিত। রাজা নিজে বাঙ্গালি ছিলেন, বাঙ্গালা কথা

কহিতেন, ধুতি চাদর পরিতেন, লোকের অঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন, সকলকে ভাল বাসিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত, তাঁহার মঙ্গলে মাতিয়া উঠিত, তাঁহার অমঙ্গলে আপনাদের অমঙ্গল জ্ঞান করিত। মূল কথা তাঁহার সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ বড় দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল।

তেজচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাণী কমলকুমারীর প্রতিনিধি হইয়া পরাণ বাবু কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন। লোকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিত, সুতরাং পূর্ব্ব রাজাদের মত তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করিত না, তিনি প্রতাপচাঁদের বিদ্বেষী ছিলেন ইহাও অশ্রদ্ধার আর এক কারণ, প্রতাপচাঁদের রাজত্বে ভাগ বসাইবেন বলিয়া পরাণ বাবু আপনার বালিকা কন্যার সহিত অশীতিপরায়ণ রাজার বিবাহ দিয়াছিলেন ইহা দ্বিতীয় কারণ; প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর কৌশলক্রমে তেজচন্দ্র দ্বারা আপনার পুত্রকে পোষ্যপুত্র লওয়াইয়াছিলেন, ইহা চতুর্থ কারণ। এই সকল কারণে লোকে তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিত। সেই অশ্রদ্ধার নিমিত্ত তিনি তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব দর্শাইতেন, কখন কখন জ্বালাতন করিতেন। সেই জ্বালাতনে লোকেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।*

তাহার পর জালরাজা আসিলেন, লোকে ভাবিল আমাদের সেই প্রতাপচাঁদ আসিযাছেন, তখন পরাণবাবুর অত্যাচার লোকের চক্ষে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। এবং সেই পরিমাণে জালরাজার প্রতি তাহাদের ভালবাসা বাড়িল। কিরূপে আমাদের রাজা আবার রাজা হইবেন, সকলের এই ঐকান্তিক যত্ন হইল। প্রতাপচাঁদের যত অমঙ্গল হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রতি লোকের যত্ন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকে সর্ব্বস্ব বেচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে ছুটিল, ব্রাহ্মণেরা ঘরে ঘরে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, কেহ নারায়ণকে তুলসী দিতে লাগিলেন, কেহ বা নিত্য সহস্র দুর্গানাম জপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, বৃদ্ধারা "কাটনাকাটার পয়সা" ব্যয় করিয়া সত্যনারায়ণকে বাতাসা দিতে লাগিলেন। এখনকার যুবারা এ কথা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালায় এইরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন এইরূপ মাতিত।

শেষ, পরাণ বাবুর জয় হইল। সেই জন্য তাঁহার প্রতি লোকের রাগ আরও বাড়িল। এদিকে অধিকাংশ বাঙ্গালিই জালরাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

* The present Zemindar is an infant, an adopted son of the late Rajah Tejchand, still under the tutilage of his natural father Prawn Babu, whose administration of these vast possession has rendered the family unpopular in the extreme." *Ogilvy's address to the Supreme Court.*

দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালির প্রতি পরাণবাবুরও জাতক্রোধ জন্মিল, তিনি একরূপ দলাদলি আরম্ভ করিলেন, এ অঞ্চলের লোকের সঙ্গে রাজবাটীর যে সম্বন্ধ ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর মহারাজ মাহাতাপচাঁদ বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু লোকের টান আর ফিরিল না; তিনি পরাণবাবুর ঔরসজাত পুত্র এ কথা লোকে ভুলিল না। অনেকে ভাবিয়াছিলেন সময়ে সাবেক রাজভক্তি ফিরিবে, কিন্তু তাহার প্রতিবন্ধক ক্রমে আরও বাড়িল। এদেশীয়ের প্রতি তাচ্ছল্যভাব মহাতাবচাঁদ বাহাদুর বাল্যকাল হইতে পরাণ বাবুর নিকট কতকটা শিখিয়াছিলেন, বিবাহের পর সেই ভাব আর একটু বাড়িল। বিলাতী লোকের বিশ্বাস আছে রাণী ধর্ম্মরক্ষিণী, তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজাও ক্রমে সেই ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়েন। সেই জন্য তথাকার রাজারা স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য। আমাদেরও বিশ্বাস আছে, স্ত্রী যে দেশী স্বামী সেই দেশীর পক্ষপাতী হন। মহাতাবচাঁদ বাহাদুর হিন্দুস্থানীর কন্যা বিবাহ করিলেন। তিনি নিজে বাঙ্গালি, তাঁহার রাণী হিন্দুস্থানী। সুতরাং তিনি ক্রমে ক্রমে হিন্দুস্থানী হইয়া দাঁড়াইলেন, লক্ষ্ণৌই ঢঙ্গের চাপকান ও চুড়িদার পায়জামা পরিয়া আপনি হিন্দুস্থানী সাজিলেন, অন্য ক্ষত্রিয়দের সেইরূপ সাজাইলেন, এবং কপুর প্রভৃতি হিন্দুস্থানী উপাধি তাঁহাদের পুনঃগ্রহণ করাইলেন। পালে পালে সারস্বত ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমানে আনাইলেন। হিন্দুস্থানী আচার ব্যবহার প্রচলিত করিলেন। শেষ পৈতৃক নবান্ন পর্য্যন্ত উঠাইয়া হিন্দুস্থানী নবান্নের প্রথা প্রচলিত করিলেন। মূল কথা, তিনি আর বাঙ্গালি থাকিলেন না, বাঙ্গালির সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিলেন না। বাঙ্গালিরাও তাঁহাকে একপ্রকার বিদেশী রাজা মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সে সম্বন্ধ, সে টান, আমাদের রাজা বলিয়া সে আহ্লাদ, সকলই ফুরাইল। বহুকালের বহুমূল্যের বন্ধন শিথিল হইল। এখন রাজভাণ্ডারে অন্য রত্ন যতই থাক, স্বদেশী বন্ধনী মহারত্ন আর নাই।

বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর সহিত বাঙ্গালির নিঃসম্বন্ধতা কেবল যে জালরাজার পরাজয়ে অথবা মহাতাবচাঁদের ব্যবহারে হইয়াছিল এমত নহে। পত্তনির প্রথাও নিঃসম্বন্ধতার আর একটি কারণ। পত্তনির সৃষ্টি অবধি রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, রাজার স্থলে পত্তনিদার দাঁড়াইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের রাজারা এক সময়ে বঙ্গ সমাজে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। সেই একাধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা জমিদারী কখন পত্তনি দেন নাই। একজন রাজা বলিয়াছিলেন যে দিন আমি পত্তনি দিব, সেই দিন অবধি "প্রজার

রাজা” বলাইতে আর আমার দাবি থাকিবে না। তাঁহার কথা নিতান্ত অমূলক নহে। বৰ্দ্ধমানের রাজার প্রজারা এমন পত্তনিদারের প্রজা, পত্তনিদারের অধীন পত্তনিদারের আজ্ঞাবহ; রাজার কোন সংস্রব রাখে বলিয়া মনে করে না, তাঁহার কোন প্রভুত্ব স্বীকার করে না।

প্রজার নিকট যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার সম্মান এখন যথেষ্ট, তিনি বহু প্রজার জমিদার বলিয়া তাঁহার বিশেষ সম্মান, তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে বিস্তর বাঙ্গালি সন্তুষ্ট থাকিবে, তিনি সম্মানিত হইলে বিস্তর বাঙ্গালি সম্মানিত হইবে, এই গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস। আমরা প্রার্থনা করি এ বিশ্বাস সত্য হউক, চিরস্থায়ী হউক, তাঁহার সহিত বাঙ্গালির পূৰ্ব্ব ঘনিষ্ঠতা পুনস্থাপিত হউক। আমরা দেখিয়া সুখী হই।

জালরাজা ধৰ্ম্মপ্রণেতা

মোকর্দ্দমা ফুরাইল। জালরাজা দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সঙ্গতি নাই, দ্বিতীয়তঃ তথায় প্রতাপচাঁদ বলিয়া নালিশ করিলে আবার জেলে যাইতে হইবে। সুতরাং নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কলিকাতায় বসিয়া থাকিলেন। পূৰ্ব্বে যাঁরা বিশেষ স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ কেহ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন “কি জানি, গবর্ণমেণ্টের যে গতিক দেখিতেছি, আর সাহস হয় না।” কেহ বা সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্যে জালরাজার সহিত আত্মীয়তা রাখিলেন, জালরাজা তাঁহাদের নিষেধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিতেন না। তাঁহাদের যত্নে জালরাজার অন্নকষ্ট—কোন কষ্টই ছিল না, ধনবানের ন্যায় সুখে সচ্ছন্দে তিনি দিন যাপন করিতেন।

প্রথমে তিনি কিছু দিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন, তাহার পর কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। তাঁহার নিমিত্ত গোবিন্দ বাবু আপনার সৰ্ব্বস্ব ব্যয় করেন, সে ব্যক্তির একান্ত ধারণা ছিল যে জালরাজা সত্যই প্রতাপচাঁদ।

কলুটোলা হইতে জালরাজা শ্যামপুকুরে গিয়া থাকিলেন। কিছু দিন. পরে লাহোরের লড়াই উপস্থিত হইল। এই সময় জালরাজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবার দৃষ্টি পড়ে। গতিক বুঝিয়া তিনি কোম্পানীর রাজ্য হইতে পলাইয়া প্রথমে চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসিস্ আশ্রমে কয়েক বৎসর থাকিলেন, তাহার পর শ্রীরামপুরে যান। শ্রীরামপুর তখন কোম্পানীর রাজ্য হয় নাই। সেখানে প্রায় ছয় সাত বৎসর ছিলেন। এই সময় শ্রীরামপুরে আমাদের যাতায়াত ছিল।

শুনিতাম তিনি তথায় ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা এক এক পঞ্চ প্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে একত্রে তাঁহাকে আরতি করিত, তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। লোকে বলে সে সময় বড় সমারোহ হইত।

এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করিত যে, জালরাজার বুদ্ধির একটু গোলমাল হইয়াছে। তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ হইলে এই দুর্ঘটনার পর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মতিভ্রম হয নাই। যাহারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, কথায় বার্ত্তায় কখন তাঁহার ভ্রান্তি বুঝা যায় নাই। বরং তখন তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বোধ হইত। তিনি তৎসাময়িক, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা—সমুদয় সংবাদপত্র নিত্য পাঠ করিতেন, যাঁহারা সে সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ফরাসিস politics, রুস-দেশীয় রাজনীতি, পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কেহ কেহ বলেন, বিলাতী রাজনীতিতে (European politics) তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আরও শুনা যায়, তিনি রুসীয় রাজনীতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন এবং সেই দেশের কিছু পক্ষপাতীও ছিলেন। এদিকে, বেদান্তশাস্ত্রে তিনি বড় পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীরামপুরে থাকিবার সময় দুই একজন অধ্যাপক তাঁহার নিকট বেদান্তের কথা শুনিতে যাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় বলা যায় না, যে তাঁহার কোন প্রকার চিত্তবৈকুল্য জন্মিয়াছিল। অথচ, আবার দেখা যায়, তিনি শালগ্রামশিলার ন্যায় ঝারায় বসিয়া থাকিতেন, লোকের সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি লইতেন, পূজা গ্রহণ করিতেন, বৈকালি খাইতেন। তখন তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি কেহ বুঝে নাই।

যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিত, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, পুরুষের দলও নিতান্ত অল্প নহে। অনেকগুলি বাবাজি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিত। বোধ হয় তাহাদের দ্বারাই জালরাজার অমানসিক শক্তি দেশ বিদেশ রাষ্ট্র হইত। স্ত্রীলোকদের ধারণা হইয়াছিল, যে এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেবতা। অনেকে তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব মনে করিত।

শুনিতে পাওয়া যায় যোগীদের ন্যায় তাঁহার দুই এক বিষয়ে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কেহ অনুভব করেন প্রতাপচাঁদ যখন হিমালয় অঞ্চলে যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতেন, তখন এ বিষয় কিছু শিখিয়া থাকিবেন। কেহ বলেন যে হটযোগ তাঁহার বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল। সেই কারণে লোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ মনে করিত। হটযোগ অভ্যাস থাকিলে, বিলক্ষণ "বুজরুগি" দেখান যায় সত্য।

যতদূর শুনা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, তিনি বৌদ্ধমতে কিছু যোগ শিক্ষা করিয়া থাকিবেন, তান্ত্রিকমতে যোগ অভ্যাস করা বড় কঠিন। বৌদ্ধমতের যোগ অপেক্ষকৃত সহজ, যত্ন করিলে কতকটা অভ্যাস হয়। বোধ হয় সেই জন্য এখন বৌদ্ধ যোগীই অধিক। আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম সতন্ত্র বলি, অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। বিষ্ণু উপাসনা, শক্তি উপাসনা উভয়ই হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ শাখা, বৌদ্ধধর্ম্মও সেইরূপ। বেদান্তের গ্রন্থি বৌদ্ধধর্ম্মের হাড়ে হাড়ে আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থার দুই একখানা গ্রন্থ, আর আমাদের তন্ত্র একইরূপ ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা কর্ম্মফলবাদি; এবং কর্ম্মফল যে মানে তাহাকেই হিন্দু বলি। বৈষ্ণব শক্তির মধ্যে আর পূর্ব্বতম বিচ্ছেদ নাই, উভয়েই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। আর কিছু দিন পরে হয় ত ভারতীয় বৌদ্ধেরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুর আর বিচ্ছেদ না থাকিবার সূত্রপাত পূর্ব্বে কতক আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধদের দন্তযাত্রা এখন হিন্দুদের রথযাত্রা, উভয় উৎসব প্রায় এক হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে, কোন গ্রন্থে রথযাত্রার উল্লেখ নাই। ইদানীং উৎকলখণ্ড বলিয়া পুরাণের এক অংশ নূতন প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল তাহাতেই রথের কথা দেখা যায়। উৎকলের যে দেবতাকে হিন্দুরা জগন্নাথ বলিয়া পূজা করিতেছেন, যাঁহার প্রসাদ ব্রাহ্মণ, বাগ্দী একত্রে আহার করিয়া, হিন্দু আচার পবিত্র করিতেছেন, সে দেবতা মূলে বৌদ্ধদের। পুরীতে তাহাদের দন্তযাত্রা হইত। সিংহলিরা সে দন্ত লইয়া পলাইয়াছে, হিন্দুরা দন্তযাত্রার রথ লইয়াছে, ঠাকুর লইয়াছে, আচার পর্য্যন্ত লইয়াছে। বৌদ্ধ আচার এ স্থলে হিন্দু আচার হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমূর্ত্তি শিবমূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আর কিছুই হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যাহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিতেন, তাহাদের স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহারা বুঝিতেন, এখনকার হিন্দুরা তাহা জানেন না, বুঝেনও না। সুতরাং তাঁহাদের বিদ্বেষভাব আর ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্ভব নহে, কেবল নামসম্বন্ধে সম্ভব। আচার, ব্যবহার, উপাসনা দেখিয়া এখন যাহাদের সহিত আমরা মিলিয়া থাকি, তাহাদের বৌদ্ধ নাম শুনিলে হয় ত আর তাহাদের সহিত মিলি না। বৌদ্ধ নামের প্রতি আক্রোশ আছে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আর তত নাই, সুতরাং বৌদ্ধনাম না জানিলে, অনেকেই এখন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন, অনেকে হয় ত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায়, এখন বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁহারা তাহা জানেন না। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা আচার ব্যবহারে অনেকটা হিন্দুদের মত। তাঁহারা হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। হিন্দুরাও সেই বৌদ্ধদের হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করেন। আমাদের জালরাজা বোধ হয় এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের

বৌদ্ধ ছিলেন। প্রথমে ছিলেন না, পরে হইয়া থাকিবেন। জালরাজাকে বৌদ্ধ স্থির করিলে তাঁহার শেষ অবস্থার কার্য্য অনেকটা বুঝা যায়। তিনি অনেক লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি পাঞ্জাবী ও অপর হিন্দুস্থানী পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্য চেলার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, স্ত্রীলোক শিষ্যার ত কথাই নাই। বাবুগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইতেন। দূরবস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া অতি গোপনে স্ত্রীলোকদের মন্ত্র দিয়া আসিতেন। তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ণুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্ত্রও নহে। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী অর্চ্চনা পদ্ধতি নূতন প্রকার। সুতরাং লোকে সে সকল কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহা হিন্দুধর্ম্মের কোন গুপ্ত প্রণালী হইবে মনে করিত। অদ্যাপি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা মন্ত্র দিয়া বেড়ান। স্থানে স্থানে লোকে তাঁহাদের ঘোষপাড়ার দল বলিয়া জানে। কিন্তু বোধ হয়, তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত কিছু হইবে, অথবা তিনি নিজে কোন নূতন পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন।

এই নূতন ধর্ম্মটি ক্রমে বিস্তার হইতেছে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা জালরাজার শিষ্যের সংখ্যা বোধ হয় এখন বহু গুণে অধিক।

অদ্যাপি লোকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে কিন্তু কেহই জানে না যে জালরাজার প্রণীত ধর্ম্মে তাহারা উপদিষ্ট হইতেছে। শিষ্যদের মধ্যে জালরাজার স্বতন্ত্র নাম ছিল এখনও সেই নাম আছে। উপাসকেরা সেই নাম প্রভুর নাম বলিয়া ভক্তি করে, কিন্তু তাহারা কেহ জানে না যে সে নাম জালরাজার। পূর্ব্বে অধিকাংশ শিষ্যেরা সে নাম জানিত।

জালরাজার ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে আর এক সময়ে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করিব, ইচ্ছা থাকিল। সেই সময় তাঁহার গুপ্ত নাম প্রকাশ করিলে অনেকেই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম চিনিতে পারিবেন।

জালরাজার মৃত্যু

জালরাজার মূর্ত্তি বড় প্রশান্ত ছিল, যে দেখিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে। সে মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতা জুয়াচোরদের নহে। গল্প আছে, তিনি একবার কোন পল্লীগ্রামে শিষ্যাদের দেখিতে গিয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে বাটীতে কেহ পুরুষ থাকিত না, শিষ্যারা সকলেই তথায় গোপনে গুরুদর্শনে আসিত। গ্রামস্থ লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে একজন বদমায়েস মধ্যে মধ্যে গ্রামে আসিয়া অভিভাবকশূন্য স্ত্রীলোকদের

লইয়া রঙ্গরস করিয়া যায়। সেই জন্য তাহারা সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, সে বদ্‌মায়েসকে একবার ধরিতে পারিলে তাহার অস্থি চূর্ণ করিবে। এখন সে সময় উপস্থিত হইল। "বদমায়েসের" সন্ধান পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে আট দশ জন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। প্রভু তখন শিষ্যা পরিবেষ্টিত হইয়া নবধর্ম্মানুশীলন করিতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গেল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। তাহার পর, যখন তাহারা যথাস্থানে তাঁহাকে লইয়া ফেলিল, তখন তাঁহাকে প্রহার করা দূরে থাকুক, কেহ কোন রূঢ় কথাও বলিতে পারিল না। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের শ্রদ্ধা হইল।

ইদানী তিনি ঈষৎ স্থূলকায় হইয়াছিলেন। মোকর্দ্দমার সময় তাঁহার বর্ণ শ্যাম বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু পরে সেই শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু এরূপ ছিল, যে তাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার চক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়িত; অথচ সে চক্ষুতে প্রখরতা মাত্র ছিল না।

তিনি সকলকেই মিষ্ট কথা কহিতেন, মিষ্ট কথাই তাঁহার বশীকরণ মন্ত্র ছিল।

মৃত্যুর আট দশ মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতার উত্তর বরাহনগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দৈহিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। অর্থেরও কিছু অনাটন হইয়া থাকিবে, কেন না, বাটীর ভাড়া একেবারে দিতে পারেন নাই। এই সময়ে বোধ হয় তিনি নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহাই আপনাকে একা বলিয়া ভাবিতেন। একা আর থাকিতে পারিতেন না, একা থাকিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামের ভদ্র-লোকদের আহ্বান করিতেন, কেহ তাঁহার নিকট আসিতেন, কেহ না আসিতেন না। যাঁহারা আসিতেন, কাতরভাবে তাঁহাদের বলিতেন, আমি আর একা থাকিতে পারি না, আপনাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে যেন সুখে থাকি।

এই প্রকার অবস্থায় তিনি ১৮৫২ সালে কি ৫৩ সালের প্রথমে ময়রা-ডাঙ্গা পল্লীতে একটি সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহ ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই জন্য আরও কষ্ট হয়।

তাঁহাকে জালরাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না; তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভাল-বাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

সমাপ্ত

ভারত বিজ্ঞানের জন্মভূমি। গণিতশাস্ত্র ভারত হইতে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতিষ, রসায়ণ, আয়ুর্ব্বেদ, শস্ত্রবিদ্যা, সকলই সর্ব্বাগ্রে ভাবতে দেখা দেয়, এবং বিশেষ যত্ন, আগ্রহ এবং প্রতিভা সহকারে অধীত হয়। আজ ইউবোপ এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব করিতেছেন। কিন্তু আমরা মানি না। মানি না বলিতেছি, কেন না, আমবা মুখে স্বীকার কবি বটে, কিন্তু কাজে স্বীকাব কবি না। পিতৃপুরুষেব কীর্ত্তি রক্ষা না করাও যা, না মানাও তাই। অপরেব সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; অপবে যদি আমাদের পৈত্রিক কীর্ত্তি মুখে স্বীকাব করে, তাহাতেই তাহাদেব মানা হয। কিন্তু আমাদেব পৈত্রিক কীর্ত্তি যদি আমরা রক্ষা না কবি তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকাব করিতে হইবে যে আমরা তাহা মানি না। আমাদেব পিতৃপুরুষেরা দেবসেবা, সদাব্রত ইত্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কবিতেন। আমবা সে সকল অনুষ্ঠান পালন করি না। তবে কেমন কবিয়া বলিব যে আমবা তাঁহাদিগকে সদনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়া মানি? পিতৃপুরুষেব সহিত ত কেবল গলাবাজিব সম্বন্ধ নয়। পিতৃপুরুষের সহিত সম্পূর্ণ দায়যুক্ত সম্বন্ধ। আমবা যদি সে দায ঠেলিয়া ফেলি, তবে কেমন করিয়া বলিব যে আমরা তাঁহাদিগকে অথবা তাঁহাদের কীর্ত্তি মানি? এখন তাঁহারা কেবলমাত্র তাঁহাদের কীর্ত্তিতে জীবিত রহিয়াছেন। সে কীর্ত্তি রক্ষা না করিলে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা হয়না। তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিলে আমরা পৃথিবীতে চণ্ডাল—হাড়ীব হাড়ী, কেন না আমাদেব স্বোপার্জ্জিত ধন কিছুই নাই, আপন লব্ধ মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। অতএব পৃথিবীতে দশজনের মধ্যে একজন হইতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে। যে বিজ্ঞান-গৌরবে জগতে তাঁহাদের এত গৌরব, আমাদিগকে সেই বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে হইবে। শুধু অনুশীলন নয়, তাঁহারা যেমন বিজ্ঞানে যশস্বী হইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের হিতসাধন করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও

সেইরূপ বিজ্ঞানে যশস্বী হইতে হইবে, এবং বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের হিত সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করি ততদিন, মুখে যতই স্পর্দ্ধা বা আস্ফালন করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা ভারতবাসী হিন্দুও নই, ভাবতানুরাগী হিন্দুও নই। স্বদেশানুরাগের মূলসূত্র পিতৃপুরুষের পূজা। কিন্তু পিতৃপুরুষের পূজা ফুল বিল্বপত্র দিয়া হয় না। সে পূজার একমাত্র পদ্ধতি—পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিরক্ষা। পৃথিবীতে আমাদের মত পূজা কেহ কখন করে নাই। আমাদের পূজার সংখ্যা নাই, আমাদের পূজার শেষ নাই। মনুষ্য-মধ্যে আমরা পূজারি। জগতে পূজারি হইয়া জন্মিয়া আমরা কি আমাদের পিতৃ-পুরুষের পূজা করিতে পারিব না?

কিন্তু যদি আমরা এতই অপদার্থ হইয়া থাকি যে, পিতৃপুরুষের পূজা করিতে অসমর্থ হই, পিতৃপুরুষেব কীর্ত্তিতে আমাদেব দেহ, প্রাণ, আত্মা, হৃদয় অর্পণ করিতে অপারগ হই, পিতৃপুরুষের পবিত্র পদে আমাদের যথা সর্ব্বস্ব বলি দিতে সাহস না পাই—যদি আমবা আমাদের নূতন সভ্যতার গুণে যথার্থই হাড়ী হইয়া থাকি, তথাপি আমাদের আর এক প্রকারের একটা পূজা ত করিতেই হইবে। পেট পূজা না কবিলে ত এক মুহূর্ত্তও চলিবে না। কিন্তু আমাদের পেট যে আব চলে না। যা কবিলে আমাদের পেট চলে, সে সকলই ত প্রায় এখন বিদেশীয়েরা কবিতেছে। ছুরি, কাঁচি, চাবি, তালা কাগজ, ধুতি, শাড়ী, চাদর, বনাত, সুতা, টুপি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্, দেশলাই, শোডা, কুইনাইন্, ইপিকাক্, আরো কত কি বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া এ দেশে আসিতেছে। অতএব আমাদের ক্ষতি কি কম হইতেছে? ভারতের তাঁতীর মত তাঁতী জগতে আর কোথাও জন্মে নাই। কিন্তু সে তাঁতীকুলের আজ কি দশা বল দেখি? আরো কত কুলের কি দশা হইবে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? তবে পেটের উপায় কি করিতেছ? শুধু ইংরাজকে গালি দিলে ত চলিবে না। ইংরাজের দোষ কি? তাহারা তোমাদের দেশীয় শিল্প নষ্ট করিতে সক্ষম বলিয়াই নষ্ট করিয়াছে। শক্তি কখন ব্যর্থ হয় না। তোমরা যদি হিন্দু হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে একথার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তোমাদের পুরাণে শত শত শাপের কথায় লেখা আছে যে, অশেষ অনুনয় বিনয় সত্বেও কোন শাপ কখন ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু শাপ কি? শক্তি বই ত নয়। তবে আজ তোমরা কেমন করিয়া, তোমাদের অপূর্ব্ব পুরাণের উত্তরাধিকারী হইয়া, শক্তির বিরুদ্ধে কথা কহিতেছ? কেমন করিয়া ইংরাজের উৎকৃষ্টতর শক্তির কথা লইয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? তোমরা নিশ্চয়ই শক্তির অর্থ হারাইয়াছ। নতুবা, হিন্দু পৌরাণিকের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ তোমরা ইংরাজের শক্তি দেখিয়া ইংরাজের উপর এত

চটা কেন, এবং জীবিকার জন্য এত নিশ্চেষ্ট এবং ম্রিয়মান কেন? কটু কথায় অথবা চক্ষের জলে কখন শক্তির শক্তি নষ্ট করা যায় না। শক্তির শক্তি নষ্ট করিতে হইলে উৎকৃষ্টতর শক্তি প্রয়োগ চাই। অতএব বিজ্ঞানমূলক ইংরাজ শক্তিকে বিজ্ঞানমূলক হিন্দুশক্তি দ্বারা পরাজয় কর। উপায়ান্তর নাই। প্রাণপণে বিজ্ঞান অনুশীলন কর।

আমাদের দেশ খারাপ; হয় ত কেহ কেহ এইখানে বলিবেন যে, বেশী বিজ্ঞান শিখিবার দরকার কি, দুই চারিটা কল চালাইতে শিখিলেই চলিবে। আমি বলি, কখনই নয়। প্রকৃতি অথবা জড়-পদার্থের নিয়ম না জানিলে, কখনই বড় পদার্থ তোমার বশীভূত হইবে না। ইহার এক প্রমাণ এই যে, ইউরোপে কল কারখানার উন্নতি বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে, আগে হয় নাই। আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বিপরীত মত সমর্থন করণার্থ বলিয়া থাকেন যে, মানুষ বিজ্ঞান শিখিবার আগে রন্ধন করিয়া খাইতে শিখিয়াছিল। আমিও বলি কথা ঠিক; কিন্তু তাহার মানে কি এই যে, বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শিল্প সম্ভব? সে কখনই নয়। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববেত্তা টাইলর সাহেব বলেন, * যে মানুষ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া কত রকম চেষ্টা করিয়া যে আগুন প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই দীর্ঘকালব্যাপী বহুবিধ চেষ্টার অর্থ কি? তাহার অর্থ এই, জড়পদার্থের নিয়মের অনভিজ্ঞতা, এবং সেই নিয়ম জানিবার প্রয়াস। আদিম মনুষ্য অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে সকল চেষ্টা করিয়াছিল, আধুনিক ভাষায় তাহার প্রত্যেকের নাম experiment অথবা hypothesis †। আরো একটি উদাহরণ দিই। বোধ হয় ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজন ফরাশী, হাঁড়ি প্রভৃতি মৃত্তিকানির্ম্মিত পদার্থ glaze করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক বার অনেক রকম দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না, বোধ হয় প্রায় ১০ কি ১২ বৎসর ধরিয়া এইরূপ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। এত চেষ্টাই বা কেন? আর এত নিষ্ফলতাই বা কেন? ইহার অর্থও তাই। জড়-পদার্থের নিয়ম না জানা এবং সেই নিয়ম জানিবার নিমিত্ত experiment বা hypothesis করা। অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে রন্ধনের আগেও বিজ্ঞান আছে—বিজ্ঞান ব্যতিরেকে শিল্প অসাধ্য এবং অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে, নিদানপক্ষে, পেটের জ্বালায়ও বিজ্ঞান শিখিতে হইবে।

---

* Early History of Mankind নামক গ্রন্থ দেখ।

† Experiment এবং Hypothesis এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, এক হিসাবে দুইই এক।

এখন কথা এই যে, বিজ্ঞান ত অনেকদিন হইতে আমাদের স্কুল এবং কালেজে শেখান হইতেছে, কিন্তু কয় জন বাঙ্গালী বিজ্ঞান জানে? তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কোথাও কিছু দোষ আছে, কোথাও কিছু অভাব আছে। বিষয়টী গুরুতর। ইহার সম্বন্ধে সকল কথা ঠিক করিয়া বলা বড় কঠিন। বলিতে সক্ষম বলিযাও আমার সংস্কার নাই। তবে যে দুই একটী কথা আপাততঃ বুঝিতে পারিতেছি তাহাই বলিতেছি।

আমি এইরূপ বুঝি যে, যে শিক্ষা আমাদের জীবনের সম্বল হইবে, জীবনের প্রারম্ভেই তাহার সূত্রপাত হওয়া উচিত। সকল দেশেই শৈশবাবস্থায় শিক্ষা আরম্ভ হয়। অধিক বয়সে শিক্ষা আরম্ভ হইলে, ব্যক্তিগত বিশেষ মানসিক শক্তি বা প্রবৃত্তি না থাকিলে, সে শিক্ষা যথোচিত ফল দান করে না। এ কথা সত্য যে, শৈশবাবস্থায় বা বাল্যকালে সকল বিষয়ের শিক্ষা একেবারে আরম্ভ হয় না, এবং করাও যায় না। কিন্তু যে যে শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক বলিযা গণ্য হয়, যত অল্প বয়সে তাহার সূত্রপাত করিতে পারা যায়, ততই তাহার সফলতা সম্ভবপর। এবং যেখানে যে প্রকার শিক্ষা বিশেষ ফলবতী হইতে দেখা যায়, নিশ্চয জানিবে, সেখানে শৈশবে তাহার সূত্রপাত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিসাব-কিতাবে বড় পটু ছিলেন। দশ বার বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার পাঠশালায় হিসাব প্রণালীতে শিক্ষা সমাপ্ত করিতেন। বিলাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ভাল হয়; বিলাতে ছেলের খেলনাও বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে প্রস্তুত। যদি আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক হইতে হয় তবে আমাদিগকেও শৈশব অবস্থা হইতে যে রকমে হউক বিজ্ঞানের সহিত আলাপ করিতে হইবে। ২০ বৎসর বযসে, এল, এ, পরীক্ষা দিয়া বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করিলে, বিজ্ঞানে প্রকৃত আসক্তিও জন্মিবে না, এবং যা কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইবে তাহাও মনে বদ্ধমূল হইবে না। অতএব দশ বৎসর বয়সে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করা চাই। অতি সহজ ভাষায়, সহজ experiment সহকারে, তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইলে দশ বৎসরের শিশু কেন যে বিজ্ঞানের দুই চারিটী মোটা মোটা কথা শিখিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অতএব আমাদের আবশ্যক হইতেছে যে, অতি সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া experiment সহকারে বাঙ্গালী শিশুকে বিজ্ঞান শিখাইতে আরম্ভ করা হয়। দেশের 'হাওয়া' বৈজ্ঞানিক রকমের হইয়া উঠিলে এত শীঘ্র বিজ্ঞান-শিক্ষা আরম্ভ না করিলেও চলিবে। কিন্তু যতক্ষণ সে 'হাওয়া' নাই, ততক্ষণ এই প্রণালীতে কার্য্য না করিলে সে 'হাওয়া' প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

এ দেশে অনেকে ইংরাজী জানেন না এবং শিখেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের ত উদর আছে এবং উদরান্ন চাই। তাঁহারা কেমন করিয়া বিজ্ঞান শিখিবেন?

শিখিলে তাঁহাদের উপকার বই অপকার নাই। ঢাকার একজন স্বর্ণকার আমাকে বলিয়াছিল যে, আমরা যদি ইংরাজ কারিগরের মত সোণা রূপা পালিশ করিতে জানিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেহ ঢাকার জহরৎ বই অপর জহরৎ কিনিত না, আমাদেরও ঘরে টাকা ধরিত না। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য। অতএব যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদিগেরও বিজ্ঞান শেখা উচিত। কিন্তু তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান বুঝাইতে হইলে সহজ বাঙ্গালায় বুঝাইতে হইবে। অতএব এবারও দেখা গেল যে, এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ফলবতী করিতে হইলে, সহজ বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রস্তুত করা চাই, এবং বৈজ্ঞানিক উপদেশ দেওয়া চাই।

যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংবাজীতে বিজ্ঞান শিখিযা কি কবিবেন? সমাজে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে? একে ত তাঁহাবা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপ-কথন করিবার লোক পাইবেন না; যদিও পান, ত ইংবাজীতে কথোপকথন করিবেন। তাহাতে সমাজেব ধাতু ফিবিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতিব ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। পবিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষাব মূল সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক কবিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

এই কয়টি কথা আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রকেই বলিলাম। কিন্তু আমাদেব জাতীয় বিজ্ঞান সভার স্থাপনকর্ত্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিশেষ করিয়া বলিলাম। মহেন্দ্র বাবু এদেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকার্য্য তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত স্বরূপ করিয়াছেন। ভবসা কবি, আমাদেব কথা কয়টি তাঁহার কাছে অনাদৃত হইবে না।

১

পশ্চিমের জলদ শয্যায়
পড়িয়া রজনী মৃত-প্রায়।
দিগন্তের স্নিগ্ধ কোলেতে,
গুরু-ভার মাথাটি রাখিয়া,—
অনিমিক অরধ-নেত্রেতে,
দেখিতেছে আত্ম হারাইয়া—
ঘুমন্ত বিশ্বের মুখখানি!
ছেড়ে যেতে চাহে না পরাণ,—
তবু না গেলেও নয়!
আশা, তৃষ্ণা সব ছেড়ে—স্মৃতির সান্ত্বনা
ফেলে—
শূন্যে পূরিয়া হৃদয়—
জানে না কোথায় হবে করিতে প্রয়াণ।
একবার ভাঙাইয়া ঘুম,
চুম্বি' নিমীলিত নয়নকুসুম
বিদায়ের শেষ কথা—প্রাণের একটি ব্যথা
না বলিয়া ছেড়ে যাওয়া দায়!
তবু যেতে হবে হায়!
অসময়ে জাগাইবে? জাগিলে বিরক্ত হবে!
কাজ নাই জাগাইয়া আর—
থাক্ তবে থাক্ অন্ধকার!
—হৃদয়ের তারাগুলি, একে একে অন্ধকারে
গিয়াছে নিবিয়া—
সারা নিশি জেগে জেগে, আঁখিপাতা
নাহি ফেলে,
দেখিয়া—দেখিয়া
তবু নয়নের সাধ মেটে নাই হায়।
কেমন করিয়া তবে যায়!
যেন কি সাধের তায়—
এক পরমাণু কণা,
জানানো,—কি দেখানো হলো না!
বিধাতা সাধিল বাদ।

২

চাহিয়া রয়েছে শুকতারা,
রজনীর হৃদয় উপরে।
পরাণটী আঁকা যেন তায়,
তৃষা-মাখা আঁখির ভিতরে!—
দেখিতেছে, শুনিতেছে, গণিতেছে
প্রতিশ্বাস,
কয়টী পরেতে দিবে আর—
দুর্ব্বহ-পরাণ উপহার!
মৃদু মৃদু করিছে ব্যজন।
নিস্তব্ধতা পারশে বসিয়া,
বিষাদের একটীও রেখা
মুখে নাহি উঠিছে ফুটিয়া!
জন্মেছে যাহার সঙ্গে, বাড়িয়াছে একসঙ্গে,
যাহাদের এক-প্রাণ দুইটী শরীর,
তাহাদের একজন মুমূর্ষু পড়িয়া আজ—
অপর অমন কেন স্থির!
মনে মনে কি একটা—না জানি করেছে
স্থির!

তাই বসে অমন গম্ভীর !
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দিগঙ্গনাগণ,
দেব-শিল্পী গড়া পুতলীর প্রায় !
জীবন্ত রয়েছে তারা—উজ্জ্বল নয়ন-তারা
দেখিলে কেবল বুঝা যায় !
ব্রহ্মাণ্ডের জলরাশি গর্জ্জিছে নয়নান্তরে,
বাহিরে তাহার নাই কোন নিদর্শন !
একবার দেখে স্বপ্ন—রজনীর পাণ্ডু-মূর্ত্তি,
হৃদয়ের বেগ নাহি সামলিতে পারে,—
দুটী কর চাপি' বুকে ছুটে যায় নিদ্রা যেথা
কাঁদিতেছে বসি এক ধারে !
দুজনারে জড়ায়ে দুজনে,—
—চারিটী নয়ন ছল ছল,—
শব্দ শূন্য, বর্ণাতীত কি ভাষায় কাঁদিতেছে
উভয়েই বুঝিছে কেবল !

৩

ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, ছুটে গিয়ে—বুকে লয়
কৃশামূর্ত্তিখানি রজনীর।
ফেলে পৃথিবী-সম্পর্ক-শূন্য
স্বর্গ-সমবেদনার—
বারি বিন্দু ছলে অশ্রুনীর !
ধীরে ধীরে আসে ধীর বায়
আসে কি না জানা নাহি যায় !
এলো থেলো অলকা দুইটী,
একবার যত্নে সরাইয়া—
ঘুমন্ত-জ্যোৎস্নামাখা, ঘুমন্ত-স্বরগ আঁকা
মুখ-খানি ঈষৎ চুম্বিয়া,—
একেবারে যেতেছে মরিয়া !
অরধ-ঘুমন্ত পারাবার—
একটু উথলি উঠি, একটু আসিয়া ছুটি,
পাদু'খানি চুম্বি একবার,—
চাহে না ফিরিয়া যেতে আর !
—একটু মলিন শশিকলা,
গগনের কোলেতে বসিয়া—
রহিয়াছে জীবন্তে মরিয়া !

প্রাণ চায়—ছুটে গিয়ে—প্রাণের ভগ্নীর কাছে
সবলে জড়ায়ে ধরে গলা,
না পারি দেখিতে আর, মেঘে মুখ ঢাকা
দেয়,
কাঁদিয়া সে অধীনা অবলা !

৪

নিঠুর মূরতি প্রকৃতির,
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই—
রহিয়াছে সুগম্ভীর স্থির !
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ—
মিলিয়া গিয়াছে বুকে তার।
কত শত লক্ষ লক্ষ প্রাণ—
ওই বুকে মিলিবে আবার।
ব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই—চাহে না থাকিতে
বাঁধা
আপনি আপন হ'তে চায় !
ব্রহ্মাণ্ড সাধিছে বলে সদা
পদে পদে বাঁধিতে তাহায়।
অর্দ্ধবশীভূতা হয়ে, অর্দ্ধ আপনার হয়ে,
তাহাই সে ছুটিয়া বেড়ায়।
এক চক্ষে তাই তার—ঝরিছে শিশিরবিন্দু
আর চক্ষু মরুময় হায় !
হৃদয়ের একপ্রান্তে আজ—
জ্বলিতেছে দারুণ শ্মশান !
হৃদয়ের আর প্রান্তে আজ—
স্বর্ণপুরী হ'তেছে নির্ম্মাণ !
—কুসুমের প্রথম সৌরভ,
গগনের প্রথম শিশির,
প্রথম তরঙ্গ জাহ্নবীর,
জননীর সস্নেহ চুম্বন,
শিশুর হৃদয় নিরমল,
বালিকার অকপট প্রেম,
মরণের স্নেহ আলিঙ্গন,
প্রেমিকের মিলনের হাসি,

জীবনের প্রথম রোদন,
যোগীর ঈশ্বর তন্ময়ত্ত,
হতাশের স্বর্গীয় জীবন
প্রকৃতরি শ্মশান হিয়ায়
সব বুঝি—মিলাইয়া যায়।

৫

রজনীর অন্ধকারে মৃত্যু—
হায় ফিরে দেখে নাই কেহ!
পাখী জগতের মাঝে—দেখেছে একটী পাখী,
সৃষ্টি-ছাড়া সে পাণ্ডুর দেহ!
বিশ্বের ভাঙ্গাতে ঘুম—তাই অত প্রাণপণে,
গলা ভেঙ্গে করিছে চীৎকার,
ফুলজগতের মাঝে—দেখেছে একটী ফুল,
—সে প্রভাতে ফুটে নাই আর!
উদ্ভিদ জগত মাঝে—দেখেছে একটী লতা
—হয়ে আছে অর্দ্ধমৃতা প্রায়।
একটু নিশ্বাসে মরে যায়।

জল-জগতের মাঝে—দেখেছে একটী অশ্রু,
—অর্দ্ধ-পথে লুকায়েছে দেহ আপনার,
সুর জগতের মাঝে—দেখেছে একটী সুর,
স্নেহ দয়া, প্রেমে মন গলেছে তাহার,
অদ্যাপিও সেই সুর হায়,
বিশাল—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী,নিরন্তর নিরন্তর ঘুরি ঘুরি,
কাঁদে আর কাঁদায়ে বেড়ায়:
—নারীজগতের মাঝে—দেখেছে একটি নারী,
বলেছে সে গরব করিয়া
কেবা আর এ জগতে, বসিবারে পারে
নারী বিনা পরাণ ভরিয়া?
নরজগতের মাঝে—দেখেছে একটি নর.
ভাবিছে অদৃষ্ট আপনার!—
এ জনমে দেখিবে না কেহ
একবার হৃদয় তাহার!
মৃতজগতের মাঝে—দেখেছে একটি মৃত,
—বলেছে পূরবদিকে সকলেই চায়—
দেখে না পশ্চিমে ভুলে—কি ডুবিয়া যায়।

(পূর্ব্বে প্রকাশিতের পর)

অন্যান্য দেশের শাসন প্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া বুঝা গেল, বিশ্বধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের প্রভেদমূলক ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ব স্ব বৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে প্রধান হইয়াছিলেন, এবং ঐ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। ইহার আর এক মাহাত্ম্য এই যে, অন্যান্য বর্ণের লোকেরা সবর্ণ সম্বন্ধে আত্ম (বা স্বায়ত্ব) শাসন নির্ব্বাহ করিতে পারিত, অথচ তাহা করিয়াও অধীনভাবেই উচ্চবর্ণের আজ্ঞাবহন করিতে পারিত। এবং তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টবর্ণের ঐক্য এবং সহযোগীতা সুসিদ্ধ করিত। এই বন্দোবস্ত রাজধর্ম্মের অঙ্গ এবং বর্ণভেদের মূল। সৈনিক বন্দোবস্তও এইরূপ সহযোগীতার উপায়ান্তর। বৌদ্ধেরা এই ব্যবস্থা বুঝিতে না পারিয়া রাজাকেই যাজনকার্য্যের কর্ত্তা করিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য বর্ণভেদ উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে এতদ্দেশীয় তীর্থস্থানের কথা মনে হয়। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম, আমাদিগের দেশের প্রধানতীর্থ। তন্মধ্যে প্রয়াগের পবিত্র স্থান—ত্রিবেণিতে- লোকের বসবাস থাকিতে পারে না; সুতরাং এই তীর্থে শাসনপ্রণালীর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না। পরন্তু প্রয়াগের পাণ্ডারা স্বকীয় ব্যবসায় সম্বন্ধে কাশীর গঙ্গাপুত্রদিগের অনুরূপ মনে হয়। অপর তিনটী তীর্থ মধ্যে প্রভেদ এই যে, পুরুষোত্তমে পুরীর রাজা, জগন্নাথদেবের সেবা বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন, কিন্তু কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনের পাণ্ডারাই সর্ব্বপ্রধান। ইহারা দেবোত্তর ভোগী অথচ সেই সকল দেবোত্তর কোন রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া ব্যক্ত হয় না। কাশীতে ৺বিশ্বেশ্বরই রাজা। [গয়াও বৃন্দাবনে ৺বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণকে রাজা বলে কি না জানি না। অনুসন্ধান কর্ত্তব্য] প্রবাদ আছে যে, শঙ্করাচার্য্য কাশী আবিষ্কার করেন। অর্থৎ এই তীর্থ এক সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং পরে ইহার পুনরুদ্ধার হয়। [কাশী তীর্থের লোপ ও পুনরু-

দ্ধারের সঙ্গে, সারনাথের ভগ্নাবশেষ, তথাকার বৌদ্ধস্তম্ভ এবং বুধমন্দির এতদ্দেশের বৌদ্ধবিপ্লব এবং শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় সমস্তই পাঠকের মনে আসিবে।] সে যাহা হউক, কাশীর বর্ত্তমান বন্দোবস্ত যদি শঙ্করাচার্য্যেরই স্থাপিত হয়, তথাচ তাহা প্রাচীন শাসনপ্রণালীর অনুকরণ বলিয়া মানিতে হইবে। শৈবসম্প্রদায় স্বধর্ম্মানুসারে মঠে মহান্তের অধীন হইয়া থাকেন। কাশীর ব্যবস্থা মহান্তদিগের শাসনপ্রণালীর অনুরূপ নহে। অথচ কাশীর পাণ্ডাদিগের শাসন পরশুরামের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ শাসন হইতেও বিভিন্ন। পাণ্ডারা যজন যাজন দুই করিয়া থাকেন কিন্তু অধ্যাপন অধ্যয়ন তাঁহাদিগের বৃত্তির অঙ্গ মনে হয় না। আর ইঁহারা সকল বর্ণেরই দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং সমাজের বিচারে অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার হেতু কি? যদি দানে পতিত হইয়া থাকেন, তবে পতিত্যের পূর্ব্বে প্রাচীন কাশীতে যাহারা দেবসেবা করিত তাহাদিগের ব্যবস্থাই বা কিরূপ ছিল? তখন কি শূদ্রগণ তীর্থ দর্শনাদি করিতে পারিত না? অথবা তখন তাহাদিগের দান কে গ্রহণ করিত? তখনকার যাজ্ঞিকেরাও পতিত ছিলেন, এ কথা মনে করা অসঙ্গত। আর তখন তীর্থস্থানে যজন ব্যতীত যাজন হইত না, ইহা মনে করাও সঙ্গত নহে। অতএব তীর্থাধিকারীর পক্ষে, অধ্যাপন এবং কেবল দ্বিজগণের দান গ্রহণ, এই দুটী বৃত্তি এখানে ব্রাহ্মণের স্বকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। কাশীর পাণ্ডারা রাজার অধীন নহে, তাঁহারা কেবল বিশ্বেশ্বরকে রাজা বলিয়া মান্য করেন। পাণ্ডা ও গঙ্গাপুত্র-দিগের মধ্যে যে অধিকার ভেদ আছে, তাহাতেও এই অনুমান হয় যে, তীর্থাধিকারীরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় রাজার অধীন নহে, স্ব স্ব ব্যাপ্যাধিকার মধ্যে যাজন এবং রাজধর্ম্ম উভয়ই প্রতিপালন করিতে সক্ষম। এই প্রণালী কতকদূর বৌদ্ধপ্রথার অনুরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু কাশীর পাণ্ডারা অশোক রাজার মত রাজ্যাধিকার করিতেন না

কেহ কেহ বলে, পুরুষোত্তমে বৌদ্ধ বিপ্লব হইয়াই ভুবনেশ্বরের দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আর ৺ জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধ প্রাধান্যের পরবর্ত্তী।

. এস্থলে কাশীর পাণ্ডা, অশোক রাজা এবং পুরীর রাজা এই তিন শ্রেণীস্থ শাসন প্রণালীর পারম্পর্য্য আন্দাজ করা সঙ্গত কি না পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই পারম্পর্য্য স্বীকার করিলে তীর্থাধিকারীদিগের শাসনপ্রণালীর সহিত মুসার প্রণীত য়িহুদীদেশীয় ঈশ্বর শাসনের কতক নৈকট্য ব্যক্ত হইবে। ফলতঃ য়িহুদি-দিগের মধ্যে ঈশ্বরের রাজত্ব এবং কাশীতে বিশ্বেশ্বরের রাজত্ব, শাসনপ্রণালী বিষয়ে নিতান্ত অনুরূপ বটে। [এস্থলে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাবিষয়ক

ভেদ ত্যাগ করিয়াই বিচার করা যাইতেছে।] অতএব কাশীর পাণ্ডাদিগের শাসন প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শৈবদিগের কাশী আর চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৃন্দাবন অনেক বিষয়ে সমান।

কাশীর পাণ্ডা ও গয়ার গয়ালীরা এক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু গয়াতে কোন লুপ্ত তীর্থের কথা শুনা যায় না; আর গয়া এবং বুধ গয়ার সমকক্ষতাব সঙ্গে জগন্নাথদেব ও ভুবনেশ্বরের বৈরিতা সমতুল্য ইহা স্পষ্ট প্রকাশিত। গয়ালির মধ্যে কোন "সর্দ্দার" নাই। * বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার সংখ্যা সঙ্কীর্ণ হইয়া একজন স্ত্রীলোকে ঠেকিয়াছে সুতরাং তন্মধ্যে প্রধান নাই। অন্নপূর্ণাব পাণ্ডাদিগের কথা জানি না। ফলতঃ কাশী তীর্থস্থানে শাসন প্রণালীর লক্ষণ এই মনে হয় যে যাজ্ঞিকেরা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত অথচ রাজশাসনের অধীন নহে। পুরুষোত্তমের রাজা— যাজ্ঞিকের আধিপত্য, অপেক্ষাকৃত অভিনব। এখানকার শাসন প্রণালী বৌদ্ধ রাজা অশোকের অনুরূপ। রাজা, যাজ্ঞিকদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করেন। অতএব কাশী গয়ার রাজধর্ম্মবিহীন যাজ্ঞিকের আধিপত্য পরশুরামের বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মানিতে হইবে। অশোক ও পুরীরাজের শাসন তাহাব পরবর্ত্তী এবং রোমগ্রীসের অনুরূপ। ব্রাহ্মণবর্ণের শাসন ক্যাথলিক যাজ্ঞিকদিগের শাসনের অনুরূপ, কিন্তু তাহাতে পোপের একাধিপত্যের সমতুল্য কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। বৌদ্ধবিদ্রোহ দ্বারাই বোধ হয় ইহার বিঘ্ন জন্মিয়াছিল।

সামান্য তীর্থগুলি মহাতীর্থের অনুকরণ মাত্র। ৺কালীঘাট তীর্থ নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। হালদার বংশ তাঁহাব শিষ্য। ইহাদিগের দ্বারা দেবীর উপাসনা আরম্ভ হইলে ভূম্যধিকারী সাবর্ণ চৌধুরীরা দেবোত্তর দেন। নন্দকিশোর শাক্ত ছিলেন, এবং শেষাবস্থায় দারপরিগ্রহ করিয়া তান্ত্রিকমতে গুরুশাসন সংস্থাপন করেন। † কাশীর পাণ্ডাবা হালদারদিগের অনুরূপ বটে কিন্তু তথায় সাবর্ণ চৌধুরী এবং হালদারদিগের গুরুকুলের অনুরূপ কিছুই দেখা যায় না। পাণ্ডারা দানপতিত হইলেও পূজারী বলিয়া গণ্য নহেন। কাশী গয়া ও কালীঘাট স্থানেই পৃথক পূজারি আছে।

এখন একবার শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাউক। প্রথমতঃ সর্ব্বত্র কাশী গয়ার মত শাসন ছিল, গ্রাম্য দেবতা গ্রামের রাজার স্বরূপ ছিলেন, যাজ্ঞিকেরা ঐ রাজা স্বরূপ দেবতার ও কুলদেবতার

*কালীঘাটের পাথুরেপটী নিবাসী শ্যামাচরণ তর্করত্নের বাচনিক শ্রুত।

† গয়ালি রাম হরিচেড়ির নিকট বাচনিক প্রাপ্ত।

উপাসনা করিতেন ; যাজন অধ্যাপন একায়ত্ত করেন নাই এবং প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে কোন নিয়মাধীন ছিলেন না। পরে পরশুরামের বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরে যুদ্ধে মগ্ন হইলেন ; অনন্তর সন্ধি দ্বারা বৃত্তিভেদ সংস্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজধর্ম্ম ও যুদ্ধবিষয়ে বীতরাগ হইলেন ; নিকৃষ্ট বর্ণের দান গ্রহণ অস্বীকার পূর্ব্বক কেবল রাজা এবং দ্বিজগণের স্বেচ্ছানুযায়ী দানের উপরে নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ; যাজন ও অধ্যাপনের বিশিষ্ট উন্নতি হইল। বাণপ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা তপস্যার প্রভাবে তেজস্বী হইয়া সন্ন্যাস দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের ঐক্য বন্ধন করিতে লাগিলেন ; সর্ব্বত্র সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন ; এবং ব্রাহ্মণের আজ্ঞা বহন প্রভাবে যুদ্ধকার্য্যে অনেকদূর বিরত থাকিলেন। বর্ণভেদমূলক সামাজিক বন্দোবস্ত পরিপক্ব হইতে লাগিল। প্রতিবর্ণে রাজা কি চৌধুরী কিম্বা সমাজপতির শাসন চলিল। অথচ বর্ণ পরস্পরা শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগীতা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা কেবল তপস্বীগণের অধীন হইলেন। স্মৃতির সৃষ্টি হইল এবং দর্শন শাস্ত্রাদির চর্চ্চা চলিতে লাগিল।

অনন্তর ক্ষত্রিযবর্ণ রাজধর্ম্মে নিশ্চেষ্ট হইয়া বিপ্রধর্ম্মের প্রতি লোলুপ হইলেন, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইলেন। দর্শনশাস্ত্র প্রভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্রাহ্মণের যাজন-কার্য্য সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ হইল। শাক্যসিংহ ক্ষত্রধর্ম্ম বিপ্রধর্ম্ম উভয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বর্ণভেদ এবং বিভিন্ন বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। রাজা, যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের উপরে কর্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন ; ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। বৌদ্ধের জয় হইল, ইহারা বৈদিক ভেদ উঠাইয়া দিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইলেন ; সৌর শৈব আদি নানা সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল। ভারতে বিরোধ বই আর কথা নাই। ব্রাহ্মণেরা নিজেই সুবোধ ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণকে বুদ্ধি দেন নাই। ক্ষত্রিয়েরা বিরোধপ্রিয় হইল। অনন্তর যবনাধিকার হইয়া পালা সাঙ্গ হইল।

বৌদ্ধগণ শূদ্রবর্ণ সম্বন্ধে বৈরাগ্যধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ কথা বুঝিবার জন্য দ্বিজ ও শূদ্রমধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এস্থলে এক বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, অতএব তাঁহাদের প্রমুখাৎ কর্ণ অপহরণের সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিজ ও শূদ্রের প্রাথমিক অবস্থা বুঝিবার জন্য, একদিকে সন ১৮৬৪ সালের পূর্ব্বে রুশিয়ার প্রকৃতিবর্গের অবস্থা কি ছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে তথাকার প্রজাবর্গের দশা কি ছিল, ইংলণ্ডের শ্রমজীবী এবং মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মধ্যে এখানকার সম্বন্ধ কিরূপ, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজাগণের অবস্থা কি, এই সমস্ত জানা আবশ্যক। আর, পক্ষান্তরে প্রাচীন কালের হাড়ি, ডোম, কেওরাদিগের কতদূর সম্বর্দ্ধনা করা সম্ভবপর ছিল, এক্ষণকার নেটিভ ষ্টেটের কৃষিবর্গের অবস্থা কি, এবং ব্রিটিশ রাজ্যাধীন জমিদার ও প্রজার মধ্যেই বা কি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এ সকল কথারও বিচার করা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, এত কথার বিচার এ প্রস্তাবে হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রবর্ণের যাজন অস্বীকার বিষয়ে দুটী কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে যখন কায়স্থগণকে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম হয় তখন ব্রাহ্মণবর্ণের আপত্তি ক-জন হিন্দুর পক্ষে কষ্টজনক মনে হইয়াছিল? আর এখন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কালেজ সাহেব-বৎসের অনুপযোগী বলিয়া পরিগণিত হওয়াতেই বা কাহারা হা হতোস্মি করিতেছে? দ্বিতীয় কথাটী আরো সহজ। তুমি যে স্কুলে তোমার পুত্রকে পড়িতে দেও তাহাতে হাড়ি ডোম ভর্ত্তি হয় শুনিলে তোমার মনে কোন ধিক্কার উপস্থিত হয় কি না? এখনও ময়রা কলুর সহিত একত্রে জুরিগিরি করিতে অনেক হিন্দু আপত্তি করিয়া থাকেন। অতএব পরশুরামের সময়ে শূদ্রবর্ণকে ব্রাহ্মণের যাজন হইতে বহিষ্কৃত করাতে ব্রাহ্মণের আচরণ এত অসহ্য মনে করি কেন? এই জন্যই বলিয়াছি কাকের উপরে কানহরণের দোষ দিবার পূর্ব্বে আপনা-আপনি কাণমলা খাওযাই বিধেয়।

যাঁহারা শূদ্র ও এতদ্দেশের প্রজাবর্গের অবস্থা মনে করিয়া সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা মনে করেন না যে ব্রাহ্মণের আশ্রয় ব্যতীত ইহাদিগের অনেককে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া দেহপাত করিতে হইত। যুদ্ধকার্য্য বলিলে ইংরাজিভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালিরা প্রায়ই মনে করেন যে, যাহার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা সে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য জীবন ত্যাগ করিবে ইহাতে দুঃখ কি। কিন্তু বাস্তবিক জীবন ত্যাগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যুদ্ধার্থিগণের মান অপমান, সুখদুঃখ পাপ পুণ্য যত হউক না হউক, তাহাদের পরিবারবর্গের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। আর স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধ করা কেবল উপকথা মাত্র। ইদানীন্তন সৈনিক পুরুষেরা গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ভিন্ন যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় না।

শূদ্র বর্ণের যুদ্ধে যাইতে হইত না; ঘরে বসিয়া পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ছিল না—এরূপ ব্যবস্থার প্রতি এতদ্দেশীয়

কৃষকেরা দোষারোপ করিবে না। কৃষকের সুহৃদবর্গ করিতে পারেন। যে সকল রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য আবশ্যক, তাহাদিগের মধ্যে আইনের বলেই সৈনিক নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণবর্ণের সুকৌশলেই বৈশ্য ও শূদ্রেরা যুদ্ধকার্য্য হইতে রক্ষিত হইয়াছে; যদি এতদ্দেশীয় প্রজাবর্গকে আইনের বিধানক্রমে যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইত, তাহা হইলে এদেশে এত শান্তি দৃষ্ট হইত না; এবং জমিদার ও প্রজার বিরোধস্থলে এতদ্দেশীয় ধর্ম্মঘটের ন্যায় সুমধুর দ্বন্দ্বের দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ হইত না। কখন বা আয়র্লণ্ডের ন্যায় জমিদারপাতন এবং কখন বা রুশিয়ার ন্যায় প্রজাক্ষয় হইত।

শূদ্রবর্ণের প্রাথমিক অবস্থা বিষয়ে আর একটী কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণা গ্রহণ না করিলে যাজন সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু যজমানের চিত্তের পবিত্রতা অনেক দূর সাধন হইতে পারে। শূদ্রের নিকট বেতন গ্রহণ না করিয়া যজন করাইলে শূদ্রযাজনের দোষ হয় না, অথচ শূদ্রের পারলৌকিক মঙ্গল আংশিকরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এরূপ প্রণালীর কার্য্যের প্রতি কোন নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং এই প্রণালী যে অবলম্বিত হয় নাই তাহার হেতু শূদ্রগণের হীনাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফলতঃ শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে অনেক উন্নত করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে বৌদ্ধদিগের সময়ে শূদ্রগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইত না।

তথাচ শূদ্রের উন্নতি বৌদ্ধ হইতেই, এ কথা ভক্তিভাবে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিভেদ বিনষ্ট হওয়াতেই শূদ্রসম্প্রদায়ের উন্নত ব্যক্তিরা ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করেন। এ বিষয়ে বৌদ্ধবিদ্রোহ মুখ্য কারণ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি উপেক্ষা করা যায় না, কেন না, বৌদ্ধের দেখাদেখি হউক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, ব্রাহ্মণেরাও ক্রমশঃ বেদ ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রে শূদ্রের অধিকার স্থির করিয়া দেন। বৈদিক দীক্ষা, বৈদিক যজ্ঞ, বৈদিক মন্ত্রপাঠ শূদ্রের অনধিকৃত বটে, কিন্তু পৌরাণিক দীক্ষা ও পৌরাণিক পূজা আদি হইতে স্মৃতি, দর্শন, কাব্য, এবং ইতিহাস অধ্যয়ন পর্য্যন্ত বোধ হয় পুরাণ এবং তন্ত্রও পাঠ্য বটে, কিছুতেই শূদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই।

এতদ্ভিন্ন শূদ্রগণ কথকতা শুনিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। পুরাণ পাঠের নিয়ম কত দিন হইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু বৌদ্ধেরা রাত্রিকালে দেশভাষাতে "বন" (কথা) পাঠ করিতেন এবং তাহা শুনিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইত। (Hardy's Eastern monachism, pp. 232-237. Beal's

Fah-Hian, CH. XVII. P. 62) পুরাণাদি, উপনিষৎ ও বেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু শূদ্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বর্ণভেদের অনেক ব্যত্যয় হয়, অথচ উহার নিগূঢ় দোষের কোন অপনয়ন হয় নাই। ইহার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মকে দোষ দিই না, কিন্তু স্বরূপ কথাটী বুঝা আবশ্যক। সংসারের কার্য্যভেদ অনুসারে সম্প্রদায়ভেদ সংস্থাপন করা দোষের বিষয় নহে, এবং বৃত্তিভেদ অনুসারে সম্প্রদায়েব ন্যূনাতিরেক করাও সঙ্গত বটে। বর্ণভেদের প্রধান দোষ এই যে, যে ব্যক্তি যে বৃত্তিব যোগ্য সে তাহা অবলম্বন করিতে পায় না। বর্ণভেদ বংশানুক্রমে নির্দ্ধারিত হয় বলিয়াই এত বিপত্তি ঘটিতেছে। কিন্তু ইহাব প্রকৃত হেতু দুইটি। প্রথম, লোকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষার অসুবিধা। দ্বিতীয়, একান্নবর্ত্তী পবিবারের মধ্যে পিতৃপৈতামহিক বৃত্তি শিখিবার সুযোগ। ইদানীন্তন কালেজ ও স্কুল দেখিয়া সকলে মনে করেন, যে অধ্যাপন, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিযারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শিক্ষা করা অতি সহজ। কিন্তু এক সময়ে কেবল চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেব আশ্রয়ে থাকিয়া এবং অধ্যাপকের ও পবস্পবের জন্য ভিক্ষা আদি কবিয়াই ছাত্রবর্গের পঠদ্দশা যাপন কবিতে হইত। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর বড় কেহ সাহসী হইতেন না। ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিয়া সন্ততিবর্গকে সুশিক্ষিত কবিতেন। অন্যান্য সকলে আপনাপন গৃহে পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা ইত্যাদি জ্ঞাতিবর্গের নিকট ব্যবসায় শিখিত; ছাত্রগণ জ্ঞাতিবর্গেব ব্যবসায়ই অবলম্বন করিত। যে সকল দেশে একান্নবর্ত্তী পবিবাবের নিয়ম অনেক দিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে এপ্রেন্টিস্ এবং গিল্ড্ বিষয়ক ব্যবস্থা দ্বাবা শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা বর্ণভেদ অপেক্ষা যে কত অপকৃষ্ট তাহা বলা যায় না।

অতএব বর্ণসমূহের শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ রূপান্তরিত করিয়া এবং রোগী সেবার নিমিত্ত হাসপাতাল করিয়া বৌদ্ধেরা যতই উপকাব করুন, এবং চীন রাজ্যে তাঁহারা শিক্ষাকার্য্য বিষয়েও যতই উন্নতি করুন, * তাঁহারা এখানে বর্ণভেদের

* এতদ্দেশের গুরুমহাশয়ের পাঠশালা কি বৌদ্ধগণের সৃষ্টি ?

"The respective nobles & land-owners of this country (Patna) have founded hospitals within the city to which the poor of all countries, the destitute, cripples and the diseased may repair (for shelter.)

Fah-Hian, CH, XXVII.

নিগূঢ় দোষ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, এতদ্দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা বদ্ধমূল হইয়াছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সহস্র দোষ স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, ইহাতে গৃহস্বামী এবং উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা বিস্তর ত্যাগ স্বীকার না করিলে কুপোষ্য প্রতিপালন হয় না। কুপোষ্যগণ স্বাবলম্বী হইলে সকল দোষ দূর হয় বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে সে পর্য্যন্ত পোষ্টৃগণের বৈরাগ্য ব্যতীত পোষ্যগণেব উপায়ান্তর নাই। কুপোষ্যকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য শ্মশানবাসী করা আবশ্যক কি না এ কথা বিচার সাপেক্ষ। আমি সহসা এ কথাতে মত দিতে পারি না। ইদানীন্তন ইংরাজি শিক্ষা হইতে কুপোষ্যের স্বাবলম্বন বৃদ্ধি হইয়াছে কি না সন্দেহের স্থল, কিন্তু পোষ্টৃবর্গের পবার্থপরতা এবং বৈরাগ্যের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। ভারতবাসী বৌদ্ধেরা এতদূব বাড়াবাড়ী করিতে পারেন নাই। সুবর্ণবণিকদিগের এ বিষয়ে দুর্নাম আছে, এবং তাঁহাদিগেব উপদেশ, বোধ হয়, জৈনশ্রেষ্ঠীগণ হইতে লব্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহাবাও বাঙ্গালি সাহেবদেব নিকট পরাজয় স্বীকাব কবিবেন।

এখন আদ্যোপান্ত সমালোচনা কবিলে প্রকাশ হইবে যে, ব্রাহ্মণেবা স্বয়ং যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণকে যুদ্ধকার্য্য হইতে রক্ষা কবিয়াছেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারেব ব্যবস্থা করিয়া সকল কর্ম্মঠ লোককে কুপোষ্যপালন বিষয়ে বৈরাগ্য শিখাইয়াছেন। বর্ণভেদেব ব্যবস্থা দ্বারা হীনবর্ণস্থ লোক সকলকে আজ্ঞাবহন বিষয়ে সুশিক্ষিত কবিয়াছিলেন এবং পরে বৌদ্ধগণের দেখাদেখি শূদ্রবর্ণের শিক্ষা বিষয়েও কতকদূর উদ্যোগী হইয়াছেন। বৌদ্ধেরা বেদ অবজ্ঞা করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করেন, কিন্তু বিপ্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের প্রভেদ লোপ কবিয়া নানা বিশৃঙ্খলা ঘটান। শিক্ষাকার্য্য বিষয়ে তাঁহারা কতক উন্নতি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না।

শ্রীযো—

"They (the hospitals) were probably first instituted by Asoka as are read in the Edicts ..These are distinctively Buddhist. The hospices founded by Brahmans (পুরাণ্ৎ. p. 82) were houses of shelter & entertainments for travellers rather than places for the restoration of the sick." Beal, p. 107.
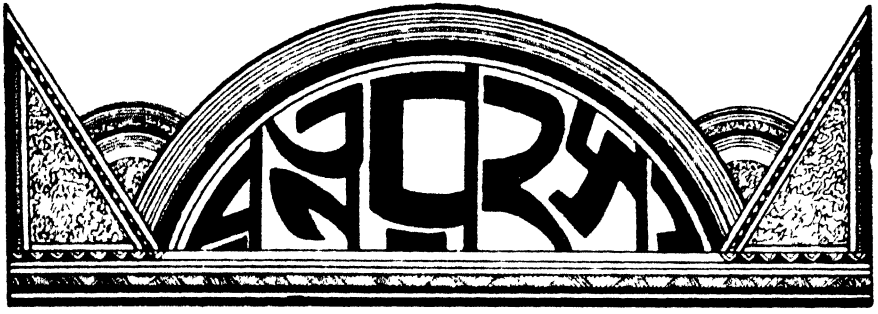
উপরত্ন

প্রধান ও বহুমূল্য রত্নসম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপরত্ন সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

উপরত্ন—অর্থাৎ মণিতুল্য কাচাদি। "উপমিত রত্নেন" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কাচ ও অন্যান্য প্রকার সামান্য মূল্যের প্রস্তর সকল উপরত্ন বলিয়া গ্রাহ্য। কৃষ্টাল্ ও পোক্‌রাজ প্রভৃতি পাথর—যাহা প্রায় রত্নতুল্য—সে সমস্তই সংস্কৃতশাস্ত্রে উপরত্ন নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালে মুক্তাশুক্তি, অর্থাৎ মুক্তার ঝিনুক ও শঙ্খকেও সামান্যাকারে রত্ন নামে গৃহীত হইত। এই জন্যই ভাব প্রকাশ বলিয়াছেন, যে—

"উপরত্নাণি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈবচ।
মুক্তাশুক্তি স্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥"

কাচ, কার্পূরাশ্ম, অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর, (ইহাকেই অধুনা মার্ব্বেল বলিয়া থাকে) মুক্তাশুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি বহুপ্রকার উপরত্ন আছে। সেই সকল উপরত্ন প্রায় রত্নতুল্য গুণসম্পন্ন। জাতারত্ন অপেক্ষা উপরত্নের গুণ অল্প বলিয়া সেই সেই উপরত্নকে সতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

"গুণা যথৈব রত্নানাং উপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিত্ততো হীনা বিশেষোহয় মুদাহৃতঃ॥"

উপরোক্ত ভাবপ্রকাশের বচনে "কাচ" শব্দ দেখিয়া কাচের প্রাচীনত্ব পক্ষে সংশয় জন্মিতে পারে, একারণ অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও দুই চারিটি কাচ শব্দের উল্লেখ প্রদর্শিত হইল।

আজকাল কাচের উন্নতি দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, যে কাচ ইংরাজজাতীর অবিষ্কৃত বস্তু। বস্তুতঃ তাহা নহে। অন্যূন ৩০০০ তিন

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশে কাচের ব্যবহার ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত সময়ের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না ইহাও জানা যায়। পঞ্চতন্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, "কাচঃ কাঞ্চন সংসর্গাৎ ধত্তে মারকতীং দ্যুতিম্।" এই উল্লেখটী পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন "আকারে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ?" এই বচনটীও বহু প্রাচীন। শুশ্রুত নামক প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থেও কাচের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

"পানীয়ং পানকং মদ্যং মৃণ্ময়েষু প্রদাপয়েৎ।
কাচ স্ফটিক পাত্রেষু শীতলেষু শুভেষু চ॥"

জল, সরবৎ ও মদ্য, মৃণ্ময়পাত্র, কাচপাত্র ও স্ফাটিকপাত্রে ব্যবহার করিবে। এই সকল পাত্র শীতল ও শুভ অর্থাৎ দোষাবহ নহে।

"অনুশস্ত্রাণি তু ত্বক্সার স্ফটিক-কাচ কুরুবিন্দাঃ।"

শুশ্রুত ঋষি শস্ত্রচিকিৎসা প্রকরণে বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের উল্লেখ করিয়া অবশেষ কতকগুলি অনুশস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্বকসার, অর্থাৎ বাঁশের চ্যাচাড়ি, স্ফাটিক, কাচ, কুরুবিন্দ নামক প্রস্তরই প্রধান। এই দ্রব্যের দ্বারা আংশিক শস্ত্রকার্য্য সমাধা হয় বলিয়া অনুশস্ত্র আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্যাপি পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামের দাই, বাঁশের চ্যাচাড়ি দিয়া নবপ্রসূত শিশুদিগের নাড়ী-ছেদ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

অনেকের ভ্রম আছে, যে, "প্রাচীনকালে কাচ ছিল না। যেখানে যেখানে কাচের উল্লেখ আছে—তাহা কাচ নহে। তাহা স্ফাটিক। বর্ত্তমান ক্ষারসম্ভূত কাচ তখন কেহই বিদিত ছিল না।" একথা যে নিতান্তই ভ্রমোচ্চারিত তাহা উপরোক্ত শ্লোকে কাচ ও স্ফাটিক পৃথক্‌রূপে উল্লিখিত থাকায় সপ্রমাণ হইতেছে। ক্ষারসম্ভূত কাচ যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল এবং কাচের প্রকৃতি যে ক্ষার তাহা নিম্নলিখিত মেদিনীকোষের উল্লেখ দেখিলে সপ্রমাণ হয়।

"ক্ষারঃ পুং লবণে কাচে।"

লবণ ও কাচ অর্থে ক্ষার শব্দ পুংলিঙ্গ। মেদিনীকারের মতে ক্ষার ও কাচ, নামে মাত্র ভিন্ন, বস্তুতঃ পদার্থ এক। সুতরাং উত্তম বুঝা গেল যে, প্রাচীন কালের লোকেরা কাচের প্রকৃতি বা উপাদান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। এতদ্ভিন্ন আমরা কাচের "ক্ষারমণি" নামও প্রাপ্ত হইয়াছি। চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক

বাৎস্যায়ন মুনি যে ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া ছাত্রবর্গের মহোপকার করিয়াছেন, ব্যাসশিষ্য অক্ষপাদ ঋষিকৃত সেই ন্যায়সূত্রেও কাচের উল্লেখ আছে। যথা—

"অপ্রাপ্য গ্রহণং কাচাভ্রপটল
স্ফটিকান্তরিতো পলব্ধেঃ।" (৪৪ সূত্র)

এই সূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনির্ণয় প্রসঙ্গে লিখিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় যে কাচ, অভ্র ও স্ফটিক ভেদ করিয়া গিয়া তদন্তরালস্থ বস্তুকে গ্রহণ করে, এ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। সুতরাং কাচ আর স্ফটিক যে বিভিন্ন পদার্থ এবং তাহা ৩০০০ তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে লোকেরা বিদিত ছিল—ইহা বলা বাহুল্য। মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে ভাবে আদর্শ ও দর্পনাদি শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কাচ বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। অত্যন্ত আদিম অবস্থায় এদেশে তীক্ষ্ণ লৌহ ও অন্যান্য ধাতু বিশেষকে প্রতিবিম্বপাতযোগ্য (পালিস্) নির্ম্মল করিয়া তাহাকে দর্পণ বা আদর্শ নামে আত্মমূর্ত্তি দর্শনার্থে ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু মহাভারতাদির সময় কাচ বা স্ফটিক দর্পণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অসুরগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্য স্বকৃত রাজনীতি গ্রন্থে "কাচাদেঃ করণং কলা।" ইত্যাদি ক্রমে কাচ প্রস্তুত করিবার উপদেশ করিয়াছেন, এতদনুসারেও কাচ এদেশের বহু প্রাচীন কৃত্রিম বস্তু।

প্রাচীন মিশর দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের নৃপতিগণের সমাধি উপরে নানা বর্ণের কাচের কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্ঞী হাতাসুর সময়ের নীল, লোহিত ও বিবিধ বর্ণের কাচনির্ম্মিত পানপাত্র, পুষ্পগুচ্ছাধার প্রভৃতি সম্প্রতি "ব্রিটিশ মিউসিয়মে" প্রেরিত হইয়াছে। এ সকল ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন, ইথোপিয়নরা কাচের আধারমধ্যে মৃতদেহ রাখিত, কিন্তু এপর্য্যন্ত মিশর দেশের প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ঐরূপ আধার দর্শন করেন নাই। আসেরিয়া নিমরুডের ধ্বংশ মধ্যে বিবিধ আকারের কাচপাত্র মৃত্তিকা মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন সময়ের কাচ প্রভাহীন ও স্বচ্ছ নহে। ইউরোপীয়গণ দ্বারা কাচের উৎকর্ষ সমাধিত হইয়াছে এবং প্রতিবৎসর ইহার উন্নতি হইতেছে। এমন কি, সম্প্রতি ভাইনায় কাচের কাপড় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। মিউনিচ্, নারেন্বর্জ, পারিশ, বারমিংহাম্, এডিন্বরা প্রভৃতি স্থানে কাচের উপর বিবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্ফটিক

ইহাও একপ্রকার প্রস্তর ও উপরত্ন। ইহার এক জাতি "সূর্য্যকান্ত মণি" নামে বিখ্যাত, এবং অন্য এক জাতি "চন্দ্রকান্ত" নামে প্রসিদ্ধ। যাহাতে সূর্য্যকান্ত কি চন্দ্রকান্তের গুণ নাই তাহা স্ফাটিক, স্ফটিক, স্ফাটিক, স্ফাটিকোপল, ভাস্বর, শানিপিষ্ঠ, ধৌতশিলা, সিতোপল, বিমলমণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমর রত্ন, নিস্তুষ রত্ন, শিবপ্রিয় ইত্যাদি নানা নামে খ্যাত। যাহার সংস্কৃত নাম সূর্য্যকান্তমণি, ভাষায় তাহাকে "আতস্ পাথর" বলে। গরুড় পুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু নামক গ্রন্থে এই স্ফটিক-উপরত্নের পরীক্ষাদি অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"যদ্গঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবি বিমলতমং নিস্তুষং নেত্রহৃদ্যং
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুর মতিহিমং পিত্তদাহাস্রহারি।
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাংনৈব জহ্যাং
তজ্জাত্যং স্ফাটিকং শুভ মুপচিনুতে শৈবরত্নক রত্নম্।"
(গরুড় পুরাণ।)

যাহা গোমুখনির্ঝরনিঃসৃত গঙ্গাসলিল ও বিন্দুতুল্য নির্ম্মল, নিস্তুষ, অর্থাৎ মিলন বিন্দু রহিত, নেত্রপ্রিয় (দেখিতে সুন্দর), স্নিগ্ধ, নির্ম্মল অন্তরাল, মধুর, হিমবীর্য্য, পিত্তদাহ-রক্তদোষহারী, যাহা কষ পাষাণে ঘর্ষণে স্ফুটিত হইলেও আপন নৈর্ম্মল্য ত্যাগ করে না,—তাহাই জাত্য স্ফটিক। এই শ্রেষ্ঠ শৈবরত্ন, অর্থাৎ স্ফটিক, যদি কদাচিৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত ব্যক্তির শুভ বৃদ্ধি হয়।

ইহার উৎপত্তিস্থান ও মূল্যাদি সম্বন্ধে গরুড় পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

"কাবের-বিন্ধ্য-যবন- চীন-নেপাল ভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ।
আকাশ শুদ্ধঃ তৈলাখ্যং উৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণাল শঙ্খধবলং কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতম্।
ন তত্তুল্যং হি রত্নানাং অথবা পাপ নাশনম্!
সংস্কৃতং শিল্পি না সদ্যো মূল্যং কিঞ্চিৎ লভেত্ততঃ।"

বলরাম ঠাকুর এক দানবের মেদ কাবেরী তীর সন্নিহিত প্রদেশ, বিন্ধ্যাচল প্রদেশ, যবন দেশ, চীনদেশ ও নেপাল দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই

আকাশতুল্য নির্ম্মল তৈলাখ্য মেদ হইতে স্ফটিকের জন্ম হইল। মৃণালও শঙ্খের ন্যায় ধবল কিন্তু তাহাতে অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ সম্মিশ্রণ আছে। রত্নের মধ্যে ইহার তুল্য পাপনাশক আর নাই। (এই সাধারণ স্ফটিকই অধুনা পোকরাজ নামে খ্যাত বলিয়া অনুমান হয়) শিল্পিরা ইহাকে সংস্কার করে, সেই জন্য তাহারা ইহার মূল্য পায়। বস্তুতঃ অসংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য অতি অল্প, সংস্কৃত স্ফটিকের মূল্য কিছু অধিক। যুক্তিকল্পতরুকার ভোজদেব বলেন যে, এই স্ফটিকের অন্য দুই জাতি আছে, তাহার বিবরণ এই।

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবি তটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্র সঙ্কাশং স্ফটীকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথা পরম্॥"

হিমালয় প্রদেশ, সিংহলদেশ, ও বিন্ধ্যাচল সমীপবর্ত্তী স্থান সমুদায়ে স্ফটিকের খনি আছে। তাহাতে নানা বর্ণের তুল্যকান্তি স্ফটিক উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু হিমালয়ে যে স্ফটিক উৎপন্ন হয় তাহা চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুভ্র এবং তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম সূর্য্যকান্ত ও অপর প্রকারের নাম চন্দ্রকান্ত। সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত স্ফটিকের লক্ষণ ও পরীক্ষা এইরূপ।

"সূর্য্যাংশু স্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্ন বেদিভিঃ॥
"পূর্ণেন্দুকর সংস্পর্শাৎ অমৃতং স্রবতে ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎকালৌ যুগে।"

যে স্ফটিক সূর্য্য কিরণে রাখিলে বহ্নি উদগীরণ করে তাহার নাম "সূর্য্যকান্ত স্ফটিক।" (ইহার নাম আতস্ পাথর)। আর যাহা চন্দ্র কিরণে রক্ষা করিলে জলস্রাব হয়, রত্নতত্ত্ববেত্তারা তাহাকে "চন্দ্রকান্ত স্ফটিক" আখ্যা প্রদান করেন। এই চন্দ্রকান্ত স্ফটিক কলিযুগে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে দুর্লভ। বোধ হয় এখন আর উহা জন্মে না। সুশ্রুত নামক বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,

"চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতম্।"
অশোক পল্লব চ্ছায়ং দাড়িমীবীজ সন্নিভম্।
বিন্ধ্যাটবি তটে দেশে জায়তে মন্দ কান্তিকম্॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে পদ্মনীলকে।
পদ্মরাগ ভবে স্থানে দ্বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ॥

অত্যন্ত নির্ম্মলং স্বচ্ছং প্রবতীচ জলং শুচি।
জ্যোতির্জ্বলনমাশ্লিষ্টং মুক্তা জ্যোতী রসং দ্বিজ।
তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্ত মুদাহৃতম্।
অনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভম্।”

বিন্ধ্যাবণ্য সমীপস্থ দেশ সমূহে যে স্ফটিক জন্মে তাহা অতি হীনকান্তি। তাহার বর্ণ অশোক পল্লবের এবং দাড়িম বীজের ন্যায়। সিংহলীয় স্ফটিক কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং তাহা “নীলম” নামক হীবকের খনিতে জন্মে। পদ্মরাগ মণির আকরে যে স্ফটিক জন্মে তাহা দুই প্রকার। তাহার এক প্রকারের নাম ‘রাজাবর্ত্ত’ ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম “রাজময়”। রাজাবর্ত্ত নামক স্ফটিক অতি নির্ম্মল, অন্তরাল স্বচ্ছ, জলস্রাবীর ন্যায়, জ্বলিত জ্যোতিঃসংযুক্ত ও মুক্তাকান্তির ন্যায় কান্তিমান। এইরূপ গুণযুক্ত স্ফটিক লোহিত বর্ণ হইলে তাহা “রাজাবর্ত্ত” আখ্যা ধারণ করে, এবং নীলবর্ণ হইলে “রাজময়” নাম প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, “আকারে পদ্মরাগাণাং জন্মকাচ মনেঃ কুতঃ?” এই পুরাতন বাক্যে “কাচমণি’ শব্দের অর্থ স্ফটিক নহে। প্রকৃত কাচকেই কাচমণি শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ্মরাগ-আকরে স্ফটিক উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কাচ উৎপন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাচমণি শব্দের প্রকৃত অর্থ, মণি সাদৃশ কাচ, অর্থাৎ সে কাচ আর স্ফটিক দৃশ্যতঃ প্রায় একরূপ। সুতরাং অনুমিত হইতেছে যে উক্ত বচনের উৎপত্তিকালে অতি পরিস্কার কাচ উৎপন্ন হইত।

রাজপট্ট নামক এক প্রকার হীরক আছে। তাহারও মূল্য অল্প বলিয়া উপরত্ন মধ্যে গণ্য। ‘রাজপট্টং বিরাটজম্” বিরাট দেশোৎপন্ন অল্প মূল্যের হীরককে রাজপট্ট বলে। “উপলানি বিচিত্রানি নানাবর্ণান্যনেকধা। দৃশ্যন্তে রত্ন কল্পানি তেষাং মূল্যং নকল্পয়েৎ।” অনেক বর্ণের ও অনেক আকারের উপল দেখা যায়—তাহা দৃশ্যতঃ রত্নতুল্য হইলেও মূল্য সম্বন্ধে কোন বিধি নাই।

শ্রীরামদাস সেন।

অনেকের বিশ্বাস, জগৎ শেঠ একজন লোকের নাম। মার্শমান্ সাহেবের কল্যাণে এই কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা জগৎ শেঠকে একটা লোক বলিয়াই জানে। আমাদের স্কুলে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা হয় না, তাই এইরূপ দুই একটি ভ্রম থাকিয়া যায়। জগৎ শেঠ কোন মানুষের নাম নহে। একটি উপাধি মাত্র। শ্রেষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশে শেঠ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠি বৈশ্যদের উপাধি। হিন্দু রাজাদের অধিকারকালে বৈশ্যেরা ধনরক্ষকের কাজ করিতেন। অসময়ে তাঁহারা রাজাকে টাকা ধার দিতেন। মুসলমান নবাবদের অধিকার কালে সেই শেঠেরা ধনরক্ষক হন, সময়ে অসময়ে টাকা ধার দিয়া নবাবের সাহায্য করেন। এই সময়ে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ধনে, মানে, খ্যাতিতে, ইঁহারা এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেক জমিদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ক্ সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ন্যায় বিস্তৃত। ইহা অত্যুক্তি নহে। শেঠগণ ভারতবর্ষে ধনকুবের ছিলেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের "রথ্চাইল্ড" বলিয়া বর্ণিত হইতেন। এক সময়ে ইঁহারা আপনাদের ক্ষমতাবলে দিল্লীর আমখাসেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অর্থ, ইঁহাদের প্রভুভক্তি ও ইঁহাদের মন্ত্রণা অনেক সময়ে দিল্লীর বাদশাহকে রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত শেঠদিগের সংস্রব আছে। শেঠগণ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সেই নবাবেরই বিরুদ্ধে উঠিয়া, তাঁহাকে হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া, শ্বেতপুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহা দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মাড়য়ারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠ শ্বেতাম্বরীর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইঁহাদের আদিপুরুষ হীরানন্দ শাহ অর্থ উপার্জ্জন মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন।

হীরানন্দের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলেই ভারবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে আপনাদের কারবার চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম মাণিকচাঁদ। ইনি ঢাকায় আসিয়া বাস করেন। শেঠগণ এই মাণিকচাঁদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের স্থাপনকর্ত্তা বলেন। ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্য ব্যবসাযের স্থান। মাণিকচাঁদ এইখানে আপনাব ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালার নবাবী এই সময়ে মুর্ষিদ কুলি খাঁর হাতে ছিল। মাণিকচাঁদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্ষিদ কুলির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুর্ষিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্ষিদাবাদে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকচাঁদ মুর্ষিদাবাদে আইসেন। এইখানে তাঁহাব ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। মাণিকচাঁদ নবাবেব দক্ষিণ হস্ত হন। তাঁহাব পবামর্শ অনুসাবে রাজ্যেব সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহদশীলদার নবাব সবকারে রাজস্ব দিতেন, তাঁহাদেব সকলকেই মাণিকচাঁদেব হাতে টাকা দিতে হইত। ইহা ছাড়া দিল্লীতে প্রতি বৎসর যে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহাও মাণিকচাঁদেব হাত দিয়া যাইত। নবাব অনেক সময়ে নিজের টাকাকড়ি মাণিকচাঁদেব ধনাগাবে জমা রাখিতেন। মুর্ষিদকুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফিবোক্ শাহকে অনুবোধ কবিয়া ১৭১৫ অব্দে মাণিক চাঁদকে "শেঠ" উপাধি দেন। এই সময হইতে মাণিকচাঁদ ও তাঁহাব সন্তানগণ মুর্ষিদাবাদেব কৌন্সিলের প্রধান সভ্য হন। শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়েই ইঁহাদেব আধিপত্য থাকে। ইঁহাবা অনেক সময়ে অনেক বিষযে দিল্লীর দববারেব প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়া আপনাদের মতামত নির্দ্দেশ কবিতে থাকেন।

মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। ফতেচাঁদ নামে তাঁহাব একটি ভ্রাতৃপুত্রকে তিনি দত্তকপুত্র লন। ফতেচাঁদও "শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সম্রাট ফিরোক্ শাহ ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭২২ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদ তাঁহার পদ অধিকাব করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অব্দে ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট্ মহম্মদ শাহ তাঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দান করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, ফতেচাঁদ ফিরোক্ শাহের নিকট হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ফতেচাঁদই যে সকলের আগে "জগৎ শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফতেচাঁদের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দিল্লীর দরবারে তাঁহার বড় সুখ্যাতি। কোন সময়ে মুর্ষিদ কুলি খাঁ সম্রাটেব বিরাগভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবী পদ ফতেচাঁদকে দিবার কথা হয়। কিন্তু মুর্ষিদ কুলি খাঁ শেঠবংশের সহায় ছিলেন, এজন্য ফতেচাঁদ এই পদ

গ্রহণ করেন নাই; বরং সম্রাটের সহিত নবাবের মিল করিয়া দিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করেন। এ বিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফর্ম্মান প্রচার হয়, তাহাতে লেখা ছিল, "ফতেচাঁদের বিশেষ চেষ্টায় ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন হইলেন।" নবাব শাসনসংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেচাঁদের পরামর্শ লইতেন। এই সময় হইতে ফতেচাঁদের সন্তানগণ দিল্লীর দরবারে প্রসিদ্ধ হন। বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎ শেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত। বাদশাহের নিকট ফতেচাঁদ মণিখচিত একটী উৎকৃষ্ট সিল মোহর উপহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে "জগৎ শেঠ" উপাধি ক্ষোদিত ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই মোহরটী যত্নের সহিত রাখিয়া ছিলেন।

মুর্ষিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। ফতেচাঁদ সুজাউদ্দৌলার কৌন্সিলের চারি জন সভ্যের মধ্যে একজন সভ্য ছিলেন। এই নবাব ফতেচাঁদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ বৎসর বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফতেচাঁদ কৌন্সিলের পদ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শেষে সরফরাজের ইন্দ্রিয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে ফতেচাঁদ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব কহেন, ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ পরমা সুন্দরী ছিলেন। নবাব তাঁহার রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবকে এই অনুচিত কাজ হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। দুরাচার নবাব আপনার জিদ্ বজায় রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ফতেচাঁদ নিরুপায় হইলেন। যুবতী পুত্রবধূ নবাবের ঘরে প্রেরিত হইলেন। নবাব কিয়ৎক্ষণ মাত্র নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিলেন। যুবতী অকলঙ্কিত শরীরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় ফতেচাঁদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনী বধূ পরধর্ম্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে ফতেচাঁদ আপনাকে বড় অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান ও এ ক্ষোভ তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ফতেচাঁদ আপনার বংশের মঙ্গল বিধাতা মুর্ষিদ কুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ ছাড়িয়া আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মিশিলেন।

কিন্তু শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটী আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, মুর্ষিদ কুলি খাঁ মাণিকচাঁদের নিকট সাত কোটী টাকা গচ্ছিত

রাখিয়াছিলেন। এই টাকা আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পর সরফরাজ্ খাঁ এই টাকার জন্য ফতেচাঁদকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে কহেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বেহারে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদ এই অবসরে তাঁহাব সহিত মিশেন। এই বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠকেব অবিদিত নাই। গড়িয়ার যুদ্ধে সরফরাজ্ নিহত হন, এবং আলিবর্দ্দী, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

১৭৪৪ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুটী ছেলে, পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই, এক একটী পুত্র রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ পৌত্রের নাম স্বরূপচাঁদ। মহাতাব রায় "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধি পাইয়া, দুই জনেই একত্রে আপনাদের কারবাব চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শেঠ-দিগের বাণিজ্যলক্ষ্মীব বড় উন্নতি। কথিত আছে, তাঁহাদের মূলধন দশ কোটা টাকা হয়। ১৭৪২ অব্দে মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কব পণ্ডিত মুর্ষিদাবাদ লুঠিয়া লন। ইহাতে শেঠদিগেব আড়াই কোটী টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক (সযের মতাক্ষরীন প্রণেতা গোলাম হোসেন) কহিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকাব বিল দেখিবামাত্র টাকা দিতে পাবিতেন। প্রবাদ আছে, শেঠরা ইচ্ছা করিলে টাকা সাজাইয়া সুতির নিকট ভাগীরথীর মুখ বুজাইয়া ফেলিতে পারিতেন। নবাবেব শাসনসময়ে টাকা রাখিবার জন্য দেশের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগাব ছিল না। জমীদারগণ রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্ষিদাবাদের ধনাগারে জমা করিয়া দিতেন। মুর্ষিদ কুলি খাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজস্বঘটিত বার্ষিক বন্দোবস্তের সময় সকল জমীদারকেই আপনাদের হিসাবাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মুর্ষিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন কাশীমবাজারের কুঠী আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

বার্টসন সাহেব, ১৭৬০ অব্দে যে বিবরণ লিখেন, তাহাতে জানা যায়, জগৎ শেঠ শত করা অর্দ্ধ মুদ্রা দিয়া মুর্ষিদাবাদের টাঁকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর্ সভা কলিকাতার কৌন্সিলের অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটী টাকাশাল স্থাপন করিবার অনুরোধ করেন, কিন্তু কৌন্সিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ

হন। এসম্বন্ধে তিনি ডিরেক্টরদের স্পষ্টাক্ষরে লিখেন, "আমরা নবাবকে যত টাকা দিব, জগৎশেঠ তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়া নবাবকে বশীভূত করিবেন। সুতরাং নবাবের নিকট হইতে টাঁকশাল স্থাপনের অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।" ইহার পর ডিরেক্টার সভার অধ্যক্ষ কলিকাতার কৌন্সিলকে জগৎশেঠের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে দিল্লীর দরবার হইতে অনুমতি আনিবার পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু জগৎশেঠের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই। ডগলাস্ নামে একজন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানীর টাকা লেনা দেনা ছিল। কলিকাতায় টাকশাল হওয়ার এক বৎসর পরে ডগলাস্ ইংরাজদের মুদ্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "জগৎ শেঠ মুর্ষিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে কম করিয়া আপনার কারবার চালাইবেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া ইংরাজদের মুদ্রিত সিক্কা টাকার মূল্য কম করিতে পারেন না।" শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও কেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা ইহাতে সুন্দর বুঝা যাইতেছে।

১৭৫৬ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই অবধি শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ বাড়িতে থাকে। নবাব সেরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে ইংরাজেরা পলাইয়া পলতার নিকট উপস্থিত হন, এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গূঢ় মন্ত্রণা করেন। এই সময়ে ইংরাজেরা জগৎ শেঠকে হাত করিবার চেষ্টা পান। ২২ এ জুন কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২ এ আগষ্ট কলিকাতার কৌন্সিল নবাবের সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব করেন।

মীরজাফর প্রভৃতি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পূর্ণীয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ শেঠের অসদ্ভাব জন্মে। জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়া নবাবকে দেন নাই, এই তাঁহার এক অপরাধ। তাঁহার আর এক অপরাধ, নবাব তাঁহাকে বনিকদের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন; কিন্তু জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। এই কথা শুনিয়া নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই কারণেই সিরাজের কপাল পুড়ে।

অপমানিত হইয়া মাহাতাব রায় ইংরাজদের সহিত মিশিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৭৫৬ অব্দের ২৩এ নবেম্বর কৌন্সিলের সভ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় পলতাতেই থাকিয়া গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুরোধে মেজর কিলপাট্রিক্ জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে এই লিখিত ছিল, "ইংরাজেরা সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য কেবল জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন। প্রকাশ পাইলে পাছে নবাব তাঁহাদের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রণজিৎ রায়কে কার্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার অনুমতি দিলেন। ১৭৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের যে সন্ধিপত্র অনুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়।

ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইংরাজদের আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই সময় শেঠেরা ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে ইংরাজদের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসিদ্ধ পলাশির যুদ্ধ। ১৭৫৭ অব্দের ৩০শে জুন (পলাশির যুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রকারিদের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এইখানেই শ্বেত ও লোহিত বর্ণ সন্ধিপত্রের মর্ম্ম বাহির হয়। এইখানেই উমীচাঁদের মাথায় বজ্র পড়ে।

ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু ইংরেজ দরবারে শেঠদিগের সম্মান ও সমাদর যে বাড়িয়া উঠে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শেঠদিগের মন্ত্রণা ও অর্থবলেই ইংরাজদিগের আধিপত্য লাভ হয়। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীর জাফর ও জগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায় আইসেন। কেবল নবাবের অভ্যর্থনার জন্য ইংরাজেরা ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। আর জগৎ শেঠের পরিচর্য্যার জন্য ১৭,৩৭৭ অর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

ইহার পর নবাব মীর কাসেমের সময়ে জগৎ শেঠ মহাতাব রায়ের কপাল ভাঙ্গিল। ইংরাজদের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মীর কাসীম তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে নবাব তাঁহাকে ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে আনেন। ইহাতে ইংরাজ গবর্ণর

১৭৬৩ অব্দের ২৪এ এপ্রিল নবাবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন, "আমি এই-মাত্র অলিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খাঁ ২১এ তারিখ রাত্রিতে জগৎ শেঠ ও স্বরূপচাঁদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে হীরা ঝিলে আনিয়া সৈন্যগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহাতে বড় বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি নবাবী পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে, আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়াছিল, যে আপনি শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের পরামর্শ লইবেন, এবং কখনও তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বা হৃতসর্ব্বস্ব করিবেন না। যখন আমি আপনার সহিত মুঙ্গেরে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এইভাবে আপনাকে অনেক কথা কহিয়াছিলাম, আপনিও শেঠদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে। আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সম্মান বিনষ্ট প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আমাদের দুর্ণাম করিবে। পূর্ব্বকার নবাবেরা কেহ কখন শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই অনুরোধ বিফল হইল। উদয়নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীর কাসেম ক্রোধে অধীর হইয়া পাটনায় ইংরাজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদও নৃশংসরূপে নিহত হইলেন।

মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলচাঁদ এবং স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম উদয়চাঁদ। বাদশাহ শাহ আলম্ কুশলচাঁদকে "জগৎ শেঠ" ও উদয়চাঁদকে "মহারাজ" উপাধি দিলেন। ইহারা উভয়েই একত্র হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন।

মীর কাসেম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের কনিষ্ঠপুত্র বাবু মিহিরচাঁদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় শেষে অযোধ্যায় উজীরের হাতে পড়েন। ইঁহাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিলে উজীর বহুসংখ্য অর্থ চাহিলেন! কুশলচাঁদ ও উদয়চাঁদ এজন্য ক্লাইবকে একখানি অনুনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়া আপনাদের দীনতা ও দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন, কিন্তু এই বিনয়পূর্ণ প্রার্থনায় ক্লাইবের হৃদয় গলিল না। ক্লাইব কঠোরভাবে ১৭৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন, "আমি যেরূপ যত্নের সহিত আপনাদের পিতার পক্ষসমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি যেরূপ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এখন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধারণের উপকারের জন্য আপনাদিগকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিতে হইবে, তাহা আপনারা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন না; এজন্য আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইতেছে। * * আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত ধন আপনাদের ঘরে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। * * আমি জানিয়াছি, যখন জমীদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের পাঁচ মাসের খাজনা বাকি রহিয়াছে, তখন আপনারা তাঁহাদের নিকট হইতে আপনাদের পিতার প্রদত্ত ঋণেব টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি কবিতে ত্রুটী করেন নাই। আমি কখনই এমন কঠোর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আপনাদের এই অর্থকামুকতাই শেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, এবং আপনারা সকল সময়ে সাধারণেব উপকারে উদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।"

শেঠেরা ইহাব পরবৎসব ইংবাজদের নিকট ৫০।৬০ লক্ষ দাবী করেন। এই টাকার ২১ লক্ষ, মীর জাফর ও কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মীর জাফবকে দেওযা হইয়াছিল। ক্লাইব এই ২১ লক্ষ টাকাব দেনা স্বীকাব কবেন এবং ইহা কেম্পানী ও নবাব উভযেই সমান অংশে শোধ কবিবেন বলিযা মত প্রকাশ কবেন। এই বৎসব কলিকাতাব কৌন্সিল শেঠদিগেব নিকট আবাব দেড় লক্ষ টাকা কর্জ্জ কবিতে উদ্যত হন।

ক্লাইবের যত্নে যখন কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশলচাঁদ জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কব হন। এই সময় কুশলচাঁদের বয়স আঠার বৎসর।

লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশলচাঁদ ইহা লইতে সম্মত হন নাই। কুশলচাঁদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকা ছিল। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কুশলচাঁদ জীবদ্দশায় আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান।

অনেকে অনুমান করেন, কুশলচাঁদের অপরিমিত ব্যয়েই শেঠদিগের দৈন্যদশা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার আর কয়েকটী কারণ আছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষে শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহাদের দুরবস্থা হয়। শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, কুশলচাঁদ বহুসংখ্য অর্থ মাটীতে পুঁতিয়া বাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা

কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং যেখানকার টাকা সেইখানেই রহিল।

ইহার পর শেঠদিগের অধঃপতনের কথা। এ কথা অতি সামান্য। কুশলচাঁদের পুত্র ছিল না। ইনি ভ্রাতৃপুত্র হরকচাঁদকে দত্তকপুত্র করেন। ইংরাজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না লইয়াই ইঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি দেন। হরকচাঁদের প্রথমে অর্থের বড় অসচ্ছল হইয়াছিল, শেষে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গোলাপচাঁদের সম্পত্তি পাইয়া কিছু সচ্ছল হন। হরকচাঁদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্রকামনায় কোন বৈরাগীর পরামর্শে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রচাঁদ "জগৎশেঠ" উপাধির অধিকারী হন। ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। গভর্ণমেণ্ট গোবিন্দচাঁদকে কোন উপাধি দেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহু মানিত "জগৎ শেঠ" উপাধি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রচাঁদের সঙ্গেই লোপ পায়। গোবিন্দচাঁদ কিছুদিন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মণিমুক্তা প্রবালাদি বেচিয়া দিন কাটান, শেষে কোম্পানী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত উপকার মনে করিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু সে কথা তুলিয়া আর কাজ কি?

যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বলা যায়। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধিধারী অনেক লোক বাস করে। ইহাদের সহিত মুর্ষিদাবাদের বিখ্যাত জগৎ শেঠের কোন সংস্রব নাই। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ ১৭৫১ অব্দের ৩০ এ মে কলিকাতার কৌন্সিলের সভাপতিকে লিখেন, "আমি শুনিলাম, রামকৃষ্ণ শেঠ নামে এক ব্যক্তি মুর্ষিদাবাদে কর না দিয়া কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি, এবং অনুমান করিতেছি, এই ব্যক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে। আমি আপনাকে লিখিতেছি, আপনি একজন চোপদার পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখিলাম, তদনুসারেই যেন কাজ হয়।" এই পত্র পাইয়া কৌন্সিলের অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন, রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়া দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানীর অনেক টাকা পাওনা আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না।" রেবারেণ্ড্ লঙ্গ্ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিয়াছেন, বোধ হয় এই সেই বংশীয়। কিন্তু বিখ্যাত জগৎ শেঠের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণ প্রসঙ্গে ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব উল্লেখ করিয়া-

ছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহাতাব রায় ও স্বরূপচাদ ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে দেড় কোটী টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগণ ইংরাজদিগকে অনেক টাকা দেন। ব্রিটিশ সৈন্যের তরবারি ও সঙ্গীনের ন্যায় জগৎ শেঠের মন্ত্রণা ও জগৎ শেঠেব অর্থ ইংরাজকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়াছে।

অষ্টম খণ্ড

১
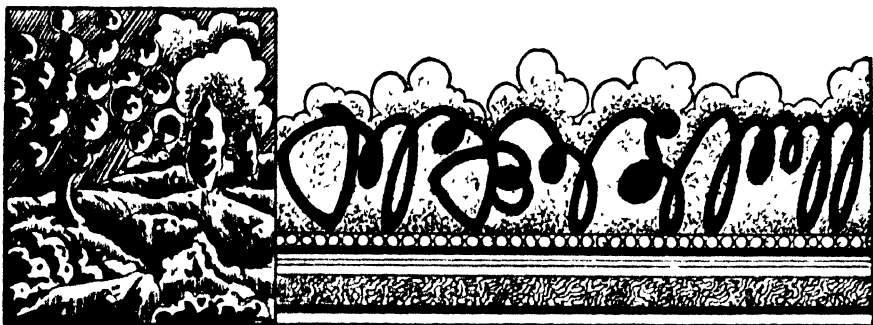
তিষ্যরক্ষা আবাব যে সেই হইল। যেন কিছুই জানে না; যেন কোন গোলযোগই ঘটে নাই, পূর্ব্বমত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইতে লাগিল, তিষ্যরক্ষা কুণালের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিল; বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য সে বড়ই উৎসাহবতী হইল। বাহিরে সব যেমন ছিল, তেমনি রহিল। কিন্তু সে ভুলিবার পাত্র ছিল না। এইরূপে মাসেক কাটিযা গেল। ত্রিশ দিনের দিন তক্ষশিলা হইতে দ্রুত অশ্বারোহণে দূত আসিল। তথায বিদ্রোহ হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কুঞ্জরকর্ণ বিদ্রোহীদেব নেতা।

পত্র পাইযাই বাজা অত্যন্ত বাস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটলীপুত্র নগরে যুদ্ধেব আয়োজন হইতে লাগিল। কামাবের দোকানে দিবারাত্রি ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল; বাশি বাশি তববারি প্রস্তুত হইয়া আযুধাগারে সংরক্ষিত হইতে লাগিল। বড বড বাঁশ কাটিয়া ধনুক নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। মণিপুব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, অঙ্গ, ওঢ্র, বিদেহ, সমতট প্রভৃতি প্রদেশেব করদ রাজাগণকে সুশিক্ষিত হস্তী প্রেরণের জন্য পত্র লেখা হইল। সহস্র সহস্র ঘোটকে বাজার অশ্বশালা পূবিয়া যাইতে লাগিল। হ্রেষারবে দিঙ্‌মণ্ডল পবিপূর্ণ হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র সূত্রধর দিবানিশি বথ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পাটলীপুত্র বন্দরের সমস্ত আহারীয় দ্রব্য যুদ্ধার্থ কৃত হইতে লাগিল। নানা দেশীয় বীবগণকে সৈন্য ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হইল। সৈন্যেরা নগরপ্রান্তরে সর্ব্বদা যুদ্ধ অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং যুদ্ধের উপকরণ বহিবার জন্য অযুত অযুত শকট ও অযুত অযুত নৌকা আনীত হইতে লাগিল। দেশের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এ দিকে তক্ষশিলা হইতে দূতের পর দূত আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা। আজি এ গ্রাম, আজি ও গ্রাম, আজি সে গ্রাম,

বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল সমস্ত দেশের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, বৌদ্ধ-দেবায়তন সকল উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতেছে। সংবাদ আসিতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে বৌদ্ধদিগকে ধরিয়া বলি দিতেছে। সমস্ত উদ্যোগ সমাধা হইলে রাজা, মন্ত্রী, ও প্রধান পারিষদবর্গ সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে বসিলেন। রাজা প্রিয়পুত্র কুণালকে ছাড়িয়া দিতে একান্ত অসম্মত। কিন্তু মন্ত্রী যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে, কুণাল বৌদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। দ্বিতীয়, তিনি বীর। তৃতীয়, তিনি কষ্টসহিষ্ণু। তিনি সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। চতুর্থ, যে সমস্ত জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা কুণালের একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণবশতঃ কুণালই এই বিদ্রোহ শান্তি নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন। রাজাও অন্য উপায় না দেখিয়া কুণালকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মন কেন এরূপ ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

২

কুণাল সেনাপতি হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যে ত্রিশরণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, সেই ত্রিশরণের কার্য্যসিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে জীবন গেলেও ক্ষতি নাই। তিনি আবার ভাবিলেন যে এই সুযোগে তিনি পাপীয়সী তিষ্যরক্ষার চক্র হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্য পরিত্রাণ পাইবেন। একবার কাঞ্চনমালার কথা মনে পড়িল। কাঞ্চন-মালাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া একবার বড়ই কষ্ট হইল। আবার ভাবিলেন, কাঞ্চনমালা যেরূপ মহৎ কার্য্যে ব্রতী আছে, যে কার্য্যের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে যে আমায় যাইতে বাধা দিবে তাহা বোধ হয় না। যদি আমি না থাকায় তাহার কিছু কষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকে আমার সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া যাইব। যে সমস্ত কার্য্য লইয়া তাহার জীবন, যে সকল কাজ সে এত ভালবাসে, তাহা পাইলে সে নিশ্চয়ই দিন কতকের মত আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে।

৩

কাঞ্চনমালা যখন শুনিলেন কুণাল সেনাপতি হইয়াছেন, তখন তাঁহার মন হর্ষে ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী পশ্চিমাঞ্চলে বিলুপ্তপ্রায়

সদ্ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবেন, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আবার যখন সে দিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, যখন সেই ফুল চুরির উৎকণ্ঠার কথা মনে পড়িল, যখন কঞ্চুকীর আগমনে নানা অনিমিত্ত দর্শনের কথা মনে পড়িল, তখন তিনি ভাবিলেন, এত কাল যে অমঙ্গলের ভয় করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি সেই অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু এই মহৎ কর্ম্মে স্বামীকে বাধা দিতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি একবারও "না" এ কথা বলিতে পারিলেন না।

কুণাল বিদায় হইতে আসিলে তিনি উহাকে নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিলেন। পরে বুদ্ধদেব যশোধরাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় যে গান করিয়াছিলেন, সেই গান গাহিলেন—বলিলেন—

"ভগবান যেরূপ যশোধরাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া লোকহিত-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ সদ্ধর্ম্মের হিতে সিদ্ধকাম হও। আমি এখানে যে ভাবে আছি এই ভাবেই থাকিব। কিন্তু আমায় অনুমতি দিতে হইবে যে, এই সময়ে একবার গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

কুণালও কাঞ্চনমালার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমতি রহিল।' এই বলিয়া হাসিমুখে অথচ সজলচক্ষে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যমণ্ডলীর অগ্রবর্ত্তী হইতে চলিলেন। কাঞ্চনমালা দেখিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়নপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। যখন কুণালের অশ্ব আর দেখা গেল না, তখন কাঞ্চনমালা সত্বরপদে আবার সেই শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন অগণ্য রণপোত এক তালে দাঁড় ফেলিয়া যাইতেছে। মাঝিরা ও আরোহীরা সমস্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক অশোক রাজার জয় গান করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাদের জয়ধ্বনিতে নৌকার দাঁড়ের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার প্রশান্ত গম্ভীর শব্দ হইতেছে। সে শব্দে ভীরু লোকেরও সাহস উদয় হয়। নৌকার মাস্তুলে মাস্তুলে শ্বেত, নীল, পীত, হরিদ্রাদি নানা রঙ্গের পতাকা সকল শোভমান হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে পতাকা সকল প্রতাড়িত হইয়া দুলিতেছে—যেন বলিতেছে শত্রুগণ পলায়ন কর, আমাদের সঙ্গে পারিবে না। কাঞ্চনমালা আর একদিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তক্ষশীলাযায়ী রাজবর্ত্ম পরিপূরিত করিয়া সৈন্য সমূহ চলিতেছে। কোথায়ও ভেরী, তুরী, কাড়া, পাড়া, দামামা, দগড়া বাজাইয়া পদাতীগণ চলিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড মেঘ-খণ্ডের ন্যায় হস্তীসমূহ ধূলিপটলে আবৃত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর একতা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগের শাণিত তরবারিতে ক্ষীণ সূর্য্যা-লোক পড়িয়া ক্ষীণ চাকচিক্য বিকাশ করিতেছে—যেন গাঢ় মেঘে ক্ষীণ বিদ্যুৎ

উঠিতেছে। কোথায়ও দেখিলেন, অশ্বসমূহ লাল, নীল, পীত, সবুজ নানাবর্ণের পৃষ্ঠাবরণে শোভিত হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর প্রকাণ্ডকায় বীরসকল শব্দায়মান বর্ম্মকবচাদি ধারণ করিয়া "আমি অগ্রে যাইব", "আমি অগ্রে যাইব" বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিতেছে।

আর এক স্থানে দেখিলেন, রথসমূহ দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া চলিতেছে। রথের অশ্ব সকল সারথি কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বায়ু অপেক্ষাও বেগে ধাবিত হইতেছে। দেখিলেন, রথের পতাকা সকল হেলিতেছে ও দুলিতেছে। এই দিগন্তব্যাপী রথমণ্ডলীর মধ্যে দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড রথ, উহার অভ্রভেদী ধ্বজ, চীনাংশুক নির্ম্মিত চারুপতাকা। রথে স্বর্ণময় কিঙ্কিণী সকল সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। কাঞ্চনমালা দেখিয়াই জানিলেন যে, এই কুণালের রথ। কাঞ্চনমালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বায়ু অনুকূল, আকাশ নির্ম্মেঘ, চারিদিকে বলাকা উড়িতেছে। দেখিলেন, আকাশে চাতকপক্ষী মদভরে শব্দ করিতেছে। এই সকলের মধ্যে কেবল একটী জিনিষ দেখিয়া তাহার কিছু উৎকণ্ঠা হইল। তিনি দেখিলেন, কুণালের অভ্রভেদী ধ্বজের উপর একটী শকুনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নবম খণ্ড

১

প্রথমে পাটলীপুত্র হইতে কুণালের যুদ্ধযাত্রা সংবাদ তক্ষশীলা প্রদেশে পৌঁছিল। তৎকালে তক্ষশীলা প্রদেশ প্রায় দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ নিজে ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধবিদ্বেষী, সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধদ্বেষীগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শ করিল, আপনাদের দ্বারা যে সমস্ত দেশ আয়ত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজার সৈন্য উপস্থিত হইলেই প্রজারা রাজার সহিত যোগ দিবে। অতএব রাজার অধিকৃত দেশেই যুদ্ধ আরম্ভ করা উচিত।

এই পরামর্শের পর এক লক্ষ রণদর্পিত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তক্ষশীলা প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অশোক রাজার রাজ্যমধ্যে আসিয়া কুণালের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৈন্য শিবিরের চারিদিক খাত করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ তাহারা শুনিতে পাইল, কুণাল অল্প সংখ্যক কিন্তু বীরপূর্ণ সৈন্যের সহিত পশ্চাৎ ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কুণাল শত্রুদের শিবিরসন্নিবেশের বিষয় চরমুখে বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি কতকগুলি দ্রুতগামী অশ্ব এবং হস্তী আপন সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা অনেকদূর ঘুরিয়া শত্রু শিবিরের প্রায় পাঁচ সাত ক্রোশ পশ্চাদ্ভাগে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে লাগিল। কুণাল সৈন্যদের প্রতি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন শত্রুদের রসদাদি যেন বন্ধ করা না হয়। দেশের লোক আমাদের পক্ষীয়, অতএব তাহাদের প্রতি যেন কোন উৎপাত করা না হয়। সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে, তোমরা কোথায় আছ তাহা যেন শত্রুরা টের না পায়। কুণাল এই সময়ে কেবল আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যুদ্ধের জন্য কোন ব্যস্ততাই প্রদর্শন করিতেন না। সেনাপতিরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "যুদ্ধের বিলম্ব আছে"। আর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বিলম্বে সৈন্যগণ ক্রমে বড়ই অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে কুণাল হঠাৎ আজ্ঞা করিলেন, "অদ্য বৈকালে যুদ্ধ।" সৈন্যগণ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল।

২

শত্রুরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিযাছিল যে, কুণালের অধিকাংশ সেনা তাহাদের সম্মুখে আছে। সুতবাং আশঙ্কা করিয়াছিল নিশ্চয সম্মুখে যুদ্ধ হইবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন পশ্চাদ্ভাগ হইতে কুণাল পদাতি ও অশ্বারোহীব সহিত ভীম পবাক্রমে আক্রমণ কবিলে তাহাবা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া বহিল। পরে তাহাবা দুই ভাগ হইয়া একভাগ ফিবিয়া কুণালেব সহিত যুদ্ধ করিতে গেল ও অপর ভাগ শিবিরে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীরা প্রায়ই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। পুরুষানুক্রমে তাহারা কখন রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা যখন অসমসাহসে কুণালের সৈন্য আক্রমণ করিল, তখন বৌদ্ধ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু কুণাল স্বয়ং রথোপবি হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দার্ঢ্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"ধর্ম্মের জয়! ব্রাহ্মণ কখনই জিতিবে না।"

তথাপি কুণালসৈন্য ক্ষত্রিয়দিগের রণে স্থির থাকিতে পারিল না। অনেক শত বৌদ্ধ রণে নিহত হইতে লাগিল। কিছু পরে দৈব বৌদ্ধদের সহায় হইলেন। পশ্চিমাকাশ সহসা গাঢ় নীল হইয়া ভীমবেগে আঁধি উঠিল। পশ্চিমদিক হইতে যে ঝড় বহিতে লাগিল, সেই বায়ুতে পৃথিবীস্থ ধূলি আকাশে উত্থিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিল। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কুণালের সৈন্য পশ্চিমে, তাহাদের মুখ পূর্ব্বদিকে; ব্রাহ্মণ সৈন্য পূর্ব্বে—তাহাদের মুখ পশ্চিম

দিকে। সুতরাং এই আঁধির সমস্ত ধূলি আসিয়া ব্রাহ্মণ সৈন্যের নয়নে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু কুণালের সৈন্যের কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। তখন কুণাল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সৈন্যগণ! বৌদ্ধগণ! ধর্ম্ম আমাদের অনুকূল, বুদ্ধ আমাদের অনুকূল, আঁধি থাকিতে থাকিতে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজিত কর।" ঝঞ্ঝা বায়ুর সহিত অসির ঝনঝনা বিদ্রোহী সৈন্যের বিষম ভয় উৎপাদন করিল। তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—কে স্বদল কে বৈরী কিছুই চিনিতে পারে না, সুতরাং ভ্রমে আপনাদের সৈন্য আপনারা কাটিতে লাগিল। কুঞ্জরকর্ণ ইহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু কুণাল তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, এবং কৌশলে আপনার সেনা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। পরে যখন আঁধি ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বিদ্রোহীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সেই সময় কুণালের সেনা সদর্পে ঘোর হুঙ্কার করিয়া তাহাদের উপর পড়িল। কুঞ্জরকর্ণ দেখিলেন সৈন্যেরা পলায়নমুখ, তাহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য। ক্রমে অশ্বে, হস্তীতে, মানুষে, ঢালে, তরবারীতে, ধূলায় আর ভয়ে, ব্রাহ্মণশিবিরে একটা ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল।

কুণাল অমনি এই সুযোগে পলায়নপর শত্রু ও শত্রুশিবিরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন বীর সৈনিককে অশ্বারোহণে দ্রুতগতি উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ অল্প প্রাণিহত্যার জয়লাভে তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। কুণালের পর অনেকেই আঁধির আশ্রয়ে জয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রাণি-হিংসা নিবারণার্থ উহার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যবন ও মুসলমান পশ্চিম হইতে আসিয়া অনেকবার জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই জানেন যে, আঁধি তাঁহাদের অনুকূল, আর হিন্দুর প্রতিকূল ছিল। এই আঁধিতেই হিন্দুকে বরাবর পরাজিত করিয়াছে। নহিলে বুদ্ধি ও ভুজবলে কাহার সাধ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমকক্ষ হয়।

৩

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। দুই দিকের শত্রুসৈন্যের মধ্যে অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া কুণালের কিছু মাত্র ত্রাস জন্মিল না। তিনি সমস্ত রাত্রি স্বয়ং প্রহরীর কাজ করিতে লাগিলেন, এবং "ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয়, বুদ্ধের জয়" বলিয়া তাহা-দিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রভাত হইবামাত্রই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে অশ্বারোহী দিগকে তিনি পলায়নপর হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা কয়েকজন প্রধান বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বন্দীরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রাজবিদ্রোহী কুঞ্জরকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কুঞ্জরকর্ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে এমনি নিঃশঙ্ক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন সেই প্রকৃত বিজেতা। কুণাল তাহাকে একজন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ অশোককে এই যুদ্ধের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। এবং কুঞ্জরকর্ণের প্রতি কি আজ্ঞা হয় জানিতে চাহিলেন।

৪

তৎপর দিনে সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া হিন্দুশিবির ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন কুণাল বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে তক্ষশিলা রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তক্ষশিলা রাজ্যে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। কুণাল ভগ্ন মঠায়তন সকল পুনর্নির্ম্মিত করিতে লাগিলেন। অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, আবার নির্ভয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই কুণাল বিদ্রোহীদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। কাঞ্চনমালাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া তিনি যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষভাগে লিখিলেন, "বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ যুদ্ধে আহত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে, আমি তাহাদিগের শুশ্রূষার চেষ্টা করিতেছি সত্য; কিন্তু তুমি থাকিলে বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত।"

আমি এই রূপ বুঝি যে হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে সকলেই পরলোককে ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে পৃথক বিবেচনা করে। এবং যখন উভয় লোককে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তখন কাহাকেও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ সকল ধর্ম্মগুলিতেই ঈশ্বর প্রধান পদার্থ এবং ঈশ্বর, হয় পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নয় পার্থিব পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্ট এবং মুসলমান ধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মের আরাধ্য বস্তু পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠ, সে ধর্ম্মের পরলোক কাজে কাজেই ইহলোক হইতে অধিক বা অল্প পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার ফল বড় গুরুতর, অনেক স্থলেই অতিশয় শোচনীয়। কারণ, যেখানে ইহলোক হইতে পরলোক স্বতন্ত্র, সেখানে মানুষ পরলোকের নিমিত্ত ইহলোক উপেক্ষা করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকলেই পারলৌকিক সুখের আশায় ইহলোকের প্রতি আস্থাহীন। বস্তুতঃ দেখা যায় যে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সংসারের প্রতি অনাস্থা, পরলোকের প্রতি বিশেষ আস্থা এবং পরলোকের প্রতি চূড়ান্ত আস্থার অর্থ চূড়ান্ত সাংসারিক বৈরাগ্য। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্ট, কি মুসলমান ধর্ম্মে, সন্ন্যাসীই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং পরলোকের প্রথম অধিকারী। কিন্তু পরলোকের নিমিত্ত ইহলোকের প্রতি অনাস্থা করিলে একটা না আর একটা বিষম অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে ইহলোকের প্রতি অনাস্থা প্রবল ছিল বলিয়া সংসারপ্রিয় ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রধান মোহান্ত পোপের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশীয়েরা প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। কথাটি ঠিক নয়। আমার বোধ হয়, সে বিপ্লবের নিগূঢ় কারণ এই যে, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপবাসীরা, তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিগুণে, সংসার অথবা ইহলোক প্রিয়, এবং সেই জন্য তাহারা দক্ষিণ ইউরোপের পরলোক-

প্রধান ধর্ম্ম-নীতি পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী এবং রোমান-ক্যাথলিক মতাবলম্বীদিগের পরস্পর শত্রুতায় ইউরোপ শয়তানের রাজ্য অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মও পরলোক প্রধান। কিন্তু দেখ আজ ইহলোকে হিন্দুদিগের কি অবস্থা! মুসলমান ধর্ম্মে পরলোক অনেকাংশে ইহলোকের সদৃশ বটে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মহম্মদের ঐহিক স্পৃহা বলে মুসলমানের পরলোক, মুসলমানের ইহলোক অপেক্ষাও জঘন্য।

ফল কথা এই যে, ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে পার্থক্য, শুধু মানুষের অনিষ্টের হেতু নয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়মেরও বিরুদ্ধ। আগেকার অপেক্ষা এখন মানুষ এই তথ্যটি বেশী বুঝিয়াছে যে, স্বভাবে কোন অবস্থার লয় নাই এবং প্রত্যেক অবস্থা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সম্পূর্ণ অনুযায়ী। অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থা এবং অস্তিত্বের বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদশূন্যতা স্বভাবের একটি প্রধান নিয়ম। অতএব পরলোককে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ক্রিয়া এবং সেই জন্যই এত অনিষ্টের মূল। পরলোককে ইহলোক হইতে ভিন্ন করা যে যথার্থ ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং অস্বাভাবিক ক্রিয়া তাহার একটি পরিষ্কার প্রমাণ আছে। হিন্দু বল, মুসলমান বল, খ্রীষ্টান বল, সকলেই ইহলোকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। সকলেই যাগযজ্ঞ, দানধ্যান, ঈশ্বরের চিন্তা প্রভৃতি কার্য্যে বিশিষ্টরূপে নিবিষ্ট থাকিয়া পরলোকবাসের উপযোগী হইতে চেষ্টা করে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাইট, সত্তর বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করে। কিন্তু এত-কাল ধরিয়া এত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ত ইহলোকের মায়া কাটাইতে পারে না। অশীতিবর্ষীয় পরম ঈশ্বরভক্তও ত মরিতে ভয় করে এবং মরিবার সময় এই সংসারের জন্য কাঁদে। কেহ কেহ মরিতে ভয় করে না সত্য; কেহ কেহ মরিবার সময় ইহলোকের নিমিত্ত কাঁদে না সত্য; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এবং অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ বা ইহলোকে থাকিয়াও ইহলোকবাসী নয়—সংসারশূন্য বৈরাগী; কেহ বা বার্দ্ধক্য বশতঃ আশা, স্পৃহা, অনুরাগাদি অনুভব করিতে অক্ষম; এবং কদাচিৎ কেহ গোঁড়া খ্রীষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মকুহকের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী। বস্তুতঃ, মানুষ পরলোকপ্রয়াসী হইয়াও ইহ-লোকের মোহে মুগ্ধ এবং ইহলোক ত্যাগ করিতে নিতান্তই ভীত এবং অনিচ্ছুক। এবং সেই জন্যই যিনি যেখানে সম্পূর্ণরূপে পরলোকপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সংসারে থাকিয়া পরলোক চিন্তায় সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ করিলে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধা-

চারণ করা হয়, এবং সেই জন্যই পরলোক-প্রয়াসীর মনে ইহলোক এবং পরলোক লইয়া একটি বিষম গণ্ডগোল বাঁধিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মে গণ্ডগোল নাই; গণ্ডগোলের স্থানও নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আগাগোড়া সুমধুর সমতান—আগাগোড়া কোকিলের কুউধ্বনি—আগাগোড়া মহাকাব্য। নিশ্চয় জানিও যাহার মনে ইহকাল এবং পরকাল লইয়া গোল আছে, যে পরলোকের নিমিত্ত ইহলোককে তুচ্ছ করিয়াও ইহলোকের জন্য কাঁদে, যে পরলোককে ইহলোক হইতে পৃথক্ এবং উচ্চ করিয়াও ইহলোক ত্যাগ করিতে ভয় পায় (মুখে মানুক আর নাই মানুক কিন্তু সত্য সত্যই ভয় পায়) এবং ইহলোকের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মরে, সে পরলোকও বুঝে নাই, ইহলোকও বুঝে নাই ; প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে সে তাহা জানে না। যে ধর্ম্মে পরলোক ইহলোক হইতে ভিন্ন, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়।

তুমি বলিবে, যে ব্যক্তি পরলোকপ্রয়াসী হইয়াও ইহলোকের জন্য কাঁদে, সে হীনবুদ্ধি, দুর্ব্বলমনা, প্রকৃত পরলোক কাহাকে বলে তাহা বুঝে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহলোকের জন্য কান্না এত দূষনীয় কেন? মরিতে ভয় করা এত লজ্জার কথা কেন? আমি যাহাদিগকে ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে ভাল-বাসে তাহাদিগের নিমিত্ত কাঁদিব না কেন? ভালবাসাই জীবন—ভালবাসাই জীবনের প্রধান কার্য্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। মানুষ ভালবাসিতে পারে বলিয়াই মানুষ পশু নয়—প্রকৃত মানুষ। মানুষ ভালবাসার বলে পরের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে পারে বলিয়াই মানুষ দেবতা। ভালবাসা পৃথিবীর জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার পরমাত্মা, ধর্ম্মের পবিত্র ভিত্তি, জগতের মোহিনী মূর্ত্তি। আমি যাহাকে ভাল বাসি, আমাকে যে ভাল বাসে, তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব—তাহাকে ছাড়িয়া কেন যাইব? জগতের আবির্ভাব কাল হইতে মানুষ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে করুণস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে। জগতের আবির্ভাব কাল হইতে ধর্ম্ম-যাজকেরা বলিয়া আসিতেছেন—কাঁদিও না, যেখানে যাইতেছ সে বড় উচ্চ স্থান। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই, মানুষ বরাবর স্ত্রী পুত্রের নিমিত্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। যাহাকে ভাল বাসি, যে আমাকে ভাল বাসে, তাহার নিমিত্ত কাঁদিয়া মরিতে তবে দোষ কি? কেনই বা কাঁদিয়া না মরিব? ধর্ম্ম-যাজকেরা যাহাই বলুন, যিনি যাহাই বলুন, এ কথার উত্তর নাই। ধর্ম্মযাজক বলেন—পরলোকে ঈশ্বরকে ভাল বাসিও। কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই। মানুষের দোষ কি? ঈশ্বরকে ভাল বাসিব আমার এমন ক্ষমতা কই? যাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না তাঁহাকে কেমন করিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে পুরিব? আর তাঁহাকে কি জন্যই বা ভাল বাসিব? তাঁহার ত কোন অভাবই নাই যাহা আমি পূরণ করিব? কোন ক্লেশই নাই যাহা আমি

মোচন করিব ? কোন যন্ত্রণাই নাই যাহা আমি ঘুচাইব ? যদি তাঁহার নিমিত্ত কিছু করিতে পারিলাম না, তবে তাঁহাকে কেমন করিয়া ভাল বাসিব ? কিছু করিতে না পারিলে ত ভালবাসা হয় না ! তাই মানুষ ধর্ম্মযাজকের কথায় কাণ দিয়াও কাণ দেয় নাই, সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া সৃষ্টবস্তুর জন্য লালায়িত। সেই জন্যই প্রায় সকল দেশে সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এই বলিয়া মনকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে, ইহলোকে যে ভালবাসার পদার্থটিকে হারাইয়াছি, তাহাকে পরলোকে পাইব ; যে ভালবাসার পদার্থটিকে রাখিয়া যাইতেছি, সে পরলোকে আমাদের কাছে যাইবে। খ্রীষ্টীয় জননী কোলের মাণিক হারাইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া থাকেন —"যাদু, এখন তাঁহার কাছে থাক, আমি গিয়া আবার তোমাকে বুকে করিয়া লইব।" ভূদেব বাবুর মাতৃদেবীর মৃত্যুর পঁচিশ বৎসব পর তাঁহার পিতৃঠাকুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিবস তাঁহার পিতৃঠাকুর বলিয়াছিলেন—"আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—সে, এতদিনেব পর আমাকে লইতে আসিয়াছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।"* ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে প্রতিপ্রাণা বিধবা একমনে পতিধ্যানে জীবন কাটাইয়া থাকেন, তিনি পবলোকে পতিক্রোড় পুনর্লাভ করেন। এইরূপে মানুষ তাহাব প্রকৃতির সফলতা সাধন করে ; ধর্ম্ম-যাজকের উপদেশ এবং মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে বিষম বিসম্বাদ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপশম সম্পাদন করে। কিন্তু এত করিয়াও মানুষের সুখ নাই। মনে এত আশা ফলাইয়াও মানুষ মরিতে ভয় করে। লোকে বলে মানুষ দুর্ব্বল তাই মরিতে ভয় করে। তা নয়। মরিতে ভয় করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্ম্মযাজকেরা মানুষকে মৃত্যুভয় শিখাইয়াছেন। তাঁহারা যে নরক-যন্ত্রণার কথা বলেন, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের কঠোর দণ্ডনীতিই তাহাদিগের বিনাশ সম্পাদন করিবে। আধুনিক উন্নত চিন্তার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, দণ্ডের দ্বারা চবিত্রের প্রকৃত সংশোধন হয় না। এবং সেই জন্যই আজিকাল শিক্ষাকার্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া যাইতেছে। প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে দণ্ডবিধি উঠিয়া না গেলে প্রচলিত ধর্ম্মও উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক্। মৃত্যুভয়ের আসল কারণ এই। যে হৃদয়ের নিধিটিকে হারাইয়াছি তাহাকে আবার পাব ; যে হৃদয়ের নিধিটিকে রাখিয়া যাইতেছি তাহাকেও আবার পাব ; —মনে এই আশা বড়ই প্রবল। ধর্ম্মের শিক্ষা, ধর্ম্মযাজকের উপদেশ ঠেলিয়া ফেলিয়া, পরলোকে ইহলোকের প্রেমপূর্ণ পরিবারটি দেখিতে পাইব— হৃদয়ের এই বাসনা যে কতই প্রগাঢ় তাহা কি বলিব। কিন্তু তবুও ত মন

---

* পারিবারিক প্রবন্ধ, ১০২ পৃষ্ঠা।

আশ্বস্ত হয় না। কই কেহই ত নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলে না যে আমার আশা পূর্ণ হইবে, যে প্রেমময় পরিবারে এখানে আছি, সেখানেও সেই প্রেমময় পরিবারে থাকিতে পাইব? সেই জন্যই ত কত আশা সত্ত্বেও মরিতে এত ভয় করে। কে বলে যে সে ভয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ? যে বলে সে জানে না যে ভয় পবিত্র প্রেমের প্রাণ।

কিন্তু এত আশা করিয়াও মানুষের মনে যে এত ভয়, তাহার কি কোন কারণ আছে? আছে বৈ কি। সে কারণের নাম—অদৃষ্ট। আমি কেমন করিয়া জানিব যে পরলোকে আমি আমার ভালবাসার জিনিষগুলি পাইব? ইহলোকেই ত আমার সকল আশা পূর্ণ হয় না। আমি একটি বিশিষ্ট কারণে আমার স্ত্রী-পুত্রকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলাম। কিন্তু দেখিয়াও সুখী হই নাই। কেন না যাহাদের সুখের নামই সুখ, যাহাদিগকে সুখের ভাগ না দিতে পারিলে সুখ দুঃখে পরিণত হয়, তাহারা আমার কাছে ছিল না। ছিল না কেন? না, আমি আমার হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নই এবং তাহাদের হইয়াও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নই। এই ক্ষুদ্র সংসারে আমি এবং তাহারা যে কত শক্তির এবং কত রকম শক্তির ক্রীড়ার পদার্থ, কে তাহার ঠিকানা করিবে? আমি তাহাদিগকে দেখিব মনে করিলেই দেখিতে পাই না, তাহাদিগকে কাছে আনিব মনে করিলেই কাছে আনিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাকে একদিকে টানিতেছে, তেমনি শত সহস্র শক্তি আমাকে শত সহস্র দিকে টানিতেছে। কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রের মধ্যেই যদি এইরূপ হইল, তবে কেমন করিয়া বলিব যে মৃত্যুর পর যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্র হইয়া উঠিবে তখন আমি আমার ভালবাসার জিনিসগুলিকে আমার কাছে রাখিতে পারিব! ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি কার্য্য, কোটি কোটি সংযোজনা, কোটি কোটি ব্যবচ্ছেদ সাধন করিতেছে। সেই ভীষণ শক্তি সংগ্রামে কে কখন কি হইয়া যাইতেছে, কে কখন কি হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমি মরিলে, সেই শক্তিরাশি আমাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া জানিব? আমার হৃদয়দেবী মরিলে সেই শক্তিরাশি তাঁহাকে লইয়া কি করিবে কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া জানিব? যখন এই ক্ষুদ্র সংসার চক্রেই এত কাটা ছেঁড়া, তখন বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের হাতে পড়িলে কি হইবে কেমন করিয়া বলিব? ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রয়োজন—আমার নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা কত উচ্চতর প্রয়োজন। কোন্ প্রয়োজনে আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে কেমন করিয়া জানিব? সাধে কি মরিতে ভয় করি?

কিন্তু সে ভয় কি নিবারণ করা যায় না? বোধ হয় যায়। পরলোককে

ইহলোক হইতে পৃথক মনে করিও না। ইহলোকে যাহা জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার পরমাত্মা সেই ভালবাসাকে পরলোকেও জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার পরমাত্মা করিও। কিন্তু ইহলোকে যাহাকে ভালবাস, তাহাকে যে পরলোকে পাইবে, তাহার ত কোন ঠিকানা নাই। তবে কি করিবে? আমি বলি তোমার ভালবাসা বিশ্বব্যাপী হউক। বিশ্বব্যাপী ভালবাসা কাহাকে বলে, প্রাচীন হিন্দুরা তাহা জানিতেন, আর কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। কোম্‌তের ভালবাসা অতি সঙ্কীর্ণ। আমার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু কোম্‌তের ভালবাসা মনুষ্যসম্বন্ধ। কোম্‌তের ভালবাসায় আমার কুলায় না। কি জানি মরিয়া যদি এমন স্থানে যাইতে হয়, যেখানে মানুষ নাই, তাহা হইলে ত মরিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। তাই বলি, প্রাচীন হিন্দুর বিশ্বব্যাপী ভালবাসার পক্ষপাতী হও। সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে স্ত্রীপুত্রের ন্যায় ভালবাস, দেখিবে যে ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে যে বিবাদ, তাহা মিটিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মোপদেশ এবং মানব প্রকৃতির মধ্যে যে বিরোধ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে, মানুষের পারলৌকিক চেষ্টা এবং আশার মধ্যে যে গণ্ডগোল তাহা চুকিয়া গিয়াছে। ইহলোকেও ভালবাস, পরলোকেও ভালবাসিবে। বিশ্ব-শক্তি বিশ্বমণ্ডলের অন্তর্ভূত পদার্থ বিশেষকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে এবং করিতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের কিছুই করিতে পারে না। তুমি মরিয়া কোথায় যাইবে তাহার ঠিকানা নাই; তোমার স্ত্রী মরিয়া কোথায় যাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু তুমি মরিয়া যেখানেই যাও এবং তোমার স্ত্রী মরিয়া যেখানেই যাউন, তুমি যদি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পদার্থকে তোমার স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসিয়া মরিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে ভয় করিতে হইবে না, মরিতে কাঁদিতে হইবে না। ইহলোকেও যেমন ভালবাসায় ভাসিয়াছ, পরলোকেও তেমনি ভালবাসায় ভাসিবে। সাধনা বড় কঠিন; কিন্তু ফলও বড় চমৎকার। বিশ্বব্যাপী ভালবাসাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে ভয় নাই, সন্দেহ নাই, ইহলোক এবং পরলোকের বিবাদ নাই, শিক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরোধ নাই। সেই ধর্ম্মের নামই বিশ্ব-জীবন, বিশ্ব-কাব্য, বিশ্ব-গীতি, বিশ্ব-মোহিনী। সমগ্র বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত বিশ্ব-দেবতা। এবং বিশ্বব্যাপী ভালবাসা সেই বিশ্বদেবতার বিমোহন মূর্ত্তি। শক্তিরূপা সহধর্ম্মিণীতে সেই বিমোহন মূর্ত্তি দেখিতে অভ্যাস করিও, সাধনার সূত্রপাত হইবে।

কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণ বাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই কাহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; রাজকৃষ্ণ বাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতিবাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী; আমরা তাঁহার অনুবাদ অত্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘ-দূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক। রাজকৃষ্ণ বাবু কালিদাসের প্রত্যেক কবিতা ছয়ছত্রে অনুবাদ করিয়াছেন; এইরূপ ছয়ছত্ররূপ শিকল পরায় কোন কোন স্থলে অনুবাদ সমাপ্তির পর কিছু টানিয়া বুনিতে হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থানে অল্পের মধ্যে অধিক ভাব প্রবিষ্ট করায় ভাষা একটু দুর্বোধও হইয়াছে। উদাহরণ দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ করার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয় এ শিকল না পরিলেই ভাল হইত।

এই উপলক্ষে মেঘ-দূতের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে কোন একটা কথা পড়িলেই সেই কথা

---

* The Meghaduta.—Translated into Bengali Verse, by Rajkrishna Mookerjee M. A., and B. L. Calcutta, Printed by Behary Lall Bannerjee at Messrs J. G. Chatterjea & Co.'s Press. 44, Amherst Street. Published by the Sanskrit Press Depository, 148, Baranoshi Ghose's Street, Price 8 annas.

লইয়া আমোদ করিতে চায়। কালিদাস এই নূতন বেশে বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা যদি তাঁহার মেঘদূতের বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি, বোধ হয় তাহাতে কেহ আমাদের দোষ ধরিবেন না।

কালিদাসের মেঘদূত ১১৫টী বই কবিতা নয়; কিন্তু মহাকবি এই ১১৫ টী কবিতায় যেন একটী নূতন জগত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সে জগতের নিকট রুসোর Ideal World বোধ হয় পরাজিত হয়; যাঁহারা উপর উপর দেখেন তাঁহারা দেখিবেন যে, একজন যক্ষ স্বীয় প্রিয়ার অদর্শন দুঃখে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে এবং মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া তৎসমীপে দৌত্যভারপ্রার্থনা জানাইতেছে; এবং তাহাকে কর্ত্তব্য উপদেশচ্ছলে যক্ষ-পত্নীর বিরহ অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারা দেখিবেন যে যদিও সম্মুখে মেঘ ও যক্ষ বই আর কিছুই নাই; কিন্তু তাহার পশ্চাতে, দূরে, যতই প্রণিধান পূর্ব্বক দেখ, অতি পরিস্ফুটরূপে একটী নূতন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কবির কল্পনায় সমাজের, মনুষ্যের, সমাজ নিয়মের, মনুষ্যের সুখের, যতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে এই জগৎ সেই উৎকর্ষ সমূহের সমষ্টি মাত্র। তাঁহারা দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুষার-ধবল কৈলাসের উপরে ভারতভূমি হইতে দুর্ভেদ্য প্রাচীর মালার দ্বারা পৃথক্কৃত করিয়া মহাকবি একটী মহানগরী সৃষ্টি করিয়াছেন। জলভরিত মেঘে অনবরত গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ বিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা হয় সে নগরের শোভাও সেইরূপ। উহার বরাঙ্গনাগণ বিদ্যুৎবরণী স্থিরসৌদামিনী তুল্য, উহার আলেখ্য সমূহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গের ধ্বনি মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচক্যময়; উহাতে ছয় ঋতু নিরন্তর বিরাজমান; ছয় ঋতুরই ফুলকুল উহার বায়ুকে নিত্য আমোদিত করিতেছে; উহার পাদপসমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে; সকল সময়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকে, আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকলকালে মেখলাকারে বিচরণ করে; সকল সময়ে ময়ূরসমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করত জনগণের আনন্দ সমুৎপাদন করে। সর্ব্বরাত্রেই সুধাংশুদেব স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার সুধাধবলিত হর্ম্ম্য শ্রেণীকে শোভিত করেন।

তথায় আনন্দ ভিন্ন অন্য কোন কারণে লোকের নয়নাশ্রু পতিত হয় না। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য প্রকার মনোবাদ কখন উপস্থিত হয় না; আর যৌবন ভিন্ন

অন্য বয়স কখন দেখা যায় না ; অর্থাৎ সে পুরীতে দুঃখ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই, কলহ নাই, জরা নাই, মরণ নাই।*

পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ অপরিহার্য্য সেখানে তাহার লেশমাত্র নাই ; সেখানে দস্যু নাই, তস্কর নাই, দণ্ডবিধি নাই, ভয় নাই, শঙ্কা নাই, সেখানে সকলই সুখ ; কেবল আনন্দ, কেবল উল্লাস, কেবল ভোগ, সে ভোগের বিরাম নাই, অন্ত নাই। যে এক মদন বাণের তাপ আছে তাহাও বিশেষ তীব্র হইবার যো নাই, কারণ মহাদেব কৈলাসে বাস করেন, মদন ভয়ে বড় একটা অধিক জারী করিতে পারে না।

অন্য কবি হইলে এরূপ সমাজের লোকে কি করিয়া দিন যাপন করে তাহার ইতিহাস দিতে পারিতেন না, কিন্তু কালিদাসের সৃষ্টির ক্ষমতার নিকট বুঝি বিধাতারও সৃষ্টি-ক্ষমতা পরাভূত হয়। মানব চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই ; তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রীপুরুষ যুবক যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না, সকলেই এই অপূর্ব্ব সুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত। তথায় কন্যাকুল নন্দাকিনীর তীরস্থ বালুকাভূমির মধ্যে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অন্বেষণ করত ক্রীড়া করে, শৈত্যসৌগন্ধমান্দ্যময় মন্দাকিনীর সমীরণ তাহাদিগকে ক্লান্ত হইতে দেয় না। যদি কখন কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয়, নিকটেই কুসুমিত মন্দার বৃক্ষ, তাহারই তলায় গিয়া খেলিতে আরম্ভ করে, খেলা কখন ছাড়ে না ; তথাকার অধিবাসীগণ নিরন্তর রূপে স্থিরসৌদামিনী সদৃশ রমণী-গণের সমভিব্যাহারে বৈভ্রাজ নামে পুরীর বহিস্থিত উপবনে বসিয়া কিন্নরদিগের গান শ্রবণ করে। সে গান আর কিছুই নহে, কেবল কুবেরের যশঃ গানমাত্র।

এই সুখময় পুরীতে যে সকল যক্ষ বাস করে তাহাদের মধ্যে একজন মেঘদূতের নায়ক। তিনি যে অলকাপুরীর একজন প্রধান ব্যক্তি, কালিদাস একথা কোথাও

---

* বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীর ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ।
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
* চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ।
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তির্বিত্তেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥

বলেন নাই ; আমাদেরও বোধ হয়, তিনি একজন সাধারণ কর্ম্মচারী মাত্র ; কিন্তু তিনি শঙ্খ ও পদ্ম নামক দুইটী নিধির অধীশ্বর ; তাঁহার তোরণের পার্শ্বে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। শঙ্খ ও পদ্মনিধি কি ? নিধি শব্দে সঞ্চিত ধন বুঝায় ; আমাদের দেশে লক্ষপতি কোটীপতি বড়ই গৌরবের কথা, কিন্তু এই সামান্য যক্ষ—লক্ষের উপর নিযুত, তাহার পর কোটী, তাহার পর অর্ব্বুদ, তাহার পর বৃন্দ, তাহার পর খর্ব্ব, তাহার পর নিখর্ব্ব, তাহার পর শঙ্খ ও তাহার পর পদ্ম, এত ধনের অধিকারী। তাঁহার এক পত্নী, সেই তাঁহার প্রাণ,—

"তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনাস্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং যাতত্র স্যাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥"

"কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রাস্তদশনা, ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য ললিত লোচনা, স্তনভরে কিছু অবনত কলেবরা
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে, বিধাতার আদ্যসৃষ্টি যুবতী-সমাজে।"

যক্ষ এই রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া একপ্রকার আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়াই তাঁহার জীবন—তাঁহার প্রাণ—তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়াছিল ; বাহ্য জগতের সত্তা তাঁহার নিকট বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছিল।

কুবের এই সুখভবনের অধিপতি। যক্ষকুল তাঁহার আজ্ঞাবহ ; অন্যদেবগণ পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন, কুবেরের যান মনুষ্য ; যাঁহার আজ্ঞায় এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত সমাজ চলিতেছে, নিজপুরী মধ্যে তাঁহার কথা লঙ্ঘন করে এমন কেহই থাকিতে পারে না। আমাদের যক্ষ হয়ত দুই একবার আপন পত্নীর সহবাস আর অলকার সুখভোগে মগ্ন হইয়া তাহার কথার অন্যথা করিয়াছিলেন। এই জন্য কুবের তাঁহাকে হয়ত দুই একবার সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবেন। একবার আশ্বিন মাসে তিনি উঁহাকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার এই কর্ম্ম সম্প্রতি তোমায় করিতে হইবে, দেখিও যেন ভুলিও না, আর যেন তোমায় সতর্ক করিয়া দিতে না হয়।"

আজ্ঞা পাইয়া যক্ষ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুইটী মন্দার বৃক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উভয়ে পুষ্পস্তবকভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইল ; বৃক্ষ দুইটী তাঁহার প্রিয় পত্নীর পোষ্য পুত্র, তাহাদের এই অপূর্ব্ব পুষ্পোদগম দেখিয়া মহা আনন্দভরে প্রিয়াকে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। প্রিয়া দীর্ঘিকাতীরে ভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তথায় গেলেন ; দেখিলেন, মরকতশিলানির্ম্মিত সোপানাবলী পুষ্করিণীর গভীর জল পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে ; বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত নালের উপর

হেম পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পুষ্করিণীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; হংসকুল তাহার চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; বর্ষাকালে মানস সরোবরে যে যাইতে হয় সে কথা তাহাদের মনেও নাই; দেখিলেন প্রিয়া তথায় নাই। নিকটেই ক্রীড়া শৈল ছিল; মনে করিলেন প্রিয়াকে তথায় পাইবেন; এই বলিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। পুষ্করিণীর তীর হইতে সে শৈল গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; উহার শিখর সমূহ ইন্দ্রনীলমণিতে নির্ম্মিত; উহার তলদেশ কনক-কদলীতে বেষ্টিত; উহার একাংশে মাধবীলতা কুঞ্জের (হয়ত এই মাধবীলতা কুঞ্জেই কল্য রজনীতে বিহার করিয়াছিলেন) কুরুবক নির্ম্মিত বেড়ার পার্শ্বে একটী অশোক ও একটী বকুল বৃক্ষ; দুইটী বৃক্ষের ফুলে মদনের বাণ প্রস্তুত হয়; এই দুইটী বৃক্ষের মধ্যস্থলে একটী সোণার দাঁড় স্ফটিকের একখানি তক্তায় দুলিতেছে, এবং তাহাব তলদেশ অঙ্কুরাবস্থ বংশের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট মণির দ্বারা বাঁধান। সেই দাঁড়ে একটী ময়ুর বসিয়া আছে। যক্ষ তথায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রিয়া করতালী দিয়া তাহাকে নাচাইতেছেন; আর তাঁহার বালা রুণ রুণ করিয়া বাজিতেছে; শিখীটী সেই শব্দে পুচ্ছ বিস্তার করিযা নাচিতেছে। প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তিনি সে দিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন কবিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়ত সুরুচি-সম্পন্ন আমাদেব তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশযেরা বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের রুচি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতাবণা করতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭, এই দুইটী কবিতা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করেন।

পর দিন প্রভাত হইলে কুবের দেখিলেন, পুনরায় যক্ষ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছেন, এবং প্রিয়ার প্রতি তাঁহার সর্ব্বান্তরিক অনুরাগই এরূপ অমান্য করার কারণ ইহা জানিতে পারিয়া কুবের এক বৎসরের জন্য যক্ষকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলায় যাহা দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহাই দেখাইলেন। দেখাইলেন, স্বর্গেই হউক বা পৃথিবীতেই হউক, সুখ-ভবনেই হউক বা দুঃখভবনেই হউক—সমাজ যেখানেই হউক, উহার আজ্ঞা কঠোর, অলঙ্ঘনীয় ও অপরিহার্য্য। যেমন শাস্তির আজ্ঞা হইল, অমনি সে যক্ষ অলকাপুরী হইতে রামগিরিতে আনীত হইল।

কুবের শাস্তি বিধান করিলেন ; যক্ষকে অলকার কোন কারাগারে বদ্ধ করিলেন না কেন ? তাহা হইলে ত যক্ষের জ্ঞানযোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু বোধ হয় অলকার ন্যায় সুখ-ভবনে কারাগার নাই, বোধ হয় দুঃখভোগ যাহার অদৃষ্ট লিপি, অলকা তাহার বাসস্থান হইতে পারে না ; তাই কুবের তাঁহাকে দুঃখময় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিরহ ভিন্ন অন্য তাপ অলকাবাসীদের হইতে পারে না, এই জন্য কুবের সেই বিরহমাত্রে শাস্তিরই বিধান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অলকায় বিরহ তাদৃশ দারুণ হইতে পারে না, কারণ মহাদেবের তথায় বাস, এই জন্য তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান হইল।

পাঠাইয়া দিলেন ত রামগিরিতে কেন ? আণ্ডামানে দিলেই ত ঠিক হইত। কিন্তু না,—যক্ষের যাহাতে বিরহ যন্ত্রণা অতি তীব্র হয়, সেই জন্য কালিদাস তাহাকে রামগিরিতে আনাইলেন। কালিদাস জানিতেন রামায়ণ দেবলোক ও দেবযোনিদিগের সুপরিচিত। রাম ও সীতা যেখানে পরস্পর সহবাসে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন যক্ষকে সেইখানে উপস্থিত করিলেন। সেখানকার প্রত্যেক তরু রামচন্দ্রের সুখের সাক্ষী ; সেইখানে যক্ষ, প্রিয়া-বিরহিত, স্বদেশ নির্ব্বাসিত। যক্ষরাজ রামায়ণের সেই সকল কথা স্মরণ করিতেন। রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইয়া যে সুখ ভোগে অযোধ্যার কথা কথঞ্চিত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আমার অদৃষ্টে বিধাতা সে সুখও লেখেন নাই ; তাই যক্ষ বলিয়াছেন যে বন দেবতারাও তাঁহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বোধ হয় ভবভূতিও যক্ষের এই অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই উত্তররামচরিতে রামকে আবাব পঞ্চবটীবনে আনিতে সাহস করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সীতার ছায়া দেখাইয়া ও বনদেবতাদিগের দয়ার পাত্র কবিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছেন। যক্ষও দিবানিশি রাম সীতার এই ছায়া দেখিতেন এবং তাহাই দেখিয়া তিনি এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন ; সে গিরির যেখানে যেখানে জল ছিল, অর্থাৎ নির্ঝরিণী, জলপ্রপাত, উৎস, প্রবাহ, নদী, ক্ষুদ্র নদী ছিল, জনক-তনয়া সর্ব্বত্রই রামের সহিত স্নান করিয়াছিলেন। যক্ষ সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে রাম ও সীতার ছায়া দেখিতেন। কালিদাস এই সকল কথা বলিবার জন্যই "জনকতনয়াস্নানপুণ্যোকেষু" অর্থাৎ "যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল" এই বিশেষণটী দিয়াছেন।

যক্ষ রামগিরিতে বসিয়া কি করিতেন ? তিনি কখন কখন প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে লিখিয়া তাহার চরণস্থলে আপনাকে স্থাপন করিতেন। হরিণীর চঞ্চল নয়ন দেখিলে প্রিয়ার নয়ন তাঁহার মনে পড়িত, পূর্ণচন্দ্র দেখিলে প্রিয়ার মুখচ্ছবি তাঁহার প্রাণ আকুল করিত, ময়ূরের পুচ্ছ দেখিলে তিনি প্রিয়ার কেশপাশভ্রমে তাহার বেণী বিন্যাস করিতে অগ্রসর হইতেন ; ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ

উঠিলে তাঁহার বোধ হইত নৃত্যকালে তাঁহার প্রিয়ার ভ্রূযুগ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও কোথাও প্রিয়ার সম্পূর্ণ উপমা না পাইয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ভূমিতলে বসিয়া রোদন করিতেন। কখন কখন স্বপ্নাবস্থায় প্রিয়ার সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে জাগরিত হইয়া দেখিতেন, চারি দিকে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির বিন্দু পড়িতেছে। তখনই তাঁহার বোধ হইত বন-দেবতারা আমার দুঃখ দেখিয়া কান্দিতেছেন, অমনি তিনি সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইতেন। উত্তরদিক্ হইতে বায়ু বহিতে লাগিলে, তিনি সে বায়ু বক্ষে গ্রহণ করিতেন, ভাবিতেন যে ইহারা অবশ্যই আমার প্রিয়ার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে অতি কষ্টে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, এই আট মাস কাটিয়া গেল। ভাবনায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গেল, তাঁহার ক্ষীণ হস্ত হইতে বলয় খসিয়া পড়িল। এমন সময়ে সর্ব্ব প্রথম মেঘ দর্শন দিল; মেঘ দেখিলে প্রিয়সহবাসেও লোকের মন উৎকণ্ঠিত হয়; বোধ হয় যেন কিছু হারাইয়াছি, বোধ হয় যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না। কিন্তু যাহারা প্রিয় বিরহী, বল দেখি তাহাদের মন কত ব্যাকুল হয়; তাহারা ভাবে যাহা গিয়াছে তাহা আর পাইব না, তাহা না পাইলে আমাদের জীবনের প্রয়োজন নাই। যাহার যাহার জন্য জীবন, যাহাতে সুখ, তাহা ছাড়িয়া দিয়া এ নিঃসার অপদার্থ ভারভূত দেহে প্রয়োজন কি? গরিব যক্ষ মেঘ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। মেঘ যে জড়পদার্থ, ধূমময় ব্যতীত আর কিছুই নয়, এ কথা তাহার মনেও রহিল না; মেঘ উত্তর দিকে যাইতেছে। আহা! আমার প্রিয়া এতদিনে জীবিত আছে কি না, যদি থাকে, মেঘ দেখিলে সে আর প্রাণ রাখিতে পারিবে না; যে দূরে আসিয়াছি, সংবাদ দিবার, সংবাদ লইবার, লোকও নাই, এই মেঘ দিয়া যদি একটি খবর পাঠাইতে পারি, হয়ত প্রিয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। সে এই ভাবিয়া কতকগুলি কুর্চ্চির ফুল তুলিয়া মেঘকে অর্ঘ্য দিল, দিয়া বলিল "মেঘ! তুমি বড় বংশে জন্মিয়াছ, সন্তপ্তদিগের দুঃখ বিমোচন কর, আমি অতি কাতর, তোমার শরণাগত, আমার দুঃখ দূর কর; তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য, তোমার অগম্য স্থান নাই, আমার বিরহে প্রিয়ার প্রাণ মলিন কুসুমের ন্যায় অতি কষ্টে বৃন্তে লাগিয়া আছে। কখন খসিয়া পড়িবে জানি না; তুমি তাহাকে গিয়া আমার এই সংবাদটী দিবে। তাহা হইলে একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা হয়; আমি আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম; তুমি ভায়ের কার্য্য কর; মনে করিও না যে আমার প্রিয়ার—আহা!—কিছু হইয়াছে, তাহার এখনও আশা আছে আমি ফিরিয়া যাইব; কিন্তু বোধ হয় সে ম্লানকুসুম আর বৃন্তে থাকে না, তুমি যাও, গিয়া তাহাকে আমার সম্বাদ দিয়া

জীবিত কর। এই কথা বলিতে বলিতে, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে, যক্ষের চক্ষে মেঘের যা কিছু জড়ত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হইল; তিনি মেঘকে শুভলক্ষণ সুযাত্রা দেখাইয়া দিলেন; বলিলেন, বলাকাকুল তোমার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে; বলিলেন, পথিক-রমণীগণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে; তুমি দ্রুত যাও। যাহাতে মেঘের পথে কষ্ট না হয় তাহার জন্য যক্ষ এই সময় যে সকল উপদেশ দিয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই বোধ হইবে যে সে মেঘকে বাস্তবিকই মানুষ বলিয়া ভাবিয়াছিল, এবং মেঘের জন্য বাস্তবিকই সহানুভূতি অনুভব করিয়াছিল।

এই সময়ে মেঘকে পথ বুঝাইয়া দিবার ছলে কালিদাস যে সকল দেশ, নগর, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ লেখকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে সকল দেশ কোথায়? এবং এখন খুঁজিয়া সে সকল পাওয়া যায় কি না প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহার সন্ধান করুন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে হিন্দু কবিগণ জড়জগতকে দূর হইতে দেখিতেন; তাঁহারা দেখিতেন জড়জগৎ নিম্নে, অন্তর্জগৎ উপরে। সংস্কৃত কবিরা জড়জগতের সহিত মিশিয়া জড়জগতের বর্ণনা করিতে ভাল বাসিতেন না, তাঁহারা উপর হইতে জড়জগৎ দেখিতেন। কালিদাস বল, ভবভূতি বল, এই চক্ষেই জড়জগৎ দেখিয়াছেন, আর এই এই চক্ষে দেখিলেই জড়জগতেব যথার্থ প্রকাণ্ডতা, যথার্থ সৌন্দর্য্য, যথার্থ মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারা যায়। কালিদাস এই চক্ষে জড়জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া অদ্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইলাম।

(ক্রমশঃ)

ঊষা-হরণ বা অপূর্ব্ব মিলন।—গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ৵১০ মাত্র। গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, "পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু———— এবং শ্রীযুক্ত বাবু———— ও শ্রীযুক্ত বাবু———— মহোদয়গণ যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সমধিক পরিশ্রম করিয়া এই গীতি নাট্যের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" যে ১২ পাতা এক জনে লিখিয়াছেন আর তিন জনে পড়ে "আদ্যোপান্ত" সংশোধন করিয়াছেন তাহা সমালোচনা করা রীতি বিরুদ্ধ ও নীতি বিরুদ্ধ।

মায়াবতী।—গীতি নাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। ১৬৭ নং কর্ণওয়া-লিস ষ্ট্রীট, কর প্রেস। ১৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ মাত্র। কালকেতু নামে একজন ব্যাধ "দেবীপদ নিত্য স্মরে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে, নাশে প্রাণী অগণন"। সুতরাং দেবী তাহার প্রতি সদয় ছিলেন। এক দিন বনে সে কিছুই না পাইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল:—"নিত্য আনি নিত্য খাই, সঙ্গতি কিছুই নাই, কার কাছে ধার চাই, ওগো মা জননী।" সুতরাং ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না। স্বর্ণ গোধিকা হইয়া তাহার সম্মুখে গেলেন। ব্যাধ অগত্যা সেই গোধিকা ভোজন করিবে বলিয়া তাহাই ধরিল, কুটীরে গেল, তথায় দেবী গোধিকা মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—

"আমি চণ্ডী আসিলাম তোরে দিতে বর, শুন কথা কালকেতু ত্যজ ধনু শর।
সপ্ত নৃপ-ধন-সম, লও এ অঙ্গুরী মম, না হবে ভ্রমিতে তোরে কানন ভিতর।
এ অঙ্গুরী ভাঙ্গাইয়া, ত্বরা গুজরাটে গিয়া, কাটায়ে সে বন সব করহ নগর।

গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য কি বুঝিলাম না। দেবীকে ভক্তি করিলে তিনি টাকা দেন, এই শিক্ষা দিবার কি উদ্দেশ্য?

সতীবাসনা।—পদ্য। শ্রীঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। ঈশান বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী———উপহারে লিখিয়াছেন "দাসী অবসর মতে

বালিকাদিগের উপযুক্ত পাঠ্য বিবেচনায় সতী বাসনা নামে পুস্তক রচনা করিয়াছে"। আমরাও বলি নিশ্চয় সতীবাসনা বালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্য। নমুনা স্বরূপ বেহুলা সম্বন্ধে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"প্রবল নদীর স্রোত তর তর যায় ছোট ছোট ঢেউ গুলি ছুটিয়া বেড়ায়।
কল কল করে জল কূল পরশিয়া, চন্দ্রমা দিয়াছে তায় চন্দ্রিকা ঢালিয়া।
মৃদুল পবন বহিতেছে ঝির ঝির, টপ টপ পড়িতেছে নিশির শিশির।
কূলে কূলে শব খুঁজে শৃগাল কুকুর, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ রবে ধরিয়াছে সুর।
'হা নাথ! কোথায় নাথ' করুণ কাকলী, কে বালা ও চারু রূপে খেলিছে বিজলী?
মাঝে দিয়ে ভেসে যায় কলার মান্দাস, পচা শব কোলে শুয়ে খ'সে পড়ে মাস।
বঙ্গের প্রতিমা উটি বণিক নন্দিনী, মুকুলেই শুকাইয়া গেছে কমলিনী।

বসন্তোপহার।—গীতিকাব্য সংগ্রহ। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। রায় প্রেস ডিপজিটারিতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। সমালোচকের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকাব ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে জনৈক সুবিজ্ঞ সমালোচক মহাশয়কে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহার প্রতি রচয়িতাব আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, ইনি বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত এবং গ্রন্থাকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গ-ভাষায় অদ্বিতীয় লেখক ভূতপূর্ব্ব বঙ্গ-দর্শন সম্পাদক মহাশয় যে শ্রেণীর সমালোচক, ইনিও সেই শ্রেণীস্থ। তিনি পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, 'ইহা মুদ্রিত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।' রচয়িতা সেই সুবিজ্ঞ সমালোচকেব নাম না প্রকাশ করিয়া ভাল কবিয়াছেন, এবং আপনারও সুরুচির এক প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন। তথাপি বলিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাব সুবিজ্ঞ সমালোচকের কথা না উল্লেখ করিলেই ভাল হইত। এ সার্টিফিকিট কোন কাজের হয় নাই। যাঁহার নাম শুনিতে পাইলাম না তিনি সুবিজ্ঞ সমালোচক কি না তাহা কি রূপে বুঝিব। রচয়িতা বলিতেছেন তিনি সুবিজ্ঞ, আবার সমালোচক বলিতেছেন রচয়িতা সুকবি। এরূপ পরস্পর সার্টিফিকিট দেওয়া লওয়াতে লোকে সন্দেহ করিতে পারে। তাহাই বলিতে ছিলাম একথা উল্লেখ না কবিলেই ভাল হইত। ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় সার্টিফিকিট সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা একটা ফেসন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে, সার্টিফিকিট দেখিলেই পাঠকের মনে সন্দেহ হয় যে এ লেখক সার্টিফিকিট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাহাই সার্টিফিকিটদাতা দয়া করিয়া, বা অনুরোধে পড়িয়া, অথবা জ্বালাতন হইয়া সার্টিফিকিট দিয়াছেন। মনে এই সন্দেহ হইলে আর সে রচয়িতা বা রচনাব প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা থাকে না। অতএব তখন সার্টিফিকিট উপকার না করিয়া অপকার করে। বসন্তোপহার লেখক উপলক্ষে এ

সকল কথা বলিলাম বলিয়া যে আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহি এমত নহে ; তাঁহার ছন্দ মাধুরী ও বাক্য বিন্যাস সুন্দর। না বাছিয়া আমরা একস্থান হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"কিন্তু হায়,

অভাগিনী বঙ্গবালা আজ দুঃখ সাগরে,
ভাসিতেছে একাকিনী নিরানন্দ অন্তরে,
কোথা ওই প্রেম নদী,
বহিতেছে নিরবধি,
কোথায় দুঃখের স্রোত ফুলে ফুলে কাঁদিছে,
অনাথিনী পড়ে তায় ঘন ঘন কাঁপিছে।

কতকাল আর আমি সহিব এ যাতনা,
নিদয় বিধাতা ওরে আমারে তা বলনা,
পারিনা পারিনা আর,
সহিতে এ দুঃখ ভার,
গুরু ভারে পাপ প্রাণ ফেটে কেন যায় না,
অভাগিনী ব'লে বুঝি মৃত্যু মোরে ছোঁয় না ?

আমার সে সুখ-রবি অস্তমিত হয়েছে,
অপ্রভাত দুঃখ-নিশি ঘোর বেশে এসেছে,
জানিনা কখন হায়,
আঁধারে নিবিয়া যায়,
জীবনের সুখ-তারা ধ্রুব তারা নয় রে,
কালের ভীষণ মেঘে আবরিলে তাহারে।

আজ হ'তে পৃথিবীতে একা পড়ে থাকিব,
একাকিনী এ বিজনে অশ্রু জলে ভাসিব,
কেহ না দেখিতে পাবে,
দিন রাত চলে যাবে,
আবার দিবস নিশি পুনঃ ফিরে আসিবে,
অভাগিনী একাকিনী তথাপিও কাঁদিবে।

ভূতের কথা বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য একবার বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু ভূতের কথা ভূতে লিখিলে ভাল হয়, এই ভাবিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করি নাই। আমাদের তখন ধারণা ছিল যে মনুষ্য না মরিলে ভূত হয় না, এখন দেখিতেছি যে আমাদের ভ্রম হইয়াছিল। মনুষ্য না মরিয়াও ভূত হয়—পাড়া প্রতিবাসী অথবা পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা দুরন্ত ছেলেদের ভূত বলেন বলিয়া যে হঠাৎ আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে এমত নহে। আমাদের বেদান্ত, মারকীনদের Owen's Footfalls on the other world, ইংরেজদের Gregory's Animal magnetism, অষ্ট্রীয়ানদের Von Reichenbach's Reseaiches on magnetism প্রভৃতি নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছে যে জীবিত মনুষ্যের ভূত আছে। কেহ নাস্তিকের মত আমাদের সহিত তর্ক করিতে চাহিলে আমরা আস্তিকের মত কর্ণে হস্ত দিয়া বসিয়া থাকিব, আর কেবল বলিব "ভূতোস্তি"—"ভুতোস্তি"।

বেদান্তে বলে আমাদের শরীর কোষময় অর্থাৎ "খাপ" স্বরূপ। একটী খাপের ভিতর আর একটী খাপ, তাহার ভিতর আর একটী খাপ, এইরূপে পাঁচটী খাপ। যেন Chinese puzzle। প্রথম খাপটীর নাম অন্নময় কোষ। সেটির ভিতর যেটী আছে তাহার নাম প্রাণময় কোষ। তৃতীয়টীর নাম বিজ্ঞানময় কোষ, ইত্যাদি। আমাদের এই দেহের নাম সুতরাং অন্নময় কোষ। ইহার আর একটী নাম স্থূল শরীর। হস্ত পদ, চক্ষু কর্ণ, উদর, ওষ্ঠ, এ সকল স্থূল শরীরের অন্তর্গত। এই স্থূল শরীরের ভিতর পর পর যে তিনটী খাপ আছে তাহা একত্রের নাম সূক্ষ্ম শরীর। ইহাই "আসল" ভূত—জীবিতে ও মৃতে। মনুষ্য মরিলে অর্থাৎ আমাদের স্থূল শরীর নষ্ট হইলে সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম শরীর চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু ভাল ভাল লোকের নিকট শুনিয়াছি যে অন্ধকারে, বনে জঙ্গলে, লোকের আনাচে কানাচে এই সূক্ষ্ম শরীর কখন কখন দেখা দেয়, তখন ইনি ভূত নামে অভিহিত হন। কেবল যে মরিলেই স্থূল শরীর হইতে

সূক্ষ্ম শরীর বহির্গত হয় এমত নহে। পণ্ডিতেরা বলেন আর তিন প্রকারে বহির্গত হইতে পারে। প্রথম, নিদ্রা অবস্থায়; দ্বিতীয়, যোগবলে, তৃতীয়, আপনা আপনি বিনা চেষ্টায়। নিদ্রা অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ আমাদের ভূত—স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আসেন, তাহার নাম স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন মাত্রেই এই ভূতের পর্য্যটন নহে, স্বপ্নের অন্য হেতুও আছে। Magnetism বা Mesmerism দ্বারা ভূত বাহির করিবার যে নূতন কৌশল এক্ষণে বিলাতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমাদের যোগের সঞ্চারণ বিদ্যা। সে সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ এক্ষণে অনাবশ্যক। তবে এইমাত্র পরিচয় দিয়া রাখি, মার্কিন দেশে, ইংলণ্ডে, জর্ম্মন ও অন্যান্য দেশে, যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন; তাঁহারা বলেন যে দৃষ্টি সঞ্চারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা একজন অপর জনকে এরূপ বশীভূত করিতে পারে যে, তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা যাইবে, উঠিতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিবে, অজ্ঞান হইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইবে। তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র যাইতে বলিলে সে তৎক্ষণাৎ যাইবে। কি কারণে এরূপ হয় তাহা অদ্যাপি বুঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা যে হইয়া থাকে তাহা অনেকের নিশ্চয় ধারণা আছে; এবং তাঁহারা বলেন যে সেই সময় স্থূল শরীরকে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর যেখানে যেখানে যায, এবং যাহা যাহা দেখে, তাহা সবিশেষ পরিচয় দিতে থাকে, এবং সে পরিচয় তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছে।

সূক্ষ্ম শরীর যে মধ্যে মধ্যে স্থূল শরীর হইতে আপনা আপনি বিনা চেষ্টায় বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহার কথা আমাদের শাস্ত্রে কি আছে জানি না। তবে বিলাতি বহিতে যাহা পাওয়া যায় তাহার দুই একটি উদাহরণ পরে দেওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন আমাদের বেদান্ত প্রভৃতির যে মত বলা হইয়াছে তাহারও পোষকতা স্বরূপ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

একটী এই। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে মার্কিন দেশের একখানি জাহাজ হিম সাগর দিয়া যাইতেছিল। এক দিন মধ্যাহ্ন কালে জাহাজের কাপ্তেন ও তাহার প্রথম মেট্ ছাদে দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জাহাজ পরিচালনা সম্বন্ধে কোন বিষয় গণনা করিবার জন্য উভয়ে ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন। কাপ্তেনের বসিবার ঘর মেটের বসিবার ঘরের সংলগ্ন। মেট নামিয়া নিজের ঘরে আসিবামাত্র গণনায় নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার নিজের গণনা সমাপ্ত হইয়া আসিলে তিনি কাপ্তেনের ঘরের দিকে না চাহিয়া কাপ্তেনকে গণনার ফলাফল

জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে কোন উত্তর না পাওয়ায় তিনি সেই দিকে মাথা ফিরাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তথাপি কাপ্তেন কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া তিনি উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দেখিলেন কাপ্তেন নহে অপর কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া শ্লেটে কি লিখিতেছে। জাহাজে অপরিচিত ব্যক্তি নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবামাত্র মেট বিস্মিত হইয়া কাপ্তেনকে খুঁজিতে গেলেন। এবং ছাদে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া অপরিচিত ব্যক্তির কথা তাঁহাকে জানাইলেন। মেটের ভ্রম হইয়াছে ভাবিয়া কাপ্তেন তাঁহাকে উপহাস করিলেন। মেটের একান্ত জেদ দেখিয়া পরিশেষে, তিনি ছাদ হইতে নামিয়া দেখিলেন, তাঁহার কামরায় কেহই নাই। ইহাতে তিনি মেটকে কিছু অনুযোগ করিলেন। মেট তথাপি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই এই খানে একজন অপরিচিত লোককে শ্লেটে লিখিতে দেখিয়াছেন। লেখার কথা শুনিয়া কাপ্তেন তখন শ্লেটখানি তুলিয়া দেখিলেন অপরিচিত অক্ষরে শ্লেটে লেখা রহিয়াছে "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও।" কে ইহা লিখিল জানিবার জন্য কাপ্তেন একে একে জাহাজের সকল ব্যক্তিকে ডাকিয়া "উত্তর পশ্চিমে জাহাজ চালাও" এই কথাগুলি লিখাইলেন, কিন্তু কাহারও লেখার সহিত শ্লেটের লেখা মিলিল না। কাপ্তেন শেষ ভাবিলেন, কেহ এই কথা লিখিয়া জাহাজেরই কোথায়ও লুকাইয়া আছে, এই জন্য তিনি জাহাজের ভিতরের সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান হইল। কিন্তু কোথায়ও কাহাকেও পাওয়া গেল না। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাপ্তেন উত্তর-পশ্চিমেই জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। জাহাজ কিছুক্ষণ উত্তর-পশ্চিমমুখে গেলে একটী বৃহৎ হিম-শিলা ভাসিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল এবং আর একখানি জাহাজ সেই শিলাখণ্ডে ভগ্ন অবস্থায় আবদ্ধ রহিয়াছে ইহাও দেখা গেল। দেখিবামাত্র কাপ্তেন দুই তিন খানি নৌকা পাঠাইয়া ভগ্ন জাহাজের আরোহীদিগকে নিজের জাহাজে আনাইলেন। তাহারা একে একে জাহাজে উঠিতেছে, প্রধান মেট্ সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতেছেন এমত সময় আরোহীদিগের মধ্যে একজনকে দেখিবামাত্র মেট শিহরিয়া উঠিলেন। পরে কাপ্তেনকে গোপনে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তিকেই আমি পূর্ব্বে আপনার কামরায় বসিয়া শ্লেটে লিখিতে দেখিয়াছি"। পরে আহারাদি কার্য্য সমাধানান্তর কাপ্তেন সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ও ভগ্ন পোতের কাপ্তেনকে ডাকিয়া অপর কামরায় লইয়া গেলেন, এবং কথিত ব্যক্তিকে বলিলেন, 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করেন তবে চরিতার্থ হই।" অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন "একি কথা বলিতেছেন, আপনি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।" কাপ্তেন

বলিলেন, "আমার অনুরোধ অতি সামান্য ; এই স্লেটে দুই একটী কথা আপনি লেখেন এই মাত্র আমার অনুরোধ।"

অপরিচিত ব্যক্তি শ্লেটের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলে শ্লেটের যে দিকে লেখা ছিল, "উত্তর-পশ্চিমে জাহাজ চালাও", কাপ্তেন সে পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যে দিকে কিছু লেখা ছিল না, সেই দিকে তাঁহাকে লিখিতে দিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখিব ? কাপ্তেন বলিলেন, যাহা আপনার ইচ্ছা তাহাই লিখুন। ইচ্ছা হয়, লিখুন "উত্তর-পশ্চিমে জাহাজ চালাও।" অপরিচিত তৎক্ষণাৎ তাহাই লিখিয়া কাপ্তেনের হাতে দিলেন। কাপ্তেন শ্লেট উল্‌টাইয়া পূর্ব্বের লেখার সহিত এক্ষণকার লেখা মিলাইয়া অবাক হইয়া থাকিলেন। পরে উপস্থিত লেখককে পূর্ব্বের লেখাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি আপনার লেখা বলিতেছেন ?"

উত্তর। আমায় তাহা আর জিজ্ঞাসার প্রযোজন কি ? আপনি ত আমাকে ইহা লিখিতে এখনই দেখিয়াছেন।

কাপ্তেন তখন শ্লেটখানি উল্‌টাইয়া অপর দিকের লেখা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ লেখা কাহার ?"

ইহাতে লেখক বড় গোলে পড়িলেন। তিনি শ্লেটের একবার এপিট্ একবার ওপিট্ উল্‌টাইয়া বলিলেন—

"ইহার অর্থ কি ? আমি একদিকে লিখিযাছি, অপর দিকের লেখাও আমারই দেখিতেছি, অথচ আমি ত তাহা লিখি নাই।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার মেট বলিতেছেন যে আপনিই অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময় এই ডেস্কে বসিয়া উহা লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে লেখক ও ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন। ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন, লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলে তাহাতে শ্লেটে লেখার কথা কিছু ছিল কি ?"

. উত্তর। তাহা আমার মনে নাই।

তখন অপর কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্নের কথা কি ?" ভগ্ন তরীর কাপ্তেন উত্তর করিলেন, "হিমশিলা হইতে আমাদের আর উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই হতাশ হইয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন অনাহারে সকলেই বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কখন্ মরি, কখন্ মরি এ কথা সকলের মনেই হইতেছিল। ইনি অদ্য দুই প্রহরের সময় অবসন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিলেন ;

তাহার পর নিদ্রা ভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিলেন, 'অদ্য আমরা উদ্ধার হইব। আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম একখানি জাহাজ আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আসিতেছে।' ইনি আপনার এই জাহাজের আকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক মিলিয়াছে।"

তখন অপর কাপ্তেন অপরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপ্নে শ্লেটে লেখার বিষয় কিছু কি আপনার স্মরণ নাই?"

উত্তর। আমার সে বিষয় কিছু মনে নাই। আমি কেবল স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম একখানি জাহাজ আমাদের বাঁচাইতে আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইখানে যত দ্রব্য দেখিতেছি তাহা যেন আমার অপরিচিত নহে, সকলই যেন আমি পূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছি।

এই পরিচয় বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে নিদ্রিত অবস্থায় এই ব্যক্তির সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ ভূত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রের ইতস্ততঃ খুঁজিয়া শেষ এই জাহাজ খানিতে উপস্থিত হয়। এবং উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আপনার দেহে আসিয়া পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু কথা এই, সকলেই ত বিপদগ্রস্ত হয়, সকলেরই ত প্রেতাত্মা আছে; তবে সকলেরই ভূত কেন বহির্গত হইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করে না। বোধ হয় অনেকেই বলিবেন, সকলের ভূত সমান উদ্যোগী নহেন।

আর একটা মার্কিন গল্প বলি। একজন গৃহস্থ ইউরোপে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, যে সময়ে প্রত্যাগমন করিবার কথা ছিল কার্য্য-গতিকে সে সময় অতীত হইয়া গেল। কোন পত্রাদি না পাইয়া তাঁহার স্ত্রী বড় ব্যস্ত হন। স্ত্রীলোকের স্বভাব সকল দেশেই সমান। স্বামীর তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তিনি একজন গণকের নিকট গিয়া আপনার কাতরতা জানাইলেন। গণক তাঁহাকে সেই স্থানে বসাইয়া অপর ঘরে উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্র আপনার স্বামীর সংবাদ আনিয়া দিতেছি। বিবিটী অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিল, তাহার পর উঠিয়া গণক কি করিতেছে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারের নিকট গেল, গিয়া দেখে একখানি কোচের উপর গণক মৃতবৎ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বিবি ঘরের ভিতর আর প্রবেশ না করিয়া পূর্ব্ব-স্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গণক কোচ হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বিবিকে বলিল, ভয় নাই, আপনার স্বামী ভাল আছেন, তিনি লণ্ডন-নগরের অমুক কাপি হাউসে বাসা করিয়া আছেন, আপনাকে অদ্যই তিনি পত্র লিখিবেন। বিবি তাহাতেই সান্ত্বনা লাভ করিয়া গৃহে আসিলেন। কিছুদিন পরে

পত্র পৌঁছিল। এবং যথা সময়ে স্বামী স্বয়ংও দেশে ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীকে পাইয়া বিবি তাঁহার গলা ধরিয়া যথা নিয়মে ক্ষণেক কাঁদিল, তাহার পর কত গল্প করিল, শেষ সেই গণকের পরিচয় দিল, এবং একদিন স্বামীকে গণকের নিকট লইয়া গেল। স্বামী গণককে দেখিবা মাত্র চিনিল। স্ত্রীকে গোপনে বলিল, "আমি ইহাকে এক দিন লণ্ডনে আমার বাসায় দেখিয়াছিলাম, তথায় গিয়া এই ব্যক্তি আমাকে বলে যে তুমি আমার সংবাদ না পাইয়া বড় কাতর হইয়াছ।" তাহার পর হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, যে দিবস তাঁহার স্ত্রী গণকের নিকট গণাইতে গিয়াছিলেন সেই দিবস সেই সময়ে তাঁহার সহিত লণ্ডনে এই ব্যক্তির দেখা হইয়াছিল।

এই গল্পটি বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে গণক আমাদের যোগেব ন্যায় কোন এক কৌশলে আপনার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া লণ্ডনে এই গৃহস্থের অনু-সন্ধান করিতে গিয়াছিল।

আর একটী ইংরেজী গল্প বলি। যিনি পরিচয় লিখিয়াছেন তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইয়া বিশ্বাস কবিয়াছেন। অতএব যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি এ গল্প বিশ্বাস কবিতে পাবেন। একদিন বাত্রে এক জন কর্ণেল সাহেব যথা প্রথা সস্ত্রীক হইয়া নিদ্রাব অর্চ্চনা কবিতে কবিতে সফল মনস্কাম হইয়াছিলেন। সেই রাত্রের ঘটনা তাঁহার স্ত্রী এইরূপ বলেন যে "আমবা উভয়ে নিদ্রা গেলে কতক রাত্রে দেখি আমি শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি; আমাব স্বামী কর্ণেল সাহেব শয্যায় অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন আর তাঁহার পার্শ্বে আমার দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিলাম, আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি আর আমার দেহ ওখানে কিরূপে থাকিল? আমি কতই ভাবিতে লাগিলাম, তাহার পর বিশেষ করিয়া দেখিলাম আমার সেই শরীর মৃত দেহের ন্যায় দেখাইতেছে—স্পন্দন রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস বিবর্জ্জিত। তখন আমার ক্রমে ক্রমে স্থির বিশ্বাস হইল আমি নিশ্চয়ই মরিয়াছি। শেষ ভাবিলাম উত্তম হইয়াছে, মরণের কষ্ট কিছুই পাইতে হইল না। এই সময় আমায় যেন প্রাচীরের দিকে ভাসিতে ভাসিতে যাইতে হইল; আমার নিজের ইচ্ছা নাই অথচ সেইদিকে যাইতে হইল। ভাবিলাম প্রাচীরে আটকাইয়া থাকিব। কিন্তু তাহা হইল না, আমি প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, যেমন প্রাচীর সেইরূপ থাকিল, কোথাও ভেদ চ্ছেদ কিছুই হইল না। প্রাচীরের অপর দিকে একটা বৃক্ষ ছিল, ভাবিলাম এই বৃক্ষে আমার দেহ আটকাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও হইল না, যেমন বৃক্ষ সেইরূপ থাকিল অথচ আমি তাহার ভিতর দিয়া সরিয়া গেলাম। তাহার পর শূন্য পথে কত দূর গিয়া দেখিলাম সম্মুখে গোরাদের বারিক, একজন সান্ত্রী

বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে একেবারে দেখিতে পাইল না, তাহার পর অস্ত্রাগারে গেলাম, সেখানেও সান্ত্রী পাহারা দিতেছে, আমি তাহারও সম্মুখে দাঁড়াইলাম সে ব্যক্তিও আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহার পর আমার কোন আত্মীয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, গৃহিণীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিলাম। তখন রাত্র ৩টা বাজিল।

* * *

প্রাতে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিলে আমি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলাম "তবে আমি মরি নাই।"

চীৎকার শুনিয়া আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি তখন আদ্যোপান্ত সকল পবিচয় দিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি একথা শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিও না; আমাদের যে আত্মীয়েব সহিত তুমি কথা কহিয়া আসিয়াছ বলিতেছ, তিনি এই শুক্রবারে আমাদের এখানে আসিবেন। আসিয়া কি বলেন তাহা শুনা যাইবে।"

শুক্রবারে সেই আত্মীয় যথাসময়ে আসিলেন। তাঁহাকে লইয়া আহ্লাদ আমোদ হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে সকলে একত্রে পুষ্প-উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে টুপির কথা উঠিল। আমি বলিলাম, "এবার আমি গোলাপি বর্ণের টুপি ক্রয় কবিব; ঐ বর্ণ আমি বড় ভালবাসি।" তাহাতে আমাদের আত্মীয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তাহা আমি জানি, সে দিন রাত্র ৩ টার সময় যখন আমার গৃহে তুমি গল্প করিতে গিয়াছিলে, তখন তোমার গোলাপি বর্ণেব বেশ ভূষা ছিল।"

তাহার কিছুদিন পরে কর্ণেল সাহেব ভাবতবর্ষে এডজুটাণ্ট জেনেরল হইয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার বিবি বিলাতে থাকিলেন। বিবিজি পূর্ব্বমত ভূত-বেশে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য কতই আকাঙ্ক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহা হইত না!

এই তিনটি গল্পই যথেষ্ট, আর অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিশ্বাস আছে যে মানুষ কেবল মরিলেই ভূত হয়; কিন্তু এই কয়টী পরিচয় যদি সত্য হয় তবে বলিতে হইবে মানুষ জীবিত অবস্থায়ও ভূত হইতে পারে। এরূপ গল্প আমাদের দেশে প্রচলিত নাই তাহাই এই বীজ রোপণ করিলাম, সময়ে এরূপ কত গল্প রটিবে। কত রূপ গল্প আছে, না হয় তাহার উপর আর দুই চারিটা জন্মিবে তাহাতে ক্ষতি কি?
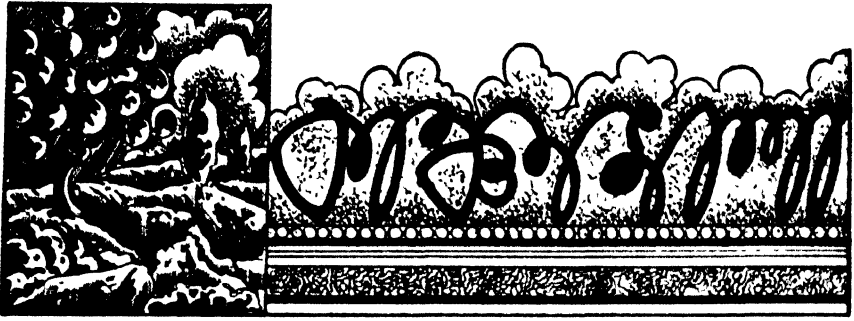
দশম অধ্যায়

যথাকালে কুণালের পত্র রাজধানী পৌছিল। কিন্তু তখন অশোক আর রাজা নাই। যে দিন কুণাল যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তদবধি প্রিয়পুত্রের শোকে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বদাই ভাবনা হইতে লাগিল, কুণালের পাছে কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন, কিন্তু আর কেহই সে পরামর্শ দিল না। ক্রমাগত ভাবনায় ও ক্রমাগত পরিশ্রমে অশোক রাজার বহুমূত্র রোগ উপস্থিত হইল। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ এই, প্রথম অবস্থাতেই উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কুণাল যাইবার দশ বার দিন পরে রাজার এই বিষম অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। পাটলীপুত্র নগরের প্রধান প্রধান চিকিৎসক পুস্তকাদি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্রি রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পাতা লতা ফল মূল গুল্ম অস্থি প্রভৃতিতে রাজবাড়ীর এক মহাল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে বড় বড় কবিরাজেরা পঞ্চবার্ষিকী সভায় সাত আটবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা স্বয়ং স্বহস্তে ঔষধ তৈল আরক বটিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পাটলীপুত্র নগরের বড় বড় বৌদ্ধমঠে প্রত্যহ উপহারাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। ভগবান উপগুপ্ত প্রত্যহ রাজবাটীতে আসিয়া রাজার ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

. সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে পরিচর্য্যার কিছুমাত্র ক্রটী হইলেই রাজার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। ঔষধ সেবন, পথ্যাদি প্রদান, নিদ্রার সময় ব্যাঘাত হইতে না দেওয়া, আহারাদির বিষয়ে বিশষ যত্ন লওয়া, শয্যা গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতির কোনরূপ ক্রটী হইলেই তাঁহার আর অব্যাহতি থাকিবে না। এরূপ পরিচারিকা অন্তঃপুর মধ্যে মিলিয়া উঠা ভার। অশোকের মহিষীগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ পক্ষীয়, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস হয় না।

যাঁহারা বৌদ্ধ তাঁহারা হয় সেরূপ পরিচর্য্যা করিতে জানেন না, না হয় করিতে প্রস্তুত নন। কাঞ্চন রোগ শোকে পরের মাতা পিতা। কিন্তু রাজার পীড়ায় পুত্রবধূ অপেক্ষা মহিষীরা সেবা করিলেই ভাল হয়। সুতরাং সে ভার তিষ্যরক্ষার স্কন্ধেই পড়িল।

তিষ্যরক্ষা দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, রাজা অশোকের সেবা করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনেই অশোক এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, যে তাঁহার উত্থান শক্তি একেবারে রহিল না। তখন তিষ্যরক্ষাই তাঁহার হাত পা হইল। তিষ্যরক্ষারও কিছুতেই সেবার বিরতি হইত না। যে সময়ে কোন কাজ না থাকিত, সে সময়ে সে রাজার কাছে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিত। দিনরাত্রি গায় হাত বুলাইত, পাখা লইয়া বাতাস করিত, একবার ঘর হইতে বাহির হইত না। দাসী বৃন্দকে রাজার নিকটে আসিতে দিত না। রাজা নিদ্রিত হইলে পার্শ্বে বসিয়া মশা মাছি তাড়াইত এবং যাহাতে রাজার নিদ্রার বিঘ্ন না হয় তাহার জন্য নিজে ঘুমাইত না। দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে সে রাজার মহলটী এমনি সুশীতল করিয়া রাখিত, যে গেলে লোকের আর ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিত না।

২

এইরূপ নিরন্তর সেবায় রাজার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিষ্যরক্ষা অনিদ্রায় অনাহারে অস্নানে ও অনিয়মে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি উহার সেবায় বিতৃষ্ণা বা বিরতি রহিল না। অনিয়মে তাহার এক প্রকার উৎকট শিরঃপাড়া জন্মিল, শিরঃপাড়া উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে সে দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অভিভূত হইয়া থাকিত।

রাজা আরোগ্য হইয়া উঠিয়া তিষ্যরক্ষার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। পরে বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করাইয়া উহার শরীর শোধরাইয়া দিলেন। এবং তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে প্রার্থনা করিল যে আমি একাকী এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করিব। অশোক সম্মত হইলেন। চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে মহারাণী তিষ্যরক্ষা এক বৎসরের জন্য মগধ সাম্রাজ্যে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। মৌল, রক্ষী, সামন্ত, গ্রামিক, সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে তাহারা এই এক বৎসরের জন্য তিষ্যরক্ষার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। এই কয়দিন অশোক প্রজাভাবে রাজপুরী মধ্যে বাস করিবেন।

৩

এই নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় দিনে কুণালের দূত জয়বার্ত্তা লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। এবং কুঞ্জরকর্ণের বন্দী হওয়ার সংবাদ আনিয়া দিল। যুদ্ধের

জয় সংবাদে মহারাণী তিষ্যরক্ষা ঘোষণা দ্বারা নগরবাসীদিগকে উৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন, রাত্রিতে মহানগর দীপরাজিতে আলোকিত হইল; বৌদ্ধমহলে আজি বড়ই আনন্দ। অশোক শুনিলেন, তিনিও নিজ বাসস্থান প্রদীপ দিয়া দীপান্বিতা করিয়া তুলিলেন।

রাজা ও তিষ্যরক্ষার পীড়ার সময় কাঞ্চন সর্ব্বদাই রোগীদের নিকট থাকিত, উভয়ে সারিয়া উঠিলে আবার নগর পরিভ্রমণ করিয়া দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন করিতে আরম্ভ করিল। আজি এই সুখের দিনে সেও কাঞ্চন-কুটীর দীপমালায় শোভিত করিল। দূত আসিয়া তাহাকেও পত্র দিল, পত্রের শেষ অংশ পড়িয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে তক্ষশীলা গমনের অনুমতি তিষ্যরক্ষার নিকট প্রার্থনা করিল। তিষ্যরক্ষা যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাইতে দিলেন না। কাঞ্চনের যাওয়া হইল না এবং সে বড় বিষন্ন হইল। তাহার হাসিখুসী ও প্রফুল্লভাব দিনকত বড় একটা দেখা গেল না। দুই পাঁচ দিন পরে আবার যে সেই হইল, কুণালের নিকট হইতে সদ্ধর্ম্মের জয় সংবাদ এবং কুণালের অবিচলিত প্রণয়ের চিহ্নসকল প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাঞ্চন ইহাতেই সুখী।

ওদিকে যথাসময়ে কুণালেব নিকট তিষ্যরক্ষার রাজ্যারোহণ বার্ত্তা পঁহুছিল। তৎপরদিন যুদ্ধজয় শ্রবণে মহারাণী বড আনন্দিত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। তৎপরে কুঞ্জরকর্ণকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা আসিল, কুণাল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর দিন পত্র আসিল যে কুঞ্জরকর্ণ আমায় "মা" বলিয়াছে, অতএব আমি তাহাকেই তক্ষশীলায় শাসনকর্ত্তা করিলাম, তুমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইবে। এই সংবাদে কুণালের অধীনস্থ সেনাপতিগণ বড় অসন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে নাপিত-কন্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিল। কুণাল বলিলেন, সে যেই হোক, সে যখন মহারাণী হইয়াছে তখন অবশ্যই আমায় তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। সেনাপতিরা অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু সেনাস্থ লোক রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের রাজত্বে মানুষের বাস করিতে নাই। কি অবিচার! বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বন্দী রাজা হইল, আর বিজয়ী রাজপুত্র তাঁহার অধীন হইল।"

এইভাবে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিনের দিন কুঞ্জরকর্ণ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কুণালকে আসিয়া বলিল, মহারাণীর আজ্ঞা আজি তোমায় আমার সহিত তক্ষশিলার দুর্গের মধ্যে যাইতে হইবে। কুণাল মস্তক অবনত করিয়া রাণীর আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাদ্বর্ত্তী

হইলেন। বামাঙ্গ স্পন্দন হইল, কাক চিল উড়িতে লাগিল, কুণাল ভাবিলেন, বুঝি কাঞ্চনের সঙ্গে আর দেখা হইল না। বাহিরে তাঁহার আন্তরিক আবেগের চিহ্নও দেখা গেল না। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম করিয়া তিনি কুঞ্জরকর্ণের পশ্চাৎ-বর্ত্তী হইলেন।

বহু সংখ্যক সৈনিক তাঁহার সহিত যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

কুঞ্জরকর্ণ কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "কুণাল, মহারাণী তোমার উপর বড় কঠিন আজ্ঞা করিয়াছেন।"

"তিনি যাই আজ্ঞা করুন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"সে আজ্ঞা পালন করিলে জীবন ও মৃত্যু সমান হইবে।"

"হয় হইবে।"

কুঞ্জরকর্ণ বলিলেন,—"এসো। আমবা কেন দুইজনে যোগ কবিয়া তক্ষশীলায় নূতন বাজত্ব স্থাপন কবি না?"

কুণাল এ কথার উত্তর দিলেন না; কিন্তু এমনি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন যে তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ভয়কম্পিত স্বরে বলিল,—"তবে আমি মহারাণীর আজ্ঞার সহিত লোক পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আপন মন দৃঢ় কর।" বলিয়া কুঞ্জরকর্ণ প্রস্থান করিল।

৪

কুণাল, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। একমনে বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

"জীবলোকের সুখের জন্য জীবন ত্যাগ করা শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু আমি কিসের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছি? ইহাতে পাপীয়সীর পাপবাসনা চরিতার্থ বই আর কিছুই হইবে না।" তখনি আবার মনে হইল,—"সে যেই হোক সে এক্ষণে মহারাণী। তাহার আজ্ঞা কোন রূপেই লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। করিলেই যুদ্ধবিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে।"

এই সময়ে একবার কাঞ্চনমালার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—বলিলেন,—

"জীবিতেশ্বরী! আমার সহিত তোমার এবার আর দেখা হইল না।"

এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে দুই জন চণ্ডাল রাজপত্র হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েই গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, সর্ব্বশরীর তৈলাক্ত; প্রকাণ্ড মুখ, বড় বড় চোখ, অনবরত মদ্য সেবনে জবা ফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল তৈলাক্ত মুখের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া দাড়ী এবং অপরিষ্কার ভয়ানক কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। গলায় রাঙা জবা ফুলের মালা, হাতে তীর ও ধনুক। আসিয়াই এক জন আর এক জনকে বলিল—"ওরে, এই শালাটার কি চোখ তুল্‌তে হবে? কিন্তু শালার চোখ দুট কি বড়!"

দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল,—"লেখনখানা ওর হাতে দে।"

প্রথম চণ্ডাল আবার বলিল,—"আর পত্র দিয়ে কি হবে? এখনি তো ওর পত্র দেখা ফুরিয়ে যাবে।"

"তবে আর কাজ নাই", বলিয়া উভয়ে কুণালের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া তীর তুলিল। প্রথম চণ্ডাল বাম ও দ্বিতীয় চণ্ডাল দক্ষিণ চক্ষু লক্ষ্য করিল। কুণাল দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তোমরা পত্রখানি আগে দেখাও, তাহার পর যাহা হয় করিও।"

তাহারা বলিল,—"দেখিয়া আর কি হইবে, কাজ দেখো না।"

"না দেখিলে আমি কিছুই করিতে দিব না।" বলিয়াই তিনি তাহাদের প্রতি এমনি তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন যে তাহাদের হস্ত কম্পিত হইল।

কুণাল উহাদের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মস্তকে ছোঁওয়াইয়া পড়িলেন—দেখিলেন তাঁহারই চক্ষু উৎপাটনের আজ্ঞা। দেখিলেন, তাহাতে তিষ্যরক্ষার নাম স্বাক্ষর—পত্রখানি পাঠ করিয়া চণ্ডাল দুইজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা যাহা আজ্ঞা পাইয়াছ তাহা কর।"

প্রথম চণ্ডাল বলিয়া উঠিল,—"দেখলে তো, এখন চোখ তুলি?"

এই বলিয়া তীর ধনু তুলিল। কিন্তু চোখের দিকে সে আর চাহিতে সাহস করিল না।

ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে রাখিয়া কুণালের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটী উৎপাটন করিল। কুণাল তখন "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে লাগিলেন। প্রথম চক্ষু উৎপাটন করিয়াই সে মাতিয়া উঠিল এবং অপর অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইল। তখন দ্বিতীয় চণ্ডাল বলিল—"ও চক্ষু আমার, আমি তুলিতে দিবনা"—এবং কুণালের চক্ষু আবরণ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথম চণ্ডাল উহাকে পদাঘাত দ্বারা দূর করিয়া

দিয়া কুণালের অপর চক্ষুটীও উপাড়িয়া লইল। পরে চক্ষুদুটী কুড়াইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় দ্বিতীয় চণ্ডালকে আর একটী লাথী মারিয়া গেল।

৫

দ্বিতীয় চণ্ডাল কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—সে এপর্য্যন্ত কথা কহে নাই। প্রথম চণ্ডাল চলিয়া গেলে সে কুণালকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখনও সেই মন্ত্র পড়িতেছ?"

কুণাল বলিলেন,—"হাঁ।"

"তোমায় লাগে নাই?"

"অল্প।"

"চোখ্ উপড়াইয়া লইল, অথচ অল্প লাগিয়াছে বলিতেছ কেমন করিয়া?"

কুণাল বলিলেন,—"আমার তো সামান্য কষ্ট হইল, কিন্তু কত লোক আমা অপেক্ষা কত অধিক কষ্ট পায়!"

"তুমি কি তাই ভাবিয়া এত স্থির থাকিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ, তাহাই আমাদের ধর্ম্মের উপদেশ।"

"কি তোমাদের ধর্ম্মের উপদেশ?"

"আপনার কষ্ট মনে করিবে না, কেবল পরের কষ্ট মনে করিবে এবং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে।"

"এই তোমাদের ধর্ম্ম?"

"হাঁ।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কুণাল দেখিতে পাইলেন না, সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তীর ধনুক অস্ত্রশস্ত্র জবাফুলের মালা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

৬

কিয়ৎক্ষণ পরে কুঞ্জরকর্ণ কুণালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল,—"কুণাল, তোমায় এই গৃহেই অবস্থান করিতে হইবে,—মহারাণীর আজ্ঞা।"

"শিরোধার্য্য", বলিলে কুঞ্জরকর্ণ স্বহস্তে সেই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

একাদশ খণ্ড

পাটুলীপুত্রে তিষ্যরক্ষা একাধিশ্বরী। মহামন্ত্রী রাধগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। উভয়ে পরামর্শ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন; দুই এক বিষয়ে মহারাজা অশোকেরও মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই মাস অতীত হইয়া গেল। পঞ্চম মাসের প্রথমেই সংবাদ আসিল, "তক্ষশিলার কুঞ্জরকর্ণ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন।" দুই এক দিন পরে আবার সংবাদ আসিল "কুঞ্জরকর্ণ আবার বিদ্রোহী হইয়া কুণালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" আবার দুই তিন দিন মধ্যে সংবাদ আসিল "কুঞ্জরকর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে ও কুণাল বন্দী হইয়াছেন।"

যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সংবাদ আসিতে প্রায় এক মাস লাগে, সুতরাং এই এক মাস কুঞ্জরকর্ণ কি করিতেছে তাহা কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসী লোকদের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—

"কুঞ্জরকর্ণ বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটলীপুত্র নগরে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বৌদ্ধ বধ করিতে করিতে আসিতেছে।"

কেহ বলিল—

"মেয়ে মানুষের হাতে রাজ্য দিলে সবই বিশৃঙ্খল হয়।"

কেহ বলিল—

"যখন কুণালকে পরাজয় করিয়াছে, তখন রাজা অশোকের তো কথাই নাই।"

অনেকে পাটলীপুত্র নগর হইতে স্ব স্ব পরিবার স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালা কুণালের বন্দীত্ব শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তিষ্যরক্ষার অনুমতি প্রার্থনা করিল—তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল—কিন্তু এবার তাহার প্রাণ বড়ই কাঁদিতেছে—সে আর কাহারও কথা মানিল না। সেই রজনী যোগেই সে তক্ষশিলা যাইবার পথ আশ্রয় করিল। কাঞ্চনমালা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, শুনিয়া নগরের মধ্যে আবার হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল,—

"অশোক রাজার রাজলক্ষ্মী এইবার ত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কাঞ্চন যে দুঃখী দরিদ্রদের মাতা পিতা ছিলেন, কাঞ্চন যাওয়া অবধি তাহারা সর্ব্বদাই অশোক রাজাকে গালি দিতে লাগিল—কেহ কেহ উহার

অনুসন্ধানার্থ তক্ষশিলার পথে গমন করিতে লাগিল, কিন্তু কাঞ্চনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাটলীপুত্র হইতে বহু সংখ্যক সৈন্য আবার প্রেরিত হইল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল "তাহারা কুঞ্জরকর্ণের সহিত যোগ দিয়াছে।" তখন নগরবাসীদের ভয়ের আর সীমা রহিল না। তাহারা সকলে তিষ্যরক্ষার প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল—"শত্রু তো এলো, নগরেব বক্ষার উপায় কি?"

তিষ্যরক্ষা তাহাদের কথায় কর্ণপাত কবিল না। তাহাবা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে গালি দিতে দিতে অশোক রাজাকে অন্বেষণ কবিতে লাগিল। মহাবাজা অশোক তখন নগর হইতে অনেক দূবে বেনুবনে উপগুপ্তের সহিত বাস কবিতে ছিলেন—সমস্ত লোক গিয়া তথায় তাঁহাকে বেষ্টন কবিযা ধবিল এবং তাঁহাকে এই অভাবনীয় বিপদেব সময স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণেব জন্য অনুবোধ কবিতে লাগিল। তখন অশোক, বাধগুপ্ত ও তিষ্যবক্ষাব প্রতি কিঞ্চিৎ বিবক্ত হইযা নগবাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

২

অশোক আসিতে আসিতে নগরবাসীদেব মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন। কাঞ্চন ও কুণালের অবস্থা শুনিয়া তাঁহাব মনেব উদ্বেগ আবো বৃদ্ধি হইল। তিনি বাজবাটীর দ্বার হইতে আশ্বাস বাক্যে প্রজাদিগকে বিদায় দিয়া প্রথমেই তিষ্যরক্ষার মহালে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, তিষ্যরক্ষা ও রাধ-গুপ্ত কি পরামর্শ করিতেছে। বাজা রাধগুপ্তকে দেখিয়া বলিলেন—

"কুঞ্জকর্ণ নাকি সসৈন্যে আসিতেছে?

রাধগুপ্ত বলিল—"কুঞ্জরকর্ণ তক্ষশিলায় জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমরা পাই নাই।"

"কুণালের কি হইয়াছে? কাঞ্চন কোথায়? তোমরা এতদিন সৈন্য পাঠাও নাই কেন? যে সব সৈন্য পাঠাইয়াছ তাহাদেরই বা সংবাদ কি? আমি তো এপর্য্যন্ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রাজা এত দ্রুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে রাধগুপ্ত কিছুরই জবাব দিতে পারিল না। রাজা যে এসময় উপস্থিত হইবেন তাহার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। রাজা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আরো ব্যস্ত হইয়া আরো লক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া তিষ্যরক্ষাকে সংবাদ দিল যে

তক্ষশিলা হইতে একজন বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। সে বলে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

রাজা বলিলেন ;—"তক্ষশিলা হইতে ?"

কঞ্চুকী রাজাকে দেখিয়াই আভূমি প্রণত হইয়া বলিল,—"মহারাজের জয় হউক।"

"জয় পরে হবে, সে লোক কি তক্ষশিলা হইতে আসিয়াছে ?"

কঞ্চুকী বলিল—,"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাহাকে লইয়া আইস।" মন্ত্রী নিষেধ করিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিয়া বলিল,—"দূতের সহিত সাক্ষাতের এ সময় নহে, বিশেষ মহারাণী ক্লান্ত আছেন।"

রাজা রাধাগুপ্তের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—"তুমি মহারাজের আজ্ঞা পালন কর।'

কঞ্চুকী শশব্যস্তে বিজ্ঞানবিৎকে আনিতে প্রস্থান করিল।

মন্ত্রী বলিল,—"মহারাজ, আপনার রাজ্যাবস্থের আর অল্প দিনই আছে।"

রাজা বলিলেন,—"অল্পদিন আছে, তাহা জানি, কিন্তু সে কথা স্মরণ করিয়া দিবার তাৎপর্য্য ?"

"এই কয় দিন মহারাণীকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে না দিলে আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।"

"তত দিনে মগধ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইবে ?" রাজা এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী বিজ্ঞানবিৎকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বিজ্ঞানবিৎ আপন বস্ত্র মধ্য হইতে একটি বাক্স লইয়া রাণীর হস্তে দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তক্ষশিলা হইতে আসিতেছ ?'

সে বলিল,—" হাঁ।'

"সে রাজার কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল,—"

'দেবি, এই দুইটি চক্ষু লইয়া আসিতে আমায় যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে বলিতে পারি না। রাজপথে বিশল্যকরণী মিলে না। সুতরাং আমাকে—

চক্ষুর কথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষা শিহরিয়া উঠিল, বাক্সটি খুলিল, খুলিয়া চক্ষু দুটী বাহির করিল দেখিল সে চক্ষু এখনও তেমনি উজ্জ্বল—সে উহা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া পদতলে দলিত করিল—করিয়াই ব্যস্ত সমস্ত

ভাবে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন এ চোখ কাহার—কোথায় পাইলে? কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনার পথের কষ্টের কথা বলিতেছিল, সে বিশল্যকরণী অন্বেষণ কবিবার জন্য কখন সাপের মুখে পড়িয়াছে কখন বাঘের মুখে পড়িয়াছে; নহিলে সে চক্ষু টাটকা থাকে না, ইত্যাদি বলিতেছিল।

রাণী চলিয়া গেলে রাধগুপ্ত তাহাক বলিলেন,—

"থাম, দেখিতেছ না রাণীর অসুখ হইয়াছে? তোমায় এ সময়ে কে আসিতে বলিয়াছিল?"

সে বলিল,—

"আমি কি করিয়া জানিব? আমায় একজন অনেক টাকা দিয়া ঐটী মহারাণীর হস্তে দিতে বলিয়াছিল। আবো বলিয়াছিল যে মহারাণীর হাতে দিলে তিনি অনেক পুবস্কাব দিবেন।"

বাজা বলিলেন,—

"কে সে লোক?"

বিজ্ঞানবিৎ বলিল,—

"তাহা আমি জানি না। আমাব বিজ্ঞানেব অনেক পবীক্ষা কবিতে হইবে, তাহাতে আমার অনেক টাকার প্রযোজন। সে আমায টাকা দিল এবং আরো পাইবার আশা দিল—আমি লইয়া আসিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে সে তুমি তাহাকে চেনো?"

সে বলিল,—

"না।"

"তুমি আসিতেছ কোথা হইতে?"

"বাসুকীশীল হইতে।"

"সে কোথায়?"

"তক্ষশিলা হইতে আট ক্রোশ পূর্ব্বে।"

"সেখানকার বিদ্রোহের কি সংবাদ জান?"

"বিদ্রোহ কোথায়?"

"তক্ষশিলায়।"

"হাঁ, একটু একটু জানি। পাঁচ ছয় মাস হইল, কতকগুলি কাটা পা যোড়া দিয়াছি। শুনিয়াছিলাম বিদ্রোহে তাহাদের পা কাটা গিয়াছিল।"

রাজা দেখিলেন, উহার নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পরীক্ষার জন্য এত টাকা চাও?"

সে বলিল;—"অন্ধত্ব দূর করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন,—"অশোক সিংহাসনে আরূঢ় হইলে আসিও, তিনি তোমায় পুরস্কার করিবেন।"

"মহারাণী আমায় পুরস্কার কই দিলেন? আমি কি অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিব?"

"থাকিলেই বা হানি কি?"

"তাহাও যদি ঠিক জানিতাম যে নিশ্চয় হইবে, না হয় দুপাঁচ দিন থাকিতাম। কিন্তু যে একবার আপন রাজ্য পরকে, বিশেষ স্ত্রীলোককে দেয় সে কি আর উহা ফিরিয়া পায়?"

মন্ত্রী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—"তুমি তো বড় অর্ব্বাচীন। তুমি জান কাহার সহিত কথা কহিতেছ?"

সে বলিল—"জানি আর নাই জানি, সত্য কথা যমের সাক্ষাতেও কহা যায়।"

মন্ত্রী বলিলেন—"তুমি এখন অতিথিশালে যাও, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব।"

"কিন্তু আমি অধিক দিন থাকিতে পারিব না।"

"আজই ব্যবস্থা করিব", বলিয়া মন্ত্রী তাহাকে বিদায় দিলেন।

৩

বিজ্ঞানবিৎ চলিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সব কি?"

মন্ত্রী গললগ্নীকৃতবাস হইয়া রাজার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, এ কয়দিন আমায় কিছু বলিবেন না। আমি আপনারই ভৃত্য। আপনিই আমাকে অন্য হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আপনি জানেন, রাজ্যের কার্য্য অতি দুরূহ। এ কয়েকদিন আমার প্রভুর অননুমতিতে আপনাকে কোন কথা বলিতে পারিব না।"

রাজা বলিলেন—"সাধু, কিন্তু নগরবাসীদের ভয় নিবারণের কি উপায় করিয়াছ?"

"তাহাও মহারাণীর ইচ্ছা।"

এই সময় আবার তক্ষশিলা হইতে দূত আসিল। কুণাল বন্দী হওয়ার পর তাঁহার সৈন্যেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কেহ বিদ্রোহে যোগ দিতেছে, কেহ দেশীয় লোকদের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। শীঘ্র সৈন্য ও সেনাপতি না পাঠাইলে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইবে। এই সংবাদ লইয়া উভয়েই দ্রুতগতি রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনও তাহার মনের আবেগ শান্ত হয় নাই। সে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া উহাদিগকে পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তথায় আসিয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"মহারাজ, আমার আর রাজত্বে কাজ নাই। আমি স্ত্রীলোক। রাজ্য চিন্তা আমার পক্ষে বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।"

মন্ত্রী তখন বার বার রাণীর শরীরের অসুখের কথা কহিতে লাগিল—"এ দিন শিরঃপীড়া হইয়াছিল, ও দিন ভ্রমি হইয়াছিল, সে দিন মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আজিও তো দেখিলেন"—ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন—"রাজ্যভার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

অমনি রাধগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন—"তবে আপনি প্রধান মন্ত্রী হইয়া আমায় অব্যাহতি দিন।"

"রাধগুপ্ত থাকিতে অন্য কেহ মন্ত্রী।"

রাণী বলিলেন, "তবে এই গোলযোগের সময় আপনি সেনাপতি হন।"

রাজা বলিলেন, "সেই ভাল। আমি নগরবাসীদিগকে শান্ত করিয়া তক্ষশিলায় যাত্রা করিব। যাবৎ না ফিরিয়া আসি তোমরা যেমন রাজ্য করিতেছিলে তেমনি রাজ্য কর।"

মৃত্যুতেও মৃত্যু নাই, ইহলোকের পর পরলোক আছে মানুষ চিরকাল এইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে, বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, আশা করিয়া আসিতেছে।

এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস, এই আশা কি অমূলক? মৃত্যু কি সত্যই মৃত্যু? ইহলোকের পর কি পরলোক নাই?

অসভ্য আদিম অবস্থাপন্ন মানুষ কেন পরলোক বিশ্বাস করে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয় তাহারা নিজেও বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারে না। কিন্তু সেই জন্যই বোধ হয় যে পরলোকবাদ নিতান্ত অমূলক নয়। কেহ কেহ বলেন যে অসভ্য মনুষ্য অনেক সময়েই ক্রোধ ভয় প্রভৃতি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস করিয়া থাকে, অতএব অসভ্য মনুষ্য প্রায়ই কুসংস্কারপরতন্ত্র (superstitious)। কিন্তু ক্রোধই বল আর ভয়ই বল, অসভ্যাবস্থায় প্রবৃত্তি মাত্রই স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, শিক্ষার ফল অথবা শিক্ষা দ্বারা বিকৃত নয়। তবে কেমন করিয়া বলি যে অসভ্যের পরলোকবাদ কুসংস্কার মাত্র? অসভ্য মনুষ্যের বিশ্বাস অনেকস্থলে ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে সত্য। অসভ্য মনুষ্যেরা চিত্রিত মনুষ্যমূর্ত্তিকে জীবিত মনুষ্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে। কিন্তু অসভ্য মনুষ্যের যে সকল বিশ্বাস, ভ্রান্তি অথবা শিক্ষাভাবের ফল, সে সকল বিশ্বাস সভ্যতা অথবা শিক্ষার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের অসভ্যাবস্থার যে সকল বিশ্বাস তাহার সভ্য অথবা শিক্ষিত অবস্থাতেও থাকিয়া যায় সে সকল বিশ্বাসকে কেমন করিয়া অমূলক, ভ্রান্তিমূলক বা কুসংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিই? অধিকন্তু যে বিশ্বাস অনেক শিক্ষা, অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, থাকিয়া যায়, তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব। স্থিতিশীলতা অসারতার গুণ নয়, সারত্বের গুণ। অপরপক্ষে আমি এইরূপ বুঝি যে মানুষের কুসংস্কার প্রায়ই কুশিক্ষার ফল এবং সেই জন্য প্রকৃত কুসংস্কার মানুষের শিক্ষার পূর্ব্বগামী

অবস্থার লক্ষণ হইতেই পারে না। আদিম অসভ্য অবস্থায় মানুষ শিক্ষাধীন* থাকে না। অতএব শিক্ষিত অথবা সভ্য অবস্থার কোন বিশ্বাস বা সংস্কার অশিক্ষিত অথবা অসভ্যাবস্থায় দেখিতে পাইলে তাহার সারত্ব এবং বিশুদ্ধতা বিষয়ে অনেকটা স্থিরনিশ্চয়তা জন্মে। মনুষ্যের পরলোকবাদ সেই শ্রেণীর বিশ্বাস। পরলোকবাদ উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়। কিন্তু অসভ্যের পরলোকবাদের হেতু ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। অতএব সে বিষয়ে আর কিছু বলিব না।

মোটা মুটি বলিতে গেলে, শিক্ষিত অথবা সভ্য মনুষ্যের পরলোকবাদের তিনটি হেতু আছে। প্রথম, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা; দ্বিতীয়, কর্ম্মফলভোগ; তৃতীয়, আত্মার অমরতা। মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে মৃত্যু হইলে সমস্তই লয় হইবে, এইরূপ ভাবিতে মানুষের যথার্থই হৃৎকম্প হয়। কিন্তু মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা বলবতী বলিয়া মানুষ মরিয়াও মরিবে না, ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে থাকিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মানুষের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহাকে মরিতে না হয়। কিন্তু মরিতে ইচ্ছা হয় না বলিয়া মানুষ অমরত্ব লাভ করে না। তবে মনুষ্যের মধ্যে অনেক মহাপুরুষ এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথা মহাকবি মিল্টন লিখিয়াছেন :—

--------Who would lose,
Though full of pain, this intellectual being,
Those thoughts that wander through eternity,
To perish rather, swallow'd up and lost
In the wide womb of uncreated night,
Devoid of sense and motion ?

মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার যে বলবতী ইচ্ছা আছে মহাকবি তাহাই প্রধানতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে একটু যুক্তিরও আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যেন তর্ক করিতেছেন যে, উন্নত জ্ঞানময় অস্তিত্ব এবং অনন্তভেদী অনন্তবিহারী চিন্তার ন্যায় উত্তম পদার্থ কি লয় হইতে পারে? আমরা যতদূর বুঝি এবং বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা আমাদিগকে যতদূর বুঝাইতে পারিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ভাবন করা এবং

* শিক্ষা শব্দে এখানে শাস্ত্রবেত্তার উপদেশ অথবা পুস্তকলব্ধ জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

অধমকে নষ্ট করিয়া উত্তমকে রক্ষা করা জাগতিক শক্তির অভীষ্ট কার্য্য। কিন্তু উত্তমও ত বিনষ্ট হয়? সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহও ত ছাই হইয়া যায়? তবে কেমন করিয়া জোর করিয়া বলি যে চিন্ময় অস্তিত্ব উত্তম জিনিষ বলিয়া তাহার বিনাশ নাই?

দ্বিতীয় কারণ কর্ম্মফলভোগ প্রথম কারণ অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মের ফলভোগ অপরিহার্য্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আগুণে হাত দিলে হাত অবশ্যই পুড়িবে এবং দুর্নীতি অনুসরণ করিলে জীবন অবশ্যই কদর্য্য হইবে। কিন্তু কর্ম্মের ফলভোগ আছে বলিয়া পরলোকও আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। অনেক অধার্ম্মিক দুর্নীতিপরবশ লোককে ইহলোকে সুখভোগ করিতে দেখা যায় বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে তাহারা পরলোকে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। কিন্তু বুঝা আবশ্যক যে অধার্ম্মিক এবং দুর্নীতিপরবশ হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়া যায়, বিশাল এবং বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব লাভে যে উৎকৃষ্টতম সুখ ও সৌন্দর্য্য মানুষ তাহা ভোগ করিতে পায় না—মানুষ তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাই কি দুষ্কর্ম্মান্বিত মানুষের দুষ্কর্ম্মের যথেষ্ট ফলভোগ নয়? অনেক ধার্ম্মিক লোক ক্লেশ পাইয়া মরে সত্য. কিন্তু ধার্ম্মিকের সুখ মনে, সম্পদে নয়। অতএব কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত পরলোক কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারি না। আরো এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় যে সুখ দুঃখের কারণ অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে উদ্ভূত হয়, লোকের নিজের নিজের সৃষ্ট নয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফলভোগের নৈতিক হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরলোকেরও প্রয়োজন থাকে না। তবে যদি বল যে প্রত্যেক সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম শক্তির ফল, এবং শক্তির বিনাশ নাই, তাহা হইলে কথাটি কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। কেন না তাহা হইলে কর্ম্মের ফল বিনষ্ট হইতে পারে না এবং অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে তাহা হইলেও একটু গোল থাকে। কেন না কর্ম্মের ফল শক্তিরূপ বলিয়া যদিও বিনষ্ট হইবার নয়, তথাপি কর্ম্মফলরূপ শক্তি যে কর্ম্মকর্ত্তাতেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অধিকার করিবে না, এমন কোন কথাই নাই। কথা নাই সত্য। কিন্তু কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকে অধিকার করিলে, সেই অপর ব্যক্তিই কর্ম্মকর্ত্তার পরলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ ইদানীন্তন ইউরোপীয় দার্শনিকেরা কর্ম্মফলবাদ হইতে এই প্রকারেই পরলোকবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। যথা জার্ম্মাণ দার্শনিক ফেকনর:—

Every person, in his lifetime, takes hold of, and grows into the minds of others, by his words and works, spoken, written, or acted. While Goethe was still alive thousands of his contemporaries bore within them some sparks from the light of his genius, which afterwards kindled up into new light. While Napoleon was still alive, his powerful genius exercised its influence on the whole generation almost, and when the one and the other died, the germs which had fallen into other minds, did not die with them, they grew, and developed themselves, constituting in their total an individual being, as their origin had been from an individual.

কর্ম্ম ও শক্তি একই বস্তু; শক্তির বিনাশ নাই। অতএব ঠিক পৌরাণিক পদ্ধতিতে না হউক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরলোক কর্ম্মফলবাদের অপরিহার্য্য ফল। কিন্তু লোকে যাহাকে পরলোক বলে, এ সে পরলোক নয়। না হইলেও এ কথা বলিতে পারি যে লোক-সাধারণের শিক্ষার যত উন্নতি হইবে এই সিদ্ধান্ত ততই তাহাদের হৃদয় অধিকার করিবে; ততই তাহাদের ধর্ম্মনীতি পরলোকমূলক হইবে; ততই পৃথিবীতে ইহলোক এবং পরলোক, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়িবে; এবং ততই কালের স্রোত প্রেমের স্রোত হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু পরে যাহা লিখিতেছি তাহা বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইবে যে এ পরলোক নিতান্তই অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ এবং অতৃপ্তিকর।

আত্মা কোন একটী স্বতন্ত্র জিনিষ কি না, এবং দেহ মন সমস্ত নষ্ট হইলে আত্মা জীবিত থাকিবে কি না, বলিতে পারি না। বহুকাল হইতে মানুষ সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছে বটে এবং বুঝিবার হেতুও দর্শাইয়া আসিতেছে। বিশেষ প্রাচীন ভারতবর্ষে যোগশাস্ত্রদ্বারা আত্মার স্বাধীনতা এবং অমরতা একরকম কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সে সকল কথা এখন ভাল বুঝা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। অপরপক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকারে জীবন-তত্ত্ব বুঝাইয়া থাকেন তাহা বিবেচনা করিতে গেলে দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র জীবন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলেন, যেখানে স্নায়ু অথবা স্নায়ব প্রণালী নাই সেখানে চিন্ময় জীবন নাই। মরিলে স্নায়ব প্রণালী ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব মরিলে আত্মা কি অপর কিছুই জীবিত থাকিতে পারে না। আত্মার স্বাধীনতার এবং অমরতার প্রমাণ যে নাই তাহা আমরা জানি।

অতএব আত্মার স্বাধীন জীবন প্রমাণ কি অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক জীবন-তত্ত্বের উল্লেখ করি নাই। যে কারণে উল্লেখ করিয়াছি পরলোকবাদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বৈজ্ঞানিকের জীবন-তত্ত্ব পরলোকবাদের প্রতিকূল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জীবন-তত্ত্বে একটী বিষম ভ্রম আছে। সেই ভ্রমটি বুঝাইয়া পরলোক প্রমাণ করিব।

জীবন কি? অথবা জীবন কিসে থাকে, কিসে হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কৃতকার্য্য না হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে যাঁহারা এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এক একটি পদার্থ বিশেষকে জীবনের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে জীবন তাপ বই আর কিছুই নয়। কেহ কলিয়াছেন জীবন তাড়িৎ বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন স্নায়ব প্রণালী বই আর কিছুই নয়। কেহ বলিয়াছেন জীবন কোন একটি স্বতন্ত্র শক্তি বিশেষ। কিন্তু একটু নিবিষ্ট ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে জীবন কোন একটি পদার্থ বা শক্তি বিশেষ নয়; জগতে যাহা কিছু আছে সকলই জীবন। যাহা না থাকিলে বা না পাইলে জীবন থাকে না তাহাই জীবন। স্নায়ব প্রণালী না থাকিলে মানুষের জীবনের ক্রীয়া হয় না সত্য। কিন্তু স্নায়ব প্রণালী থাকে কেমন করিয়া? পানাহারের জোরেই স্নায়ব-প্রণালী থাকে কি না? যদি তা হয়, তবে যাহা পানাহার করিলে স্নায়ব-প্রণালী থাকে তাহাকেই জীবন বলিয়া স্বীকার করা উচিৎ কি না? দেহে যত ধাতু বা মৌলিক পদার্থ, (elementary substance) আছে সকলই জীবন এবং সেই সকল ধাতু বা মৌলিক পদার্থ যাহাতে আছে তাহাই আমাদের জীবন। আবার মানুষ ছাড়িয়া পশু, পশু ছাড়িয়া পক্ষী, পক্ষী ছাড়িয়া সরীসৃপ, সরীসৃপ ছাড়িয়া কীটপতঙ্গ, কীটপতঙ্গ ছাড়িয়া মৎস্য, মৎস্য ছাড়িয়া উদ্ভিদ, এইরূপ পৃথিবীতে যত জীবিত বস্তু আছে, সকলের পুষ্টিসাধন জীবনপোষক বস্তুই জীবন। যখন অনাহারে মৃত্যু হয় তখন যাহা আহার করা যায় তাহাই জীবন। যখন তৃষ্ণার অশান্তিতে মৃত্যু হয়, তখন যাহা পান করা যায় তাহাই জীবন। যখন শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় তখন যাহা নিশ্বাসিয়া লওয়া যায় তাহাই জীবন। কিন্তু জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা আহারীয় নয়, পানীয় নয়, অথবা নিশ্বাসিয়া লইবার নয়? অতএব জগতে এমন কোথায় কি আছে যাহা জীবন নয়? এইটি জীবন-তত্ত্ব বুঝিবার প্রকৃত পদ্ধতি। এবং এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা জীবন নয়, কেন না জগতে এমন কিছুই নাই যাহা জীবন-সাধন এবং জীবনপোষক নয়,—

ধূলাও জীবন, মৃত্তিকাও জীবন, জলও জীবন, সূর্য্যালোকও জীবন, চাঁদের সুধাও জীবন, দুগ্ধও জীবন, মাংসও জীবন, গোধূমও জীবন, বাতাসও জীবন, পাথরও জীবন, সাপের বিষও জীবন, পচা মৃতদেহও জীবন। বাস্তবিক জগতে মৃতবস্তু বা মৃত্যু নাই—সকলই জীবন। শুধু তাও নয়। জগতে জীবিত ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ নাই। জগতে যাহা কিছু আছে সমস্ত লইয়া জীবন—যেন সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুতে দুগ্ধস্থিত জলের ন্যায় জীবন হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে, ওতপ্রোত ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। যেন সমস্ত জগৎ একটি বিপুল জীবন্ময় উচ্ছ্বাস। সমস্ত জগৎ একটি বিশাল জীবন। জগতে যাহা কিছু আছে, সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত—সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমার জীবন, তোমার জীবন, সকলেরই জীবন সেই বিশাল জীবনের অন্তর্ভূত। আবার সেই বিশাল জীবনের দৈর্ঘ্য ভূতকালেও অসীম, ভবিষ্যতেও অসীম। অথবা তাই বা কেন বলি? ভূত ভবিষ্যতের বিভাগ কোথায়? জগতের বিশাল জীবনে ছেদ কোথায়? ছেদ হয় কেমন করিয়া? না, জগতের বিশাল জীবনে ছেদ নাই, ছেদ হইতেও পারে না। জগতের বিশাল অনন্ত জীবনের নাম অসীম অনন্ত জগৎ। অসীম অনন্ত জগতের নাম বিশাল অনন্ত জীবন। অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোক ও পরলোকের প্রভেদ কি? অসীম অনন্ত জীবনে ইহলোকও আছে, পরলোকও আছে, সব লোকই আছে। যে বলে, অসীম অনন্ত জীবনে পরলোক নাই, জীবন কাহাকে বলে সে জানে না, জগৎ কাহাকে বলে সে জানে না। এই জীবনরূপী জগতে ইহলোকের পর পরলোক থাকিবেই থাকিবে। কেন না যেখানে জীবন বই আর কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যুর স্থান নাই।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল জীবনে আমিও জীবন, তুমিও জীবন। আমার জীবনও সেই বিশাল জীবনে জীবিত, তোমার জীবনও সেই বিশাল জীবনে জীবিত। আমিও সেই বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তুমিও সে বিশাল জীবন ছাড়িয়া থাকিতে পার না। তবে আইস আমরা সেই বিশাল জীবনে মজিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে মাতালের ন্যায় মাতিয়া থাকি, সেই বিশাল জীবনে প্রেমিকের ন্যায় মরিয়া থাকি। সেই মৃত্যুতেই তোমারও প্রকৃত জীবন, আমারও প্রকৃত জীবন।

মুসলমান ও ইংরাজী ইতিহাস লেখকেরা যদি কখন কোন হিন্দুর প্রশংসা করিয়া থাকেন তবে সে সিতাব রায়ের। সিতাব রায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় জাতি নানা ভাগে বিভক্ত। তিনি সুক্সন জাতীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। দিল্লী সাজেহানাবাদে তাঁহার জন্ম হয়। মহম্মদ সার রাজত্বকালে সামসাম উদ্দৌলা আমির উল ওমরা ছিলেন। তিনিই খাঁ দৌরান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাঁ দৌরানের পুত্র সাম সাম উদ্দৌলা দিল্লীর মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক ছিলেন। সিতাব রায় অতি অল্প বয়সে তাঁহার বাড়ীতে চাকরী আরম্ভ করেন। তাঁহার বেতন প্রথমে অতি অল্প ছিল। সাম সাম উদ্দীনের দাওয়ান আগা সলিমান সিতাব রায়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এবং তিনি সিতাবকে বিষয় কর্ম্মে শিক্ষা দেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে সিতাব আপন কার্য্য দক্ষতা বলে আসা সলিমান ও সাম সাম উদ্দীনের বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। যখন সাম সাম উদ্দীনের পরলোক হয় তখন দিল্লীতে ভয়ানক অরাজক, নিত্য রাজপরিবর্ত্তন হইত, বাহিরের লোক দিল্লী আক্রমণ করিত, মহারাষ্ট্রীয়েরা লুঠপাট করিত এবং দিল্লীর ভিতরের ওমরাহদিগের অন্তর্বিবাদে রাজবর্ত্ম সকল রক্তে প্লাবিত হইত। আপনার প্রভুর পরলোক গমনের পর সিতাব দেখিলেন যে দিল্লীতে বাস করিলে নানা বিপদ হইতে পারে, এজন্য তিনি বাদসাহের নিকট বেহার প্রদেশের দাওয়ানী গ্রহণ করেন। এবং মালদহ অঞ্চলে তাঁহার প্রভুর পুত্রের যে জায়গীর ছিল তাহার কর্ত্তা হন। বাদসাহ তাঁহার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রোটাস্ দুর্গের গভর্ণর করিয়া দেন, সুতরাং তিনি এই তিনটি কর্ম্ম লইয়া ১৭৫৮ সালে দিল্লী হইতে পাটনা যাত্রা করেন।

এই সময়ে মিরজাফর ইংরাজ বন্ধুদিগের সহিত পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; রাজা রামনারায়ণ বিহার প্রদেশের নিজাম ছিলেন; রাজা রামনারায়ণের পরম বন্ধু মহম্মদী খাঁ সিতাব রায় যে তিন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই তিন কর্ম্ম করিতেছিলেন। সিতাব পাটনায় উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার

পদপ্রাপ্তি নিতান্ত দুরূহ ; তিনি অনেক লোকজন সঙ্গে করিয়া প্রকৃত ওমরাহের ন্যায় আসিয়াছিলেন ; তাঁহার কথা বার্ত্তা এবং আচার ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইয়াছিল ; তিনি প্রথমেই আসিয়া রাজা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই মিরজাফরের নিকট পরিচিত হইলেন। সিতাবের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন ; তিনি দুই এক দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে মিরজাফর আপনার আমোদ লইয়াই ব্যস্ত, রাজকার্য্য বুঝেন না ; তিনি আর বুঝিলেন মহম্মদী খাঁর সহিত রামনারায়ণের যেরূপ সদ্ভাব তাহাতে রামনারায়ণ দ্বারা তাঁহার কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তিনি প্রথমেই ইংরাজদিগের সহিত সদ্ভাব করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি নানা প্রকার বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া এবং সর্ব্বদা আনুগত্য করিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুর্ষিদাবাদে আগমন করিলেন। তথায় কর্ণেল ক্লাইব এবং মিরজাফর উভয়ে তাঁহাকে রামনারায়ণের নিকট এই মর্ম্মে এক অনুরোধ পত্র দিলেন যে, "আপনি রাজা সিতাব রায়কে বাদসাহ দত্ত পদ সমত্ত প্রদান করিবেন।" রামনারায়ণ কর্ণেল ক্লাইবের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। এইরূপ নির্বিবাদে সিতাব রায় বেহারের দেওয়ান ও রোটাস্ দুর্গের গবর্ণর হইলেন। বলা বাহুল্য যে ইংরাজদিগের সহায়তা না পাইলে বাদসাহের ক্ষমতা তৎকালে এরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, যে সিতাবের এতাদৃশ উচ্চপদ প্রাপ্তি দুরূহ হইয়া উঠিত। দেওয়ানী পাইয়া সিতাব রায় এরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, যে অতি অল্প দিনের মধ্যে রামনারায়ণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বেহার প্রদেশে সিতাব রায়ের প্রাধান্যের এই সূত্রপাত ; তিনি এই অবধি বেহারের একজন প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

যে সময়ে বাদসাহের পুত্র আলিগোহর বারবার পাটনা আক্রমণ করেন, সে সময়ে সিতাব রায় রামনারায়ণের অবিচলিত বন্ধু ছিলেন এবং সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সহায়তা করিতেন। তিনি এই গোলযোগের সময় আপনার বাড়ী ও কাছারী রক্ষা করিবার জন্য দুইশত অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক পদাতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের সহিত বাদসাহের যুদ্ধকালে এই সকল লোক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

এক সময়ে রামনারায়ণ বেহারের অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতিকষ্টে পাটনা রক্ষা করিতেছিলেন। পাটনার বাহিরে সমস্ত স্থানই বাদসাহের অধিকৃত হইয়াছিল। এমন সময়ে সহসা সম্বাদ আসিল পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁ

বাদসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া পুর্ণিয়া হইতে পাটনার অপর পার গাজিপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। রামনারায়ণ একান্ত ভীত হইয়া আমিয়াট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমিয়াট সাহেব বলিলেন কাপ্তেন নক্সের সহিত তিনদল তেলিঙ্গা ও একদল ইংরাজ সৈন্য আছে, আপনি নগর রক্ষার উপযোগী কয়েক জন মাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য কাপ্তেনের সহিত প্রেরণ করুন; বাদসাহ হইতে কোন ভয় নাই; তিনি এক্ষণে শীকার খেলিতে মত্ত আছেন। রাম নারায়ণ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; কাপ্তেন নক্স পাঁচশত মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহাবে কিরূপে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন। যাহা হউক রামনারারণ আপনার প্রধান সেনাপতিকে কাপ্তেন নক্সের সহিত যোগ দিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু দুই তিন ক্রোশের অন্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন যুদ্ধের নামও করিলেন না; তখন কাপ্তেন নক্স রাজা সিতাব রায়কে স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য অনুরোধ কবিলেন। সিতাব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ করা দূরে থাকুক রাত্রে সিতাব রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন আপনি কি বুঝিতেছেন না, রামনারায়ণ আপনাকে ও আমাকে ভালবাসেন না, সেই জন্যই আমাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু সিতাব রায় তাহাতে বিচলিত হন নাই। কাপ্তেন নক্স ও সিতাব রায় দুই প্রহর রাত্রে শত্রুদিগকে আক্রমণের জন্য উদ্‌যোগ করিলেন; কিন্তু তিনটার পূর্ব্বে তাঁহারা শিবির হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না এবং তাঁহারা বহির্গত হইবামাত্রই কাদিম হোসেন তাঁহাদের শিবির লুঠ করিয়া লইলেন এবং এরূপ দক্ষতার সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ইংরাজ-দিগের জিতিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই রহিল; এরূপ সহসা আক্রমণ দেখিয়া ইংরাজদিগের কতকগুলি পালকিওয়ালা নদীর তীরে যে কয়েকখানি নৌকা ছিল তাহাতে চড়িয়া পলায়ন করিল; ইংরাজদিগের পলায়নের উপায় রহিল না; পালকিওয়ালারা পাটনায় যাইয়া এই দুর্ঘটনায় সম্বাদ দিলে পাটনা শুদ্ধ লোক ভয়ে একান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল; মুসলমান ইতিহাস-লেখক এই সময় পাটনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

তিনি পাটনাবাসীদিগের এই সময়ের ভয়ের কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া-ছেন। তৎকালে সকলেই ভাবিয়াছিল কাপ্তেন নক্স ও সিতাব রায়ের আর রক্ষা নাই; রামনারায়ণের একপ্রকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। সহসা দূর হইতে কামানের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল; সে শব্দে যেন আকাশ কাটিয়া

গেল। সকলেই ভাবিল, যা—এইবার ইংরেজদিগের শেষ হইয়া গেল; কিন্তু উহারই মধ্যে একজন বলিল "যদি আর কামানের শব্দ শুনা যায় তবে জানিব ইংরাজেরা জিতিয়াছে।" বলিতে বলিতে আবার সেইরূপ গগন-ভেদী শব্দ হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল; আবার কামানের শব্দ হইল, বারবার কামানের অগ্নি দেখা দিল; কিন্তু সকলেই ভাবিল শত্রুর কামানের আওয়াজ্! এমন সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আমিয়ট্ সাহেবের নামে এক পত্র আসিল। কাপ্তেন নক্স লিখিয়াছেন, "আমরা জয়ী হইয়াছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘর্ম্ম ও ধূলায় আবৃত হইয়া কাপ্তেন নক্স ও সিতাব রায় পার হইয়া আমিয়ট সাহেবের কুটীতে উপস্থিত হইলেন। নক্স সাহেব বারম্বার বলিতে লাগিলেন "সিতাব রায়ই প্রকৃত নবাব (বীর); আমি এজন্মে কখন এরূপ বীর দেখি নাই।" কিন্তু তখনও রামনারায়ণের বিশ্বাস হইল না যে নক্স সাহেব জিতিয়াছেন; তিনি বলিলেন উহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তৎপর দিন প্রাতঃকালে সম্বাদ আসিল কাদিম সাহেব পলায়ন করিয়া বেত্তিয়ার রাজার আশ্রয় লইয়াছে; তখন আর সন্দেহ রহিল না; এই অবধি সিতাব রায় একজন বীর বলিয়া গণ্য হইলেন।

তাহার পর বাঙ্গালার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ইংরাজেরা মিরজাফরকে দূর করিয়া মিরকাসিমকে নবাব করিলেন; মিরকাসিম ইংরাজদিগকে দূর করিবার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; ইংরাজদিগের আশ্রিত লোকদিগের উপর দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। রাজা রামনারায়ণের প্রধান সহায় মুরারী ধরকে কারারুদ্ধ করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করা হইল; রাজা রামনারায়ণকে কারারুদ্ধ করিয়া মুরশিদাবাদে লইয়া যাওয়া হইল; তাহার পরই রাজা সিতাব রায়। সিতাব রায়ের উপরও অনেক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল; যাহাতে তাঁহার সর্ব্বনাশ হয় তাহারই চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু সিতাব রায় সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার সম্মান রক্ষার্থ আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিব। এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া নবাব সহসা তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি বাদসাহের নিকট হইতে রোটাসের গবর্ণরি এবং বেহারের দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন এবং সিতাব রায়ের নিকট এই দুই পদের কার্য্যের নিকাশ চাহিলেন। সকলেই বুঝিল এবার আর সিতাব রায়ের রক্ষা নাই; এই নিকাশের দায়েই মির কাসিম তাঁহার প্রাণ বধ করিবেন। কিন্তু ইংরাজেরা সিতাব রায়ের চির সহায়; কলিকাতার গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব তাঁহার হিসাব নিকাশ লইতে সম্মত হইলেন। সিতাব রায় মেজর কার্ণ্যাকের সহিত কলিকাতায়

উপস্থিত হইলেন; সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, সিতাব রায়ের কোন দোষ নাই। তখন ইংরাজেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে "আপনি নবাবের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যান।" সিতাব সম্মত হইলেন, ইলিশ ও লষিঙটন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন; তথা হইতে লষিঙটন সাহেব একদল তেলিঙ্গ লইয়া সিতাব রায়কে নিরাপদে বেহারের সীমা পার করিয়া দিয়া আসিলেন।

মিরকাসিমের চাকবি ত্যাগ করিয়া সিতাব রায় অযোধ্যায় প্রস্থান কবেন, এবং তথায় অল্প দিনের মধ্যে নবাবের সরকারে চাকরি প্রাপ্ত হন এবং নবাবের সর্ব্বাধ্যক্ষ বেণীবাহাদূরের একজন প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

মির কাসিম ইংবাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন সসৈন্যে অযোধ্যাব নবাবেব আশ্রয় গ্রহণ কবেন, তখন সিতাব রায়ের পরামর্শে বেণীবাহাদুর তাহাতে হস্তক্ষেপ কবেন নাই। এবং মির কাসিমের সহিত সন্ধি করিতে তাঁহার তাদৃশ মত ছিল না। কিছুদিনেব পর তিনি মিরজাফর এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে নবাবকে অনুবোধ কবেন; তখন নবাব ও বেণীবাহাদুর উভয়ে সিতাব বায়কে মিরজাফবের নিকট প্রেরণ কবেন এবং তাঁহাকে খিলাত দেন, মিবজাফব সিতাব বাযকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা কবেন।

গতবারের বঙ্গদর্শনে মেঘদূতের সমালোচনায় আমরা কালিদাসের স্বভাববর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ছাড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে।

হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। তাঁহাদের মতে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড় জগত প্রাণী জগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই। পার্থিব ঘটনায় মনুষ্যের ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাঁহারা একথা সহ্য করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা যেখানে যেখানে দুঃখ ঘটাইয়াছেন, সেই খানে সেই খানেই আবার সুখ দেখাইয়া কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। আবার সেই সংস্কারের বশেই তাঁহারা মানুষ জড় জগতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জড়জগতের শোভা অনুভব করিতেছে, একথা লিখিতে সাহস করেন না। তাঁহারা দেখান, মানুষ উপরে জড়-জগৎ নীচে; মানুষ জড় জগত হইতে ভিন্ন, পৃথক এবং উহার দ্রষ্টা সাক্ষীমাত্র। এরূপ বর্ণনা রঘুবংশে ত্রয়োদশে, শকুন্তলায় সপ্তমে, ভবভূতির মহাবীরচরিতে শেষ অঙ্কে। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ। ভারবি অর্জ্জুনকে জড় জগতের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষে উর্দ্ধে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং সেইখান হইতেই স্বভাবের উৎকৃষ্ট বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর মনের গতিই এই। এখন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কবিগণ মনুষ্যকে এইরূপে জড় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। মেঘদূতের স্বভাব বর্ণনাও তাহাই। মেঘ উচ্চ হইতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, বন, উপনগর, নগরী, কিরূপ দেখিবেন তাহাই লইয়া কবি ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে এরূপ বর্ণনা কম। তাঁহাদের এক কথা আছে "Bird's eye view". কিন্তু সে অতি সামান্য চিত্রমাত্র। একটী পর্ব্বতেরই না হয় 'Bird's eye view' তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের কবিরা চিরকালই সমস্ত জগতের Bird's

eye view লইয়া থাকেন। তাঁহাদের নায়কেরা সমস্ত জগতের উপর চটিয়া মনুষ্য-সমাজে সুখ না পাইয়া জড় জগতের সহিত মিত্রতা করিতে আসেন না। যখন সুখে বা দুঃখে সমস্ত মন ডুবিয়া যায়, যখন কেবল মন একটী মাত্র বাসনায় মগ্ন হয়, সেই সময় আমাদের কবিরা হয় সুখের বৃদ্ধি বা দুঃখের শমতার জন্য জড় জগতকে আনয়ন করেন। Childe Harolde যে চক্ষে জড় জগত দেখিয়াছেন, সে চক্ষে আমাদের কবিরা জড় জগত দেখেন না। যে মনের অবস্থায়—যেরূপ হৃদয়ের উন্মত্ততায় Skylark কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায়ই আমাদের কবিরা জড় জগতের সঙ্গে মানুষেব মনের সম্পর্ক বাধাইয়া দেন। তাহাতে স্বভাবের শোভা দ্বিগুণিত হয়, মনুষ্যেব অন্তরেব শোভাও বর্দ্ধিত হয়।

কালিদাস এইরূপ উন্মত্ত অবস্থাতেই মেঘকে আনিয়া যক্ষের সম্মুখে ধরিলেন। যক্ষের Spirit মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলিল ; সমস্ত স্বভাবে তাহার গাঢ় সহানুভূতি হইল ; সম্মুখে দেখিতে যক্ষ মেঘকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু যক্ষও সেই পথে যাইতেছেন। মেঘ যেন যক্ষের আত্মা। সে যেন পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া মেঘ হইয়া যাইতেছে ; যাইবাব সময় মেঘদূতখানি মনে মনে লিখিয়া যাইতেছে। সে যেন দেখিতেছে, দূরে নর্ম্মদা উপলবিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু তাহাব প্রিয়া কত দূরে। রেবা দেখা যায় কিন্তু যক্ষপ্রিয়া লোচনের অদৃশ্য। এইরূপে ক্রমে দক্ষিণ হইতে উত্তর কৈলাস পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ দেখাইয়া কালিদাস মেঘকে অলকায় লইয়া গেলেন। অলকা সুখপুবী ; সে পুরীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার পর সেই পুবীর মধ্যে যক্ষের বাড়ী ; আর সেই বাড়ীর মধ্যে সেই "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা" রমণী। সে কি অবস্থায় আছে ? যক্ষ বলিতেছেন, "মেঘ, তুমি দেখিবে প্রিয়া হয় আমার মঙ্গলের জন্য পূজা করিতেছে, না হয় বিরহে আমি কত কৃশ হইয়াছি মনে মনে ভাবিয়া আঁকিতেছে ; অথবা সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'সারিকে তুই তো তাঁহার বড় প্রিয় ছিলি, তাঁর কথা কি তোর মনে হয় ?' না হয় মলিন বসনের উপর ক্রোড়ে বীণা ধরিয়া আমার কথার গান বাঁধিয়া গাইতেছে, আর নয়ন-জলে বীণার তার ভিজিয়া উঠিতেছে ; আর অন্যমনে সুর ভুলিয়া যাইতেছে ; অথবা ফুল দিয়া বিরহের আর কয় মাস আছে তাহাই গণিতেছে। আহা ! সে যখন কৃশশরীরে সেই দুগ্ধ ফেন-ধবল শয্যার এক প্রান্তে শুইয়া থাকিবে, তোমার বোধ হইবে যেন পূর্ব্ব আকাশে এককলা মাত্র চন্দ্রের উদয় হইয়াছে।"

এইখানে যক্ষরাজ তাঁহার প্রিয়াকে যে নিজ বিরহের সংবাদ দিয়াছেন, তত কোমল, তত মধুর, তত গভীর ভাব, বোধ হয় আর কখন কোন কবির হাত দিয়া বাহির হয় নাই। উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন, "We have few

specimens either in classical or in modern poetry of a more genuine tenderness or delicate feeling." ইহা পাশ্চাত্য কবির কল্পনার অতীত। যক্ষের সংবাদ এইরূপে আরম্ভ হইতেছে, যক্ষ বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, তখন যদি সে নিদ্রা গিয়া থাকে, তাহাকে জাগাইওনা; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিও; নিদ্রা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন দেখিবে, তাহার সে সুখের ব্যাঘাত করিও না। তাহার পর জাগিয়া উঠিলে তাহাকে এই মাত্র বলিও যে, 'আমি তোমার স্বামীর মিত্র মেঘ; তাঁহার সংবাদ লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। বিরহী প্রবাসিদিগের মন আমি প্রিয়ার জন্য উৎসুক করি; ও ত্বরায় তাহাদিগকে প্রিয়সন্নিধানে প্রেরণ করি।' এই কথা বলিলেই সীতা যেমন এক মনে হনূমানের কথা শুনিয়াছিলেন, সেই রূপ সে তোমার কথা শুনিবে। তাহার পর বলিবে 'সে মরে নাই; সে তোমার কুশল সংবাদের জন্য লালায়িত হইয়াছে; তাহার অঙ্গ ক্ষীণ হইয়াছে; সে কেবল মনে মনে তোমার ক্ষীণ অঙ্গ কল্পনা করিতেছে; আর মনে মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। সাদৃশ্য দেখিলে মনের তৃপ্তি হয়। সে শ্যামামৃগে তোমার শরীরের সাদৃশ্য দেখে; চকিত হরিণী-নয়নে তোমার নয়নের সাদৃশ্য দেখে। কিন্তু হায়! তোমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কিছুতেই নাই। প্রতিকৃতি দেখিলে মনের কষ্ট নিবারণ হয়! সে ধাতুরাগে তোমার ছবি পাথরে আঁকিয়া যেমন তাহার পদতলে পড়িতে যায়, অমনি নয়নের জলে তাহার দৃষ্টি লোপ হয়। তাহার পর স্বপ্নে যদি কখন তোমার সাক্ষাৎ লাভ হয়, সে তোমায় আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বপ্নে হস্ত প্রসারণ করে, আর তাই দেখিয়া বনদেবীগণের নয়ন দিয়া জলধারা নির্গত হয়। এইরূপে তোমার বিরহে সে এক প্রকার অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।' মেঘ! তুমি তাহাকে বলিও যেন এই কয় মাস কোন রূপে কাতর না হয়, তাহাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিও, আশা এখনও যায় নাই, একবার মিলন হইলে মনের সুখে অলকার সুখ সম্ভোগ করিব।"

এইরূপে মেঘকে সমস্ত সংবাদ দিতে বলিয়া যক্ষের মনে হইল, মেঘকে যে দূত করিয়া পাঠাইব, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞান কই? আমি যে উহাকে পাঠাইলাম প্রিয়া তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তখন যক্ষ কি বলিলেন? অঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন, না আর কোন চিহ্ন পাঠাইলেন? তাহা নহে। কালিদাস বুঝিয়া ছিলেন মেঘদূতে এরূপ অভিজ্ঞান চলিবে না। রামায়ণে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু এ প্রেমোচ্ছ্বাসে অঙ্গুরীতে হইবে না, তিনি বলিলেন,

"ভূয়শ্চাহত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি।"

বলেছেন, তব কান্ত একথা আবার :—"পূর্ব্বে একদিন তুমি ছিলে ঘুমাইয়া মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চীৎকার করিয়া কি জন্য কাঁদি উঠিলে জাগিয়া, হাসি জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্বপনে দেখেছি বিহার তব, ধূর্ত্ত, অন্য সনে।" অর্থাৎ আমার এই দুঃখের আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে তুমি এক দিন আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শয়ন করিয়াছিলে, তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলে, আমি কেন কাঁদিলে বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় বলিলে "শঠ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি তুমি আর এক রমণীর সহিত বিহার করিতেছ।" কি গাঢ় প্রণয়!! কি প্রগাঢ় বিশ্বাস!! আবার ইহাই যক্ষ অভিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া দিলেন। এত সুন্দর ও এত কোমলতার আকর যে মেঘদূত তাহাতেও আর দ্বিতীয় নাই—এই জায়গায় বুঝি কালিদাস বাল্মীকির উপর উঠিলেন। হনুমানের অঙ্গুরী অভিজ্ঞানে আর এ অভিজ্ঞানে যত প্রভেদ, বোধ হয় বাল্মীকি আর কালিদাসেও সেই প্রভেদ।

যেমন মধুর গ্রন্থ, মধুর ভাব, সমস্ত মধুময়, উপসংহারে মেঘের প্রতি যক্ষের আশীর্ব্বাদও তেমনি মধুময়। যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন

"মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।"

আমি আশীর্ব্বাদ করি যেন বিদ্যুতের সহিত তোমার এমন বিরহ না হয়। বিরহ সন্তপ্তের মুখে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ হইতে পারে?

আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক পণ্ডিতগণের যত্নে রসায়ণ শাস্ত্র অত্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা নানা রূপ পবীক্ষা এবং যুক্তি দ্বারা রাসায়ন শাস্ত্রে পঁয়ষট্টি প্রকার ভূতের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের আর্য্য পণ্ডিতগণ পাঁচ ভূতে মাত্র বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? এটী কি তাহাদিগের ভ্রম? যে দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছিল—যে দেশে বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বও অনেক পবিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে দেশে বৈদ্যুতিক নৈসর্গিক ব্যাপার অবিদিত ছিল না—যে দেশে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা—মাদুলি ধারণ প্রভৃতি—আধুনিক উন্নত চিকিৎসা তত্ত্বও পবিজ্ঞাত ছিল—যে দেশে মহাদ্রাবক (Sulphuric Acid) প্রভৃতি কঠিন রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষের প্রস্তুত প্রকরণ প্রচলিত ছিল, সে দেশে যে রাসায়ন তত্ত্ব এত অসম্পন্ন ছিল তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

আর দেখিতে গেলে আধিভৌতিক জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় সকল বিষয়কেই বিভিন্ন অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় পরীক্ষা এবং পরিদর্শন রূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রথা পরিজ্ঞাত না থাকিলেও সমস্ত পদার্থ পাঁচটী মাত্র মূল পদার্থ হইতে উৎপন্ন এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য অসভ্যাবস্থায় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিত—অনেক দেবতার কল্পনা করিত। ক্রমে, জ্ঞানের উন্নতি সহকারে একমাত্র জগতের আদিকারণ ঈশ্বর অনুমতি হইয়াছে। রাসায়নিক শাস্ত্রেও প্রথমে কত যৌগিক পদার্থকে মৌলিক পদার্থ মনে করা হইত। ক্রমে তাহাদিগের গুণানুসন্ধান করিয়া সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা এই সমস্ত পদার্থ হইতে পঁয়ষট্টিটা ভূত অর্থাৎ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। এখনও কত মৌলিক পদার্থকে যৌগিক পদার্থ স্থির করা হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পণ্ডিতবর টেট্ সাহেব তাঁহার Unseen Universe নামক পুস্তকে

দেখাইয়াছেন যে কালে সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলি যৌগিক পদার্থ স্থির হইবে—এবং সকল গুলিই একমাত্র আদি মৌলিক পদার্থের রূপান্তর মাত্র প্রমাণ করা হইবে। এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথমাবস্থায় বিদ্যুৎ উত্তাপ চুম্বক প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছিল—ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সে শক্তিগুলিকে একমাত্র আদি শক্তির রূপান্তর মাত্র স্থির করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতে থাকে ততই বহুত্ব হইতে একত্বের অনুমান হয়। যখন সকল শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আধিভৌতিক-জ্ঞানে প্রথমে একত্ব অনুমিত হওয়া সম্ভব নহে, তখন আর্য্যঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে আলোচনা না করিয়াই যে এরূপ সমস্ত মৌলিক পদার্থকে পাঁচটি মাত্র আদি পদার্থে পরিণত করিয়াছেন ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব হয়ত কেহ মনে করিবেন, যে আর্য্য ঋষিগণ আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে মূলানুসন্ধায়ী যুক্তির দ্বারা (*a priori* reasoning) পঞ্চভূতের কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কত দূর যুক্তিসঙ্গত? এই পঞ্চভূত তত্ত্ব আমাদের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যদিগের আদিমাবস্থা অন্বেষণ করিলে বুঝা যায় যে জ্ঞানের প্রারম্ভে প্রায় সকল জাতিই, ভূমি, জল অগ্নি ও বায়ু এই চারিটী ভূতে বিশ্বাস করিয়াছে। পুরাতন গ্রীক রোমানেরাও এই কথা বলিয়া গিয়াছে। সভ্য ইউরোপ হইতেও এ বিশ্বাস প্রায় দুই শত বৎসর মাত্র তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং যখন এই বিশ্বাস প্রথমে সর্ব্ব-জাতি-সম্মত ছিল, তখন ইহার মূল কারণ কি—আর তখন ইহার কি অর্থ ছিল?

প্রথম যখন মানুষ্যের মন হইতে অজ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল, তখন আত্মদৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন আমি কে, কিরূপে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, কি করিয়াই বা জীবিত আছি, মরিয়াই বা কোথায় যাইব, আর আমার সহিত অনন্ত অপরিজ্ঞাত জগতের আদিকারণের সহিতই বা কি সম্বন্ধ—এই সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান মনে প্রথমে সঞ্চার হইল। যখন আমাদের শরীর কিসে গঠিত—কিরূপেই বা রক্ষিত হয়—মনে হইল, তখন বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিল যে নিশ্বাসই আমাদের জীবন, নিশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়, আর বায়ুদ্বারা আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারি—সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস হইল যে বায়ু আমাদের জীবনের বড় প্রয়োজনীয়। তাহার পরে দেখিল অন্যান্য প্রাণীরাও বায়ুর দ্বারা জীবন ধারণ করে আর এই বায়ু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং বায়ুকে তখন একটা ভূত বলিয়া প্রতীতি হইল। জলও আমাদের আর একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ। জল ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না; সুতরাং জলকেও

ভূত বলিয়া স্বীকার করা হইল। এই কারণে অগ্নিও ভূতের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আর ক্ষিতি, ইহার ত কথাই নাই—ইহারই উপর আমরা বাস করি—ইহার দ্বারাই গৃহ-নির্ম্মাণ করি—আবার মরিলেও মাটির শরীর মাটীতে মিশিয়া যায়। সুতরাং ক্ষিতি আর একটী ভূত। ইহা ব্যতীত আর্য্যেরা আর একটী ভূতের কথা বলিয়াছেন। আমি কথা কহিলে তুমি কিরূপে শুনিতে পাও? মধ্যে যদি কোন পদার্থ না থাকে ত কে আমার কথা তোমার কাছে লইয়া যাইবে? কে বজ্রের ভীমনাদ দূরস্থ মেঘের কোল হইতে তোমরা কাণে আনিয়া দিবে? যে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আর এক ব্যক্তির কাছে কথা লইয়া যায় সে আমাদের পরমোপকারী নহে ত কি? ইহাই আকাশ, ইহাই আমাদের পঞ্চম ভূত। এইরূপে নিজের আবশ্যকমত আদিম জাতিরা একে একে পাঁচটী ভূত কল্পনা করিয়াছিলেন। তখন মানুষ আপনাকেই বুঝিত—আপনাকেই চিনিত, স্বার্থপরতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সুতরাং যাহা আমাদের আবশ্যকীয় নহে, যাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই তাহার কথা কেহ ভাবিত না।

এই গেল প্রথমাবস্থা। এ সময়ে পাঁচ ভূতের অর্থ জীবনের পাঁচটী আবশ্যকীয় পদার্থ (Five necessary existences)। ইহার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চ্চার সময় উপস্থিত হইল। আর্য্য ঋষিরাই প্রথমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে রত হন। মনই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্ঞেয় পদার্থ। ইহার দ্বারা প্রথমে একত্ব অনুমিতি হয়। এই একত্ব জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে বহুত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ কারণ হইতে কার্য্য অনুমিতির ইংরাজি নাম '*a priori* argument'. এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা প্রথমে আদি কারণ অনুমান করা হয়। এই সময়ে পঞ্চভূত জগতের সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আছে—ইহাই সর্ব্বত্র বিরাজমান—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়—এবং বাস্তবিক অধিকাংশ পদার্থে ইহার অস্তিত্ব দেখিয়া ইহাদিগকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র বিরাজমান, পঞ্চভূত (five existences or conditions pervading universe) মনে করা হয়। এ সময়েও পঞ্চভূতকে পাঁচটী মৌলিক পদার্থ বলা হয় নাই। পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যেক পদার্থেই পাঁচটী ভিন্ন বস্তুর—অথবা ভিন্ন অবস্থার কল্পনা হইয়াছে মাত্র। ইন্দ্রিয়গণের উপযোগিতা প্রমাণের জন্যই—প্রধানতঃ এই পাঁচটী ভূতের অনুমান হইয়াছে মাত্র। পরে এ বিষয় সবিস্তারে উল্লিখিত হইবে।

কিন্তু আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান এই স্থলে সীমাবদ্ধ হয় নাই। তাঁহাদের জ্ঞান চর্চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের মনেও যে এইরূপ বিশ্বাস বরাবর ছিল একথা বলা যায় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণের পর ঋষিরা আবার জগতের তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হইয়া আধিভৌতিক জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। বলিয়াছি, পূর্ব্বে যেরূপই

ধারণা থাকুক না কেন—আধিভৌতিক জ্ঞান চর্চ্চার সময় প্রথমে বহুত্ব অনুমিত হয়। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রসঙ্গত। এই বহুত্ব জ্ঞান ক্রমে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা একত্ব জ্ঞানে পরিণত হয়। আর্য্য ঋষিগণ যখন আত্ম ও ঐশ্বরিক চিন্তা হইতে অপসৃত হইয়া বাহ্য জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—তখন এই নানা পদার্থপূর্ণ জগৎ তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তখন পঞ্চ ভূতের কথাও মনে পড়িল। তাহার পর তাঁহারা তত্ত্বান্বেষণ করিয়া যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহার যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় এস্থানে তাহাই উল্লেখ করা উদ্দেশ্য।

আর্য্য ঋষিরা চিন্তার দ্বারা পাঁচ ভূতের অর্থ, স্থূল পদার্থের (matter) পাঁচ প্রকার অস্তিত্ব (Five different conditions of matter) এই বুঝিয়াছিলেন। আধুনিক উরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থূল পদার্থের চারি প্রকার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। সেগুলি ১ম, কঠিন পদার্থ (solid)। ২য়, তরল পদার্থ (liquid)। ৩য়, বাষ্পীয় পদার্থ (gas)। ৪র্থ, সূক্ষ্মতর বাষ্পীয় পদার্থ (ether)। আর্য্য ঋষিরাও এই চারি অবস্থা বিশ্বাস করিতেন। সমস্ত কঠিন পদার্থের উপমাস্থল ক্ষিতি, এই জন্য ক্ষিতি অর্থে তাঁহারা কঠিন স্থূলপদার্থ বুঝিলেন। বাস্তবিক মাটি, গাছ, পাথর সবই এক দ্রব্য,—এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র একথা তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ব্যতীত সামান্য কয়লা ও বহুমূল্য হীরক খণ্ড যে এক দ্রব্যের রূপান্তর মাত্র তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। তাঁহারা এ সব দ্রব্যই এক-ক্ষিতি এ কথা মনে করেন নাই। যাঁহারা স্বর্ণকেও যৌগিক পদার্থ মনে করিতেন এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এরূপ ভ্রম সম্ভব নহে। সুতরাং ক্ষিতির অর্থ কঠিন পদার্থ (solid) ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। আরও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ভাষার প্রথমাবস্থার গুণবাচক শব্দ (abstract terms) ছিল না; উপমার দ্বারা সে অভাব পূর্ণ করা হইত। সুতরাং কঠিন, এই গুণ যে ক্ষিতির সহিত উপমায় ক্রমে ক্ষিতি এই শব্দ কাঠিন্য বাচক হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্য নহে। এইরূপে জল, তরল পদার্থ বাচক হইয়াছে, বায়ু বাষ্পীয় পদার্থবাচক হইয়াছে, এবং ব্যোম, সূক্ষ্মতর বাষ্পীয় পদার্থবাচক হইয়াছে। তাহার পর অগ্নি; দেখা গেল অগ্নি স্থূল পদার্থের অবস্থান্তর নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ কথা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অগ্নি কি একথা আমাদের মনে প্রথম উদয় হয়। অগ্নি প্রকৃত উত্তাপ নহে—উত্তাপ এবং অগ্নি স্বতন্ত্র পদার্থ। উত্তাপ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ উত্তাপ (heat) এবং অগ্নি (combustion) একই পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা মনে করিতেন। উত্তাপ সর্ব্বদাই পদার্থ হইতে বাহির হয় (Newton's Emission theory

of light). যখন কেবল অতিশয় বেগে বাহির হয় তখন ইহা আলোক প্রদান করে এবং আমরা দেখিতে পাই। যাহা হউক উত্তাপ পদার্থ মাত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে উত্তাপ এক প্রকার শক্তি—ইহা পদার্থ মাত্রের অভ্যন্তর আণবিক সম্বন্ধ এবং আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করে। কঠিন পদার্থে উত্তাপ দিলে উহা প্রথমে তরল হয়। কতকগুলি পদার্থ জ্বলিয়া উঠে অগ্নি উদ্গীরণ করে, কতকগুলি বাষ্প হইয়া যায়—পূর্ব্বেকার পদার্থের আর কিছুই থাকে না। সুতরাং যখন এক বস্তুকেই তরল পদার্থে, অগ্নিময় পদার্থে, বাষ্পময় পদার্থে, এবং হয়ত শব্দময় পদার্থে পরিণত করা যায়, তখন অগ্নি যে স্থূল পদার্থের রূপান্তর মাত্র তাহাই প্রথমে অনুমিত হয়। বিজ্ঞানের এবং রসায়নের উন্নতি না হইলে অগ্নির (combustion) তত্ত্ব স্থির করা সম্ভব নহে। সুতরাং অগ্নিকে পদার্থের রূপান্তর মনে করা বড় আশ্চর্য্যজনক নহে। এই সকল পদার্থের অবস্থাকে যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে ক্রমে স্থূল কঠিন অবস্থা হইতে সূক্ষতর অবস্থাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ক্ষিতি হইতে জল সূক্ষতর, জল হইতে বায়ু সূক্ষতর, এবং বায়ু হইতে আকাশ আরও সূক্ষতর। এই শ্রেণীর মধ্যে অগ্নিকে জল অপেক্ষা সূক্ষতর—কিন্তু বায়ু অপেক্ষা স্থূলতর বিবেচনা করা হইয়াছে। আর যখন অগ্নি আবির্ভূত হইয়া কোথায় চলিয়া যায় আর দেখা যায় না—এবং তরল পদার্থের ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে এবং একপাত্র মধ্যে রক্ষা করা যায় না, তখন অগ্নি অবশ্য তরল পদার্থ অপেক্ষা সূক্ষতর—এইরূপই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় অগ্নিকে পদার্থের রূপান্তরমাত্র মনে করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় নাই। আর এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে অগ্নি-সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ছিল তাহাও প্রায় এইরূপ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অগ্নিকে স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে ইহা সকল বস্তুর মধ্যেই প্রবিষ্ট থাকে। উত্তাপ দিলে তাহা বাহির হইয়া যায়। এক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে লেবুস্যুর (Lavoisier) এই Phlogiston Theoryর ভ্রম প্রমাণ করেন এবং অগ্নির স্বরূপ স্থির করেন। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে অগ্নি রূপান্তরে নিহিত আছে এবং উত্তাপে তাহা বহির্গত হয় এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান চর্চ্চার পূর্ব্বে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

আমাদের পঞ্চভূতের এইরূপ অর্থ মনে করার দ্বিতীয় কারণ এই যে সে সময়ে মৌলিক পদার্থের (elements) অনুমানও সম্ভব নহে। তখন সংযোগ বিয়োগ রূপ রাসায়নিক আবিষ্কার প্রথা পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তখন কোন পদার্থকেই বিভিন্ন করিয়া তাহা হইতে মৌলিক পদার্থান্বেষণের সম্ভব ছিল না।

তখন যত প্রকার বিভিন্ন বস্তু ছিল সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন মৌলিকপদার্থ (element) মনে করা হইত। সুতরাং সে সময়ে ভূতের অর্থ মৌলিক পদার্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভূতের অর্থ অস্তিত্ব (existence) পাঁচটী আদি অস্তিত্ব অর্থে পদার্থ সকলের পাঁচ প্রকার অবস্থা (five different essences or five conditions of matter) এই মাত্র।

আমাদের পঞ্চভূতের এইরূপ অর্থ অনুমান করিবার তৃতীয় কারণ এই যে পঞ্চভূত উপলব্ধি করিবার জন্য, আর্য্য ঋষিগণ পঞ্চতন্মাত্রের কল্পনা করিয়াছেন। এই পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারাই পঞ্চভূত আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি তন্মাত্র, অর্থাৎ কেবল এই পাঁচটী গুণের দ্বারাই আমরা এই পঞ্চভূতকে এবং সেই জন্যই এই সমস্ত জগৎকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর করিতে পারি এবং সেই জন্যই ইহাদের দ্বারা আমাদের বাহ্য জগতের জ্ঞান হয়। রূপের দ্বারা কঠিন পদার্থ (Solids) আমাদের চক্ষুর গোচর হয়। বাস্তবিক চক্ষু দ্বারাই আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎকে একেবারে (immediate) উপলব্ধি করি। তারপর রস, ইহার দ্বারা আমরা তরল পদার্থ উপলব্ধি করি। তরল পদার্থ বর্ণহীন, স্বচ্ছ, সুতরাং তাহা স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত সহজে জানা যায় না। যে সকল তরল পদার্থ স্বচ্ছ নহে তাহা বোধ হয় কঠিন দ্রব্য মিশ্রিত। যাঁহারা দর্শনশাস্ত্র সম্মত পঞ্চীকরণ প্রকরণ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। স্পর্শ দ্বারা আমরা অগ্নি বুঝিতে পারি। এই স্থলেই আমরা অগ্নির স্বরূপ অর্থ বুঝিতে পারি। অগ্নি সাধারণতঃ আলোকর দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হয় না। স্পর্শই (feeling) অগ্নি উপলব্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং অগ্নি ও উত্তাপ এক, আর্য্যগণ ইহাই মনে করিতেন।

বায়ু আমরা গন্ধের দ্বারা অনুভব করি—নাসিকাই আমাদের বায়বীয় পদার্থ উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। নতুবা বায়ু আমরা দেখিতে পাই না এবং বায়ুর গতি না হইলে আমরা তাহা স্পর্শের দ্বারা অনুমান করিতেও পারি না।

এইরূপ শব্দই আকাশ উপলব্ধি করিবার আমাদের একমাত্র উপায়। তখন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা ছিল না, সুতরাং এখন যেরূপ আলোক ও উত্তাপের গতি স্থির করিয়া আকাশের (aether) অনুমান করা হইয়াছে এবং পদার্থ মাত্রেরই অধিক শক্তি বিশেষের দ্বারা আমরা শব্দ উপলব্ধি করি স্থির হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ

জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। এই পঞ্চতন্মাত্র এবং তাহাদের সহিত পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ আমরা নিম্নে দেখাইতেছি :—

Solid.	Liquid.	Phlogiston.	Gas.	Aethor
ক্ষিতি।	অপ্।	তেজঃ।	মরুত।	ব্যোম্।
রূপ।	রস।	স্পর্শ।	গন্ধ।	শব্দ।
চক্ষু।	জিহ্বা।	ত্বক্।	নাসিকা।	কর্ণ।

এইরূপে পঞ্চভূত পঞ্চেন্দ্রিয় গোচর হইলেই তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু যদি পঞ্চভূতের অর্থ পাঁচ মৌলিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে পঞ্চ তন্মাত্রের দ্বারা তাহার উপলব্ধি সম্ভব হইত না। কারণ মৌলিক পদার্থ কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি হয় না। রীতিমত পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রকরণ দ্বারা তাহা বাছিয়া লইতে হয়। আর্য্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে সকল বস্তু একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় তাহাতে একাধিক ভূত আছে। ইহারই নাম পঞ্চীকরণ প্রথা। ইহা ভ্রমাত্মক হইলেও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। যেমন জলেতেই তরল, কঠিন, বায়বীয় এবং সূক্ষ্মতর বায়বীয় পদার্থ আছে। এই পঞ্চতন্মাত্র সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এই পাঁচটি স্থূল পদার্থের অবস্থা জানিবার প্রধান উপায়—অন্য উপায় যে নাই তাহা নহে। সুতরাং আমাদের বোধ হয় যে পঞ্চতন্মাত্রে পদার্থের পাঁচ অবস্থা উপলব্ধি হয়। পাঁচ মৌলিক পদার্থ উপলব্ধি হয় না। অতএব পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ বোধ হয় না।

পঞ্চভূতকে পদার্থের পাঁচ অবস্থা মনে করার চতুর্থ কারণ এই যে, আমাদের সৃষ্টির বৈদান্তিক তত্ত্ব এই যে পরমাণু সূক্ষ্মাবস্থায় চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। তাহার পর বায়ুরূপ—তাহার পর অগ্নিরূপ—তাহার পর জলরূপ—সর্ব্বশেষে ক্ষিতিরূপ হইয়াছে। এই মত পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক এই প্রশস্ত বৈজ্ঞানিক মত লাপ্লেস হইতে স্পেন্সর পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট হইয়া সৃষ্টির উৎপত্তি মত (evolution) নামে খ্যাত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমে পরমাণু সমষ্টি যথেচ্ছভাবে চারিদিকে বিস্তৃত ছিল (in a chaotic state); এই মত ন্যায় ও বৈশেষিক মীমাংসাযও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর এই সকল একত্রিত হইতে (condensation) আরম্ভ হয় এবং বাষ্প রূপের পরে একত্রিত হইয়া উত্তাপ উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিময় তরল পদার্থ (molten state) হইয়া থাকে। তাহার পর উত্তাপ কমিয়া তরল পদার্থ ক্রমে কঠিন পৃথিবীর আকারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ অলৌকিক প্রতিভা বলে এই আধুনিক সর্ব্ববাদি-

সম্মত বৈজ্ঞানিক মত অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ নহে। তাহা হইলে একটী রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? মৌলিক পদার্থ কখন একটী হইতে আর একটীতে পরিণত হয় না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পঞ্চভূত পাঁচটী আদি মৌলিক পদার্থ নহে। এগুলি স্থূল পদার্থের (matters) রূপান্তর মাত্র। অতএব পঞ্চভূত পাঁচটী মৌলিক পদার্থ ইহা বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন আর্য্যঋষিগণকে দোষ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়—এই কথা প্রতিপন্ন করাই আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ওপি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী !"

"যাই মা।"

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল, বলিল—"কেন মা ?"

মা বলিল,—"যা না—ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুণ চেয়ে নিয়ে আয় না।"

প্রফুল্লমুখী বলিল, "আমি পারিব না। আমাব চাইতে লজ্জা করে।"

মা। তবে খাবি কি ? আজ যে ঘরে কিছু নেই।

প্র। তা সুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা ?

মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি ? কাঙ্গাল গবিবের চাইতে লজ্জা কি ?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, "তুই তবে, ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা খাও আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেযেমানুষের তাই ঢের।"

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়া ছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার ধুচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, "চাল কই ?" প্রফুল্লকে দেখাইল আধমুঠা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধ পেটা হইবে না।

মা ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, "কোথা যাও ?"

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নহিলে সুধু ভাতই কপালে যোটে কই ?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাউল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস করিব।

মা। উপস করিয়া কয় দিন বাঁচিবি।

প্র। না হয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস; তুই উপস করিয়া মরিবি আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? একদিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসোনা মায়ে ঝিএ আজ পৈতা তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সুতা কই?

প্র। কেন চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্ল মুখ অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা, ধুচুনী হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মার হাত হইতে ধুচুনী লইয়া যে কয়টা চাউল ছিল—তাহা ফেলিয়া দিল। মা অবাক্ হইল—বলিল, "সে কি? যে কয়টা ছিল তাও ফেলিয়া দিলি?"

প্রফুল্ল বলিল, "মা—আমি কেন চেয়ে ধার ক'রে খাব—আমার ত সব আছে?"

মা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "সবই ত আছে মা—কপালে ঘটিল কৈ?"

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলে এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোর অন্ন খায় কে?

প্র। শোন, মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে যোটে তবে খাইব—নহিলে আর খাইব না। তুমি চেয়ে চিন্তে, যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া আইস।

মা। সে কি মা! তাও কি হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ী যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ী চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুর বাড়ী যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনও তোর নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কি?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—কিন্তু আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ ঘুচিবে এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।"

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মা বুঝিল যে মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, কিছু চাল ধার করিয়া আনিয়া বাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন প্রফুল্ল বলিল, "তবে আর বেলা কাটাইয়া কি হইবে? অনেক পথ।"

তাহার মাতা বলিল, "আয় তবে চুলটা বাঁধিয়া দেই।"

প্রফুল্ল বলিল, "না। থাক! কি অবস্থায় আমাকে বাখিয়াছে তা তাহারা দেখুক।'

তখন দুই জনে, মলিন বেশে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভ বাবু খুব বড় মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারী আছে, দোতালা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ী, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কীতে বাগান পুকুর, প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, মাতা ও কন্যা অনশনে, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সেই ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ কালে, প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে. বলিয়া সে হরবল্লভ বাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এ দিগে, প্রফুল্লের মা, কন্যা বড় মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু

ছিল ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্ব্বস্বই তার কত টাকা?—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিগ কুলান করিতে পারিল না। বরযাত্রীদিগেব লুচি মণ্ডায় দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রীগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রীরা অপমান মনে করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মার সঙ্গে তাহাদেব কোন্দল বাঁধিল। প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় বকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হববল্লভ বেহাইনেব প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে কুলটা জাতিভ্রষ্টা, তাহাব সঙ্গে হরবল্লভ বাবুব কুটুম্বিতা কবিতে হয় করুন,—বড় মানুষের সব শোভা পায়—কিন্তু আমবা কাঙ্গাল গবিব, জাতিই আমাদের সম্বল—আমরা জাতিভ্রষ্টাব কন্যাব পাকস্পর্শে জল গ্রহণ করিব না। সমবেত সভার মধ্যে এই কথা প্রচাব হইল। হববল্লভের মুখ শুকাইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা মেয়েটি লইয়া ঘবে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না। বিশেষ, হববল্লভের মনে হইল, যে বিবাহের বাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহ বাড়ীতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখনও তাহাদের সম্বাদ লইলেন না; পুত্রকেও লইতে দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মার পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্ত্তা অন্তঃপুর মধ্যে আপরাহ্নিক নিদ্রার সুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ী, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে, প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধ হাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠার বৎসর।

গিন্নী ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কে গা?"

প্রফুল্লের মা, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কি বলিয়াই বা পরিচয় দিব ?"

গিন্নী। কেন—পরিচয় আবার কি বলিয়া লোকে দেয় ?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নী। কুটুম্ব ? কে কুটুম্ব গা ?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরাণী কাজ কবিতেছিল। সে দুই একবার প্রফুল্লদিগের বাড়ী গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পবেই। সে বলিল, "ওগো চিনেছি গো ! ওগো চিনেছি ! কে বেহান ?"

(সে কালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধবিত)

গিন্নী। বেহান ? কোন্ বেহান ?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড় ছেলেব বড় শাশুড়ী।

গিন্নী বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, "বসো।"

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা ?"

প্রফুল্লের মা বলিল, "তোমাব বড় বউ ?"

গিন্নী বিমর্ষ হইয়া কিছু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তোমবা কোথায় এসেছিলে ?"

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়ীতেই এসেছি ?

গিন্নী। কেন গা ?

প্র, মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুর বাড়ী আসিতে নাই ?

গিন্নী। আসিতে থাকিবে না কেন ? শ্বশুর শাশুড়ী যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভাল মানুষের মেয়ে ছেলে কি গায়ে প'ড়ে আসে।

প্র, মা। শ্বশুর শাশুড়ী যদি সাত জন্মে নাম না করে ?

গিন্নী। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন ?

প্র, মা। খাওয়ায় কে ? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে ?

গিন্নী। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন ?

প্র, মা। তুমি কি খাওয়া পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে ? তা হলে সেই সঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোষাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই ?

গিন্নী। আ মলো ! মাগী বাড়ী ব'য়ে কোঁদল করতে এসেছে দেখি যে ?

প্র, মা। না—কোঁদল করতে আসি নাই। তোমার বউ একা আসিতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন, তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।

এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনও আহার হয় নাই।

মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিল, "তোমার মা গেল, তুমিও যাও।"

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। নড় না যে?

প্রফুল্ল নড়ে না।

গিন্নী। কি জ্বালা? আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে না কি?

এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ী মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! এমন চাঁদপানা বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না!" মন একটু নরম হলো।

প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।"

গিন্নী। তা কি করিব মা—আমার কি অসাধ যে তোমায় নিয়ে ঘর করি, লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রফুল্ল। মা, এক ঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?

শাশুড়ীর মন আরো নরম হলো। বলিলেন, "কি করব মা, জেতের ভয়।"

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করতে দোষ কি?"

গিন্নী আর বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্ত্তার কাছে, তিনি কি বলেন। তুমি এই খানে বসো মা, বসো।"

প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কি? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে, হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তা মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাত মুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি তবু কেও শোনে না।"

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন,—"ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমিয়াছি—কথাটা কি?"

গিন্নী মুখখানা হাসি ভরাভরা করিয়া বলিলেন "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বলতে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া, কেননা বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথা গুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্ত্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"এত বড স্পর্দ্ধা! সেই বাগদী বেটী আমার বাড়ীতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে—হাজার হোক বেটার বউ · আর বাগদীর মেয়ে বা কিরূপে হলো? লোকে বল্‌লেই কি হয়?"

গিন্নী ঠাকুরুণ, হার কাত নিয়ে খেলতে বসেছেন—কাজে কাজেই এই রকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছুই হইল না। "বাগদী বেটিকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।" এই হুকুমই বহাল রহিল।

গিন্নী শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, "ঝাঁটা মারিতে হয় তুমি মার; আমি আর তোমার ঘর কন্নার কথা কিছু জানি না।" এই বলিয়া গিন্নী রাগে গর গর করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে তাকে

হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "দ্বার দিলে কেন ?"

মেয়েটি বলিল, "কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব তাই।"

প্রফুল্ল বলিল, "তোমার নাম কি ভাই।"

সে বলিল, "আমার নাম সাগর ভাই।"

প্র। তুমি কে ভাই ?

সা। আমি ভাই তোমার সতীন।

প্র। তুমি আমায় চেন নাকি ?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম ?

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর তা কেন ? পোড়া কপাল আর কি—আমি কেন সে হতে গেলেম ? আমার কি তেমনি দাঁত উঁচু না আমি তত কালো ?

প্র। সে কি—কার দাঁত উঁচু ?

সা। কেন ? যে ঘরণী গৃহিণী।

প্র। সে আবার কে ?

সা। জান না ? তুমি কেমন ক'রেই বা জানিবে ? কখন ত এসোনি। আমাদের আর এক সতীন আছে জান না ?

প্র। আমি ত আমি ছাড়া আর এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম সেই তুমি।

সা। না। সে সেই। আমার ত তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত ?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়।

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে।

সা। না তা নয়। তোমাকে বলি, কারও সাক্ষাতে বলো না (সাগর বড় চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি আর বলিতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত সে ঘরণী গৃহিণী হলো কিসে ?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনে না। তাই, আমি এখানে কখন থাকি না। কাজে কর্ম্মে কখন আনে। এই দুই চারি দিন এসেছি আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে সাগর দিব্য মেয়ে—সতীন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল, "আমায় ডাকলে কেন ?"

সা। তুমি কিছু খাবে ?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, "কেন, এখন খাব কেন ?"

সা। তোমার মুখ শুরু, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমাব তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বল্‌লেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি। কই কেউ ত তোমাকে কিছু খেতে বলিল না ?

প্রফুল্ল তখন পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, "শাশুড়ী গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝতে। আমার অদৃষ্টে কি হয়, তা না জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় ত তাই খাব। আর কিছু খাব না।

সা। না, না, এদের কিছু তোমাব খেযে কাজ নাই। আমাব বাপের বাড়ীর সন্দেশ আছে- বেশ সন্দেশ।" এই বলিযা সাগর কতকগুলা সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লেব মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শবীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, "আমি ত শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না খাইয়া মরিয়া যাইবে।"

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন ?

প্র। কি জানি ? বোধ হয় পথে দাঁড়াইয়া আছেন ?

সা। এক কাজ করব ?

প্র। কি ?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব ?

প্র। তিনি কে ?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসী—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কি করবেন ?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ বাড়ীতে কিছু খাবে না।

সা! দূর! তাই কি বলছি ? কোন বামুন বাড়ীতে।

প্র। যা হয় কর, মার কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মত ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিল, "মা, তাইত! গৃহস্থ বাড়ী উপবাসী থাকিবেন। অকল্যাণ

হবে যে!" ব্রহ্ম প্রফুল্লের মার সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, "এখন ভাই যে গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।"

সা। গল্প আর কি? আমি ত এখানে থাকি না—থাকতে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মত—তাকে তোলা থাকব দেবতার ভোগে কখন লাগিব না। তা, তুমি এয়েচ যেমন করে পার থাক। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাকব বলেই ত এসেছি। থাকতে পেলে ত হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চ'লে যেও না।

প্র। না গিয়া কি করিব? আর কি জন্য থাকিব?

সা। একবার দেখা করবে না?

প্র। কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?

সা। দূর! যেন হাবি। শ্বশুর বাড়ী এসে কি কেবল সতীনের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যেন দেখা করতে হয় না।

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল। বলিল, "বুঝি নাই ভাই—স্বামীর সঙ্গে? তা কি কপালে ঘটিবে?

সা। আমি ঘটাইব। তুমি সন্ধ্যার পর, এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা ত আর দেখা হবে না?

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর অতীতকালে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও যুবতীরা কখন দিনমানে স্বামী সন্দর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, "কপালে কি হয় তাহা আগে জানিয়া আসি। তার পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কি বলেন শুনিয়া যাইব।"

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ী তাহার তল্লাস করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নী বলিলেন, "কোথা ছিলে মা?"

প্র। বাড়ী ঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নী। আহা! তোমারই বাড়ী ঘর বাছা—তা কি করব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ীর বড় দয়া হইল। গিন্নী মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথ নাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না,—কেবল বলিলেন, "আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাক। কাল সকালে যেও।"

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, "তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের এক বেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব? আমি বাগ্‌দীই হই—মুচিই হই, তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কি করিয়া দিনপাত করিবে?"

শাশুড়ী বলিল, "অবশ্য বলিব।" তারপর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর, সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, "কে গো?"

"আমি গো।"

সাগর, প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "কথা কস্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এয়েছে।"

প্র। সতীন?

সা। হাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল সে বলিল "কেগা, ঘরে কথা কস্‌নে কেন? যেন সাগর বৌয়ের গলা শুনিলাম না?"

সা। তুমি কেগা—যেন নাপিত বৌয়ের কথা শুনিলাম—না?"

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত বৌয়ের মতন?"

সা। কে তবে তুমি?

"তোর সতীন! সতীন! সতীন! নাম "নয়ান বৌ।"

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে "নয়ান বৌ" বলিত—সাগরকে "সাগর বৌ" বলিত)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল,—"কে? দিদি? বালাই তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

নয়ান। মরণ আর কি—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতীন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্‌।

সা। তা, চৌদ্দ বছর হলো ত কি হলো—তুমি সতের—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ যৌবন নিয়ে বাপের বাড়ীতে বসে বসে ধুয়ে খাস্। আমার যেমন মরণ নাই তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম!

সা। কি কথা দিদি?

ন। তুই দোরই খুল্লিনে, তার কথা কব কি? সন্ধ্যা রাত্রে দোর দিয়েছিস কেন্ লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে ছুটো সন্দেশ খাচ্চি। তুকি কি খাও না?

ন। তা, খা খা। (নয়ান নিজে সন্দেশ বড় ভাল বাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি।

সা। আবার একজন কি? স্বামী?

ন। মরণ আর কি? তাও কি হয়?

সা। হলে ভাল হতো—ছুইজনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ও সব কথা কি মুখে আনে?

সা। মনে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা ভাই কি জিজ্ঞাসা কর্বে, না বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি গিন্নির নাকি আর একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ?

ন। সেই মুচি বউ।

সা। মুচি? কই শুনি নে ত।

ন। মুচি না হয় বাগ্দী?

সা। তাও শুনিনে।

ন। শোননি—আমাদের একজন বাগ্দী সতীন আছে।

সা। কই না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে ত বামনের মেয়ে।

ন। হ্যাঃ বামনের মেয়ে? তা হলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে, আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগ্‌দীর মেয়ে হবে ?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন্ লা পোড়ার মুখী ?

সা। তুই আর একজনকে গাল দিচ্ছিস্ কেন্‌লা পোড়ার মুখী ?

ন। মর্‌গে যা—আমি ঠাকুরুণকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড় মানুষের মেয়ে ব'লে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, "না দিদি ফের! ফের! ঘাট হয়েছে, দিদি ফের! এই দোর খুলিতেছি!"

নয়নতারা রাগিয়া ছিল—ফিরিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেহ নহে—আর একজন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল—"এ আবার কে ?"

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে ?

সা। মুচি বৌ।

ন। এই সুন্দর ?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে আর জ্বালাসনে। তোর চেয়ে ত নয়।

তখন প্রফুল্লমুখী ও নয়নতারার চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল। যেমন ব্যাঘ্র ও শীকারী দুইজনে পরস্পরে চাহে—কে কাহার প্রাণবধ করিবে—সেইরূপ দুইজনে পরস্পরের প্রতি চাহিল। দুইজনেই বুঝিল, "এই আমার পরম শত্রু।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিগে কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহ মধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজন হস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারী ধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর দশজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামী সেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

কর্ত্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগ্‌দী বেটি গিয়াছে ?"

গৃহিণী, মাছি তাড়াইয়া, নথ নাড়িয়া বলিলেন, "রাত্রে আবার সে কোথা যাবে ? রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বউটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব ?"

কর্ত্তা। অতিথ হয় অতিথশালায় যাক্‌না ? এখানে কেন ?

গিন্নী। আমি তাড়াতে পার্‌ব না আমি ত বলেছি। তাড়াতে হয় তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বউ কিন্তু—

কর্ত্তা। বাগ্‌দীর ঘরে অমন দুটো একটা সুন্দর হয়। তা আমিই তাড়াচ্চি। ব্রজ কে ডাক্‌ ত রে !

ব্রজ, কর্ত্তার ছেলের নাম। একজন চাকরাণী ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ বাইশ ; অনিন্দসুন্দর পুরুষ,—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, "বাপু—তোমার তিন সংসার—মনে আছে ?"

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

"প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগ্‌দীর মেয়ে।"

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হিরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে।

কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "সে বাগ্‌দী বেটি—আজ এখানে এয়েছে—জোর ক'রে থাকিবে, তা তোমার গর্ভ-ধারিণীকে বল্‌লেম যে ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে ? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।"

গিন্নী বলিলেন, "ছি ! বাবা মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুল না। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চল্‌বে না। তা যা কর, ভাল কথায় বিদায় করিও ;"

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, "যে আজ্ঞা।" মার কথায় উত্তর দিল, "ভাল।"

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কি করিয়া।"

কর্ত্তা বলিলেন—"যা খুসি করুক—চুরি করুক ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।"

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, "তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন ব্রহ্ম ঠাকুরাণী তদ্‌গদচিত্তে মালা জপ করিতেছেন আর মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, "ঠাকুর মা।"

ব্রহ্ম। কেন ভাই ?

ব্রজ। আজ নাকি নূতন খবর ?

ব্রহ্ম। কি নূতন ? সাগর আমার চরকাটা ভেঙ্গে দিয়েছে তাই ? তা ছেলে মানুষ দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাটতে তার সাধ গিয়েছিল —

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ নাকি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাক আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়ো মানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুনবে ?

ব্রহ্ম। বুড়ো মানুষ কবে নেই, দুটা পৈতা তুলে বামুনকে দিই এই বৈত নয়। তা যাক্‌গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নহিলে তোমার যত চরকা হবে সব আমিই ভেঙ্গে দেব।

ব্রহ্ম। কি বলচ ? চরকার কথা নয় ?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটী ব্রাহ্মণী আছে জান ত ?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী ? মা মা মা। যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল ! ভাই আমি এত রূপকথা পাব কোথা ?

ব্রজ। রূপকথা থাক—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বল্‌লে থাক, তারা ছাড়ে কই ? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জান ? বলি শোন। এক বনে, বড় একটা শিমুল গাছে এক বিহঙ্গম বিহঙ্গমী থাকে।

ব্রজ। সর্ব্বনাশ ! ঠাকুর মা কর কি ! এখন রূপকথা ! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কি ? অমি বলি রূপকথা শুনতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নেই ?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল, "কবে বুড়ীদের ৺ প্রাপ্তি হবে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আমার দুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগ্‌দীনী। বাগ্‌দীনীটি নাকি আজ এয়েছে?"

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগ্‌দীনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ! আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ মার দু চক্ষের বিষ হই? তার চেয়ে বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ মা আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণ নাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন ত বল্‌তে পারি। বাগ্‌দীর কথাতেও নই বামনের কথাতেও নই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে।

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস্‌নে—বড় ডাকাতের ভয়! কি, দেখা করবি?

ব্রহ্ম। তা নহিলে কি তোমার মালা জপ দেখ্‌তে এয়েছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতীন কি সতীনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যানা। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙ্গেছে বলে? নয়ানকে ব'লে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙ্গে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে? যা! যা!

ব্রজ। গেলে বাগ্‌দীনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ীর কথাটাই শোন্‌ না, কি জ্বালাতেই পড়্‌লেম্‌ গা? আমার মালা জপ হলো না। তোর ঠাকুর দাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক্—আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাকলে ত কখন না বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুর দাদার অক্ষয় স্বর্গ হৌক—আমি চোদ্দ বছরের সন্ধানে চল্‌লেম। ফিরিয়া আসিয়া চুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপা ঘুরে গেল। রঃ নয়নতারাকে বলে দিব তুই বড় চেঙ্গড়া হয়েছিস।

ব্রজ। ব'লে দিও। খুসী হ'য়ে দুটো ছোলাভাজা পাঠিয়ে দেবে। এই বলিয়া ব্রজেশ্বর—সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নীচে একটি উপরে। নীচেব ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘবে রাত্রে শুইত; দিনমানে সোয়া হইলে সেই ঘরে গিযা দ্বাব দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্ম ঠাকুবাণীর উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপবের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পবিবর্ত্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথম স্ত্রী।

বড গোল বাধিল। দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী-পুরুষ—পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ, পৃথিবীব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনও দেখা নাই। কখন কথা নাই। কি বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে আর একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কি রকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হৌক—উচিত মত কিছুই হইল না। প্রথমে দুই জনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষ প্রফুল্ল, অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া চিপ করিয়া এক প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মত নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল—ব্রজেশ্বর, দেখিল যে প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বচব বয়সেই ধিক! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া

মুঝিয়া, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বিত করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি মার্জ্জিত-রুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্ব্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে করিতেছিল যে বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহ জগতে কখনও কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কাণ সেদিকে গেল। ব্রজেশ্বর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড় কোঁকড়া ঝাপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাপটা বাখিত—তাব উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্মপলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙ্গা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর, স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলেমানুষ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিয়া, শিকল লাগাইয়া কুলুপে চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড়্ দুড়্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে পাইয়া, "কি কর সাগর! কি কব সাগব!" বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতে কাণ না দিয়া দুড়্ দুড়্ ঝম্ ঝম্ করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্ম-ঠাকুরাণীর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন, "কি লা সাগর বৌ? কি হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?"

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

সা। তা নইলে আর তোমাব আশ্রয়ে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো! এখনই আবার ডাক্‌বে আখন! আহা! তোর ঠাকুর দাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরও রাগ করে যেতেম না—তা মেয়ে মানুষের প্রাণ ভাই! থাক্‌তেও পারতেম না। একদিন হলো কি—

সা। ঠান্‌দিদি—একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা বলিব? তা একেলা শুন্‌বি, নূতন বৌটা কোথায়, তাকে ডাকনা—দুজনে শুন্‌বি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজতে পারি না। আমি একাই শুনবো। তুমি বল।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিল। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণী সে সম্বাদ অনবগত, দুই চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিত চিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

এখন নয়নতারা জানে যে স্বামী সাগরের ঘরে; তাকে একবার আড়ি পাতিতেই হইবে। সে যখন আসিয়া জুটিয়াছিল—তখন সাগর দ্বারে কুলুপ দিয়া পলাইয়াছে। নয়নতারা আড়ি পাতিয়া বুঝিয়া গেল যে বাগদী বউ ঘরে আছে। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে মনে মনে বলিল—"সাগরি বাঁদরী—অধঃপাতে যাও—উনুনমুখী—চুলোমুখী—আপনি শুতে যায়গা পায় না শঙ্করাকে ডাকে।" তখন নয়নতারা, একজন দাসীকে শিখাইয়া পড়াইয়া শ্বশুরের কাছে পাঠাইলেন। সে কোন কাজের ছলে কর্ত্তার কাছে গিয়া, কথায় বলিয়া আসিল, যে মুচি বৌ—প্রফুল্ল বাগ্‌দী ঘুচিয়া ক্রমে মুচিতে দাঁড়াইতেছিল—মুচি বৌ ব্রজেশ্বরের ঘরে শয়ন করিয়াছে। তখন কর্ত্তার হুকুম হইল যে, কালই প্রাতে নয়ান বৌমা স্বহস্তে তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিবেন। ব্রজেশ্বরের ভাগ্যে, কর্ত্তা মহাশয় এক কাঁড়ি তিরস্কার জমা করিয়া রাখিলেন।

এদিগে প্রভাত হইতে না হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাঙ্গা চরকা লইয়া সেই নিদ্রামগ্না বর্ষিয়সীর কাণের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

"কটাশ—ঝনাৎ" করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাড়াইল। বলিল—

"সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি চলিলাম। যে যে কথা হইয়াছে, তাহা তোমার মনে থাকিবে কি?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "ভুলিবার কথা কোন্‌টা?"

প্র। সবই ভুলিবার কথা—কেননা আমিই যে ভুলিবার বস্তু। কিন্তু কথাটা চিরদিনের জন্য মনে রাখ, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি না হয় ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করি। প্রথম কথা, তুমি আমায় ত্যাগ করিলে বটে?

ব্র। এমন কথা কেন বল? তোমায় আমি কখন ত্যাগ করিব না—যে স্ত্রী ত্যাগ করে সে মহাপাতকী। তবে যত দিন আমার বাপ বর্ত্তমান আছেন, তত দিন তোমায় আমায় দেখা সাক্ষাৎ হইবে না। পিতার অবাধ্য কোন মতেই হইতে পারিব না—অবাধ্য হইবার আমার সাধ্য কি? কিন্তু পিতার অবর্ত্তমানে—

প্র। অর্থাৎ তোমার আর আমার প্রাচীন বয়সে, তুমি আমায় গ্রহণ করিবে। ভালই। ততদিন আমি খাইব কি? আমাব শ্বশুর এককথায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ত তোমারই মুখে শুনিলাম। তোমারও কি সেই মত? চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা, করিয়া খাইব, তোমাবও কি সেই মত?

ব্রজেশ্বর অধোবদন হইল। কিছু পরে বলিল, "আমাব নিজেব কিছু নাই, কিন্তু যেমন করিয়া হৌক আমি কিছু কিছু সংগ্রহ কবিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

প্র। সংগ্রহ করিয়া—অর্থাৎ বাপেব টাকা হইতে কোনমতে কিছু লইয়া। তাহা আমি লইব না—তোমার বাপেব এক পযসা আমি খাইব না। তুমি নিজে উপার্জ্জন করিয়া আমায খাওযাইতে পাব না?

ব্র। আমি বাপের অধীন—ঘবের বাহিব হইতে পাই না—নহিলে উপার্জ্জনে আমি অক্ষম নহি। সে চেষ্টা এখন করা বৃথা।

প্র। তবে তোমার কিছু দিয়া কাজ নাই। আমি পারি, চুরি ডাকাতি ভিক্ষা করিয়াই খাইব। না পারি মরিয়া যাইব।

ব্র। অমন সকল কথা মুখে আনিও না। আমার একটি আঙ্গটি আছে—অনেক টাকা দাম—ঐটি লইয়া যাও—এখন কিছু দিন চলিবে—তার পর—

প্র। আঙ্গটি লইয়া আমি কোন্ বাজারে বেচিতে যাব? তবু আঙ্গটিটি দাও। তোমার সঙ্গে এক রাত্রের জন্য যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া এ স্মরণ করিব। কিন্তু এ আঙ্গটি আমার কাছে দেখিলে কেহ চোর বলিয়া ধরিবে না ত? কিম্বা আরও কি—

ব্র। এ আঙ্গটিতে আমার নাম খোদা আছে। নিতে কোন ভয় করিও না।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আঙ্গটি আনিয়া দেখাইলেন, তাহার ভিতর পিঠে তাঁহার নাম ফারসী অক্ষরে খোদিত আছে। প্রফুল্ল আঙ্গটি লইল।

ব্র। এখন কোথায় কি প্রকারে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া দাও।

প্র। সে ভার তোমার উপর—আমার যত দূর সাধ্য তাহা করিয়াছি। এখানে ত আর আমার আসা হইতে পারে না। তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে?

ব্রজেশ্বর আবার অধোবদন হইল—বলিল, "শক্ররা জাতি মারিবে।"

প্র। তবে দেখা সাক্ষাৎ এই পর্য্যন্ত। যদি আর একবার কখনও কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়——

ব্র। যদি কোন গতিকে সাক্ষাৎ হয়—তবে কি ? চুপ করিলে কেন ?

প্র। তখন তুমি আমায় চিনিতে পারিবে কি ? এ বয়স ত থাকিবে না।

ব্র। আমি ভুলিব না।

প্র। ভুলিবে।

এই বলিয়া প্রফুল্ল এক হাতের পিতলের বালা খুলিয়া জোর করিয়া তাহা দুইখানা করিয়া ভাঙ্গিল। বলিল, "আধখানা বালা তোমার কাছে থাক। আধখানা আমার কাছে রহিল। আধখানায় আর আধখানা মিলাইলে, তুমিও চিনিবে, আমিও চিনিব। এখন চলিলাম। মনে থাকে যেন—আমায় বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলে।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল—ব্রজেশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বার খুলিয়া প্রফুল্ল দেখিল, দ্বার পার্শ্বে নয়নতারা ঝাঁটা হাতে দাঁড়াইয়া আছে। প্রফুল্লকে দেখিয়াই নয়নতারা বলিল, "বেরত মাগী, ঝাঁটা মেরে তোর বিষ ঝেড়ে দিই।"

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, "তুমি কি বাড়ীর ঝাড়ুওয়ালা নাকি ?"

নয়নতারা জ্বলিয়া অঙ্গারের মত হইল। মারিবার জন্য ঝাঁটা তুলিল। প্রফুল্ল সরিল না। ব্রজেশ্বর ঘরের ভিতর হইতে এসব দেখিতে পাইল—ঝাঁটা প্রফুল্লের ঘাড়ে পড়ে এমন সময়ে ব্রজেশ্বর নয়নতারার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইল। প্রফুল্ল আবার হাসিয়া নয়নতারাকে বলিল—"তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইও না দিদি—ও ঝাঁটা মারাই হইয়াছে। ইহজন্মে আমি তাই ভাবিব। মনে থাকে যেন—তুমি আমাকে ঝাঁটা মারিয়া এ বাড়ী হইতে বিদায় করিলে।"

প্রফুল্ল আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কী দ্বার পার হইল। দেখিল সেখানে সাগর ঘেরা-বাগানে ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর পূজার ফুল তুলিতেছে। প্রফুল্ল বাগানের কাছে গিয়া বলিল, "আমি ভাই আজ চলিলাম। এ বাড়ীতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ী গেলে সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী চেন ?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ী যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কি? আমি আর কুলের কুলবধূ নই। সে নাম আমার ঘুচিয়াছে।

সা। ছি, অমন কথা বলিও না। তোমার মা, তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মার কাছে গেল।

ব্রহ্মঠাকুরাণীর গুণে প্রফুল্লের মার উপবাস ও নিরাশ্রয় দুঃখ সহিতে হয় নাই। এখন মায়ে ঝিয়ে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের সম্বাদ পরস্পরের কাছে শুনিল। প্রফুল্লের মা বলিল, "এখন সাধ মিটিল। চল ঘরে যাই।"
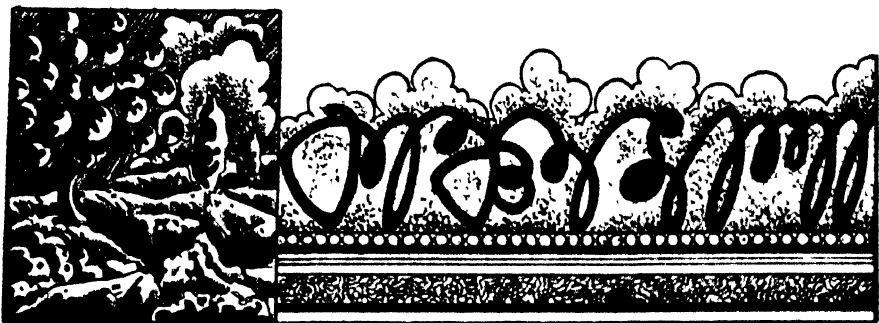
দ্বাদশ খণ্ড

১

স্বামী বন্দী হওয়ার সম্বাদ পাইয়া অবধি কাঞ্চনের মনের স্ফূর্ত্তি ছিল না। তাঁহার যাহা নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহা তিনি করিতেন,--কেবল মাত্র অভ্যাসের গুণে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বড় একটা উৎসাহ ছিল না। নিত্য সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, নিত্য দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দিতেন, নিত্য রোগীদের সেবা করিতেন, নিত্য ঔষধ বিতরণ করিতেন, সমস্ত কেবল অভ্যাসের গুণে। ক্রমে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার কাজ ভাল হয় না। এক দিন সঙ্ঘ-ভোজনে পরিবেশন করিতে গিয়া সর্ব্বাগে পায়স দিয়া ফেলিলেন, একদিন একজন রোগীকে ঔষধ সেবন করাইয়া আসিলেন, পরদিন পথ্য দিতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথ্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল না। মনে পড়িলেই দৌড়িয়া গেলেন, গিয়া দেখেন রোগী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে। অতি কষ্টে তাঁহার কথা বাহির হইতেছে। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কিছু খাবার লইয়া যাইতে যাইতে একটী পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন, মনে হইল একদিন কুণাল ও তিনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন; আবার সেই পূর্ব্ব কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, গয়াশীর্ষ পর্ব্বতের বাঘ শীকার হইতে সকল কথা মনে পড়িল। দাঁড়াইয়া এক মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন—আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া উঠিলেন, খাবারগুলি চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

কাঞ্চন দেখিলেন, এরূপ মনে গৃহে বাস আর সঙ্গত নয়। যে কাজে উৎসাহ নাই, সে কাজ করিতে নাই। যেখানে থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না সেখানে থাকিতে নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিলেন। এক দিন ঘোর দ্বি-প্রহরা নিবিড়-গাঢ় তমস্বিনী রাত্রিতে পতি-অন্বেষিণী কাঞ্চন-মালা আপন কুটীরে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন; শাক্য ভিক্ষুকী সাজিলেন। রক্তবস্ত্র

পরিধান করিলেন, স্বহস্তে আপাদ লুলিত কেশরাশি ছেদন করিলেন। কত গুলা ধূলা কাদা মাখিয়া সে তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের হীনতা সম্পাদন করিলেন। ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন; ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; করিয়া অনন্ত পিচ্ছিল অন্ধকার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিলেন।

পাটলীপুত্র হইতে তক্ষশীলা যে অনেক দূর। একখানি চিটী আসিতে এক মাস লাগে; একা কাঞ্চন এতদূর কিরূপে যাইবে? কিন্তু কাঞ্চন ঋষিকন্যা; পর্ব্বত তাহার জন্মভূমি। সে রাজপুরীর সুখকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে। রাজ-পুরীতে বসিয়া থাকিতে হয়। রাজপুরীতে পাখীরা প্রাণ খুলিয়া গান গাইতে পারে না। যে বায়ু পর্ব্বত-শীর্ষে প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া দেয়, সে বায়ু রাজ-বাড়ীতে পাওয়া যায় না। রাজ-বাড়ীতে প্রাণ খুলিয়া কথাই কহার যো নাই; সুতরাং কাঞ্চনের পক্ষে বাজ-বাড়ীই কষ্টকব; পথশ্রম তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। কিন্তু এবার পথ চলিতে গিয়া কাঞ্চন বুঝিতে পারিল যে, সেকালের পথ চলায আর একালের পথ চলায় অনেক তফাৎ। এখন ভাবনার ভারে মন পীড়িত, পথ যেন বড় লম্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পা যেন উঠিতেছে না বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্য লোক অপেক্ষা অনেক দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মন উঠিল না। পাছে রাজ-পথে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে তিনি সে পথে গেলেন না। রাজপথ বাঁকিয়া গিয়াছে, মগধ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত প্রধান নগবগুলি ঐ একটী রাস্তার ধারে, সুতরাং সে পথে যাইতে গেলে অনেক দেরি হইবে ভাবিয়া কাঞ্চন গ্রাম্য পথ আশ্রয় করিলেন। কখন মাঠের উপর দিয়া, কখন বনের মধ্য দিয়া, কখন গ্রামের ভিতর দিয়া, কখন বড় বড় নদী সন্তরণ করিয়া, পতিগতপ্রাণা পতির অন্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে পতির রূপ অঙ্কিত, পতির ভাবনায় পথের ক্লেশ অনুভব হইল না। এক দিন সরযূতীরে বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণে দীপ্যমান মূর্ত্তি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা বিদ্যাধর সকলের সম্মুখে সরযূ জলে ঝাঁপ দিল; সরযূ তখন উত্তাল তরঙ্গ-মালা পরিপ্লুত মৃত্যুর দন্তাবলীর মত বন্ধুর। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িল, কেহ কেহ নৌকা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সে দেব না মানুষ হাত তুলিয়া বারণ করিল এবং "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "সংঘং শরণং গচ্ছামি" "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া

অবিরল ঘূর্ণ্যমাণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্প ক্ষণেই নদীর অপর পারে পঁহুছিল। তাহার পর সেই আর্দ্রবস্ত্রে পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৩

একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় অহিচ্ছত্রের লোক সহসা জাগরিত হইয়া শুনিল স্বরলহরীতে আকাশ পাতাল পরিপূর্ণ করিয়া গাথা গান করিতে করিতে কে রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতেছে। কেহ বলিল নগরের অধিষ্ঠাত্রী, কেহ বলিল বিদ্যাধরী।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় মদিপুরার লোকে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহা কোলাহল করিতেছে, একটা বালক জলে ডুবিয়া গিয়াছে কেহ তুলিতে পারিতেছে না। তাহার পিতামাতা হাত পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে; কেহ সান্ত্বনা করিতেছে, কেহ ক্রন্দন করিতেছে, কেহ ডুবরি ডাকিতে যাইতেছে। এমন সময়ে সহসা আশ্চর্য্য হইয়া তাহারা দেখিল, জয়-ধর্ম্ম জয়-সঙ্ঘ জয়বুদ্ধ ধ্বনি করিয়া এক রক্তাম্বরীদেবী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কাহাকে কোন কথা বলিলেন না, জলমধ্যে ঝাঁপ দিলেন, ডুবিলেন, কিয়ৎ পরে জল যেমন ছিল তেমনি হইল। তাহার গর্ভে যে দুইটা মানুষ আছে তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। সকলে ভাবিল কোন যক্ষ বালককে লইয়া পাতালপুরী প্রবেশ করিল। ওমা!! অল্প ক্ষণে বালক কোলে দেবী জলোপরি ভাসমান হইলেন, বালক মূর্চ্ছিত অচেতন। তাহার বাপ মা দৌড়িয়া বালক কোলে লইতে আসিল। দেবী দুই পা ধরিয়া বালককে ঘুরাইতে লাগিলেন, লোকে বিস্মিত হইল; পিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু মানুষের সাধ্য কি দেবীর বল রোধ করিতে পারে? কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দেবী মাতার ক্রোড়ে সন্তান দিলেন। সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ে হাসিতে লাগিল। সকল লোকে ছেলের মা বাপের জন্য আহ্লাদ করিতে লাগিল। এ দিকে দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

৪

ক্রমে কাঞ্চনমালা মাণিক্যালা আসিয়া পৌঁছিলেন। মাণিক্যালা পার হইয়াই বিদ্রোহী দেশ। কাঞ্চন মাণিক্যালার প্রধান মঠে একরাত্রি অবস্থান করিলেন। সমস্ত দেব-মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং প্রাতঃকালে ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বিদ্রোহী রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শতদ্রু নদী পার হইয়া তিন চারি ক্রোশ যাইয়া তিনি দেখিলেন একস্থানে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত

হইয়াছে। কাঞ্চনমালা সৈন্য দেখিয়া অন্য পথে যাইবার উৎযোগ করিলেন, কিয়ৎ দূর গিয়া ক্রমে শাল বনে প্রবেশ করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দেখিলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ যাহার মধ্যে সূর্য্য রশ্মি কখন প্রবেশ করিতে পায় না। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে দেখিলেন কোথাও কতকগুলা কম্বল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা ঢাল পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও কতক গুলা ভাঙ্গা হাঁড়ি রহিয়াছে, কোথাও কতকগুলা কাঠ রাশি করা রহিয়াছে; কিন্তু সব ঝোপের মধ্যে লুকান। কোথাও একটী মনুষ্য নাই, চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন কোথাও একটী মনুষ্য নাই। পশ্চাৎ ভাগে অনেক দূরে বোধ হইল একটা কি আসিতেছে, ঠিক স্থির করিয়া বুঝিতে পারিলেন না মানুষ কি জানোয়ার। তিনি সত্বর পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিয়ৎ দূর গেলেই একটা বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখেন কএকজন প্রকাণ্ডাকার অশ্বারোহী কতক গুলি গুনে গোরু বেড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাইয়াই তিনি বৃক্ষান্তরাল দিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ হইল; আর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে দুইটী ১টী, ৩টী করিয়া বহু সংখ্যক লোকে কানন ব্যাপ্ত হইল। কাঞ্চন যে দিকে চাহেন, দেখেন রণবেশ। ব্রাহ্মণ সেনা, প্রকাণ্ড বলবান, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান, অপরিষ্কার শরীর, কাহার যজ্ঞপবীত আছে কাহার নাই। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িয়া সকলে অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবিত হইল, বোধ হয় অশ্বারোহীগণ ইহাদেরি জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। দেখিয়া কাঞ্চন রক্তাম্বরখানি বিলক্ষণ রূপে মুড়ি দিয়া একটী বৃক্ষের দুইটী শিকড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক দুষ্ট-স্বভাব সৈনিক বৃক্ষের উপর হইতে অসামান্য রূপ-লাবণ্য-বতী একটী রমণীকে কানন মধ্যে একাকী দেখিয়াছিল। দেখিয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কি করে, অশ্বারোহীগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার নিষেধ ছিল। সুতরাং এতক্ষণ তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। এক্ষণে তাহারা সুন্দরী কোথায় গেল, খোঁজ করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ খুঁজিতে হইল না। সন্ধান করিয়া, সন্ধান করিয়া, বৃক্ষমূলে রক্তাম্বর দেখিয়া তদভিমুখে ৭৷৮ জন ধাবিত হইল। যখন কাঞ্চন দেখিলেন, লুকান আর থাকা গেল না, তখন তিনি সত্বর বৃক্ষারোহণ করিলেন। বৃক্ষের শাখায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সৈনিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি পতি অন্বেষণে বহুদূর হইতে আসিতেছি, আমার পতি তক্ষশিলায় বন্দী আছেন, আমি তথায় যাইব, আমায় বাধা দিও না।

একজন সৈনিক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, ততদূর যাইতে হইবে না, এইখানেই পতি লাভ করিবে ; আর একজন বলিল, পতির অন্বেষণে না উপপতির ? দুই, তিনজন সত্বর বৃক্ষ আরোহণ করিতে লাগিল ; কাঞ্চন বলিল, বৃক্ষে উঠিও না, এক পদাঘাতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিব। সকলে হাস্য করিয়া উঠিল কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা উহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, তিনি উহাকে এমন দারুণ পদাঘাত করিলেন যে সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া সত্বর বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল। বহু সংখ্যক লোক বৃক্ষ-তলে সমবেত হইল। তখন সকলে কি করা যায় পরামর্শ করিতে লাগিল, আর কাহার সাহস হইল না যে বৃক্ষে আরোহণ করে। কেহ বলিতে লাগিল প্রেতিনী, কেহ বলিল দেবী, কেহ বলিল উহাকে ছাড়িয়া দাও, কেহ বলিল ও পতি অন্বেষণে আসিয়াছে উহাকে দুই একটা পতি দিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কথপোকথন হইতেছে, এমন সময়ে দৃষ্ট হইল দূরে সংগৃহীত কাষ্ঠ কম্বলাদি জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া যেন বনরাশিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। হঠাৎ অগাধ ধূমরাশিতে কাননাভ্যন্তর গাঢ়তর অন্ধকার হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে যে স্থানে অশ্বারোহীগণ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর খাদ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাব সন্নিকটে প্রচণ্ড পাবক রাশি পবিদৃশ্যমান হইল। সেনা-পতি বারম্বার তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন ; বোধ হইতে লাগিল যেন অগ্নিদেব, সৈনিকদিগের প্রাণভূত অন্নরাশি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন বৃক্ষ তলস্থ সকলেই আহার্য্য দ্রব্যরাশি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল কাঞ্চন যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল, সে ও আর একজন বিকটাকৃতি লোক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিল, এবং ঘন ঘন বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের কি অভিসন্ধি ছিল বলিতে পারি না ; কিন্তু যতদূর অনুমান কবা যায় অভিসন্ধি ভাল ছিল না। কাঞ্চন একবার মনে করিলেন নামি, আবার ভাবিলেন, এরূপ দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে পড়া ভাল নয়, ভাবিয়া তিনি বৃক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কিছু উপায় আছে কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাঞ্চনের উপায় ভগবান করিয়া দিলেন, কাঞ্চন বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, অরণ্যানী পরিবেষ্টন করিয়া বহু সংখ্যক অশ্বারোহী প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইতেছে, সূর্য্য-কিরণে তাহাদের বর্ম্ম, উষ্ণীষ, কবচাদি জ্বলিতেছে ; তীক্ষ্ণধার বর্ষার অগ্রে অপরাহ্ন সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত, শীর্ণ, বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহারা ঘুরিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাঞ্চন যে বৃক্ষে আছেন তাহার নিকট দিয়া ব্রাহ্মণ সেনার পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল। যাইবার

সময়ে একজন বৃক্ষতলস্থ যোধবেশী ব্রাহ্মণ সৈন্যদ্বয়ের পৃষ্ঠে বর্ষাঘাত করিল, তাহারা উভয়েই তরবারি নিষ্কাশন করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল ; কিন্তু তিন চারিটি বর্ষার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া উভয়েই ধরাশায়ী হইল। ও দিকে ব্রাহ্মণসৈন্যগণ সম্মুখে প্রচণ্ড অগ্নি পশ্চাতে প্রচণ্ড অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা বীর—যুদ্ধে পরাজিত হইবার লোক নয়—অগ্নিদেবকে ঋক্ মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক সকলে সম্মুখ ফিরিয়া অশ্বারোহীদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন অশ্বে অশ্বে, অশ্বে পদাতিকে, প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। কাঞ্চন উপর হইতে দেখিতেছিলেন। গাঢ় ধূমান্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু শুনিতে লাগিলেন হ্রেষারব করিয়া—অশ্ব পড়িতেছে, বিকট হুঙ্কার করিয়া—মনুষ্য মরিতেছে, অগ্নি মধ্যে মনুষ্যদেহ অশ্বদেহ পুড়িতেছে—কেহই পলাইতেছে না।

কাঞ্চন এ দৃশ্য অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষু ফিরাইলেন ; দেখিলেন, যে দুইজন লোকের ভয়ে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, তাহারা ধরাশয়ী হইয়া রহিয়াছে ; দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। আসিয়া দেখেন উভয়েই মুমূর্ষু ; দেখিলেন বর্ষাফলক একজনের বক্ষদেশে বিদ্ধ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে। কাঞ্চন নিকটবর্ত্তী হইলে সে কষ্টে ক্ষীণ হস্ত যোড় করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল —দেবী ক্ষমা—তাহার আর কথা কহিতে হইল না। কাঞ্চন একবাব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন যে প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র হইতে বর্ষাফলক তুলিয়া লইলে সে বাঁচিতে পারে। তৎক্ষণাৎ কাঞ্চন ধীরে ধীরে বর্ষাফলক উত্তোলন করিলেন, প্রবল বেগে রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাঞ্চন নিজ রক্তাম্বরের অঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত মুখে অর্পণ করিলেন, সম্মুখে জল ছিল না, ক্ষত মুখে ধূলি মুষ্টি প্রদান করিলেন। এবং নিকটে যে সকল লতা পাতা ছিল তাহার রস নিঙগ্ড়াইয়া ক্ষত মুখে দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বতর আরোহণ করিয়া এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে কি কতক গুলা বোঝাই দিয়া কতকগুলা লোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে একজন আকার প্রকারে বোধ হইল দলাধিপতি, দেখিলেন দুইটা মানব মৃতপ্রায় ; দেখিয়া দলস্থগণকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। তখন কাঞ্চন কতক গুলা লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহার রস ক্ষতস্থানে দিতেছেন, সেও অশ্বতর হইতে অবতীর্ণ হইয়া গাধার বোঝা নামাইল এবং তাহার মধ্য হইতে কি একটি ঔষধ লইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দিল। তখন রোগীর চৈতন্য হইল, সে সম্মুখে

কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি", আগন্তুক কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি তোমার কে হন ?" রোগী অমনি বলিয়া উঠিল, "আমি উহার পরম শত্রু"। আগন্তুক আবার কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসা করিল "শত্রুর সেবা করিতেছ কেন ?" কাঞ্চন বলিল "উহার যন্ত্রণা দেখিয়া সে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দুইবার বলিয়া উঠিল "গুরুদেব ! গুরুদেব !" কাঞ্চন বলিল "তোমার গুরুদেব কে ?" সে বলিল "জানি না তিনি কে। আমি পূর্ব্বে চণ্ডাল ছিলাম ; তক্ষশীলা নগরে জল্লাদের কর্ম্ম করিতাম। একদিন শাসনকর্ত্তা আমাকে ও আর একজন জল্লাদকে এক নির্জ্জন ভূগর্ভস্থ ঘরে লইয়া গিয়া একজন ঋষির চক্ষু উৎপাটন করিতে বলিলেন। আমার সঙ্গী চক্ষু উৎপাটন করিল। কিন্তু আমি দেখিলাম ঋষি চক্ষু উৎপাটনে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন আজি আবার তোমার মুখে সেই কথা শুনিয়া তাঁহার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার পর কতবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোথায় যে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে খুঁজিয়া পাই নাই। তদবধি আমি আমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা করিয়া বেড়াই। এই যে কয়েকজন লোক আসিয়াছিল ইহারা সকলেই চণ্ডাল, সকলেই আমার মতাবলম্বী হইয়াছে।"

কাঞ্চন যতক্ষণ চণ্ডালের কথা শুনিতেছিলেন তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছিল। এক একবার সেই দিনের স্বপ্নের কথা মনে হইতেছিল। তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইতেছিল যে এ কুণাল ভিন্ন আর কেহ নহে। চণ্ডালের কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "মহোত্তর ! তোমার গুরুদেবকে একবার দেখাইতে পার ?" সে বলিল "দেখিতে পাইলে আমিই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতাম।"

কাঞ্চন বলিল "তুমি আমার দুঃখে কাতর হইলে তাই তোমায় বলিতেছি আমার স্বামী এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছেন। তিনি মহারাণীর সেনাপতি ছিলেন। তোমার গুরুদেবকে পাইলে আমার স্বামীর অন্ততঃ সন্ধান পাওয়া যায়। তোমার কথায় বোধ হইতেছে তিনিও পাটলীপুত্র হইতে আসিয়াছিলেন।" এই সময়ে রোগী চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরা দুই জনে আমার প্রাণ দিয়াছ তোমাদের একটা কথা বলি, আমায় এক দিন (পার্শ্বে দেখাইয়া দিয়া) এই মৃত চণ্ডাল দুইটী চক্ষু দিয়া বাম্নকীশীল পাঠাইয়াছিল। আমি আর কিছু জানি না। এই সকল জানি।"

তখন বৌদ্ধ চণ্ডাল হিন্দু চণ্ডালের কাছে গিয়া বলিল 'হাঁ, হাঁ, এই সেই, এই চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল।" বলিয়াই সে চণ্ডালের গাত্র বস্ত্র মধ্যে হস্ত পূরিয়া দিল; দিয়া কিছুই পাইল না; কেবল এক সঙ্কেতের মোহর পাইল। সে কাঞ্চনকে বলিল "চল গুরুদেবের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিয়া দিব। কারাগৃহে যাইবার উপায় করিয়াছি, সেই কারায় তিনি নিশ্চয়ই আছেন।"

ত্রয়োদশ খণ্ড

মোহর পাইয়া বৌদ্ধ চণ্ডাল যুদ্ধস্থলে গেল। তথায় স্বদলবলের উপর আহত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সৈন্যের শুশ্রূষার ভার দিয়া সে কাঞ্চনকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশীলায় গমন করিল।

তক্ষশীলার অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। অশোকের রাজ্য অনেক দিন লোপ হইয়াছে। বার বার যুদ্ধে নগরের বড় বড় পরিবার বিধবার পুরী হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-বাড়ীতে লোক অতি অল্প। সমস্ত বিদ্রোহী পল্টন অশোক সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন শুনিয়া, সীমাপ্রদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছে। নগর রক্ষী সেনাও কেহ যুদ্ধের জন্য, কেহ লুটের জন্য নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের উৎপাতে নগরবাসীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। নগরের বড় লোকে ছোট লোকের উপর উৎপাত করিতেছে। ছোট লোকে এক যোট হইয়া বড় লোকের বাড়ী লুট করিতেছে, কোথাও শৃঙ্খলা নাই।

তাঁহারা দুই জনে অতি কষ্টে কারাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যদিও বিদ্রোহিদিগের জন্য কারাগৃহ, তথাপি তাহাতে অধিক পাহারা নাই। যাহাও দুই চারি জন আছে, তাহারা দ্বারের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে কি একটা গোলযোগ করিতেছে, বোধ হইল। কি যেন একটা ভাগ লইয়া গণ্ডগোল করিতেছে। বৌদ্ধ চণ্ডাল পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বেশ ধরিয়া গিয়াছে। গিয়া মোহর দেখাইল। এক জন বাহিরে আসিয়া বলিল "কি চাও?" "রাজার হুকুম তামিল করিতে চাই।" "আজ কয় জন?" "তিন জন"। "সব কটা একেবারে সার না।" "রাজার হুকুম।" তখন ভিতর হইতে এক জন বলিল "কিহে বাহিরে গোল করিতেছ, এখানকার কাজটা সারিয়া যাও না।"

"দাঁড়াও হে, সরকারী কাজ।"

"আর পাঁচ সাত দিনেই সরকারী কাজ বাহির হইবে। এই যোগে কিছু করে লও।" তখন পাহারাওয়ালা এক থোলো চাবি লইয়া বলিল "আমরা আর ভিতরে যাইতে পারি না। তুমিও ত সরকারী চাকর—যাও চাবিটা আমাদের দিয়া যাইও।"

স্বচ্ছন্দে একজন অপরিচিত লোককে চাবি দিয়া শাস্ত্রীরা লুঠের টাকা ভাগ করিতে বসিল। উহার সঙ্গে যে কাঞ্চনমালাও গেল তাহা দেখিলও না। উহারা দুইজনে প্রবেশ করিলে, কাঞ্চনমালা শিহরিয়া উঠিলেন—দেখিলেন ঘোর অন্ধকার—ছুঁচা ইন্দুর চামচিকার আড্ডা—দুই হাত অন্তরে বস্তু দেখা যায় না। পথ দেখা যায় না। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দ্বার দেখিতে লাগিলেন। দ্বার দেখিয়াই চাবি খুঁজিয়া দ্বার খুলিলেন, দেখেন ঘরটী অতি ছোট। একজন কষ্টে থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি লোক। ঘরে বিছানা নাই, খাবার জল নাই। কেবল কয়েদীর লোটাটী মাত্র রহিয়াছে। যাইবামাত্র কয়েদী বলিল "আমায় মারিয়া ফেল; জলতৃষ্ণায় প্রাণ যায় একটু জল পর্য্যন্ত পাই না। যদি খুন করিতে হয় একেবারে কর না কেন? দগ্ধাও কেন?" কাঞ্চন বৌদ্ধ চণ্ডালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাবাগারে এত কষ্ট?"

কাঞ্চনের স্বরে কয়েদী একটু উন্মনা হইল। চণ্ডাল বলিল, "কয়েদী ভাই! আমরা তোমাদের শত্রু নহি, তোমাদের বন্ধু, আমরা বৌদ্ধ। সত্বর তোমাদের উদ্ধার করিব। বলিতে পার কুণাল নামে রাজপুত্র কোথায়?"

"কুণাল কোথায়? সর্ব্বপ্রথম তাহাকে বন্দী করিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে জানি না, তিনি আছেন কি না তাহাও জানি না।"

"এখানে তোমরা কে কে আছ?"

"কেমন করিয়া জানিব? আমি এই ঘরে আছি এই মাত্র জানি। যখন বড় কষ্ট হয় এক একবার চীৎকার করি, পাশের ঘর হইতেও কে চীৎকার করে—ভ্যাঙ্গায কি জবাব দেয় জানি না। মানুষের মুখ দেখিতে পাই না। মানুষের কথা শুনিতে পাই না। প্রাণ যায যায় হইয়াছে।"

"তোমরা খাও কি?"

"আগে শাস্ত্রীরা খাবার দিত, এখন ৭।৮ দিন দেয় না। ঐ উচ্চে ছোট গবাক্ষটী দেখিতেছ, ঐখান দিয়া কে দুই খানি করিয়া রুটী দেয়, কখন দিনে দেয় কখন রাত্রে দেয়, তাই খাই। জল পাই না, কখন ঘাম খাই, কখন কখন প্রস্রাব খাইতে যাই, কিন্তু সে দুর্গন্ধে প্রাণ বাহির হয়।"

কাঞ্চন কহিল, "তবে ইহাদের একটু জল আনিয়া দিই।"

চণ্ডাল বলিল, "মা! এমন কর্ম্ম করিবেন না। আমিই ইহাদের উদ্ধার করিব।" কয়েদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনি স্ত্রী লোক? আপনি কে? মনে হয় পাটলীপুত্রে আমার পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া দুগ্ধ পান করাইতেন, স্বরে বোধ হয় আপনি সেই।"

"আমিও তোমার মত বিপদগ্রস্ত!"

"বুঝিয়াছি—কুণালের কথা জিজ্ঞাসা করায়ই বুঝিয়াছি, যখন আপনি আসিয়াছেন আমাদের নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবে।"

চণ্ডাল তখন আপনি জল আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যদি আসিতে না দেয়। বিশেষ একটুকু টের পাইলে ইহারা নিশ্চয়ই কাটিয়া ফেলিবে। কয়েদীকে বলিলেন, "কেমন হে গায়ে জোর আছে, আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে?"

"জোর কি সবে ৭।৮ দিনে যায়, এখনও উদ্ধারের ভরসা পাইলে দশ হস্তীর বল ধরিতে পারি। কি করিতে হইবে বল।"

"কারাগারের সব ঘরের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে।"

"এখনি"—বলিয়াই কয়েদী হর্ষে জয়ধ্বনি কবিল। অমনি পার্শ্বস্থ তিন চারিটী ঘর হইতে শব্দ হইল "জয়"।

শাস্ত্রীরা বলিয়া উঠিল "শালারা আচ্ছা গোল করে।" বলিয়া আবার লুটের টাকা গণিতে বসিল।

২

একজনকে উদ্ধার করিয়া তিনজন হইল। আর একজনকে উদ্ধাব করিয়া চারিজন হইল। ক্রমে পাঁচ ছয় সাত আট জন হইল। তখন চাবির থোলো ছিঁড়িয়া সকলের হাতে দেওয়া হইল যে, যে ঘর পাও খুলিয়া দাও। ক্রমে সেই গাঢ় অন্ধকার গৃহ সমূহ হইতে ১৫০ জন বৌদ্ধবীর বহির্গত হইল। তখন সমবেত কয়েদীগণ, কাঞ্চনমালা দেবী তাহাদেব উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন জানিয়া আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শাস্ত্রীরা এখনও কি করিতেছিল, এবারকার জয়ধ্বনিতে তাহাদের বড় ভয় হইল। তাহারা বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সমস্ত কয়েদীরা ঘর খুলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে দ্বারের দিকে আসিতেছে। তখন তাহারা প্রমাদ গণিয়া যাহা সম্মুখে পাইল লইয়া পলায়ন করিল। কতক ভাগ হইয়াছিল, কতক হয় নাই, কতক লইতে পারিল, কতক পড়িয়া রহিল, শাস্ত্রীরা পলায়ন করিল। তখন কাঞ্চন কয়েদীদিগকে আহার ও জল দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন.। সকলে শাস্ত্রীদিগের ভাণ্ডার হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিল। কাঞ্চন পাক করিয়া স্বহস্তে সমস্ত লোকদিগকে খাওয়াইলেন।

আহারান্তে তাহারা বিশ্রাম করিলে কাঞ্চন তাহাদের নিকট হইতে কুণালের সংবাদ সংগ্রহ করিতে গেলেন। কেহই সংবাদ বলিতে পারিল না। "কুণালকে কুঞ্জরকর্ণ রাণীর গুপ্ত আদেশ জানাইবার জন্য লইয়া গেল তাহার পর আর

তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুণালের সংবাদ না পাওয়া গেলে সৈন্যেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন নানা কৌশলে অসন্তুষ্ট সেনাপতিদিগকে কারারুদ্ধ করিল; কাহাকেও বলিল মহারাণীর আদেশ; কাহাকেও রাজসভা হইতে কারাগারে পাঠাইল। কাহাকেও যুদ্ধে জয় করিয়া কারারুদ্ধ করিল। এইরূপে কতক মারিয়া ফেলিয়াছে; অবশিষ্ট এই কারাগারে ছিল, কাঞ্চন দেবী উদ্ধার করিলেন।"

কাঞ্চন স্বামীব কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন কয়েদীদিগের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে উহাদিগের ভার দিলেন। বলিলেন আমি এইখানেই স্বামীর অন্বেষণেব জন্য রহিলাম। তোমরা যেরূপে পার আত্মরক্ষা কর।

তখন চণ্ডালের আদেশমত সকলে এক পবামর্শ কবিল; তাহারা বলিল এখানে বসিয়া আত্মবক্ষা অসম্ভব; আইস আমরা আত্মবক্ষা না কবিয়া আক্রমণ আবম্ভ কবি কাবাগার বাজবাটীব অতি সন্নিকট। তাহারা সকলে একত্রে একবাত্রের মধ্যে কাবাগার হইতে বাজবাটী পর্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে ৫০ জন সুড়ঙ্গপথে রাজবাড়ীর উঠানে গিয়া উঠিল এবং আব ৫০ জন বাজবাড়ীব দ্বাবদেশ আক্রমণ করিল। রক্ষী অধিক ছিল না, ত্বরায় বাজবাটী দখল হইয়া গেল, তখন কাবাগার ত্যাগ করিয়া উহারা বাজবাটীতে বাস করিল। রাজবাটীর ভাণ্ডার উহাদের হস্তগত হইল। উহাবা অশোকের নামে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা চিরদিন গোলযোগে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা উহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অশোকের সৈন্যের মধ্যে যাহারা আশে পাশে লুটিয়া খাইতেছিল, তাহাবা যোগ দিল। উহাদের অনেক লোক সহায় হইল। অল্প দিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক কুঞ্জরকর্ণকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। সে কোথায় পলায়ন কবিয়াছে তাহার অন্বেষণে অশোক রাজা একদল সৈন্য পাঠাইযাছেন। বিদ্রোহীরা সেনাপতিশূন্য হইয়া পলাইয়া তক্ষশীলায় আসিতেছিল, দেখিল রাজবাটীতে ও দুর্গে অশোকের পতাকা তুলিতেছে। তাহারা নিরুপায় হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল। বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধ যে যেখানে ছিল, আসিয়া একত্রিত হইল। কেবল দুই জনের সন্ধান পাওয়া গেল না। কুণাল কোথায়, কেহ বলিতে পারিল না। আর যে প্রত্যহ কারাগারে রুটী ফেলিয়া যাইত তাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। কাঞ্চন হাসিতে হাসিতে একদিন বলিলেন যে এ বৌদ্ধ চণ্ডালের কর্ম্ম।

সে বার বার বলিল, এরূপ কাজ করা আমার স্বপ্নের অগোচর।

সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। অশোক সসৈন্যে শীঘ্র তক্ষশীলা আসিবেন শুনা গেল। কিন্তু কাঞ্চনের মনের শান্তি হইল না। স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তিনি নানা উপায়ে যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং চণ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই এক জন প্রধান বৌদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু কোথাও স্বামীর সন্ধান পাইলেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে চণ্ডালের সহিত এক খণ্ড নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়া আসিতেছেন, চণ্ডালের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহাকে অনেক ইতিহাস, অনেক ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কাঞ্চন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাণ দুটী খাড়া করিয়া যেন এক মনে কি শুনিতে লাগিলেন। চণ্ডাল জিজ্ঞাসা করিল "কি ও?" কাঞ্চন হাত দিয়া সঙ্কেত করিয়া বলিলেন "থাম।" সে আশ্চর্য্য হইয়া কাঞ্চনের মুখপানে চাহিয়া অনেকক্ষণ রহিল। আধ ঘণ্টার পর কাঞ্চন বলিলেন "কুণাল এইখানে আছে।"

চণ্ডাল বলিল, "কেমন করিয়া জানিলে?"

কাঞ্চন কহিলেন, "শুনিতেছ না সেই স্বর—ও যে আমি বেশ চিনি।"

"কই স্বর।"

"শুনিতেছ না? আমার কর্ণ ভরিয়া যাইতেছে, ও স্বর আমার বেশ জানা আছে, এখনও শুনিতেছ না? আমার শরীর শিথিল হইয়া আসিতেছে, আমি আর দাঁড়াইব না।"

তবে আইস, বলিয়া কাঞ্চনমালা স্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতি ধাবমান হইলেন। লতারাজি ছিন্নভিন্ন করিয়া, কণ্টকরাশির মস্তক চূর্ণ করিয়া, সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয় তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া, কাঞ্চন বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া এক কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "এই আসিয়াছি নাথ!" বলিয়া লাফ দিয়া সেই কূপে পড়িলেন।

চণ্ডালও আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কূপের নিকটে গিয়া শুনিল "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি," "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি," "সংঘং শরণং গচ্ছামি," শব্দ বাহির হইতেছে।

সে দেখিল কুণাল সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মমতাবিপশ্চিৎ নামক সমাধি বলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া রহিয়াছেন। কাঞ্চনও কূপতলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিতবৎ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া রহিলেন।

৫

তখন চণ্ডাল উভয়কে স্কন্ধে করিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন। উভয়েই বাহ্যজ্ঞান শূন্য। অনেকক্ষণ পরে কাঞ্চনের চৈতন্য হইল। কুণালের চৈতন্য হইল না। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কেবল ধর্ম্ম সংঘ ও বুদ্ধের নাম বাহির হইতে লাগিল; প্রভাতে বাহ্যজ্ঞান জন্মিল। তিনি কাঞ্চনের স্পর্শ অনুভব করিলেন। বলিলেন "কাঞ্চন! তুমি এতদূর কিরূপে আসিলে?

কাঞ্চন উত্তর কবিতে পারিলেন না। তিনি চাহিয়া দেখেন কুণালের চক্ষুর বিবরে চক্ষু নাই। তিনি বলিলেন "একি?"

"কাঞ্চন, চক্ষু না থাকায়ই আমি সমাধি করিতে পারিয়াছি। নহিলে পারিতাম না।"

চণ্ডাল কাঞ্চন-কে জিজ্ঞাসা করিল, নগরে গেলে হইত না? তাহাতে কুণাল বলিলেন "আব নগরে কাজ কি? আমি এইখানেই অবস্থান কবিব। তাহাতে সমাধির বিঘ্ন হইবে না।"

তখন চণ্ডাল চারিদিগে চাহিয়া দেখিল, লতা পাতায় কূপ ও তাহার চারিদিকে অতি সুন্দব স্থান হইয়াছে, কে যেন একখানি চন্দ্রাতপ বিস্তার কবিযা রাখিয়াছে। দেখিয়া সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

চণ্ডাল তখন নগর মধ্যে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানাইবাব জন্য প্রস্থান করিল, কুণাল ও কাঞ্চন নানা কথায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

৬

ক্রমে দুইটী একটী করিয়া লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। ক্রমে বৌদ্ধগণ আসিয়া জুটিল। অশোক রাজা রাত্রিতে তক্ষশীলায় আসিয়া পুত্রবধূর গুণে দেশে শান্তির আবির্ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আজি পুত্রের সমাধি সফল হইয়াছে শুনিয়া সমস্ত লোক জন সঙ্গে বন মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কুণাল তখন উপদেশ দিতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধের অবদান সমূহের কথা বলিয়া সমবেত লোকসঙ্ঘ মোহিনীমুগ্ধবৎ করিতে লাগিলেন।

রাজা অশোক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই সুধাময় কথা শুনিতেছিলেন। পরে আর আনন্দ রাখিতে স্থান না পাইয়া বক্তৃতার সময়েই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কুণাল সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন। বহুকালের পর মিলনে

উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তখন অশোক টের পাইলেন যে কুণালের চক্ষু নাই।

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল, তোমার এ দশা কে করিল?"

কুণাল কোন কথা বলিলেন না। কেবল বলিলেন, "চক্ষু থাকিলে সমাধি হইত না।"

বনমধ্যে সকলে এইভাবে আছেন, এমন সময়ে কুঞ্জরকর্ণকে ধরিয়া কতকগুলি সৈন্য সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অশোক রাজা এইখানে আছেন, শুনিয়া উহাকে লইয়া অশোক রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। হস্তে ও পদে শৃঙ্খলবদ্ধ চারিজন সৈনিক উহাকে লইয়া অশোকের নিকট উপস্থিত করিল।

তিষ্যরক্ষা যে চক্ষু মর্দ্দন করিয়াছিল, তদবধি রাজার মনটা অত্যন্ত সন্দেহাকুল ছিল। কাহার চক্ষু কে পাঠাইল ইত্যাদি। আজি তাঁহার চক্ষু ফুটিল, তিনি কুঞ্জরকর্ণকে রোষভরে বলিলেন, "নরাধম! তুই আমার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়াছিস্?"

তখন কুঞ্জরকর্ণ মিষ্ট মিষ্ট করিয়া রাজাকে বলিতে লাগিলেন, "সেনাপতি অশোক! আমি তোমার হাতে আর দয়া প্রার্থনা করি না। তুমি যত দিন স্বধর্ম্মে ছিলে, আমি তোমার ভৃত্য ছিলাম। তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিলে আমি তোমার শত্রু হইয়াছি। বিধিমতে তোমার শত্রুতা করিয়াছি। কখন বৌদ্ধদের সঙ্গে একটী সত্য কথা বলি নাই। আজি আমার শেষ দিন, আজি তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলিব। ধর্ম্মের ভয়ে বলিব তাহা নহে; বিধর্ম্মীর কাছে মিথ্যা বলিব তাহাতে আবার অধর্ম্ম কি? আমি সত্য বলিব, কারণ তাহাতে তোমার কষ্ট হইবে। যাহাকে তুমি এত ভালবাস, যাহাকে তুমি রাজ্যেশ্বরী করিয়াছ, সে ভ্রষ্টা, সেই তোমার পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করাইয়াছে, সে বৌদ্ধ নহে সে হিন্দু। তোমার দীক্ষার সময়ে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সেই আমায় উদ্ধার করে, সেই আমায় বিদ্রোহী হইতে বলে, আমি কুণালের সঙ্গে বন্দী হইলে সে-ই বন্দিত্ব মোচন করিয়া আমায় রাজত্ব প্রদান করে। এখনও সে রাজ্যেশ্বরী; এখনও তোমার উপর হুকুম আনাইতে পারি, যে তুমি আমার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তক্ষশীলায় রাজা করিবে, কিন্তু তাহার আর জ্ঞান নাই। সে এখন পাগল হইয়াছে, তাই পারি নাই। আমার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে, নহিলে তুমি আমায় ধরিতেও পারিতে না। আমি এইখান হইতে গিয়া তোমার পাটলীপুত্রে যাওয়া বন্ধ করিতাম।"

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

কুঞ্জরকর্ণ তখন বলিল, "আমার প্রতি কি শাস্তি দিবে ?"

"যত দিন তিষ্যরক্ষার অধিকার না হয়, তত দিন তোমায় ঐভাবে থাকিতে হইবে।"

"তবেই তুমি রাখিয়াছ! অদ্য তৃতীয় প্রহরে এ দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে।"

বলিয়া সে রক্ষিদিগকে বলিল, "চল" ; তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাকে লইয়া গিয়া এক গাছতলায় দাঁড় কবাইল। তথায় ইষ্টদেবেব নাম কবিতে করিতে কুঞ্জরকর্ণ দেহত্যাগ করিল।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

সেই বন হইতেই অশোক রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে আমি নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম। পরে তিনি কুণাল ও কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে করিয়া তক্ষশীলায় আসিলেন। কুণাল আব সংসারে প্রবেশ করিতে রাজী নহেন। রাজা বলিলেন "ভগবন্ বোধিসত্ব আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন ও সুভদ্রাঙ্গীর সহিত একাবার সাক্ষাৎ করুন।" কুণাল সম্মত হইলেন। তখন তক্ষশীলা শাসন ও রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত সৈন্য ও কুণাল এবং কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া পাটলীপুত্রে প্রস্থান করিলেন।

২

পাটলী-পুত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমেই তিষ্যরক্ষাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বেই তিষ্যরক্ষা তথায় উপস্থিত হইলেন। আর সে বেশের পরিপাটী নাই, মাথায় এককালে চুল হইয়াছে, ছিন্নবস্ত্র মাত্র পরিধান। আসিয়াই রাজাকে বলিল, "তুমি আমার আসনে বসিও না।"

রাজা বলিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠা"। তখন সে ঘুসা উঠাইয়া রাজাকে মারিতে গেল। রাজা প্রহরীদিগকে ধরিতে বলিলেন ; তাহারা সাহস করিয়া ধরিতে পারিল না। তখন কাঞ্চন উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন ; সে কাঞ্চনের মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলিল "মা! নমস্কার, তুমি আমার সংসার কেন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে ? আমি তোমায় কত খুঁজিয়াছি ? কোথায় গিয়াছিলে ?" বলিয়া কাঞ্চনের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আবার সেখান হইতে সরিয়া "আমি ভ্রষ্টা না হইলে তুমিই বা রাজা হইতে কিরূপে? আর আমিই বা তোমায় ঠকাইয়া রাজ্যেশ্বরী হইতাম কি করিয়া? আমি কুঞ্জর-কর্ণকে বলিয়াছিলাম তুই বিদ্রোহী হ আমি তোকে টাকা দিব। পারিস ত এই কাছাখোলা বেটাদের তাড়াইয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম বজায় কবিব।

রাজা বলিলেন "আর শুনিতে চাহিনা। পাপীয়সি! ভণ্ডতপস্বি! তুই ক্রমাগত আমায় ঠকাইয়াছিস, তুই না আগে ভাগে বৌদ্ধ হইয়াছিলি; তাহার পর তুই আমার প্রিয় পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিস? তোর মতলব কি জানি না। কিন্তু তোর মতলব বদ ভিন্ন ভাল হইতে পারে না, তোরে কুকুর দিয়া খাওয়াইব, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।"

"আহা মরি মরি কি গানই গাইছ। আবার গাও। আমি রাজসিংহাসন তোমায় দিয়া যাইব।" কুণালের কাছে গেল। কুণালের চিবুক ধরিয়া তুলিল। কই বাঘা তোমার সে মণি দুটী কই?

কে নিল নয়ন মণি
ক' কহ গো সজনি

বড় যে আমায় দেখ্‌লেই চোখ্‌ লুকুতে? খুব হয়েছে।

এমনি করে—এমনি করে--

এমনি করে—এমনি করে—পায়ে পিষে ফেলেছি। কেমন, এখন একবার চাওত সোণার চাঁদ? "বলিয়া আবার কুণালেব চক্ষে আঙুল পুরিয়া দিতে গেল। সকলে যেমন ধরিতে আসিল, অমনি কুণালেব গায়ে হাতে বুলাইতে লাগিল।

রাজা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন "নাপিতানি! কুঞ্জরকর্ণকে কি হুকুম দিয়াছিলে?

"নাপিতানি? আমি রাজরাজেশ্বরী। আমি ত রাজ্যশুদ্ধ সব কল্‌ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আমায় বলেন নাপিতানি।"

"না তুমি সাবিত্রী অতি ধন্যা'।

"আমি সাবিত্রী নহি, আমি ভ্রষ্টা।"

কাঞ্চনমালা রাজাকে বলিলেন, "পিতঃ! ইনি এখন উন্মাদ পাগল। আপনি ইঁহাকে কেন তিরস্কার কবিতেছেন? ইঁহাকে শাস্তি দিলে কিছুই ফল হইবে না। আমার এক ভিক্ষা আছে; আপনি উহাকে আমার হাতে দিউন। আমি উহার উন্মাদ উপশম করিব ও ধর্ম্মপথে উহার মতি লওয়াইব।"

রাজা বলিলেন "তুমি পারিবে না।"

কাঞ্চন বলিলেন, "সে ভার আমার, আমি উহাব উদ্ধারের পথ করিব। না পারি আপনি রাজা আছেন।"

রাজা বলিলেন "সেই ভাল, উন্মাদ উপশম হইলে আমি উহার প্রাণদণ্ড করিব।"

"না মহারাজ, এ যাত্রা উহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

"এরূপ পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিলে, শাস্তি কাহাকে দিব ?" তিষ্যরক্ষা নৃত্য করিতে করিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "নিজে গলায় দড়ি দিয়া মর।"

কাঞ্চন বলিল, "সে যাহা হউক মহারাজ, আমার স্বামীর চক্ষু ইনি উৎপাটন করিয়াছেন, আমার স্বামী বোধিসত্ত্ব, তিনি নালিশ করেন নাই। আমারই আবার অনুরোধ আপনি উহাকে ক্ষমা করুন। ধর্ম্ম থাকেন আমার স্বামী আবার চক্ষু পাইবেন।"

রাজা বলিলেন, "তবে তুমি নিতান্ত ছাড়িবে না, তবে লও ও তোমার দাসী হইয়া থাকুক।" রাজা এই কথা বলিলে কাঞ্চন তিষ্যরক্ষার হাত ধরিলেন, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

৩

তিষ্যরক্ষা চলিয়া গেলে, রাজা উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, বাসুকিশীল হইতে বিজ্ঞানবিৎ আসিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন। সে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ ?"

"আপনি বলিয়াছিলেন অশোক রাজা হইলে আসিও। অনেক টাকা পাইবে, আমি সেই জন্য আসিয়াছি। আপনি আমায় এক লক্ষ টাকা দিন।"

"এত টাকা তুমি কি করিবে ?"

"কিছু লইয়া মরা মানুষ ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করিব। আর কিছুতে স্ত্রীর গহনা গড়াইব।"

"আচ্ছা আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা দিব, আর তুমি যে আমায় আগা-মক বলিয়া চৈতন্য দিয়াছিলে, তাহার জন্য তোমায় আমি আর এক লক্ষ টাকা দিব, আর তোমায় জিজ্ঞাসা করিব তুমি যে অন্ধত্ব বিমোচন করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছিলে, তাহা সফল হইয়াছে ?"

"আমি একের চক্ষু অন্যের চক্ষে লাগাইয়া দিতে পারি। এখনও চক্ষু তৈয়ার করিতে পারি না।"

"আচ্ছা, আর কাহারও চক্ষু লইয়া ঐ অন্ধের চক্ষুতে বসাইয়া দেও দেখি।"

কেহই আপন চক্ষু দিতে সম্মত হইল না। শেষ বৌদ্ধচণ্ডাল আপন গুরুর জন্য আপন চক্ষু উপড়াইয়া দিল। কুণাল বারণ করিলেন সে শুনিল না। বিজ্ঞানবিৎও সেই চক্ষু কুণালের চক্ষুকোটরে বসাইয়া দিলেন। কুণালের যেমন চক্ষু ছিল, আবার তেমনি চক্ষু হইল।

তিষ্যরক্ষা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই যে বাছার চক্ষু হইয়াছে—" বলিয়াই বেগে প্রস্থান—সকলে দেখিল তিষ্যরক্ষা শাক্য ভিক্ষুকী হইয়াছে।

কুণাল চক্ষু পাইয়াই চণ্ডালকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে চক্ষুদান করিলে তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত ?"

তখন চণ্ডাল আনুপূর্ব্বিক আপন বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিল। রাজা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শেষ সে বলিল, "যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু দিয়াছেন, তাঁহার জন্য চর্ম্মচক্ষু ত্যাগ কবিতে কষ্ট হইলে, আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ আর নাই।"

এই সত্য কথা কহায় চণ্ডালের যেরূপ চক্ষু ছিল আবার সেইরূপ হইল।

স্বামীব চক্ষু হইয়াছে শুনিয়া কাঞ্চন দেখিতে আসিলেন। রাজা বলিলেন, "কাঞ্চন! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।" কাঞ্চন লজ্জানম্র মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

তখন রাজা কুণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুণাল। তুমি বোধিসত্ব ; তোমার উপকার আমার দ্বারা সম্ভবে না। তথাপি যদি তোমার কোন অভীষ্ট আমার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে, বল আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন, "মহারাজ। আপনি তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় যে কার্য্যের জন্য এ রাজসংসারে আসা সেই কার্য্যটী করিয়া দেন।"

রাজা বলিলেন, "বল আমি এখনই করিব।"

কুণাল বলিলেন, "তবে ঘোষণা করিয়া দিন যে, বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্মই প্রচলিত হইবে এবং সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তক্ষশিলায় সদ্ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। আর আমায় তক্ষশিলার ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া দেন।" রাজা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম মগধ সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইবে।

রাজা আপন পুত্রদিগকে, কাহাকেও সিংহলে, কাহাকেও পারস্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

কুণালকে বলিলেন, "তোমায় পঞ্চনদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা হইতে হইবে।"

কুণাল বলিলেন, "শাসনকর্তৃত্ব আর কাহাকেও দেন।"

রাজা বলিলেন, তবে কাঞ্চনের উপর সে ভার থাকুক, কাঞ্চন এবার তক্ষশীলা জয় করিয়াছে।

কুণাল বলিলেন, "কাঞ্চনও সাংসারিক কার্য্য ভালবাসে না।" বলিয়া তিনি চণ্ডালের দিকে মুখ ফিরাইলেন, সে বলিল, "প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমি গুরুর পদসেবা করিব, শাসনকার্য্য আমার জন্য নহে দয়াময়!"

রাজা তখন শাসনকার্য্যের ভার অন্য লোকের হস্তে প্রদান করিলেন।

৫

এই দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এসিয়া এই দিনের কার্য্যবলে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় করে।

৬

শুনা গিয়াছে, তিষ্যরক্ষা কাঞ্চনের অনুগ্রহে আপনাব ঋদ্ধিমতী নাম সার্থক কবিয়াছিল।
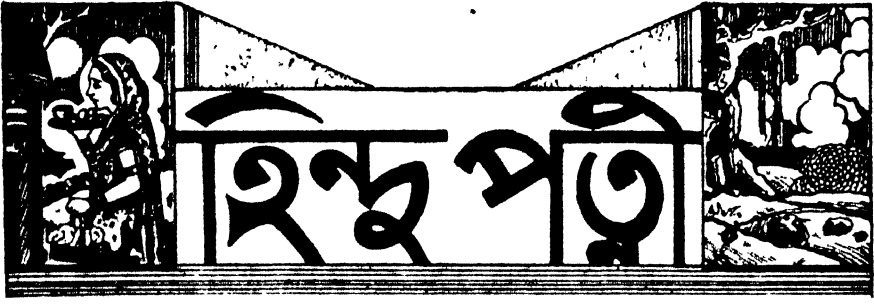
হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যজীবনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম; দ্বিতীয়, গৃহস্থাশ্রম; তৃতীয়, বানপ্রস্থাশ্রম; চতুর্থ, সন্ন্যাসাশ্রম। এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমকে তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ। (৩অ-৭৭)

যেমন বায়ু আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবিত থাকে তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া আর সকল আশ্রম জীবিত থাকে।

যস্মাত্ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী। (৩অ-৭৮)

যেহেতু অপর তিন আশ্রম অহরহ এই গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া রক্ষিত হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ। (৩-অ-৭৯)

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্য স্তেভ্যঃকার্য্যং বিজানতা। (৩অ-৮০)

ঋষিগণ, পিতৃলোক, দেবলোক, অতিথি, এবং অন্যান্য প্রাণীগণ পুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহীর নিকট আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিয়া থাকেন। অতএব জ্ঞানী গৃহস্থ ঐ সকলের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

এখানে দুইটি সার তথ্য পাওয়া যাইতেছে। প্রথম তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রম অপর তিনটি আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা অপর তিনটি আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়াধীন। গৃহস্থাশ্রম অপর সমস্ত আশ্রমের প্রাণস্বরূপ বলিয়া সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। অপর সমস্ত আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বপ্রধান আশ্রম। পরোপকারের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান। পরোপকার গৃহস্থাশ্রমের সর্ব্বপ্রধাম ধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় তথ্যটি এই যে, গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি ইন্দ্রিয় সংযমন। গৃহস্থাশ্রম আত্ম-সুখের জন্য নয়, ভোগবিলাসের জন্য নয়, যশ গৌরবের জন্য নয়। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য—পরোপকাবের জন্য। অতএব শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সংযমন গৃহস্থাশ্রমের মূলভিত্তি। কিন্তু এই যে আশ্রমপ্রধান গৃহস্থাশ্রম, এই যে আত্মসংযমন-মূলক গৃহস্থাশ্রম, দার পরিগ্রহ ভিন্ন ইহাতে প্রবেশ করা যায় না—ভার্য্যা ব্যতিরেকে এই পবম পরোপকাব ব্রতে ব্রতী হওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসেবা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটি কবেন, তিনি মনুষ্য মধ্যে এতই অধম যে জীবন সত্ত্বেও তিনি মৃত বলিয়া গণ্য। যথা ভগবান মনুঃ—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃনামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা মুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি। (৩অ—৭২)

যিনি দেবতাগণের, পিতৃলোকের, ভৃত্যগণের, অতিথি এবং আত্মার সন্তোষ সাধন না করেন, তিনি শ্বাস প্রশ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নন।

কিন্তু যে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে মনুষ্যের জীবন সার্থক হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়, বিবাহ ব্যতিরেকে—ভার্য্যা ব্যতিরেকে সে কর্ত্তব্য পালন করা যায় না।

মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্তিঞ্চা ন্বাহিকীং গৃহী (৩অ—৬৭)

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং মহামুনি কাশ্যপ বলিয়াছেন—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ।

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না ; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।*

বুঝা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এবং উদ্দেশ্য, ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকার। হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের জন্য। ভার্য্যা ব্যতিরেকে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না এবং সমাজ সেবা হয় না। বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে একথা বলে না। বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য দারপরিগ্রহ করে নাই ও করে না। আর কেহ যাহা করে নাই, একা হিন্দু তাহা কেন করে, সে কথা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এত দিনের পর ইউরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতের দার্শনিক ভিত্তি যাহাই হউক, সে মতটি কি এস্থলে কেবল তাহাই জানা আবশ্যক। জানা গেল যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও পরোপকার। জানা গেল যে পবিত্র পরোপকার ব্রত পালন করিবার জন্য, সমগ্র সমাজের সেবা করিবার জন্য, পবিত্র পিতৃপুরুষগণের আত্মার যথাবিহিত পূজার জন্য, জগতে মনুষ্য বল, পশু বল, পক্ষী বল, সকল প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দু পুরুষ হিন্দু রমণীর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন।

যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র, এত প্রশস্ত, সেই বিবাহে পত্নী অথবা ভার্য্যা কি বস্তু তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু অগ্রে আর একটি কথার সংক্ষেপে নিষ্পত্তি করিব। সকল দেশেই বিবাহের অগ্রে কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হয়। নির্ব্বাচন প্রণালী সকল দেশে এক নয়। এ দেশে পিতামাতা পুত্রের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন এবং যে সকল দোষগুণ বিবেচনা করিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্রকারেরা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে অনেকেই এই প্রণালীর বিরোধী ; এবং ইংরাজী courtship প্রণালীর পক্ষপাতী। দুইটি প্রণালীর মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা মীমাংসা করা কঠিন কি সহজ বলিতে পারি না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবা, সে বিবাহের নিমিত্ত কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, যে যৌবনমদমত্ত

*বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক; ১৭২ পৃষ্ঠা।

যুবক বিবাহ করিবেন তিনি না করিয়া, কোন বিজ্ঞ, বর্ষীয়ান, প্রশান্তচিত্ত, ধর্ম্মশীল, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি করিলেই ভাল হয়। যে ভার্য্যাকে প্রধানতঃ পতির নিমিত্ত নয়, সমাজের নিমিত্ত সংসারে থাকিতে হইবে, সে ভার্য্যা স্বয়ং পতির দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে যতগুলি বিষয় এবং যে সকল বিষয় স্থিরচিত্তে এবং বহুদর্শিতাসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ, বিবাহার্থী যুবক স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন কবিতে বসিলে ততগুলি বিষয় এবং সেই সকল বিষয় কখনই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন না। তিনি নিজের ভাবনা যত ভাবিবেন, ধর্ম্ম বা সমাজেব ভাবনা কখনই তত ভাবিবেন না। এবং সেই নিমিত্তই দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মসেবা এবং আত্মতুষ্টি সে দেশে বিবাহার্থী ব্যক্তি স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এতএব বিবাহের উদ্দেশ্য ভেদে কন্যানির্ব্বাচন প্রণালী ভেদ। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যদি প্রধানতঃ নিজের উদ্দেশ্যে, নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা মহত্ত্ব মনে করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিব যে ইংবাজি courtship প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কন্যা নির্ব্বাচন প্রণালী তাঁহারা কোথাও পাইবেন না। কিন্তু যদি তাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত, পবোপকারেব নিমিত্ত, সমাজ সেবাব নিমিত্ত দার পরিগ্রহ কবা তদপেক্ষা মহত্ত্ব মনে কবেন, তাহা হইলে যেন একটু লোভ সম্বরণ করিয়া প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বয়োজ্যেষ্ঠদিগের হাত হইতে কন্যা নির্ব্বাচনের ভারটি কাড়িয়া না লয়েন। মনুই ত বলিয়াছেন যে সংযতেন্দ্রিয় না হইলে সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। দুইটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট এবং কোন্‌টি নিকৃষ্ট, বোধ হয় তাহা মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। আত্মতুষ্টি অপেক্ষা পরোপকার যে অনেক ভাল কাজ বোধ হয় তাহা হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। তবে যাঁহারা আত্মোদ্দেশ-মূলক বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে একটি কথা বলা আবশ্যক। যেখানে স্ত্রী পুরুষ প্রধানতঃ আত্মোদ্দেশে বিবাহ করে, অর্থাৎ স্ত্রী এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে পুরুষ সর্ব্বরকমে আমার মনের মত হইয়া চলিবে, এবং পুরুষ এই মনে করিয়া বিবাহ করে যে, স্ত্রী সর্ব্বরকমে আমার মনেব মত হইয়া চলিবে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ প্রধানতঃ পরস্পরের হাবভাব আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কাল যাপন করে। সেই জন্য তাহারা অপরের ভাবনা ভাবিতে অনেকাংশে অপারগ এবং অনিচ্ছুক হয় এবং পরস্পরেব প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখে বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী হইয়া সর্ব্বদাই কলহ করে এবং যারপরনাই অসুখী হইয়া পড়ে। মূর্খতা, ক্রোধাধিক্য অথবা সাংসারিক অপ্রতুলতা বশতঃ অন্য দেশেও যেমন এ দেশেও তেমনি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু বোধ

হয় যে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রকৃত বা কল্পিত তাচ্ছীল্য লইয়া অথবা মনোযোগের কড়া ক্রান্তি কম হইয়াছে, অথবা তদনুরূপ অপর কোন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যত কলহ হয়, এ দেশে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অপর পক্ষে, যেখানে বিবাহ আপনার উদ্দেশে না হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশে হইয়া থাকে, সেখানে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাহাদের প্রবৃত্তিও হয় না, সেখানে আত্মবিশ্লিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষ দুইজনে এক হইয়া এক মনে এক প্রাণে সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হয়। যদি তাহাতে কাহারো ত্রুটি হয়, তবেই তাহাদের মধ্যে অসুখ বা কলহের হেতু উপস্থিত হয়, নতুবা নয়। অতএব, বোধ হয় যে, আপনার উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক; এবং ধর্ম্মচর্য্যা এবং সমাজসেবার জন্য যে বিবাহ তাহা আপন এবং পর উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যানির্ব্বাচন না করাই ভাল। স্বয়ং কন্যানির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ক্রমশঃ তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াই সম্ভব।

হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপযুক্ত প্রণালীতে কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে পর বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। দেখা যাউক সেই বিবাহ ক্রিয়া অনুসারে হিন্দু ভার্য্যা কি বস্তু হইয়া দাঁড়ান। ইংরাজী প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে, বিবাহ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেবল একটি চুক্তি বই আর কিছুই নয়; অতএব সেই সকল প্রণালীতে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরের তুল্য, কেহ কাহার বড় নয়, কেহ কাহার ছোট নয়, স্বামীও যত বড় এক জন, স্ত্রীও তত বড় এক জন। হিন্দুপত্নী ও কি হিন্দু পতির সম্বন্ধে তাই? দেখা যাউক।

হিন্দু বিবাহরূপ যে কার্য্য সেটি চুক্তি অথবা Contract নয়। ইংরাজী বিবাহ যেমন পুরুষ স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে এবং স্ত্রী পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলে সম্পন্ন হইয়া যায়, হিন্দু বিবাহ তেমন করিয়া সম্পন্ন হয় না। মোটা মুটি বলিতে গেলে হিন্দু বিবাহের প্রথম কার্য্য —দান ও গ্রহণ। কন্যাকর্ত্তা কন্যাটিকে বরকে দান করেন। কিন্তু সে দানের গুণে, কন্যা বরের ভার্য্যা হন না। বরের সম্পত্তি হন মাত্র। মনু বলিয়াছেন :—

> সকৃদংশোনি পততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
> সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানিসতাং সকৃৎ॥ (৯অ—৪৭)

অংশ একবার, কন্যাদান একবার, দানবাক্য একবার—সাধুদিগের এই তিন কার্য্য একবার।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন বস্তুও যেমন একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না, কন্যাও তেমনি একবারের বেশী দুইবার দান করা যায় না। অতএব সম্পত্তি দান করার অর্থও যা; কন্যা দান করার অর্থও তাই। এবং প্রদত্ত সম্পত্তির উপর দানগ্রহীতার যেরূপ স্বামিত্ব জন্মে, প্রদত্ত কন্যার উপর কন্যাগ্রহীতার সেইরূপ স্বামিত্বই জন্মিয়া থাকে। আর এক স্থলে মনু একথা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণং ॥ (৫অ ১৫২)

বিবাহ কালে যে স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতির উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে তাহা কেবল মঙ্গলের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাগ্দানই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্বামিত্বের কারণ।

এখানে স্বাম্য অর্থে অধিকার অথবা প্রভুত্ব বই আর কিছুই নয়। অতএব সম্প্রদানরূপ কার্য্যের গুণে কন্যা ভার্য্যাত্ব লাভ করেন না, পতির সম্পত্তি হয়েন মাত্র। ঘটি, বাটি যেমন সম্পত্তি, তেমনি সম্পত্তি হয়েন মাত্র। বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটার একটু মানে আছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা একা পুরুষকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া গণ্য করেন না। স্ত্রীর সহিত মিলিত যে পুরুষ তাহাকেই তাঁহারা পুরুষ বলেন। যথা ভগবান মনু :—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥ (৯অ ৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুইয়ের নামই পুরুষ।

এই চমৎকার কথার যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য তাহা এস্থলে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। জানা গেল যে হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে, ভার্য্যাহীন পুরুষ একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তি: ভার্য্যা ব্যতিরেকে পুরুষ পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ পুরুষ হইতে পারে না। অতএব যিনি ভার্য্যা হইবেন তাঁহাকে পুরুষের সম্পত্তি হওয়া চাই, নহিলে পুরুষ কি প্রকারে তাঁহাকে নিজস্ব করিয়া তাঁহার দ্বারা তাঁহার আপনার অভাব পূরণ করিবেন? দাসখত ব্যতীত চুক্তির দ্বারা মানুষকে নিজস্ব করা যায় না। প্রভু ও কৃতদাস ছাড়া আর যাহাদের সম্পর্ক চুক্তিমূলক, তাহাদের মধ্যে কেহ কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রকার সম্প্রদানরূপ কার্য্যের দ্বারা কন্যাকে পুরুষের নিজস্ব করিয়া দিলেন। পুরুষের উপকারার্থ স্ত্রীকে ক্ষুদ্র

এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিলেন। স্ত্রীর পক্ষ হইতে বলিতে গেলে এটা কি সামান্য গৌরব ও মহত্ত্বের কথা? পতির উদ্দেশে এই আত্মত্যাগ হিন্দু রমণী বই আর কে কোথায় করিয়াছে বা করিতে পারে? কিন্তু গৌরবের কথা হইলেও, ঘটি বাটির মতন সামান্য সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড় একটা হিতকর বা সম্মানসূচক অবস্থা নয়। তাই দান গ্রহণে কেবল মাত্র সম্পত্তি সৃষ্টি হয়, ভার্য্যাত্ব জন্মে না। যাহাতে ভার্য্যাত্ব জন্মে তাহা এই:—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে। (৮অ ২১৭)

পাণিগ্রহণের যে মন্ত্র তাহাই প্রকৃত দার লক্ষণ। সপ্তপদী গমনে সেই মন্ত্রের পরিসমাপ্তি হয়—বিজ্ঞেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

সপ্তপদীগমনরূপ যে একটি প্রক্রিয়া আছে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে সেইটি যতক্ষণ না সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ ভার্য্যাত্ব নিষ্পন্ন হয় না। এই কথার প্রকৃত অর্থ রঘুনন্দন বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিলেন:—

ভার্য্যাশব্দোযূপাহবনীয়াদিবদ-লৌকিকাস্বসংস্কারালৌকিক-
সংস্কারযুক্তোস্ত্রীবচনঃ। (উদ্বাহতত্ত্ব)।

যেমন যূপ বলিলে যে সে পশু বন্ধন কাষ্ঠ বুঝায় না, যেমন আহবনীয় বলিলে যে সে অগ্নিকে বুঝায় না, কোন অলৌকিক সংস্কারসম্পন্ন কাষ্ঠ বা অগ্নিকে বুঝায়, তেমনি ভার্য্যা বলিলে যে সে স্ত্রী বুঝায় না, কেবল সেই অলৌকিক সংস্কার-সম্পন্ন স্ত্রীকে বুঝায়।

পশু বাঁধিবার কাষ্ঠ এবং অগ্নি দুই-ই অতি সামান্য জিনিষ—পথের ধুলা যেমন সামান্য জিনিষ, তেমনি সামান্য জিনিষ-কাহারো কোন মাহাত্ম্য নাই, কাহারো কোন পবিত্রতা নাই। কিন্তু ধর্ম্মযাজক যখন সেই কাষ্ঠ অথবা অগ্নির সহিত কোন একটি অলৌকিক সংস্কার সংযোগ করেন তখন সেটি আর পথের ধূলার ন্যায় সামান্য পদার্থ থাকে না, তখন সেটি দেবতা অথবা দেবত্বের ন্যায় একটি অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে। অলৌকিক পদার্থ হইয়া পড়ে অর্থাৎ মনুষ্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় না এমন পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্য বুদ্ধির কাছে রহস্যবৎ, এমন অপার্থিব পদার্থ হইয়া পড়ে; মনুষ্যবুদ্ধি ও শক্তিদ্বারা যাহা কিছু সম্পন্ন করা যাইতে পারে, সে সকল অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র পদার্থ হইয়া পড়ে। হিন্দু ভার্য্যাও তাই। দানগ্রহণের গুণে যে স্ত্রী পথের ধূলার ন্যায় সামান্য জিনিস বই আর কিছুই নয়, সপ্তপদীগমন প্রভৃতি অলৌকিক সংস্কারের অলৌকিক গুণে

সেই স্ত্রী অলৌকিক সংস্কারপ্রাপ্ত অগ্নি এবং পশুবন্ধনকাষ্ঠের ন্যায় একটি পবিত্র, দেবতুল্য, অলৌকিক পদার্থ। হিন্দুপত্নী পতির সম্পত্তি বটে কিন্তু পতির সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি অলৌকিক, অতি দেবতুল্য বস্তু। সে বস্তুর গৌরবের, সে বস্তুর মর্য্যাদার, সে বস্তুর পবিত্রতাব, সে বস্তুর দেবত্বের কি সীমা আছে? ভগবান মনু শিক্ষাগুরুকে পিতামাতা অপেক্ষাও বড় বলিয়াছেন বলিয়া সেই শিক্ষাগুরুকে আহ্বানীয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (২অ—২৩১)। আবার রঘুনন্দন বলিয়াছেন, আহ্বনীয়ও যা, হিন্দু ভার্য্যাও তাই। একবার হিন্দুর জ্ঞানচক্ষে চাহিয়া দেখ, হিন্দু ভার্য্যাব কি পদ, কি মহিমা। যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ যাঁহার আবাধ্য দেবতা, যজ্ঞের আহ্বনীয় যাঁহার আরাধ্য দেবতা, তিনিই বলিতেছেন যে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠও যা, যজ্ঞের আহ্বনীয়ও যা, ভার্য্যাও তাই। আবাব বলি হিন্দুর চক্ষে দেখ বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুভার্য্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই। হিন্দুব ধর্ম্মভাবে ভোর হইযা দেখ বুঝিতে পাবিবে যে হিন্দুভার্য্যা দেবাসনে উপবিষ্টা, দেবীপদে প্রতিষ্ঠিতা, দেবীমাহাত্ম্যে মণ্ডিতা। যতদব পাব, হিন্দুব অলৌকিক শব্দেব অলৌকিক অর্থ ভাবিযা দেখ, চিত্ত এই ভাবে ভরিযা উঠিবে, যে মানুষ যত দিন মানুষ অপেক্ষা বড না হইবে, ততদিন হিন্দু ভার্য্যাব ভার্য্যাত্ব যে কি অননুভবনীয় কল্পনাতীত পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারিবে না। এখন বলি—হিন্দু ভার্য্যা হিন্দু পতির সম্পত্তি, এ কথায় লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা মনুষ্যেব দেবতাব ন্যায় সম্পত্তি আব কি আছে? মানুষ যদি দেবতাকে নিজেব সম্পত্তি মনে না করেন, তবে কেমন করিযা বলিব যে মানুষে দেবত্ব আছে? হিন্দুশাস্ত্রকার ভার্য্যাকে পতির দেবতা করিবেন বলিয়াই তাঁহাকে পতির সম্পত্তি করিয়াছেন। এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুর ভার্য্যাগ্রহণের উদ্দেশ্যও যেমন মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর, তাঁহাব ভার্য্যাও তেমনি মহৎ হইতে মহত্তর এবং পবিত্র হইতে পবিত্রতর। ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহাব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সংসারধর্ম্মরূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে যথার্থই দেবতার প্রয়োজন হয়। যে যেখানে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই দেবশক্তির সাহায্যে সম্পন্ন করিযাছে। বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, হোমর, সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবিরূপধারী মহাযাজ্ঞিকগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই এক একটি দেবতা ছিল। সেই দেবতার পবিত্র প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া, সেই দেবতার অলৌকিক উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, সেই দেবতার অপরিমেয় বলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রত্যেকেই এক একখানি মহাকাব্য রূপ এক একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ফরাসি রাজ বিপ্লবোন্মত্ত "মহাপুরুষেরা মাদাম রোঁলা-রূপী মহাদেবীর উৎসাহে

উৎসাহিত হইয়া একটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীর মুখ চাহিয়া, পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া, ভীষণ বনবাস রূপ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসার-ধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম, শক্তি এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি স্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুভার্য্যার এই অর্থ। হিন্দুভার্য্যা কি সামান্য জিনিস!

এখন সময়োপযোগী দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে স্ত্রীজাতীকে অতি নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করিত এবং ঐ ধর্ম্মই প্রথম স্ত্রীজাতীকে পুরুষের সমান করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস না জানা হেতু এই মিথ্যা কথাটি শুধু ইউরোপে কেন, আজকাল এদেশেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। আমি হিন্দু বিবাহ প্রণালীর যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়া থাকি, তবে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতীকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীজাতীকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। "যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতাঃ।"—যেখানে নারী পূজিতা হয়েন সেখানে দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন। (মনু ৩অ, ৫৬)

এ কথা যদি ঠিক হয় তবে ভাবিয়া দেখ, অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইংরাজি সাম্যবাদে ভর করিয়া, বাঙ্গালীর স্ত্রী এটি পাবে না কেন, ওটি পাবে না কেন, বলিয়া যে গোলযোগ করিয়া থাকেন, তাহা ভাল কি মন্দ, সঙ্গত কি অসঙ্গত। বাঙ্গালীর স্ত্রী দেবতা, অতএব তাঁহাকে অদেয়, এমন ভাল জিনিস কিছুই নাই। যদি বল বিদ্যা, "স্বাধীনতা" প্রভৃতি অনেক ভাল জিনিস তাঁহাকে দেওয়া হয় না। তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যাহা ভাল জিনিস বলিয়া উক্ত হয়, তাহা যদি সত্যই ভাল জিনিস হয়, তবে লোকে যখন বুঝিবে যে তাহা ভাল, এবং স্ত্রী দেবতা, তখন অবশ্যই তাহারা সে জিনিস স্ত্রীকে দিবে। এই প্রসঙ্গে আমি আমার কৃতবিদ্য স্বদেশীয়গণকে বলি যে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইংরাজি সাম্যবাদ প্রয়োগ করিও না। স্ত্রী এবং পুরুষকে সমান জ্ঞান করা যুক্তিসঙ্গত কি না, এখন তাহার মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু একথা অকুতোভয়ে বলিতেছি যে, স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা

মনে করিয়া স্ত্রীর প্রতি বিহিতাচরণ করিলে স্ত্রীর যত লাভ হইবে, তাঁহাকে পুরুষের সমান মনে করিয়া সমানের প্রতি যেরূপ আচরণ কর্ত্তব্য সেই রূপ করিলে, তাঁহার তদপেক্ষা অনেক কম লাভ হইবে। জাতির কথা ছাড়িয়া ব্যক্তি বিশেষে কথা ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে, কি ফ্রান্সে, যেখানেই স্বামী স্ত্রীকে যথার্থ মনের সহিত কোন কিছু দিয়াছে, সেই খানেই স্ত্রীকে হয় দেবী নয় দেবতুল্য ভাবিয়া দিয়াছে, পুরুষের সমান অথবা সমস্বত্বাধিকারিণী ভাবিয়া দেয় নাই। স্ত্রীকে দেবতা মনে করিয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার করিলে, এবং দেবতাব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বাখিলে, তাঁহার যত বিশুদ্ধ সুখ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তাঁহাকে সমান মনে করিয়া সমানের ন্যায় ব্যবহার করিলে কখনই তত সুখ এবং উন্নতি হইবে না। সাম্যবাদের বিরোধী আছে—দেবতার বিরোধী নাই। সাম্যবাদে তর্ক আছে, যুদ্ধ আছে—দেবসেবায় তর্ক নাই, যুদ্ধ নাই, সমস্তই প্রীতির আহুতি। সাম্যবাদের ফল সীমাবদ্ধ, সমান সমান, বেশী নয়—দেবতাকে যত ইচ্ছা দাও, দেবতাকে দিয়া সাধ মিটে না, দেবোপহারের সীমা নাই। এতএব এ দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাম্যবাদ অবলম্বন করিলে আমাদেব যে ঊর্দ্ধে আরোহণ করা হইবে তা নয়, নীম্ন অবতরণ করা হইবে; এবং আমাদেব স্ত্রীদিগকে দেবী মণ্ডপ হইতে নামাইয়া রসাতলে নিক্ষেপ করা হইবে। এক্ষণে বাঙ্গালীর স্ত্রীর যে কোন দুঃখ নাই, এমন কথা বলি না। দুঃখ অনেক আছে। কিন্তু দেশেব লোক যত শিক্ষা লাভ করিবে এবং হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে হিন্দু স্ত্রী কি পদার্থ তাহা যত বুঝিবে, ততই তাহারা স্ত্রীজাতির অবস্থা ভাল করিতে যত্নবান হইবে। বোধ হয় যে, এ দেশে বৃদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর ঘরে স্ত্রীর যে সুখ, সম্মান, পূজা, গুণ এবং মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কৃতবিদ্য সাম্যবাদী বঙ্গীয় যুবকের ঘরে তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

আর এক কথা। ইংরাজের সাম্যবাদ এ দেশের লোক জানে না, কখন বুঝে নাই, এবং বোধ হয় যে সহজে বুঝিবেও না। স্ত্রী পুরুষের সমান—এ কথা এ দেশের লোক কখন শুনে নাই—শুনিলে নিশ্চয়ই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। স্ত্রী গৃহের দেবতা—এ কথা এ দেশের লোক ভাল করিয়া না হউক এক রকম করিয়া বহুকাল হইতে জানে এবং বুঝিয়া আসিতেছে। অতএব হিন্দু স্ত্রীর উপকারার্থে যদি কিছু করিতে হয়, তবে হিন্দু স্ত্রী দেবতা এই বলিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিলে, এ দেশে সিদ্ধি লাভ সম্ভব। অতএব ইংরাজি ধুয়া ছাড়িয়া, দেশীয় পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। সকল লোক এবং সকল জাতি এক ছাঁচে ঢালা নয়। অধিকন্তু স্ত্রীকে পুরুষের সমান বলিয়া বুঝিলে পুরুষের

যত লাভ হইতে পারে, স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলে পুরুষের তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইবে। স্ত্রীকে পুরুষের সমান মনে করা মানুষের কাজ। কিন্তু স্ত্রীকে পুরুষের দেবতা মনে করা দেবতার কাজ। প্রকৃত দেবতা ভিন্ন জগতে কেহ কখন প্রকৃত দেবতা গড়িতে পারে নাই। যিনি সীতা গড়িয়াছেন তিনি বাল্মীকি; যিনি শকুন্তলা গড়িয়াছেন তিনি কালিদাস; যিনি দিস্‌দেমোনা গড়িয়াছেন তিনি সেক্সপীয়র; যিনি থেক্‌লা গড়িয়াছেন তিনি শিলর। অতএব আমাদের রামণীদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় আমরাও কিঞ্চিৎ দেবত্ব লাভ করিব। তাহার বেশী লাভ আর আমাদের কি হইতে পারে? যদি সে লাভ হয়, তাহা আমাদের পিতৃপুরুষগণের পুণ্যবলে এবং হিন্দু নারীর ভাগ্যবলেই ঘটিবে।*

---

* এই প্রবন্ধ বাবু চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সাবিত্রি লাইব্রেরির সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত হইয়াছিল।

একদা প্রাতঃসূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে, শ্রীমান্ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাব পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষ শাখায় শোভিত হইতেছিল। চারিপাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভৃতি নানা জাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রম্ভা বৃক্ষ হইতে থরে থরে কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীবরব, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ব্বণ করিয়া কদলী জাতীয় ফল মাত্রের অনন্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন, এমত সময়ে দৈবযোগে সেইখানে বুট, কোট পেণ্টালন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনুমানচন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলী বৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপি কোটপবিবৃত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল—

"Good morning Mr. Hanuman! How do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at break-fast already.

হনুমান কহিলেন, "কিমিদং? কিং বদসি?"

বাবু। What's that? I suppose that is the Kish-kinda patois? It is a glorious country—is it not? "There is a land of every land the pride."—and so on, as you know.

হনু। কস্তং! কস্মাজ্জনপাদাৎ আগতোসি?

বাবু। (জনান্তিকে) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুল পাশ বিস্তারণ পূর্ব্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় ভয়ে হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া গেল। বলিলেন—

"I say - this seems somewhat—"

লেজের আর এক পেঁচা।

"Somewhat unmannerly—to say the least—"

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr. Hanuman—you will hurt me."

আর এক পেঁচ।

"Kind—good Mr. Hanuman."

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল—ডাকিলেন, "ও হনুমান্ মহাশয়, ঘাট হয়েছে ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।"

তখন হনুমান, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে তাহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনুমান বলিলেন, "মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিষ্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে—"

বাবু। এক্ষণে কি?

হনু। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ব্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন ?

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন—"With the greatest pleasure".

হনু। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি ; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে বামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিযাছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। তার আশ্চর্য্য কি ? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন ? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।

হনুমান তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেব-দুর্ল্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা ?"

বাবু। অতি মিষ্ট—delicious !

হনু। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে excuse করুন—"

হনু। তাই বা কাকে বলে ?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড—কি বলব ?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাংলা কি ?

হনু। বৎস ! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গাছে আছে পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয় ! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটী বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনু। কি বিষয়, হে বিদ্বন ?

বাবু। সেই বিষয়, হনুমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন সে সকল গল্প মাত্র, fable—

হনূ। (চক্ষু আরক্ত, এবং দংষ্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প। বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ্—তবে কেমন গল্প!

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহা লাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুষ্কবদনে বলিলেন, "থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও—তোমার লাঙ্গুল ত গল্প নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি?

হনূ। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী?

বাবু। তা না। Local self-government,

হনূ। সে কি?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের?

হনূ। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থান বিশেষে আত্মশাসন? তাহা আমরা সর্ব্বদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড়্ সড়্ করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই, তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয় মধ্যে লুক্কায়িত করিতাম। এমন কি, যেদিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সেদিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয় মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও, আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনূ। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন——

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে?

হনূ। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে—কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটী।

বাবু। সে কি রকম?

হনূ। তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রি-দিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতেছিলাম না।

হনূ। তবে কি অর্থে?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত?

হনূ। অবশ্য। তোমাকে এক চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এইত শাসন?

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না?

হনূ। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে, রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি। (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন?

হনূ। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি! এই বুঝি তোমাদের রাম রাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন?

হনূ। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom—বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত?

হনু। আমি বনের পশু, আমি স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনু। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলা নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে।

হনু। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি।

বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—free-born.

হনু। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনু। আমরাও সেই লক্ষণ বিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবী মধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হইতে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বুঝিলাম বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

হনু। ঠিক কথা ভাই। আইস দুই জনে কদলী ভোজন করি।

শরীর রক্ষণ। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির কৃত। কলিকাতা, ক্যানিং প্রেস।

স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক এই গ্রন্থখানি বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে যে প্রণালীতে লেখা উচিৎ, আমাদের বোধ হয় সে প্রণালীতে ইহা লেখা হয় নাই। যে সকল মত বা ব্যবস্থা সর্ব্ববাদী সম্মত, বালকদের পাঠ্য গ্রন্থে কেবল তাহাই সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। সেরূপ গ্রন্থের ভাষা সরল ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক, এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার ছাপা ভাল হওয়া চাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কোন অংশে "শরীর রক্ষণের" দোষ আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও অনেক বৃদ্ধও ইহা পাঠে বিশেষ ফল পাইবেন। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য যে অন্নদাবাবু যেরূপ দক্ষ চিকিৎসক, সেইরূপ দক্ষতা সহকারেই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন।

কুসুম-কানন। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট অধরলালবাবু অপরিচিত নহেন। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার প্রণীত "নলিনী" বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়াছিল। অধর লাল বাবু গীতি কাব্য লিখিতে যে বিশেষ দক্ষ, এবং সুললিত ছন্দবিন্যাসেও সুপটু, তাহার পরিচয় তৎকালে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যদি "নলিনী" প্রকাশের পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কবির প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ না হইয়া বরং যেন কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, আমরা এ পুস্তকের নিন্দা করিতেছি। সচরাচর যে সকল কবিতা উত্তম বলিয়া পঠিত হয়, ইহার কবিতা-গুলি তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। "উপহার", "কোথা থাকে সুধাকর", "যাইলাম সেইখানে," "বিসর্জ্জন" প্রভৃতি কবিতাগুলি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তবে "আলোর (আলোয়ার) সঙ্গীত",

"The Empress of India," প্রভৃতি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ ইংরাজী কবিতা বিশেষের অবিকল অনুবাদ বা অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ পুস্তক হইতে একটি কবিতা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম; তাহাতে লেখকের রচনা শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"কোথা থাকে সুধাকর, হাসে কুমুদিনী
পুলকিতমনে,
কোথা থাকে দিনকর, দোলে কমলিনী
সহাসবদনে,
কোথা থাকে জলধর, হাসে চাতকিনী
প্রেমের পবশে,
প্রেমের তরঙ্গে চলে' পড়ে লো তরঙ্গিণী
সাগর-উরসে;
নাহি দূর, নাহি কাল, সবে ভালবাসে রে
মরত ভুবনে,
তবে কেন আমি ভাল বাসিব না তোমারে,
লো বিধুবদনে?

গগন চুম্বন করে প্রেমে গিরিবর
উন্নতহৃদয়,
কুসুমনিকর প্রেমে চুমে মধুকর
মধুর নিলয়,
লহরী চুম্বন করে দেব শশধর
সুধার আকর,
বিজলী করিয়ে বুকে চুমে লো কাদম্বিনী
উল্লাস-অন্তর,
কি কাজ বল লো তবে এ সকল চুম্বনে
মরত ভুবনে,
যদি তুমি না চুম্বিলে আমার অধর
ত্রিলোক-শোভনে?

ত্রিদিবে বাজনা বাজে, জননী-কোলে
হাসে শিশুগণ,
রসের বাজনা বাজে কবির বদনে
মনোবিনোদন,

সমর বাজনা বাজে, প্রফুল্লিত হয়
বীরের হৃদয়,
বিজনে সঙ্গীত ধ্বনী করে লো প্রতিধ্বনি
নিশীথ সময়,
কোমল-কুসুম সম ও চারু-হৃদয়,
নহে ত পাষাণ,

সঞ্জীবনী সুধা, যেই বিষাদ-তাপিত রে
জুড়াও তাহারে,
সকলে বাসিল যদি তোমারে, লো স্বজনি
বিমোহিত মনে,
তবে কেন আমি ভাল বাসিব না তোমারে,
লো বিধুবদনে ?"

এখন Shelley-বিরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটির সহিত উপরোদ্ধৃত কবিতার প্রথমাংশের স্থানে স্থানে তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা ঠিক বুঝা যাইবে।

The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean,
* * *

Nothing in the world is single ;
All things by a law divine
In one another's being mingle—
Why not I with thine ?
See the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another.
* * *

And the sunlight clasp the earth,
And the moonbeams kiss the sea
What are all these kissings worth ;
If thou kiss not me.

এই গ্রন্থকার Shelley, Swinburne, প্রভৃতি অনুকরণ-প্রিয়।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি। শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত বিরচিত। কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

ইহাও একখানি কাব্য গ্রন্থ ; ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তবে গ্রন্থকারের অনুকরণ রোগটা বড় প্রবল। Montgomeryর "Night" নামক কবিতা অবলম্বনে "বিভাবরী," Moor এর "Light of other Days" অনুকরণে "অতীত জীবনালোক," এবং Wordsworthএর "To Sleep" কবিতাদৃষ্টে "শয্যাকণ্টক" রচিত হইয়াছে। এগুলি অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার স্বনামে ধন্য হইবার জন্য এ সকল বিষয় পাঠককে বলিয়া দেন নাই। সে যাহা হউক, আমরা গ্রন্থকারকে এ প্রকার "নকল নবীশ" হইতে নিষেধ করি। তাঁহার কিছু ক্ষমতা আছে, তিনি তাহারই যথারীতি পরিচালনা করিলে ভাল হয়।

তৃণ-পুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। কলিকাতা ; নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

বোধ হয়, জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এই প্রথম উদ্যম। তাহাই তিনি সভয়ে, কতকটা বা নম্রতার অনুরোধে, তাঁহার গ্রন্থখানিকে তৃণ-পুঞ্জ বলিয়াছেন। কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে ইহার কবিতাগুলি তৃণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ দরের। কবিতাগুলি কষ্ট-কল্পিত হইলেও গ্রন্থ-খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর অপরাপর ছন্দগুলি উত্তম, কিন্তু তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিছুই নহে। এই গ্রন্থেও অনুকরণের অভাব নাই—তবে অনেক কম। উদাহরণ:—

Southey লিখিয়াছেন,

"From heaven it came to heaven returneth"

গ্রন্থকার ইহারই অনুকরণ করিতে গিয়া লিখিলেন :—

"স্বর্গ হতে ভালবাসা ধরাতলে নাবে লো।
ধরা ছেড়ে ভালবাসা স্বর্গে চলে যাবে লো॥"

এইরূপ "ফুলমালা ও গীতি" কবিতাটী Longfellowর অনুকরণে রচিত।

"আমার প্রণয়গীতে কেন না মজিবে লো
তোমার পরাণ?
ত্রিদিব কুসুম তুমি সোণার কমল,
ফুটেছ মরতে,
অলকা রতন তুমি কুবেরের মণি,
উজল জগতে,
সম্মোহন বাণ তুমি, ভুলে' যায় সবে
যে দেখে তোমারে"।

পদ্য-ব্যাকরণ। হুগলী, বুধোদয় যন্ত্র।

সংস্কৃতের প্রাদুর্ভাব-কালে প্রায় সকল গ্রন্থই পদ্যে রচিত হইত। চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, যাহা পদ্যে বুঝান বড় কঠিন, তৎ সমুদয়ও অধিকাংশই ছন্দোবন্ধে লিখিত হইত। এই প্রকার পদ্যে পুস্তক লেখার এক গুণ আছে। যে সকল বিষয় মনে রাখা কর্ত্তব্য, সে সকল বিষয় পদ্যে লিখিত হইলে সহজে কণ্ঠস্থ হইয়া যায়; বিশেষতঃ বালকদিগের পাঠ্য গ্রন্থাদি পদ্যে লিখিলে বালকেরা বেশ মনে রাখিতে পারে, এবং পদ্য পড়িতে এবং আবৃত্তি করিতে তাহাদের আমোদও বোধ হয়। এমন স্থলে ব্যাকরণের ন্যায় নীরস গ্রন্থ পদ্যে লিখিত হইলে বালকদিগের পাঠের সুবিধা হয়। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা এই অভাবটি দূর করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের কতিপয় অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ লইয়া রচিত; পাঠশালা মাত্রেই ও স্কুলসমূহের নিম্নশ্রেণীতে ইহা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

কবিতা-কল্প-লতিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, রাজকীয় যন্ত্র।

পুস্তকখানি কতিপয় কবিতার সংগ্রহ। খুলিয়াই দেখি—একরাশি সার্টিফিকেট্। কলিকাতা মহানগরের কয়েকজন মহোদয় সার্টিফিকেট প্রদাতা। কিন্তু আমরা সহসা ইঁহাদের চিনিয়া উঠিতে পারি নাই, ইঁহারাও বোধ হয় মনে মনে জানিতেন লোকে বড় চিনিবে না, তাহাই ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিচয়-দানে বাধিত করিয়াছেন। আমরা পাঠকদিগকে একখানি সার্টিফিকেটের নমুনা দেখাইতে ইচ্ছা করি, নতুবা তাহার মহিমা বুঝা যাইবে না। কাব্যের সার্টিফিকেট অবশ্য কবিতাতেই দেওয়া চাই, সুতরাং সার্টিফিকেট্ প্রদাতা নিম্নোদ্ধৃত সার্টিফিকেট্-খানি যথারীতি কবিতাতেই লিখিয়া প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নামটি সার্টিফিকেট্ হইতে বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম। সার্টিফিকেট্ খানি এই :—

নানাবিধ কাব্যরসজ্ঞ কল্যাণীয়
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্তমহাশয়
দীর্ঘজীবেষু—

মহাশয় আপনার,
সুললিত কবিতার,
শুনি রস, এ মানস হয়েছে সরস।
উচিত বর্ণিতে নারে ভাবেতে অবশ।
অন্তরে যাহা উদিল,
ত্বরা তাই প্রকাশিল,
হেন কাব্য রস নব্য না হয় শ্রবণ!
ভাসিবে ভারত ভাবে হয়ে নিমগন!

পূর্ব্বতন গ্রন্থকার,
বিহনে এবে আন্ধার,
হয়েছিল এ ভারত বলে যত জন,
নব্য আর কবিতার কোথা আস্বাদন,
এখন আসুন তারা,
কেমন সুধার ধারা,
'কবিতা-কল্প-লতিকা' কি ভাবে লিখন্!
নব কবি নব ছবি আঁকিছে কেমন!

কলিকাতা
২ ভাদ্র ১২৮৬

শুভার্থি
শ্রী • • ন্যায়রত্ন।

যদি এই গ্রন্থে "ন্যায়রত্নী" সার্টিফিকেট না থাকিত, তাহা হইলে অনেকে গ্রন্থকারের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার রচনা পাঠ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থকার সার্টিফিকেট্ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কবিতার প্রতি যেন পাঠকদের অশ্রদ্ধা না হয়; রাজকৃষ্ণ বাবুর কল্পনা শক্তি উত্তম, তাঁহার কবিত্বও আছে।

ফুলের সাজি। শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কর প্রেস, কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানি আমরা অনেক দিন পাইয়াছি; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ ইহার সমালোচনা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, গ্রন্থকার আমাদের এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কুঞ্জবাবু "নিবেদন" পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"কবিতা লিখিতে জানি—এ কথা আমি বলিতে পারি না। এ বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জন করা যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে তিনি প্রবেশ করুন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে।"

তবেই কুঞ্জবাবু নিজেই এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি কবিতা খিলিতে পারেন; সুতরাং আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার গর্ব্বটুকুর লাঘব করিতে চাই না। কারণ গর্ব্ব-প্রিয়তা সম্বন্ধে তিনি "ঘড়ী" নামক গদ্য-প্রবন্ধে লিখিযাছেন :—

"হ্যাঁগা, তোমবা পাঁচজন ভদ্রলোক কি আমার আত্মগরিমা শুনে রাগ ক'চ্ছ? কি কোর্ব্ব বল, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে হৃদয়মধ্যে গর্ব্বকে স্থান দেয় না, সে অসার।"

পুনশ্চ স্থানান্তরে,

"গর্ব্ব বিহীন হৃদয় পশুর হৃদয়বৎ"।

তাহার পর গ্রন্থকার "নিবেদন" পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অনেক স্থলে পদ্য অপেক্ষা গদ্য কবিতার উপযোগী। ইহা আমারও দৃঢ় বিশ্বাস বলিয়া ঘড়ী নামে একটী গদ্য কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইল।"

এই কয় পংক্তি পাঠ করিবার পর আমরা দেখিলাম যে, সমালোচ্য গ্রন্থখানি কতকাংশে "কবিতা পুস্তকের" এক প্রকার নকল বলিলেও বলা

যায়। "কবিতা পুস্তকে" "অধঃপতন সঙ্গীত" আছে, ইহাতেও "অবনতি" নামক কবিতা সেই ছাঁচে ঢালিয়া লিখিত হইয়াছে; ইহার "রাসলীলা" আর "কবিতা পুস্তকের" "আকবর সাহের খোষরোজ" ছন্দে পর্য্যন্তও এক, কেবল-মাত্র বিষয় বিভিন্ন। পাঠক দেখুন:—

"ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ,
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥"

উপরের লাইন গুলি "খোষরোজ" হইতে উদ্ধৃত। কুঞ্জবাবু ইহারই অনুকরণ করিয়া "রাসলীলায়" দশসহস্র ফুলঘটিত শব্দ যোজনাপূর্ব্বক মাথা ধরাইয়াছেন:—

"ফুল ছড়াইয়ে, ফুল বিছাইয়ে,
নাচিছে যতেক গোপিনীকুল।
ফুলের বাতাস, ফুলের সুবাস,
ফুলের খোঁপায় গোলাপ ফুল॥
ফুলের যমুনা, ফুলের বিছানা,
ফুলের বালিস ফুলের ডালা।
ফুলের বাসর, ফুলের চামর,
ফুলের বাগানে ফুলের মালা॥
ফুলের কলিকা, ফুলের মালিকা,
ফুলের যূথিকা গোপের নারী।
ফুলের বাসেতে, ফুলের রাসেতে,
নাচিছে কেমন ফুলের ঝারি॥"

"কবিতা-পুস্তকের" শেষভাগে "মেঘ" "বৃষ্টি" "খদ্যোত" এই গদ্য কবিতাত্রয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, কুঞ্জবাবুও "ঘড়ী" নামক একটী গদ্য রচনা তাঁহার পদ্যাংশের শেষভাগে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত চিত্তে লিখিতেছি, গ্রন্থকার তাঁহার যে প্রবন্ধটিকে গদ্যকবিতা বলিয়াছেন, আমরা তাহাকে কবিতা বলিতে কোনমতেই প্রস্তুত নহি। আমরা পাঠকবর্গকে কুঞ্জবাবুর গদ্যকবিতার রসাস্বাদন করাইতে চাই, তাহাই তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ঘড়ী বলিতেছে:——

"সকল জাতির নানাবিধ দেবতা। আমি সকল জাতিরই দেবতা। আমার অসীম ক্ষমতা! আমার মুখ সহজে বন্ধ হয় না। আমার মত ক্ষমতা ত্রিভুবনে

কাহারও নাই। হপ্তায় হপ্তায় আমার ভোগ দিও। আমি ডাক্তারের পুঁজি। আমি থাক্‌লে তাঁদের অন্ন মারে কে? কিন্তু আমি না থাক্‌লে তাঁদের কপালে আগুণ! ছ মাস অন্তর ডাক্তার বাবুরা যেন আমায় একটু একটু "মিষ্ট তৈল" খাওয়ান! মাঝে মাঝে আমার পেট খোলসা থাক্‌লে শরীর ঠিক থাকবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, বামণের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুই বেলা স্নান—জুটিলে আহার, পূর্ব্বমত চলিল। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষ প্রফুল্লের মা শয্যাগতা হইল। সেকালে, সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে, চিকিৎসা পত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন উপায় নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল। শেষ প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচ জন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মার সৎকার করিল। বাঙ্গালীরা, এ সময় আর শত্রুতা রাখে না। বাঙ্গালী জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা—পাড়ার পাঁচ জন আসিয়া বলিল—"তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।" প্রফুল্ল বলিল, "ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কি পাইব?" পাড়ার পাঁচজন বলিল, "তোমার কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।" কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল। এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

প্রফুল্ল বলিল, "একটা কথা মনে হইতেছে। আমার মার শ্রাদ্ধে আমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?"

প্রতিবাসীরা বলিল "অবশ্য করিতে হইবে।"

প্রফুল্ল বলিল, "কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে ?"

দুইজন পাড়ার মাতব্বর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজেই তাহারা আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, "তোমরাই ত আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।"

তাহারা বলিল, "সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোন বিবাদ নাই।"

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুই জন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, "কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে এক ঘ'রে ক'রেছিলে—আবার তোমাদের মুখে এই কথা।"

ব্রাহ্মণেরা বলিল, "সে কি জানেন—অমন পাড়াপড়সীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।"

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন "এসব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগ্‌দী বেটীর কাছে টাকা খাইয়াছে। ভাল, বাগ্‌দী বেটী টাকা পাইল কোথা ? নিশ্চিত তাহাব চরিত্র মন্দ।" অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

প্রতিবাসীবা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ কবিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস, প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, ভয়ও আছে, কলঙ্কও আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে এক জন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এজন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণির বাড়ী, প্রফুল্লের বাড়ীর নিকট, সে বিধবা; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই ব'নেই প্রফুল্লের মার অনুগত ছিল। এই জন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যে দিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেইদিন অবধি প্রফুল্লের বাড়ীতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কি চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ

নয়, বেশভূষার একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা ; চরিত্রটা বড় সে খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁর বাড়ী সেখান হইতে প্রায় আট ক্রোশ। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখন শুনে নাই—তা নয়। কিন্তু কি করে—আর কেহ আপনার ঘর দ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, "সে মন্দ হোক—আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে ?"

অতএব ফুলমণি দুই চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পর দিন ফুলমণি একটু দেরি করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আম গাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর একজন পুরুষ মানুষ দাঁড়াইয়া ছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বুলরাগরক্তাধরা, বাঙ্গাপেড়ে সাড়ী পরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন ;—

"কেমন, আজ ?"

ফুলমণি বলিলেন, "হাঁ আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপরের সময়ে পাল্‌কী নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো গোল না হয়।

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে ত গোল করবে না ?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুলব, তুমি আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁচায়, কার বাপের সাধ্য।

দুর্লভ। তা, অমন জোর ক'রে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকবে ?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পারলেই হলো। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙ্গাল, সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাকবে না ? সে ভার আমার—আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মার কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মার জন্য যেমন রোজ কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্ল্ভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্ল্ভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্‌কীতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণ বাবু জমীদারের বিহাব-মন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রমপ্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ কবিলে গোলযোগ হইবে, ত। ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর মুখে শুনা গিয়াছে বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যু-ভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানেব বাজ্য গিযাছে; ইংবেজেব বাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবাব, বছব-কত হইল, ছিয়াত্তরেব মন্বন্তব দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তাবপর, আবার দেবী সিংহেব ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্টমিনষ্টর হলে দাঁড়াইযা এদ্মন্দ বর্ক সেই দেবী সিংহকে অমব করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহেব দুর্ব্বিসহ অত্যাচাব অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাব নিজমুখে সে দৈববাণী তুল্য বাক্যপরম্পবা শুনিযা শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শবীব লোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভযানক অত্যাচার, বরেন্দ্রভূম ডুবাইয়া গিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই, এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহাব সাধ্য শাসন করে। গুডল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী, ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছু করিতে পারিল না।

অতএব দুর্ল্ভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তাঁর উপর ডাকাতে ন। ডাকাতি করে। পাল্‌কী দেখিয়া ডাকাতেরা আসা সম্ভব। সেই ভয়ে বেহাবারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই কেবল দুর্ল্ভ নিজে আর ফুলমণি। এই রূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তারপর বড় ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুই জন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মত দুই মূর্ত্তি আসিতেছে। এক জন বেহারা অপরদিগকে বলিল ;—

"মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়।" অপর আর একজন বলিল, "রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভাল মানুষ।"

তৃতীয় বাহক বলিল, "মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।"

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্‌ছি না!

৫ম। চক্রবর্ত্তী মশাই কি বলেন। আর ত এগোনা যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তাই ত, বড় বিপদ দেখি যে। যা ভেবেছিলেম, তাই হলো।"

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল।—

"কোন হ্যায় রে!"

বেহারারা অমনি পাল্‌কী মাটীতে ফেলিয়া দিয়া "বাবা গো!" শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি "আমায় ফেলে কোথা যাও?" বলিয়া তাঁহার পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুইজন আসিতেছিল- যাহারা এই দশজন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুই জন হিন্দুস্থানী দিনাজপুরের রাজ-সরকারে চাকরীর চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্র প্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারা পলাইল দেখিয়া, তাহারা একবার খুব হাসিল, তার পর আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পাল্‌কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্র দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই; চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে। প্রথমে ভয়েও প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। যখন বেহারারা পাল্‌কী ফেলিয়া পলাইল

তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কি নূতন বিপদ। ধীরে ধীরে পাল্‌কীর কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল দুইজন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল ; যে অল্প ফাঁক রহিল তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল মনুষ্য দুইজন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পাল্‌কী হইতে বাহির হইল—দেখিল কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যে দিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারও সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনও সাহস হয় না। দেখিল এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ী হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ ভালুকে খায়, সেও ভাল, আর ডাকাতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয়ও আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল! জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষ প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল।

দেখিল এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলে থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়া মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরি মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল

সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষুঃ কোটর-গত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "মা তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারেব জন্য আসিলে?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোন উপকার করিতে পারি?"

বুড়া বলিল, "অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় জগদীশ্বর! এ সময়ে মনুষ্যেব মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।"

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জলকলসী আছে, কলসীতে জল আছে, জলপাত্র আছে। কেবল দিবাব লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জলপান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহাব সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কযটি কথা বলিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই।

বুড়া বৈষ্ণব। তাহাব কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণব বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথা মত, বৈষ্ণবী বাড়ীর উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হয় ত, সাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, "আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটী চাপা দিও।"

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তারপর বুড়া বলিতে লাগিল, "আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে না লইয়া পলাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু সে ত পালাইয়াছে। আর কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নীচে এক

খানি চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তা খানি তুলিবে। একটা সুরঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নীচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সেই ঘরের বায়ু কোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।"

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, "এই বাড়ীতে গোহাল আছে—গোহালে গোরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও—একটু আপনি খাও।"

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময়ে দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি সাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণ বিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া কবরে শুয়াইয়া মাটী চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া, ভিজা কাপড় আধ খানা করিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালী সাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোন বাধা আছে, মনে করিল না। প্রফুল্ল দীনদুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্ব্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘ প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসান আছে। এখন সাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। বরং কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল, প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলা গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সর ওয়াল্‌টর রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্ব্বিসহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভাল হয় নাই—তার আর কিছু দিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চকমকি,

সোলা দিয়াশালাই সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উঁচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। সাবল কোদালি আগে নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ু কোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যে সব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরের মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে "ঠং" করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল ঘটি কি ঘড়ার গায়ে সাবল ঠেকিয়াছে। ঘড়া কি ঘটি? একটা চুমকি ঘটি বাহির হইলেও প্রফুল্ল খুসী—পৃথীবিতে প্রফুল্লের কিছুই নাই—এক খানি বস্ত্র মাত্র।

প্রফুল্ল খুঁড়িতে লাগিল—ঠং ঠং করিয়া সাবল বাজিতে লাগিল—না এ বাটীঘটি নয়, বড় একটা লোটা হবে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাত্রের আকার দেখা গেল—কি সর্ব্বনাশ! এ যে ঘড়া বোধ হইতেছে! এক ঘড়া টাকা! প্রফুল্লের বিশ্বাস হইল না—এত অর্থ তাহার কপালে ঘটিবে না।

ক্রমে ঘড়াটা সব বাহির হইল—মুখে খুরি আঁটা। প্রফুল্ল সেটাকে তুলিবার চেষ্টা করিল—কিছুতেই পারিল না—বড় ভারি। তখন প্রফুল্ল অগত্যা তাহার মুখের খুরি খুলিয়া ফেলিল। দেখিয়া প্রফুল্লের মাথা ঘুরিয়া গেল। টাকা নহে—এক ঘড়া মোহর!" এত অর্থ লইয়া প্রফুল্ল পৃথিবীতে কি করিবে?

প্রফুল্ল ঘড়া তুলিতে না পারিয়া আঁজলা আঁজলা করিয়া মোহর তুলিয়া মাটিতে রাখিতে লাগিল—ইচ্ছা গণিবে কত মোহর। কিন্তু অঙ্ক বিদ্যায় তত দখল নাই—গণিয়া সংখ্যা করিতে পারিল না। কেবল কাঁড়ি করিয়া সাজাইল। কিন্তু তুলিতে তুলিতে মোহর ফুরাইল—হরি! হরি! এ আবার কি উঠে। যাহা উঠিল, তাহা কুঁদোর আগুনের প্রতিফলনে লক্ষ অগ্নি বিকসিত করিল—প্রফুল্ল চিনিল—হীরা, পান্না, চুনি! অঞ্জলিপূর্ণ হীরা, পান্না, চুনি উঠিতে লাগিল।

প্রফুল্ল শত সহস্র বার মনে মনে জননীকে স্মরণ করিল। ভাবিল, "হায় মা! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে এ টাকা পাইলাম না! আমি যদি এ টাকা রাখিতে পারি, রাজরাণীর মত কাটাইব! কিন্তু তুমি, মা! না খাইয়া মরিয়াছ!"

প্রফুল্ল আবার মনে মনে ভাবিল, "পৃথিবীতে এত ধন আছে, তাহা আমি জানিতাম না? যাই হউক, এখন পুঁতিয়া রাখি। এই ভাবিয়া, প্রফুল্ল কেবল পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া, আবার ঘড়া পুঁতিয়া রাখিল, তখন প্রফুল্ল

অতিশয় সহর্ষচিত্তে সিঁড়িতে উঠিতে চলিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে হইল—"আরও যদি থাকে? আর থাকে ত লইয়া কি করিব? যা পাইয়াছি, আমার যাবজ্জীবনের পক্ষে অনন্ত ঐশ্বর্য্য।" এই ভাবিয়া প্রফুল্ল সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। অর্দ্ধেক উঠিয়া, কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না। ভাবিল—"ভাল, দেখিই না কেন, আর আছে কি না।" আবার সাবল লইয়া বসিল। যেখানে ঘড়া পাইয়াছিল, তাহার চারি পাশে খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে—ঠং! আবার সাবলে বাজিল। আবার ঘড়া! আবার কেবল মোহর! নীচে আবার তেমনি হীরা, পান্না চুনি পাইল। প্রফুল্ল ভাবিল "আজ নিশ্চয় আমি মরিয়া যাইব—এত ধন মনুষ্যের ভোগে কখন হয় না। ভাল দেখিই না কেন কুবেরের কত ধন আছে?" এই বলিয়া প্রফুল্ল আবার খুঁড়িতে লাগিল। আবার ঠং!—আবাব সেইরূপ ঘড়া—আবার উপরে মোহর, নীচে হীরা, পান্না, চুনি।

প্রফুল্ল বেশ করিয়া সব পুঁতিল। মনে ভাবিল, "আবও যদি থাকে, তা আমি চাই না। আমি যা পাইয়াছি, রাখিতে পারিলে দিনাজপুরের রাণীর সঙ্গে টক্কর দিতে পাবিব।' প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

বড় পবিশ্রম হইয়াছিল। প্রফুল্ল গোহালে গিয়া আবার গরু দুইয়া দুধ খাইল। তাব পবে খড়েব শয্যা রচনা করিয়া শুইল। একা সেই জঙ্গলের ভিতর ভগ্ন অট্টালিকায় শয়ন কবিতে বড় ভয় কবিতে লাগিল। প্রফুল্লের বড় সাহস—তাহাব পরিচয় আমরা যথেষ্ট দিয়াছি; তথাপি ভয় করিতে লাগিল। বিশেষ সেই ঘরে সেই দিন মানুষ মরিয়াছে—প্রফুল্ল আলো নহিলে শুইতে পারিল না, তেল খুঁজিতে লাগিল। তেল পাইল না—কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটা মোম বাতি পাইল। তাই জ্বালিয়া, খড়ের বিছানা করিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। শয়ন করিয়া প্রফুল্লের ঘুম হইল না। আরও ঘড়া আছে কি? না আর ধন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। থাকিলেই বা? আর লইয়া কি হইবে? তবু দেখিলে ক্ষতি কি? না দেখিব না—না দেখিলেও ঘুম হয় না। ঘুম হইল না।—কাজে কাজেই প্রফুল্ল আলো জ্বালিয়া সুরঙ্গে নামিল। আবার সাবল লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল—আবার ঠং করিয়া সাবল ঘড়ায় বাজিল। আবার—এক ঘড়া ধন বাহির হইল।

এইরূপে প্রফুল্ল বার ঘড়া ধন পাইল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে পর প্রফুল্ল হাত পা ধুইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিল। এবার বোধ হয় পরিশ্রমের ফলে একটু নিদ্রা আসিল। কিন্তু

অকস্মাৎ ভয়ানক কোলাহলে প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যেন একশত লোক মার মার! কাট কাট! শব্দ করিতেছে। প্রফুল্ল থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে তৃণশয্যা হইতে উঠিল। বেশ করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শব্দ শুনিতে লাগিল। শব্দ তাহার দ্বারে। মার মার! কাট কাট শব্দ নহে, তবু অনেক লোকের কোলাহল ধ্বনি বটে। সর্ব্বনাশ এ জঙ্গলে এত লোকের শব্দ—এ নিশ্চিত ভূত। নিতান্ত তা না হয় তবে ডাকাত।

রে রে হৈ হৈ শব্দ মধ্যে প্রফুল্ল, একটা শব্দ বেশ বুঝিতে পারিল। প্রফুল্ল ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, সেই দ্বারে যেন সহস্র লোকে ঠেঙ্গাইতেছে। দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়—আর থাকে না। প্রফুল্ল তখন মনে মনে সকল দেবতাকে ডাকিল। একবার ভাবিল যে তক্তা তুলিয়া সুরঙ্গে নামিয়া গিয়া লুক্কায়িত থাকি। তার পরে ভাবিল যে নীচেয় গেলে, তক্তার উপর ত বিছানা করিয়া তক্তা লুকাইতে পারিব না—যাহারা দ্বার ভাঙ্গিতেছে, তাহারা দেখিতে পাইয়া তক্তা তুলিয়া নীচেয় গিয়া ধরিবে। তখন প্রফুল্ল বুঝিল যে, সাহস ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। একে স্বভাবতঃ প্রফুল্লের অনেক সাহস—তাতে কয় দিন ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছে—অনেক বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাইয়াছে—অনেক সাহস করিয়াছে। অতএব সাহসে ভর করিয়া, প্রফুল্ল গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তখন মম বাতি জ্বলিতেছিল।

দ্বার খুলিবা মাত্র, হুড় হুড় করিয়া জনকুড়ি পঁচিশ কালান্তক যমের ন্যায় জোয়ান ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

"যোগ মগন হর, তাপস যত দিন
তত দিন না ছিল ক্লেশ"
দশমহাবিদ্যা।

১

প্রকৃতি! কোথায় আজ রাখিব এ প্রাণ
বিশাল এ ধরাতলে—
অনন্ত ও নভস্থলে—
অতল এ বক্ষে মম—মিলে না যে স্থান,
কোথায়—কোথায়—আজ রাখি এই
প্রাণ!

কোথা তুমি রাখ তারে—প্রলয়ে যখন—
ওই গ্রহ তারা টুটে
শূন্য পথে ধায় ছুটে,
কোথা সে অনাথ গ্রহে কর স্থান দান!
আমার এ প্রাণ তথা পায় নাকি স্থান?

৩

জলধি! তোমার গর্ভে—সে স্থান কোথায়
বক্ষচ্যুত অনাশ্রয়
ক্ষুদ্র রেণু নিরাশায়—
অকূল প্রবাহে পড়ি' যবে ভেসে যায়—
কোথা সেই স্থান যথা রাখ তুমি তায়?

৪

বসুন্ধরে!
যে ব্যথার নাহি স্থান বিপুল সংসারে
মর্ম্মেও না স্থান পেয়ে
অশ্রুধারে পড়ে বেয়ে
হৃদয় পাতিয়া তুমি স্থান দেহ তারে—
কোথা রাখ সেই অশ্রু দেখাও আমারে!

তুমি হে সমীর! তুমি দেহ দেখাইয়া
ছিন্ন-প্রাণ-পাদপের—
দগ্ধ-প্রাণ-মানবের—
কাতর নিশ্বাস যথা লহ মিশাইয়া—
সেই স্থান আজ মোরে দেহ দেখাইয়া।

৬

বনরাজি! তব অঙ্কে সে স্থান কোথায়—
যথা রাখ পাপিয়ার
সকরুণ সে চীৎকার
যবে সে অস্থির প্রাণে গভীর নিশায়
তোমার নির্জ্জন অঙ্কে কাঁদিয়া বেড়ায়?

৭

হিমাচল !
বিপুল অন্তরে তব গোপনে যেখানে—
রাখি' প্রাণ আপনার
না পাও যন্ত্রণা আর—
সেই খানে বিন্দুমাত্র মিলিবে কি স্থান ?
রাখিতে আমার এই নিরাশ্রয় প্রাণ !

৮

শর্ব্বরি ! তোমার বক্ষে আতস* যখন
ছুটি ভীম যাতনায়
কাঁদিয়া ফাটিয়া যায়
লুকাও হৃদয়ে তায় করিয়া যতন
এ প্রাণ রাখিতে কেন সঙ্কুচিত মন !

৯

স্রোতস্বতি !
তোমার উভয় তীর-বাসি প্রাণিগণ—
ধূলি, কুটা, মলা, ছাই
যা কিছু ঘৃণার, তাই—
দেয় ফেলি তব নীরে—সবে দেও স্থান
তা'হ'তে যে ঘৃণ্য বলি' ফেলেছে এ প্রাণ !

১০

সংসার হে ! তুমি আজ দেখাও আমারে
তিলার্দ্ধ এমন স্থান—
যথা আজ রাখি প্রাণ !
জগদীশ ! অনাথের তুমিই আশ্রয়—
তুমি বল ! আজ প্রাণ রাখিব কোথায় ?

১১

অথবা কেন রে বৃথা ডাকি ত্রিসংসারে
এ জগৎ খুলে প্রাণ
যদি আজ দেয় স্থান—
এ প্রাণ তথায় আজ রহিতে না পারে !
তবে কেন অকারণ সুধাই সবারে !

১২

আর তুমি !—
ইহ জীবনের তুমি অনন্ত, অমরি !
না জানি সে কি যে স্থান—
যাহা ক'রেছিলে দান !
জগতে যে সমতুল তার নাহি হেরি
অনাথ করিলে সেই স্থান-চ্যুত করি !

১৩

বারেক নয়ন খুলে দেখ তুমি হায় !—
কোথায় তুলিয়া ছিলে !—
কোথায়—ফেলিলে ঠেলে !
স্বর্গাধিক স্বর্গ সে যে—তুলিলে যথায়
ফেলিলে এ প্রাণে আজ দেখহ কোথায় !

১৪

কি ভীষণ এ পতন দেখ একবার—
সূচী-মুখ মাত্র স্থান
তুমি করেছিলে দান
উঠিল এ প্রাণ – সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড উঠিল !
খসিল এ প্রাণ—সঙ্গে কেহ না টুটিল !

১৫

সেই স্বর্গচ্যুত প্রাণ একাকী আমার
ক্ষিপ্ত উন্মাদতা প্রায়
কেবলি কাঁদিয়া ধায়
জগতে তাহার স্থান কোথাও না মিলে
কি করি তুলিলে দেবি !—কি করি ফেলিলে !

১৬

কিন্তু তুমি নহ দোষী—আমি দুরাশয় !
সামান্য সাধনা করি'
স্বর্গের কামনা ধরি
আমার গভীর সেই নাহি স্বার্থ দান—
প্রতিদান যার তব অপার্থিব প্রাণ !

---

* হাউই।

১৭

মুছে ফেল অশ্রুজল পরাণ আমার
আপন অদৃষ্ট ফলে
আপনি অনাথ হ'লে
কর নাই সে তপস্যা পুণ্য-বলে যার
সে স্বরগ রাজ্যে তব হ'বে অধিকার !

১৮

নহে সেই সাধনার ওরূপ আচার
নিরাকারে পূজে যেই
প্রণয় কি, বুঝে সেই ;
সাধ সেই মহাযোগ প্রাণ এইবার
ধ্যায়ে নিত্যং এবে সুধু পরমাত্মা তাঁর।

১৯

আইস দেখাই প্রাণ সে যোগ-পদ্ধতি—
এ তুচ্ছ যন্ত্রণা ভুলি
সংসারের ঢাকা খুলি—
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি সৃজিয়া মন্দির
কর পূজা আত্মাময়ী প্রেমদা দেবীর।

২০

অণু পরমাণু ধোরে—শূন্য ধরাতলে
গন্ধ পুষ্প উপাদান
সংগ্রহ করহ প্রাণ,
নিরাকার মূর্ত্তি পদে গঠি পীঠস্থান
প্রথমে সে ঘোর স্বার্থ দেহ বলিদান।

২১

হৃদয়ে মথিলে প্রাণ উঠিবে চন্দন
ওই গন্ধ পুষ্প সনে
মিশাইয়া সে চন্দনে
"যে দেবীর ছায়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান
সেই দেবী পদে" বলি কর তাহা দান।

২২

জগৎ ! ফিরায়ে দাও প্রতিবিম্ব তাঁর—
প্রকৃতি !—তোমার বক্ষে
রাখিয়াছি কক্ষে কক্ষে—
তাঁহার আত্মার ছায়া করি স্তূপাকার—
দেহ আজ গঠি তাঁর মূর্ত্তি নিরাকার !

২৩

চন্দ্রমে !
শারদী পূর্ণিমা রাতে তোমার কিরণে
যে মধুর হাসি তাঁর
শিখায়েছি অনিবার
আঁধারি জগৎ তাহা কর প্রত্যর্পণ
প্রাণের মন্দিরে দেবী করিব সৃজন।

২৪

মলয় ! তোমারে নিত্য নীরব নিশায়
নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁর
শিখায়েছি অনিবার
রোধি ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস দেহ তাহা ফিরে,
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে।

২৫

জাহ্নবি ! তোমার বক্ষে নির্ম্মলতা তাঁর
ঢালিয়াছি অবিরল
স্নিগ্ধ করি তব জল
শুকায়ে প্রকৃতি কণ্ঠ দেহ তাহা ফিরে !
প্রাণের মন্দিরে আজ সৃজিব দেবীরে ।

২৬

অবনি ! তোমার বক্ষে যে মমতা তাঁর
তরু লতা সরোবরে
ঢালিয়াছি যত্ন করে,—
ফিরাইয়া দেও তাহা কাঁদায়ে সংসার—
প্রাণের মন্দিরে দেবী সৃজিব আমার !

২৭

হে প্রসূন!
তোমার ও দলে দলে এত দিন ধরি,
যেই পবিত্রতা তাঁর,
ঢালিয়াছি অনিবার,
কাঁদায়ে দেবতাকুল দেহ তাহা ফিরে—
নির্ম্মাইব দেবী আমি প্রাণের মন্দিরে!

২৮

লজ্জাবতী নাম তব কানন বল্লরি!
ঢালিয়া সরম তাঁর
দিয়াছি আমি তোমার—
দেহ সে সরম তুমি আজ আমারে ফিরি—
সৃজিব এ প্রাণে আমি প্রাণের ঈশ্বরী!

২৯

কবিতে!
এই দীর্ঘকাল ধরে তোমার ভাণ্ডারে
যে মধুর ভাষা তাঁর
ঢালিয়াছি অনিবার
শুধু সে মাধুরী দেহ ফিরায়ে আমারে—
প্রাণময়ী রূপে তাঁর রাখিব তাহারে।

৩০

নমি তব আত্মারূপে প্রাণের ঈশ্বরী—
লহ স্বার্থ বলিদান—
নাহি চাহি প্রতিদান!
যেরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় তুমি বিদ্যমান
সেই রূপে প্রাণে মম হও অধিষ্ঠান।

হুগলী জাহ্নবী-তীর
শুক্লপক্ষ নিশি

ঈশান—

আমরা এতক্ষণ যে রূপে মেঘদূতের সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে উহার গল্পমাত্র সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু গল্পের সমালোচনা মেঘদূতের সমালোচনা নহে। নাটক, নভেল, ও মহাকাব্যের সমালোচনায় গল্পের সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক। মেঘদূতে সমালোচনায় উহার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি মেঘদূতের গল্প, ঘটনা, বচনা-প্রণালী কত সুন্দর তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এতক্ষণ লিখিতেছিলাম।

মেঘদূত গীতিকাব্য। যে অর্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিকাব্য সে অর্থে মেঘদূত গীতিকাব্য নহে। গীত গোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে মেঘদূত লিখিত হইয়াছে, তাহা গীত হইতে পারে সত্য, এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ গীত হইলে সহৃদয়গণের হৃদয় উন্মত্ত করিতে পারে, তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাতে গান নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে গীতিকাব্য বলিবেন না। না বলুন, আমরা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। কাব্যের বাহ্য আকারের প্রতি আমাদের তাদৃশ দৃষ্টি নাই।

যে স্থলে কোন একটী ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া, হৃদয়কে অধিকার করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া, আপ্লুত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাব-প্রকাশক কাব্যের নাম গীতিকাব্য। যে গানময় কাব্যে এই ভাবের প্রকাশ নাই আমরা তাহাকে গীতিকাব্য বলি না। যদি গদ্যেও এই প্রকার গভীর ভাব প্রকাশ থাকে, তাহাকেও আমরা গীতিকাব্য বলিতে সঙ্কুচিত হই না।

অন্যে যাহাই বলুক, মেঘদূত আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। যক্ষের বিরহ, প্রথম দিন হইতেই অতি তীব্র হইয়াছিল। রামগিরিতে আসিয়া রাম ও সীতার মিলন-সুখ-সাক্ষী বৃক্ষ, পর্ব্বত ও প্রস্রবণাদি দর্শনে ক্রমেই তাহা তীব্রতর হইতেছিল। কিন্তু এত দিন তাহা মনেই ছিল, আজি আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে

যক্ষের হৃদয় সে তীব্র যন্ত্রণাময় ভাবপ্রবাহ আর ধারণ করিতে পারিল না। সে ভাব-প্রবাহ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইল।—গরিব যক্ষ পাগল হইল। মেঘকে সচেতন বোধে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার নিকট আপনার দুঃখ-কাহিনী বলিয়া নিজের যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিল এবং পরিশেষে সে উত্তর দিকে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আপনার দূত-পদে বরণ করিল। যক্ষের সেই প্রবল স্থায়ী বিরহ-ভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত হইয়া, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ পল্লবিত ও সুশোভিত করিয়াছে, তাহার, সমালোচনা মেঘদূতের প্রকৃত সমালোচনা।

কালিদাস প্রথম চারিটী কবিতায় যক্ষের পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, বিরহে তাহার শরীর কৃশ হইয়াছে, কনক বলয় খুলিয়া পড়িতেছে, সে মেঘ দেখিবা মাত্র কিযৎক্ষণ মেঘের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া উন্মনা হইয়া রহিল। আপনার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা মনে মনে তুলনা করিয়া কান্দিতে লাগিল। প্রথম শ্লোকেই বলিল, আমার প্রিয়া দূরে, তাই আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিল, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ, তাই তুমি আমার সংবাদ লইয়া আমার প্রিয়াকে দেও। এরূপ গভীর প্রণয় স্থলে যেরূপ ঘটা স্বাভাবিক, যক্ষেরও তাহাই ঘটিয়াছে। যক্ষ আপনার প্রিয়ার জন্য যত কাতর, নিজের জন্য তত নহে। সেই প্রিয়ার সন্তাপ নিবারণের জন্য মেঘকে দূত করিতে চায়। সমস্ত মেঘদূতে বরাবর প্রিয়ার জন্য এই কাতরতা পরিদৃষ্ট হয়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিরহিণীদিগের জন্যও তাহার কাতরতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজ বাক্যে তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছে, "মেঘ। তুমি আকাশে উঠিলে পথিকদিগের বনিতাগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইবে।" আর এক স্থানে মেঘকে বলিতেছে, "যখন সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে অভিসারিকাগণ কান্ত-ভবনে গমন করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তুমি তাহাদিগকে স্থির সৌদামিনী বিস্তার করতঃ পথ দেখাইয়া দিও।" "সূর্য্যদেব যখন সমস্ত রাত্রি অন্যত্র অতিবাহিত করিয়া বিরহিণী নলিনীর নয়নাশ্রু নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে উদিত হইবেন, তখন যেন তুমি তাঁহার কররোধ করিও না।" "যখন বিরহশীর্ণা, কোন নদী তোমাকে দেখিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে, তখন প্রচুর জলদানে তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া যাইও"। "যখন মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে পর্ব্বতে আরোহণ করিবেন, তখন তুমি সেই পর্ব্বতে মিশিয়া তাঁহাদের কোমল সোপান হইও।" এই রূপে যক্ষের নিজের উন্মাদাবস্থাতেও পরের প্রণয়সুখে তাহার সুখ এবং পরের দুঃখে তাহার গাঢ় দুঃখ প্রতিপদে প্রকাশ হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে

স্বভাবের, মনুষ্যের, এবং মনুষ্য-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে তাহার প্রগাঢ় সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া মেঘদূত কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার প্রথম সহানুভূতি স্বভাব সৌন্দর্য্যে। রামগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই সুদূরবিস্তীর্ণ পথে যেখানে যে বস্তু সুন্দর, কালিদাস যক্ষ-মুখে সেই সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বত পাদমূলে নিরন্তর প্রবাহিনী নদী, সুপক্ক ভক্ষ্যফল ও প্রস্ফুটিত ফুলে সুশোভিত কাননমালা, কাননাবৃত পর্ব্বতের অভ্রভেদী উচ্চতা, উজ্জয়িনী নগরে রমণীয় অট্টালিকাশ্রেণী, মহাকাল মন্দিরের সায়ংকালীন আরতি, ষড়ানন মন্দিরে মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরদিগের উন্মন নৃত্যলীলা, ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা, হরিদ্বার সমীপে হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গার অবতরণ, তদনন্তর তুষারধবল কৈলাস পর্ব্বত, তন্মধ্যে নগর-শিরোমণি-ভূত কুবের রাজধানী অলকা, অলকায় কুবেরের অত্যাশ্চর্য্য সমাজ-শাসন-প্রণালী, যক্ষদিগের স্বর্গসুখ, প্রভৃতি স্বভাবে, শিল্পে, পুরাণে, যাহা কিছু সুন্দর আছে, যাহা দেখিলে হৃদয় গভীর ভাবে পরিপূর্ণ হয়, কালিদাস সে সমস্তই দেখাইলেন। ক্রমে ভৌতিক সৌন্দর্য্য পরিহার করিয়া তিনি মনুষ্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া রমণী-সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী সৌন্দর্য্য স্বভাব সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর: উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। যে অনুপম রূপবতীর রূপ পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, কবি দেখাইলেন সেই রমণীকুলললামভূতা যক্ষপত্নী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতেছে, অনবরত অশ্রুপ্রবাহে তাহার নয়ন স্ফীত হইয়াছে। সেই মুখের উপরে তৈলশূন্য রুক্ষ অলকাবলী বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণ মেঘান্তরালে চন্দ্রমণ্ডল ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কবি তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না। তিনি সেই পরমরূপবতী পরমগুণবতী পতি-প্রাণা রমণীর চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূতভৌতিক পরিহার করিয়া চিত্তচৈত্তিক জগতে অবগাহন করিলেন। পরম-পবিত্র প্রণয়ীর বিরহে পতিপ্রাণা প্রণয়িণীর হৃদয়ের ভাবগুলি বাছিয়া বাছিয়া লইয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। তিনি দেখাইলেন, যক্ষ-পত্নী কখন স্বামীর মঙ্গল কামনায় দেবতাদের পূজা করিতেছেন, শারিকার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সখি তুমি ত তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলে, তাঁহার কথা কি তোমার মনে হয়?" কখন বা তাঁহার প্রাণনাথ-বিরহে কিরূপ কৃশ হইয়াছেন, মনে মনে তাহাই ধ্যান করিয়া চিত্রপটে তাহাই চিত্রিত করিতেছেন। কখন বা স্বামীর নাম দিয়া বিরহ-গান রচনা করতঃ বীণা-যোগে তাহা গান করিতে যাইতেছেন। প্রতিবারই নয়নজলে বীণা-তন্ত্রী ভিজিয়া

যাইতেছে। আর তিনি গানের তানলয় ভুলিয়া যাইতেছেন। কখন বা দ্বারদেশে রক্ষিত পুষ্পগুলি গণিয়া দেখিতেছেন বিরহের আর কতদিন বাকী আছে। এই কোমলতার প্রতিকৃতি সমস্ত দিন বরং নানাবিধ মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু রাত্রে একাকিনী সেই সুখভবনে, সেই সুখশয়নে তাঁহার আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না, ক্রমাগত পূর্ব্ব কথা মনে পড়ে, ক্রমেই হৃদয়ের সন্তাপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেমন যক্ষ-পত্নী কোমলা, তাঁহার প্রণয়ী যক্ষও তেমন কোমল-হৃদয়। তিনি মেঘকে বলিয়া দিতেছেন, "ভাই রে! যদি সে তখন ঘুমাইয়া থাকে, তাহাকে জাগাস্ না, যদি কোনরূপে একটু নিদ্রা গিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্নে আমাকে পাইবে। তাহাকে জাগাইয়া বিরহের উপর আবার বিরহ দিস্ না।"

যে দৌত্যের জন্য এত আড়ম্বর, যে দৌত্যের জন্য জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সংগ্রহ, যে দৌত্যের জন্য নর্ম্মদার দক্ষিণ হইতে মেঘকে অলকায় প্রেরণ, সে দৌত্যের প্রধান কথা এই "তুমি কেমন আছ?"

"তুমি কেমন আছ?" এ কথা আমরা যখন তখন যার তার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া থাকি। সুতরাং এ কথাটীতে অনেক পাঠক কোন নূতনত্ব দেখিবেন না। কিন্তু যে প্রণয়ী, যে কখনও পরের জন্য ভাবিয়াছে, পরের সহিত বিচ্ছেদ সময়ে যাহার হৃদয়ের তন্ত্রী ছিঁড়িয়াছে, সে-ই জানে 'তুমি ভাল আছ?' এই কথার মর্ম্ম কত গভীর। যক্ষ কতবার ভাবিয়াছে সে বুঝি নাই; কতবার ভাবিয়াছে, এক বৎসরের দারুণ বিরহে সে কোমল কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। তাই সে আজি "তুমি কেমন আছ?" জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

যক্ষের মনে তাহার স্ত্রীর চরিত্রসম্বন্ধে কোনরূপ অবিশ্বাস নাই, বরং সম্পূর্ণ গাঢ়তর বিশ্বাস আছে। তাই সে বলিয়াছে—

"বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ।"

কিন্তু এ অবিশ্বাসের কথা লইয়া মেঘদূত সমালোচনায় আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। এই অকৃত্রিম বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ দৌত্যের দ্বিতীয় কথাটী বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে কথাটীর মর্ম্ম এই "এই দারুণ সময়ে তোমারও অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, আমারও তাই। তোমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছে, আমারও সেরূপ হইয়াছে। তোমার যেরূপ দারুণ মনস্তাপ, আমারও তেমনি। যদিও বিধাতা আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি আমরা যেন সহানুভূতি-বলে একই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।" যক্ষ-পত্নী যে বিরহে কষ্ট পাইতেছে,

তাহার শরীর যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, সে বিষয়ে যক্ষের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সে যেন সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছে।

দৌত্যের তৃতীয় প্রধান কথা এই "তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও। আমি ত নানা উপায়ে আমার চিত্ত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছি, কোথাও তোমার অঙ্গশোভা দেখিতেছি, কোথাও তোমার নয়ন-মাধুরী দেখিতেছি, কিন্তু আমার সাধ মিটিতেছে না।"

আমি কখন কখন উত্তর দিক হইতে যে বায়ু আসিতেছে, তাহাতে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি। ভাবিতেছি, "এই বায়ু অবশ্যই তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। পরক্ষণেই আবার আপনার মূর্খতার কথা ভাবিয়া একান্ত অসহায়, অশরণ ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু, প্রিয়ে! তুমি আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিও।"

দৌত্যের চতুর্থ কথা—আশা। যে আশা না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রণয়ীর হৃদয়-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইত, সেই আশা। সে আশা আর কিছু নয়, আর চারি মাস বিরহের অবশিষ্ট আছে; এই চারি মাসের শেষে শরৎ কালের পূর্ণিমা রাত্রিতে আবার তোমার সহিত মিলিব, আর মনের সাধে এক বৎসর মনে মনে যত সাধ পূরিয়া রাখিয়াছি, মিটাইব। কে বলিয়াছে বিরহে প্রণয়ের ধ্বংস হয়? আমি ত দেখিতেছি বিরহে ভোগ হয় না, মনের নানা সাধ জমিয়া জমিয়া রাশীকৃত হইয়া থাকে, এই আশ্বাসই দৌত্যের শেষ কথা।

আমরা এই যে নদ নদী, পর্ব্বত কন্দর, বন উপবন, নগরনগরী প্রভৃতি সঙ্কুল পৃথিবী, কল্পনার পরাকাষ্ঠাসম্ভূত কৈলাস-পর্ব্বত-শিখরোপরিস্থিতা অলকা-পুরী, তন্মধ্যে যক্ষের প্রাসাদ, তন্মধ্যে কোমলতার প্রতিকৃতি যক্ষের পত্নী, বিরহে তাহার ম্রিয়মাণ অবস্থা, এই যে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সন্দর্শন করিলাম, এই যে পৃথিবী হইতে স্বর্গ, স্বর্গ হইতে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম; ভৌতিক রাজ্য ত্যাগ করিয়া মানস রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া লইলাম, এ সমস্তই এক সুরে বাঁধা। যক্ষের মনোভাব ইহার সকলেই মাখান। সমস্তটুকু যেন যক্ষ গাইতেছে আর আমরা শুনিতেছি, শুনিতেছি আর তন্ময় হইয়া যাইতেছি। আমাদেরও যেন প্রাণ ফাটিয়া ঐ দুঃখলহরী বাহির হইতেছে। তাই আমরা প্রথমে বলিয়া-ছিলাম যে, মেঘদূত গীতে রচিত না হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য—ভুবনে অতুল।

BRANSONISM

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগাঁয়ে কাছারিকে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক জুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটীর কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট ; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালীটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো—নিরাহ রকম ভাল মানুষ, জড় সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনষ্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন,

"সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনিলো ?"

হাকিম বলিল, "কি জানি, সাহেব ! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ ?"

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন সাহেব ?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে।

হাকিম। তার পর ?

সাহেব। হামি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখ্‌ছি—তাতে কি হলো ?

সাহেব। তোমার—কি বলে ? সেটা নেই।

হাকিম্। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন ? কি নেই ?

সাহেব। সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না ?

হাকিম। সাহেব—আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর "তুমি" "তুমি" করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা লেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব?—

সাহেব। সেই যে—জুষ্টিকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কাল কেন?

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি?

সা। বাপের নামে কোর্টের কি কাম আছে?

হা। বলি সেটা জানা আছে কি?

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন লামটা এখন মনে পড়্ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয। তোমাব নামটা কি?

সাহেব। হামার নাম জান সাহেব—জান ডিক্‌সন্।

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন্ নয়?

সা। হোবে—ডিক্‌সন্ হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, "হুজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব।"

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন হইলো ত কি হইলো—তোমার বাপের নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ চূড়া বেচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।"

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি? ঘটকালি করিত না কি?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনার জয় ঢাক ঘাড়ে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিস্‌ডিক্‌সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নথর কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিম্নে কিছু লিখিতেছি:—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি?

উত্তর। রঙ্গিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর?

উত্তর। বিল খালে মাছ ধরে বেচি।

আসামী সাহেব কহিল, "ঝুটা বাত। ও সুঁটকি মাছ বেচে।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।"

প্রশ্ন। তোমার কিসেব নালিশ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুবি করেছে?

উত্তর (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্দীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগ্দী লই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পূরিল।

প্রশ্ন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন করে?

উত্তর। পাকেটেব যে আধখানা বৈ ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল "না বাবুজি! ওর চুপড়িটাই ফুটো; তাই মাছ বেরুইয়ে পড়েছিল।"

জেলেনী বলিল, "ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।"

সাহেব বলিল, "সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।"

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্‌সন সাহেব সুঁটকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর "জুষ্টিকেশন লেই।" সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতাব একখানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পরদিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে নিম্নোক্ত লীডর দেখা গেল।

"**The wisdom of A Native Magistrate.**—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentle-

man of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth and considerable influences in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European Magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the name *Jaladhar* and of *Jaliani* the whether tie of kindred which obviously exist between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision."

এই লীডর বাহির হইলে পর, উহা পড়িয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জলধর বাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে, সাহেব গরম হইয়া বলিলেন,

"What do you mean, Babu, by convicting a European British subject ?"

ডিপুটী। What European British subject, Sir ?

মাজিষ্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন,

"Do you now understand ?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

Magistrate. How do you know that ?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject ?

Deputy. No Sir.

Magistrate. Well what other evidence did you take ?

এখন ডিপুটি বাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য,—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন,

"I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

এখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"Very sorry for what ?"

Deputy. For convicting a European British subject.

Magistrate. Why so ?

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British subject.

Magistrate. Why very wrong ?

ডিপুটিটি, সাহেবকে একহাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল,

"Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a native can not judge honestly."

Magistrate. Do you admit that ?

Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do

Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your countrymen were equally so ; at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top ? you must have served long .

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thougt of speaking to you, Sir, on the subject.

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েণ্ট দেখিলেন। জয়েণ্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"What could you have been saying to this fellow ?"

Magistrte. Oh ! He is very amusing.

Joint. How so ?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint. And did you tell him your mind ?

Magistrate. O no ! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A concieted native is perfectly uselsss as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন,

"সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?"

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি।

২রা ডিপুটি। কেন ?

জলধর। কালকার সেই বাগ্দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর ?

জলধর। তার পর আর কি ? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি ? কি মন্ত্রে ?

জলধর। মন্ত্র আর কি ? দুটো মন রাখা কথা।
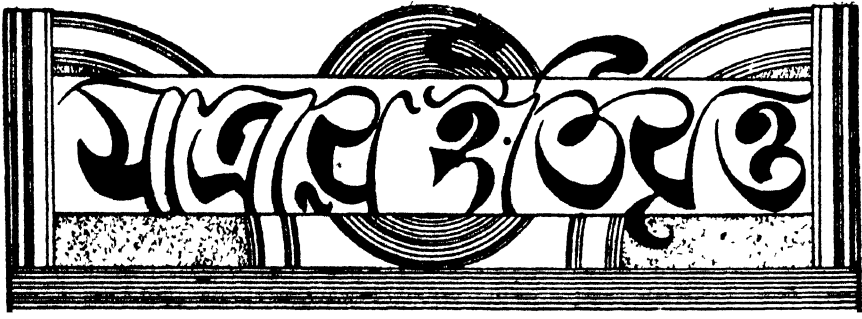
কিছু দিন হইল বাঙ্গালার যাত্রা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছিলাম। গ্রন্থ খানি বিলাতে বসিয়া বিলাতি ভাষায় লিখিত হয় এব বিলাতেই তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য দুই সিলিং। লেখক বাঙ্গালি, আমাদের সুপ্রসিদ্ধ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সেই জন্য আমরা বিশেষ আহ্লাদ পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিয়াছি।

ইদানী ঢাকা অঞ্চলে "স্বপ্ন-বিলাস" প্রভৃতি তিন খানি যাত্রা রচিত হইয়াছে। তথাকার বিস্তর লোক এই যাত্রার পক্ষপাতী। নিশিকান্ত বাবু সেই যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু নাম পড়িয়া আমরা তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম প্রধানতঃ বাঙ্গালার সাধারণ যাত্রার কথা এই গ্রন্থে আছে।

ইউরোপের যে অবস্থায় মিষ্টরিজ (Mysteries) আরম্ভ হইয়াছিল, বাঙ্গালার সেই অবস্থায় যাত্রা আরম্ভ হয়। সে কতদিনের কথা, তাহা আমরা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যাত্রা ছিল, সে যাত্রা কেবল শক্তিবিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারে হইত না। চৈতন্য দেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়া উঠিল, তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয়। এই সময় একজন বৈষ্ণব এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক এক পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। পুষ্করিণীটী বড় সুন্দর সাজান হইয়াছিল। তাহার নাম কালীয়-হ্রদ দেওয়া হইয়াছিল। মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেই ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে "নয়ন ঢোলাইয়া" নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপীড়নে কালীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। চারি পার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্দ্ধাঙ্গ তুলিয়া যোড় করে কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে—কখন তাহা কথায়, কখন বা গীতে। নিকটে এক

মাচার উপর মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া যাত্রাওলারা "দোয়ার্কি" করিতেছে। অন্য সময়ে এই যাত্রা হইতে নাটক উৎপন্ন হইত, কিন্তু তখন শাক্ত বৈষ্ণবে বড় দলাদলি, সুতরাং নাটকের রস কেহ লক্ষ করে নাই, শক্তি-যাত্রার স্থলে কৃষ্ণযাত্রা হইল, লোকে এই মাত্র বুঝিয়াছিল। শক্তিযাত্রার স্বতন্ত্র নাম ছিল না। অন্য কোন যাত্রা না থাকায়, বোধ হয়, স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হয় নাই। পরে যখন কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হইল, তখন সে প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কালীয় দমন যাত্রায় সাধারণতঃ লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের অভ্যাস পাইয়াছিল, সুতবাং লোকে কৃষ্ণ যাত্রাকে সেই নামে অভিহিত করিল। তাহার পর যখন কালীযদমন ছাড়িয়া কৃষ্ণ যাত্রার অন্য পালা আরম্ভ হইল, লোকে তখনও সেই কালীয়দমন নাম ব্যবহার করিতে লাগিল। কালীয়-দমন কৃষ্ণযাত্রা, সুতরাং তাহারা বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা মাত্রেই কালীয়দমন। দান হৌক, মান হৌক, মাথুর হৌক, যে পালাই হৌক, লোকে সকল পালাকেই কালীয়দমন বলিতে লাগিল। অদ্যাপি অনেকেই এই নাম ব্যবহাব করিযা থাকেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল, কালীয়দমন যাত্রা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। চৈতন্য দেবের পর ইহাব জন্ম, রাজা রামমোহন রায়ের পর ইহার মৃত্যু। ইহার আদিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, অন্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য ভাল বুঝা যায় না। ভাগীরথী মনে আইসে। আদিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম, শেষে সাগর। কিন্তু ভাগীরথীব ন্যায় কালীয়দমন কৃতকার্য্য হইয়াছে। সগরবংশ উদ্ধার না করুক, অনেক মরুভূমিতে রস সেচন করিয়াছে। ইহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় লেখা কঠিন। কালীয়দমন প্রায় চাবি শত বৎসর জীবিত ছিল, এ জীবনী লিখিতে পারিলে ফল আছে। কিন্তু আমাদের তাহা অসাধ্য। কেবল শেষ অবস্থার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, চেষ্টা মাত্র।

প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, শ্রীদাম সুবল নামে দুই সহোদর কালীয়দমন যাত্রা করিত। এখন অনেকেই বলেন, ইহারা যাত্রাওয়ালাদের আদি ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহারা উভয়ে বড় গুণবান ছিল, তাহাই কালে তাহাদের এই রূপ খ্যাতি জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ যে সময় শ্রীদাম সুবল যাত্রা করিত, সে সময় বাঙ্গালার অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়াছিল, চারিদিকে একটু ধূমধাম পড়িয়াছিল। সেই সময় বর্গীরা দেশ ছাড়ে, মুসলমানদের রাজ্য যায়, কোম্পানির ব্যবসা জাঁকে। বাঙ্গালার কার্পাস, বাঙ্গালার থান, বাঙ্গালা কোরা, বিদেশীদের শিরোভূষণ হয়। সেই সময় কবি, কীর্ত্তন শিল্প, সাহিত্য, সকলই জাঁকিয়াছিল। সে রূপ জাঁক তাহার পর আর হয় নাই। তখন ভারতচন্দ্র

লেখক; কবিওয়ালা নন্দলাল, কীর্ত্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণ বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি; যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম সুবল।

ইহাঁরা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন, এই জন্য ইহাঁরা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র; অন্য কয় জনের কবিত্বে স্নেহ প্রণয় বড় বাড়িয়াছিল, সেই স্নেহের তরঙ্গ বাঙ্গালির অন্তরে অদ্যাপি বহিতেছে। বৈষ্ণবতা সতত স্নেহ প্রণয়ের সঙ্গী। সুতরাং সেই সঙ্গে বৈষ্ণবতাও বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীদাম সুবলেব পর, তাহাদের মধ্যে একজনের পুত্র যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তাহার মৃত্যু হওয়ায় সে দল নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীদাম সুবলের পর প্রধান যাত্রাওয়ালা হুগলি জেলাব তাবানিবাসী পরমানন্দ দাস। বালক কালে শ্রীদাম সুবলের দলে এই ব্যক্তি সখী সাজিত, সেই দলেই ইহার শিক্ষা, সুতরাং ইহার যাত্রার প্রণালী পদ্ধতি অনেকটা শ্রীদাম সুবলেব মত ছিল। তাহার বেশ ভূষার কোন পবিপাট্য ছিল না, যেখানে যাত্রা কবিতে যাইত, সেখান হইতে দুই খানি সাটী চাইয়া পবিত, পরমা বড় স্থূলকায় ছিল, এক খানি সাটীতে তাহার কুলান হইত না। নাসায় একটী বেসব পরিত, যেখানে যেরূপ যুটিত, সেই রূপ হস্তে অলঙ্কার পবিত; নিজে কোন অলঙ্কার সঙ্গে রাখিত না। তখন বাটপাড়ের ভয় বড় ছিল, পঞ্চাশ জন একত্রে পথ চলিলেও বিপদ আশঙ্কা কবিত। সুতরাং যাত্রাওয়ালারা অলঙ্কার বেশভূষা কিছুই সঙ্গে রাখিত না, কেবল খোল করতাল লইয়া যাত্রা করিতে যাইত। তেলেব চোঙ্গা অবশ্য সঙ্গে থাকিত। রাঢ অঞ্চলের লোক তাহা ভুলিয়া কখন এক পদ চলিতে পারিত না।

পরমা দূতী সাজিত, প্রায় একাই যাত্রা করিত, কৃষ্ণ, রাধা এবং আর আর সকলে উপলক্ষ মাত্র থাকিত। কিন্তু যে নিজে কবি, সে একা হইলেও এক সহস্র। দূতী কৃষ্ণের সহিত কথা কউন, অথবা রাধার সহিত কথা কউন, অভিসার সম্বন্ধে কথা কউন, অথবা বাসর সজ্জা সম্বন্ধে কথা কউন, যখন যে বিষয়ে কথা কহিতেন, চারিদিকে যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া থাকিত।

যিনিই পরমার যাত্রা শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিতেন যে, আসরে আসিয়া পরমা "নব, নিতুই নব" প্রেমপূর্ণ দুইটী হৃদয় লইয়া যেন ক্রীড়া করিত। দুইটীকে কখন পরস্পরের নিকটে রাখিত, কখন দূরে ধরিত, আর তাহাদের অন্তর চাঞ্চল্য দেখাইত। বিশেষতঃ মানের পালায় তাহার এই ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। মান বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র drama; এবং বোধ হয় বাঙ্গালার প্রথম drama। drama বলিয়াই বুঝি মান লোকের এত মিষ্ট লাগিত। গীতের ভাগ

পরমার যাত্রায় নিতান্ত অধিক ছিল না, কাব্যরস ঘটাইবার নিমিত্ত পরমা কথা বার্ত্তাই অধিক কহিত। সেই কথার যে যে অংশে গীত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়া-রের ছন্দে রচিত, এবং তাহা প্রায়ই পয়ারের সুরে গাওয়া হইত; কিন্তু তাহার শেষ ছত্রটীতে একটু করিয়া অমৃত থাকিত, শ্রোতার কর্ণে সেইটুকু ঢালিয়া দিবার নিমিত্ত কীর্ত্তনের সুরে সেই ছত্রটী গাওয়া হইত। লোকে একেবারে যেন আর্দ্র হইয়া যাইত। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলিত। অনেকে তর্ক করেন, পরমার তুক্কোর ন্যায় সুশ্রাব্য আর বাঙ্গালায় হয় নাই। এই স্থলে দুই একটী তুক্কো উদ্ধৃত করা গেল। এই তুক্কো হয় ত এখনও বৈরাগী ভিক্ষুক যাত্রাওয়ালা কেহ কেহ গাইয়া থাকে, কিন্তু সুরের অভাবে তাহার মোহিনী শক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়।

"সারা বন বুলে বুলে,
বনফুল আনলাম তুলে,
তার বোঁটা গুলি দিলাম ফেলে,
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে বলে॥"
আর একটি—
"বঁধু যেতে যেতে, প্রাণের বঁধু
যেতে যেতে,
রথে হতে কি কথাটি বল্‌তে ছিল।
বল্‌তে বল্‌তে অমনি বঁধুর
মুখের কথা মুখে রৈল।
নয়ন জলে ভেসে গেল॥"

পরমার সম্বন্ধে আর একটা কথা এই ছিল যে, তাহার যাত্রা আদ্যন্ত শুনিতে হইত, তাহা না শুনিলে সম্পূর্ণ রসগ্রহ হইত না। তাহার যাত্রা শুনিতে গিয়া একটী কি দুইটী গীত শুনিয়া আসিলে রসের কিছুই অনুভব হইত না। একটী কি দুইটী তুলি দেখিয়া সেই তুলির চিত্রিত পট অনুভব করা যে রূপ অসম্ভব ও অসঙ্গত, সেই রূপ হইত। চিত্রকর যেমন পটের রং ফলাইবার নিমিত্ত প্রথমে মোটা তুলি ধরিয়া খড়ি মাখায়, তাহার পর সে তুলি ফেলিয়া আর এক তুলি ধরে এবং কোন বাজে রং মাখাইয়া জমি করে, যাত্রায় পরমা ঠিক সেই রূপ করিত, শ্রোতার অন্তরে ক্রমে ক্রমে "জমি" করিত; তাহার পর রং ফলাইত। কেবল পরমা নহে, সে সময় আর যত যাত্রাওয়ালা ছিল, সকলেই এই রূপ জমি করিতে চেষ্টা করিত; সকলেরই উদ্দেশ্য কাব্য-রসের সৃষ্টি করা। কিন্তু একটী কি

দুইটী গীতে সে সৃষ্টি হয় না; সুতরাং তাহাদের যাত্রা আদ্যোপান্ত শুনিতে হইত। যদি কোন যাত্রাওয়ালা যাত্রা করিতে করিতে বুঝিত, শ্রোতাদের অন্তরে কিছু ধরিতেছে না, তাহাদের হৃদয়-পটে "জমি" হইতেছে না, সে তৎক্ষণাৎ সং আনিয়া গোলমাল করিয়া দিত। যে টুকু তুলি ঘসিয়াছিল, এই রূপে তাহা মুছিয়া ফেলিত। তাহার পর আবার নূতন পরিশ্রম করিত। সং এই জন্য ছিল। সে আবশ্যকতা এখনকার যাত্রাওয়ালারা আর মনে করে না। তাহাদের আর "জমি" করিতে হয় না। শ্রোতা বারইয়ারিতলায় দাঁড়াইয়া একটী কি দুইটী গীত শুনিয়া চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া তাহারা এখন যাত্রা করে।

পরমানন্দ দাসের সময় আর একজন প্রধান যাত্রাওয়ালা ছিল। তাহার নাম প্রেমচাঁদ। লোকে সচরাচর তাহাকে থরকাটা প্রেমা বলিত। এ ব্যক্তির "তুক্কো" ছিল না, চৌপদীই সমুদয়। তাহা ভিন্ন সে কীর্ত্তন যাহা গাইত, তাহা একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইত। খাঁটী মহাজনী পদ "পত্তন" দিয়া গাইলে সামান্য লোকে বড় বুঝিত না। এই জন্য প্রেমচাঁদ মহাজনী পদ হাল্‌কা করিয়া সেই পদের পুবাতন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া, ঘোষা পদ মাজিয়া ঘষিয়া যাত্রা কবিত। সামান্য লোকে একেবারে মাতিয়া উঠিত। সেই অবধি স্ত্রী-লোকের কীর্ত্তন ব্যবসা কবিবার পথ পরিষ্কার হয়। স্ত্রীলোকের মুখে কীর্ত্তন শুনিতে পূর্ব্বে নিষেধ ছিল।

প্রেমচাঁদ অধিকাবীর ছোকবা বদন। এবং পবমানন্দ দাসের ছোকরা গোবিন্দ অধিকারী। প্রেমচাঁদ ও পরমানন্দের পব বদন ও গোবিন্দ প্রধান যাত্রাওয়ালা হইল। কিছুকাল ধরিয়া গোবিন্দ আপনার ওস্তাদের পদ্ধতি অনুসারে যাত্রা করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহাকে নূতন স্রোতে ঘেরিতে লাগিল। দাশরথীর অনুপ্রাসে ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া তাহার অনুকরণ করিতেন। যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ দাস সেই পথ কেনই অনুসরণ না করিবে? ক্রমে ক্রমে পরমানন্দের প্রণালী ছাড়িয়া গোবিন্দ ইদানীর যাত্রাওয়ালা হইয়া উঠিল। কিন্তু বদন অধিকারীকে কোন স্রোতে কোন দিকে ফিরাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সে সাবেক প্রণালীতে যাত্রা করিয়াছিল। তাহাই বলিতেছিলাম যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল কালীয়দমন লোপ পাইয়াছে। বদনের পর আর কালীয়দমন হয় নাই। যাহা আছে, তাহা নাম মাত্র। বদনের "ছোকরা" ব্রজনাথ দাস কয়েকটা বদনের ও থরকাটা প্রেমচাঁদের পদ্ধতি রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু সে ব্যক্তি অধিক দিন যাত্রা করে নাই।

এখন বাঙ্গালার বক্তা অধিক, পূর্ব্ব কালে শ্রোতা অধিক ছিল। মহাজনদের গীত শুনিতে তখন বিস্তর লোক একত্র হইত। পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতে শ্রোতা ছুটিত। এক এক স্থানে দশ বার হাজার লোক বসিয়া কীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, কথকতা শুনিত। প্রায়ই কোন বাটীতে এত শ্রোতার স্থান হইত না, বোধ হয় তাহাই বারইয়ারি আরম্ভ হয়। যেখানে সকল শ্রোতার স্থান হইতে পারে, এরূপ পরিসর স্থানে যাত্রাদি দিবার নিমিত্ত বারইয়ারির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

যেখানে দশ হাজার শ্রোতা একত্রে, সেখানে "ভাদ্রের ভরা" নদীর ন্যায় একটা কল্লোল ধ্বনি উঠে। শ্রোতারা নিঃশব্দ নিস্পন্দ থাকিলেও সে কলরবের অভাব হয় না, যেন কোথা হইতে উঠিয়া আকাশ ব্যাপিতে থাকে, সুতরাং সেই কলরবের উপর সুর চড়াইতে না পারিলে যাত্রা লগ্ন হয় না, তাহাই সে কালে খোল, ঢোল, জোড়ঘাই প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। ঢোলক তবলার প্রাণ অল্প দশ জন ঘেরিলে স্ত্রীলোকের সুরের ন্যায় সে সকল যন্ত্রের স্বর ডুবিয়া যায়। এখন শ্রোতা অল্প, তাহাই ঢোলক তবলা চলিতেছে। অদ্যাপি কোন কোন যাত্রার দলে এবং কীর্ত্তনে খোল অর্থাৎ মৃদঙ্গ ব্যবহার হয় সত্য, কিন্তু তাহা একখানি বা দুই খানির অধিক নহে। অল্প শ্রোতার স্থলে দুই খানিই অতিরিক্ত, বরং লোকের তাহাও অসহ্য হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বাঞ্ছারাম বৈরাগীর দলে বার খানা, রূপ বাউলের দলে চৌদ্দ খানা, রামসুন্দর অধিকারীর দলে দশ খানা খোল বাজিত। লোকের তাহা মধুর বলিয়া বোধ হইত।

যেখানে আট দশ হাজার শ্রোতার গোল, দশ বার খানা খোল, তাহার উপর সেই মত আবার করতাল, সেখানে গীত শুনিতে পাইবার সম্ভাবনা অল্প, অন্ততঃ এখনকার যাত্রা গান শুনিয়া আমাদের এই মত বোধ হয়। কিন্তু কার্য্যে তাহা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় দশ হাজার শ্রোতার মধ্যে দাঁড়াইয়া দূতী একা কথা কহিতেছে, সকলেই তাহা শুনিতে পাইতেছে, এবং বুঝিতে পারিতেছে। এখন যে যাত্রায় দুই শত শ্রোতা ঘুটে, সে যাত্রায়ও কোন গীত বুঝা যায় না, প্রায়ই সুরের গোলে কথা অস্পষ্ট হইয়া যায়। এখনকার যাত্রাওয়ালারা মনে করে চীৎকার করিয়া গাইলে সর্ব্বত্র শুনা যায়। পূর্ব্বে গীতে চীৎকার ছিল না, অথচ, সকলে তাহা স্পষ্ট শুনিত ও বুঝিত। পূর্ব্বের যাত্রাওয়ালাদের সুর এখনকার যাত্রাওয়ালারা হারাইয়াছে। সে সুর অতি তীব্র ছিল না, অথচ তাহা সকল কলরব ছাড়াইয়া উঠিত। আমরা দেখিতে পাই যে, অতি চীৎকার যে দূর পর্য্যন্ত না যায়, কোন কোন মৃদু স্বর সে দূর পর্য্যন্ত যায়। বন্দুকের শব্দ যে দূর পর্য্যন্ত না যায়, কোন কোন গলার স্বর সে দূর পর্য্যন্ত যায়। পূর্ব্বকার ডাকাতের "কুক" এবং চৌকিদারের "হাঁক" অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, সে "কুক" সে "হাঁক"

মৃদু নহে, কিন্তু বন্দুকের শব্দের তুলনায় অতি উচ্চ কি তীব্রও নহে, অথচ সে হাঁক চারি ক্রোশ হইতে শুনা যাইত। বন্দুকের শব্দ বোধ হয়, তাহার অর্দ্ধেক দূর হইতে শুনা যায় না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, যে কথা অতি চীৎকার করিয়া বলিলে কোন বধির শুনিতে পায় না, সেই কথা মৃদু স্বরে বলিলে বধির অনায়াসে শুনিতে পায়। মৃদু স্বর হইলেই বধিরে যে শুনিতে পাইবে এ কথা বলিতেছি না। যে স্বরে কথা কহিলে বধিরেরা শুনিতে পায়, সে স্বর মৃদু হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহার গ্রাম স্বতন্ত্র। ব্যবসায়ীরা বলেন, সুরের তিন গ্রাম। সুর সম্বন্ধে যে গুণের কথা আমরা বলিতেছি, সে গুণ হয় ত ঐ তিন গ্রামের মধ্যে কোন বিশেষ গ্রামে আছে অথবা প্রচলিত তিন গ্রামের অতিরিক্ত অন্য কোন গ্রামে আছে, পূর্ব্বকার যাত্রাওয়ালারা তাহা জানিত, এখনকার যাত্রাওয়ালারা তাহা জানে না। কেহ কেহ বলেন, সেই গ্রামের অনুরোধে সাবেক যাত্রাওয়ালারা কথাবার্ত্তা সুরে কহিত এবং সুরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত। ইটালিয়ান অপেরাওয়ালারা হয় ত সেই জন্য সুরে কথা কহে।

সাবেক যাত্রাওয়ালাদের সুর সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। তাহাদের লোক বিশেষের স্বর স্বতন্ত্র ছিল। বাসদেবের স্বর পিতল পাত্রের ন্যায় বাজিত। তাহার প্রতিধ্বনি শুনিলে বোধ হইত যেন রাত্রিও বাজিতেছে। কণ্ঠস্বর সেরূপ না হইলে কেহ বাসদেব সাজিতে পাইত না। বিরহিণীদের আর এক প্রকার সুর ছিল, সে সুরে বৃক্ষের পক্ষী জাগিয়া উঠিত, স্বজাতি কণ্ঠ ভাবিয়া ডাকের উপর ডাকিত, সুরের উপর সুর চড়াইত।

এই সকল সুর এখন গিয়াছে; যাইবারও অনেক হেতু আছে। প্রধান হেতু কলিকাতার বাণিজ্যের উন্নতি, ও পশ্চিম দেশী লোকদের কলিকাতায় গতায়াত। মুসলমানদের সময় পশ্চিম দেশীয়দের সহিত আমাদের সংস্রব অতি অল্পই ছিল; সে দেশের লোক বাঙ্গালায় বড় আসিত না, আমরাও বড় যাইতাম না। যদি কোন বাঙ্গালী যাইত, তাহা প্রায়ই শেষ দশায় তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে। যদি তথাকার কেহ কখন আসিতেন, তাহা প্রায়ই রাজকর্ম্ম উপলক্ষে, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যেই থাকিতেন। সাধারণের সহিত তাঁহারা প্রায়ই মিশিতেন না। কিন্তু কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হইলে অর্থ উপার্জ্জন উপলক্ষে বিস্তর হিন্দুস্থানী আসিয়া সাধারণের সঙ্গে মিশিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মাড়য়ারি বণিক্ আর মারাহাট্টা বাই আমাদের বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিল। এখানকার ধনাকাঙ্ক্ষীরা মাড়ওয়ারিদের অনুগত হইল, ধনসম্পন্নেরা মারাহাট্টা বাইদের সেবা করিতে লাগিল। এই বাইজিরা বাঙ্গালীর সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ করে।

বাঙ্গালা দেশে গায়কী প্রায় ছিল না। কীর্ত্তন পুরুষেরা গাইত, যাত্রাও পুরুষেরা করিত। নট নামে এক নীচ জাতির যুবতীরা খোল সঙ্গে লইয়া পথে ঘাটে নাচিয়া গাইয়া উপার্জ্জন করিত, অদ্যাপিও তাহা করে। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী নহে, দেখিতে অতি কুৎসিৎ। বিশেষত তাহাদের বেশভূষা অতি জঘন্য, কথাবার্ত্তা আরও কদর্য্য ছিল বলিয়া তাহারা কখন ভদ্র লোকের নিকটে যাইতে সাহস করিত না। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় সুবেশী সুন্দরীরা আসিল। তাহাদের উপর আমার রাগ আছে, এইজন্য শপথ করিয়া বলিতে পারি তাহারা অতি মন্দ অভিসন্ধিতে আসিয়াছিল। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছু দিন পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা বর্গীরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। গৃহস্থের ধন ধান্য সকলই লুট করিয়া পলাইত, অন্ন-ভক্ষ্য কিছুই রাখিয়া যাইত না. কিন্তু তাহারা ধনীদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিত না, ধনীরা প্রায়ই পলাইয়া ধন রক্ষা করিতেন। বর্দ্ধমানের রাজা শ্যামনগরে একটী গুপ্তগড় প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, বর্গী আসিতেছে শুনিলেই তিনি গঙ্গাপার হইয়া সপরিবারে সেই গড়ে লুকাইতেন। অন্যান্য ধনীরাও সেইরূপ একটা না একটা উপায় অবলম্বন করিত। সুতরাং বর্গীরূপী মহারাষ্ট্রীয় পুরুষেরা কিছু করিতে পারিল না দেখিয়া তাহাদের যুবতীরা বাইরূপে বঙ্গপ্রবেশ করিল। আর রক্ষা হইল না। তাহারা আসিবামাত্র ধনীরা ধরা দিল, কেহ পলাইল না, কেহ আর ধন রক্ষা করিতে চাহিল না।

বাঙ্গালার কেবল যে, টাকা কড়ি গেল, এমত নহে; বাঙ্গালার সঙ্গীতবিদ্যা সেই অবধি হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইল। বহুকালাবধি এই বিদ্যা বাঙ্গালায় নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, বিদেশী বিদ্যার তাহাতে কোন সাহায্য বা সংস্রব ছিল না। নূতন সুর আবিষ্কার হইয়াছিল, নূতন পদ্ধতি বাঁধিয়া ছিল। কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়া বাঙ্গালি কীর্ত্তনের সুর পঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই সুরের অদ্যাপি অনেক স্থানে ব্যবহার আছে। বাইজিদের আগমনে আমাদের সেই সুর নষ্ট হইতে লাগিল। তবলার টীমটীমি বোল বাবুদের ভাল লাগিয়াছিল, খোল করতালের গোলমাল আর তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। টপ্পার সুরে তাঁহাদের প্রাণ "মজিয়াছিল," সুতরাং রেণেটী মনোহর সাহির সুর আর তাঁহারা শুনিতে পারিলেন না। দেশী সঙ্গীতব্যবসায়ীদের উপার্জ্জন ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহারা দেখিল টপ্পার সুর ও তবলার সঙ্গত ভিন্ন আর যাত্রা ভাল লাগিবে না। অতএব সেইমত পরামর্শ করিতে লাগিল। এই সময়ে একজন ধনী "সখ" করিয়া আপনার ব্যয়ে সময়োচিত একটী যাত্রা প্রস্তুত করিলেন। মহাজনী পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গীত তিনি নিজে রচনা করিলেন, অথবা কোন রসিক আমলা দ্বারা তাহা করাইলেন।

ক্রমে সেই গীতেব অনুরোধে পশ্চিম দেশী টপ্পার সুর চূর্ণীকৃত হইল, খোলের পরিবর্ত্তে তবলা বাজিল, নূপুরের পরিবর্ত্তে ঘুমুর চলিল। সুতরাং এই নূতন যাত্রা বড় রঙ্গদার হইল। সকলেব মন তাহাতে ভুলিল। তাহার পর যখন যাত্রাওয়ালারা "হ্যা, হ্যা, হ্যায়" বলিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন আর কাহার জ্ঞান থাকিল না। সকলে প্রেমরসে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যিনি এই যাত্রা প্রথম প্রস্তুত করেন, তিনি অর্থকামনায় করেন নাই, "সখ" করিয়া দল করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকে এই দলকে "সখের" দল বলিত। তাহার পর যখন অন্য লোকে অর্থ লোভে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল, তখন সেই নাম থাকিয়া গেল। লোকে বুঝিল, যাহাতে ঢোলক তবলা আছে, তাহা সখের দল; আর যাহাতে খোল করতাল আছে, তাহা কালীয়দমন।

সখের দল ও কালীযদমনের মধ্যে আর একটু প্রভেদ আছে। দেবতার প্রসঙ্গ ভিন্ন কালীয়দমন যাত্রা হইতে পারিত না, কিন্তু সখেব যাত্রায় তাহা নিষেধ ছিল না, মনুষ্যের ঘটনা লইযা এ যাত্রা হইত, যথা বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী। ইদানী কালীয়দমন ও সখের যাত্রা বলিয়া কোন উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায না, তাহার কারণ কালীয়দমন প্রায উঠিয়া গিয়াছে।

প্রায় ষাট বৎসর হইতে চলিল, এই সখের যাত্রা প্রথম আবম্ভ হয়। সখেব দলের মধ্যে পূর্ব্বে বেলতলাব ও আঁড়িয়াদহের যাত্রা বড় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপালে উড়ের নাম বিশেষ পরিচিত। তাহার বিদ্যাসুন্দবেব যাত্রা অদ্যাপি লোকে আদর কবিয়া শুনিয়া থাকে। নলদময়ন্তীর যাত্রা আরও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সে যাত্রার পব বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা হয়।

কয়েক বৎসর হইল, আর এক পদ্ধতির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ অপেবা বলে, কেহ বা উপহাস করিয়া "অপ্লেয়েরা" বলে। ইহাতে সামলা আছে, পেণ্টুলেন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার জিনিস্ যথেষ্ট। পূর্ব্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাই এই নূতন যাত্রায় বেশ ভূষার এত জাঁক; সঙ্গীত ও কাব্য রসের এত অভাব।

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেই খানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন. কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভাল লাগে না, তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন "তা কেমন করিয়া হবে, এখনও যে, এ গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছু হন, আমি বলিব যে "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।'

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধুভাষায় বুঝি ইহাকে মধুক্রম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধুভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয় অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এই জন্য এক একবার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এই জন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে এই মাত্র মধুক্রম লিখিত হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোক বৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই তাঁহারা হয় ত কিছুই বুঝিবেন না; সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধু ভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায়

গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা সচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ সখ করিয়া চাল ভাজার সঙ্গে এই ফুল খাইয়া থাকেন। শুখাইয়া রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া তুই তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্ত্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদেব মজুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল সেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি, মৌমাছি, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পূরিয়া যায। বোধ হয়, দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোবে নিদ্রা ভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমাব স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বযসের কোন্ সুখেব স্মৃতি তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতি-বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোন একটি দ্রব্য দেখিয়া বা কোন একটি সুর শুনিয়া অনেকেব মনে হঠাৎ একটা সুখেব আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে অথচ কি জন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখ স্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্ব জন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লীগ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুটস্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিযা কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না স্মরণ নাই, এখনও ভাল লাগে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকান ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতাপল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই প্রাতবায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয় ত আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ।

নিত্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে, ইহা বুঝাইবার নহে সুতরাং সে কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক একটি করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহুকালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম, বোধ হয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোন্ পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন, যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনিই কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন। অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতাশক্তি কতদূর জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সে বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেন না আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল, বিস্তর বমি করিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতি মদের সহিত তুলনায় এ মদের দোষ কি তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতি মদে নেশা আর লিবর দুই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটা থাকে, নেশা—লিবর থাকে না; তাহাই এ মদের এত নিন্দা, এ মদ এত সস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশী মদের আর একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত পা দুইয়ের একটাও ভাল চলে না। কিন্তু বিলাতি মদে পা চলুক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে,

বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজ কাল আমাদের দেশেরও দুই চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার স্বপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রাণ্ডি হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদেব দেশী জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তর জ্বালা নিবারণ হয়।

প্রঃ নঃ বঃ।

পরলোক কথায় কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিয়া আসিয়া বলে নাই, কেহ কোন পরলোকবাসীর মুখে শুনিয়া মানুষকে জানায় নাই। যে পরলোক পরলোক করিয়া মানুষ চিরকাল উন্মত্ত, চিরকাল ইহলোক-বিস্মৃত, সে পরলোক মানুষ কখন দেখিতে পাইল না অথবা কোন পরলোকবাসীর মুখে তাহার কোন সম্বাদ শুনিল না। যেমন চিন্তাশীল চিন্তাকুল হ্যামলেটের পক্ষে, তেমনি সমস্ত মানবজাতির পক্ষে পরলোক চিরকাল একটি—

"Undiscover'd country, from whose bourn
No traveller returns."

ইহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? এ কথার মীমাংসা পরে হইবে। কিন্তু দুরদৃষ্টই হউক, আর শুভ দৃষ্টই হউক পরলোক কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই — বোধ হয় হইবেও না।

কিন্তু না দেখিয়াও মানুষ চিরকাল পরলোক দেখিয়া আসিতেছে—পরলোকের ছবি মানুষের সামনে চিরকাল উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। নিতান্ত অসভ্য অবস্থার কথা বলিব না। ইংরাজী গ্রন্থে অসভ্যের পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে কথা গুলি যে ঠিক, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত ঠিক বলিয়া বোধ হয় যে, অসভ্যের মধ্যে অনেকের পরলোক জ্ঞান নাই, অনেকের আছে। যাহাদের পরলোক জ্ঞান আছে, তাহাদের পরলোক স্বর্গ ও নরকের ন্যায় দুইটি নির্দ্দিষ্ট স্থান, কিন্তু ইহলোকের পাপপুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত সে স্থান সৃজিত বা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।* অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ বহুকাল এইরূপ বুঝিতেছে যে, ইহলোকের পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরলোক আছে। ইহলোকের পাপপুণ্যের ফল স্বরূপ সেই পরলোকে বাস করিতে হয়। প্রাচীন মিসরবাসীরা এইরূপ বিশ্বাস করিত যে,

* Sir John Lubbock সাহেবের Origin of Civilisation নামক গ্রন্থের ৩০৪ এবং ৩০৫ পৃষ্ঠা।

পৃথিবীর নিম্নে একটি ভয়ানক অন্ধকারময় বিভীষিকাপূর্ণ স্থান আছে ; মানুষ মরিয়া প্রথম সেইখানে যায়, এবং পাপপুণ্যের বিচারে দণ্ডিত হইলে সেইখানেই বিষম যন্ত্রণাভোগ করে এবং মুক্তিলাভ করিলে কোন একটি আলোকময় পুরীতে গমন করে। প্রাচীন পেরুনিবাসীরা বুঝিত যে, পাপীলোক পৃথিবীর গর্ভমধ্যস্থিত একটি যন্ত্রণাপূর্ণ স্থানে যন্ত্রণাভোগ করে এবং পুণ্যাত্মারা একটি অতি রমণীয় স্থানে বিপুল বিলাসের অধিকারী হইয়া অপূর্ব্ব সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করে। মহাকবি হোমরের নরকের চিত্র সকলেই দেখিয়াছেন। সে চিত্রে নরক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং সে স্থান একটি নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিবিশিষ্ট। সেখানে পাপ পুণ্যের বিচার হয়। মুসলমানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ এবং নরক আছে। সে স্বর্গ পৃথিবীর উপরে, সে নরক পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে পুণ্যাত্মা পরম সুখে মাতিয়া থাকে, সে নরকে পাপাত্মা ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। মুসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানেরও নির্দ্দিষ্ট স্বর্গ ও নরক আছে। সে স্বর্গও পৃথিবীর উপরে, সে নরকও পৃথিবীর নীচে। সে স্বর্গে খ্রীষ্টপ্রসাদানুগৃহীতেরা পরম সুখে—পরম উল্লাসে ঈশ্বরের স্তুতি গান করিয়া থাকে, সে নরকে যাহারা খ্রীষ্টপ্রসাদে বঞ্চিত, তাহারা অসীম অপার অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। সে স্বর্গ এবং সে নরকের ছবি দাস্তে এবং মিল্টন উভয়েই আঁকিয়াছেন। খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের ন্যায় হিন্দুরও পৃথিবীর উপরে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ এবং পৃথিবীর নীচে নরক আছে। সে বৈকুণ্ঠ এবং সে নরকও পাপপুণ্যের ফল। কিন্তু সে বৈকুণ্ঠ এবং নরক ছাড়া, হিন্দুর আরো একটি পরলোক আছে। সে পরলোক এই পৃথিবী। এক জন্মের কর্ম্ম গুণে এই পৃথিবীতেই অপর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে বহুজন্ম পরিগ্রহের পর, হয় উপরে বৈকুণ্ঠে, নয় নীচে নরকে গমন করিতে হয়। কর্ম্মগুণে জন্মান্তরের কথা বৌদ্ধেরাও মানিয়া থাকে, সুতরাং এই পৃথিবীই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পরলোক। হিন্দুর এই কর্ম্মফলমূলক পরলোকবাদে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনমূলক পরলোকবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক আধুনিক জর্ম্মাণ দার্শনিক বলিয়া থাকেন যে, ইহজন্মে আত্মার যে প্রকার শিক্ষা হইয়া থাকে, অর্থাৎ উন্নতি বা অবনতি হয়, সেই অনুসারে মৃত্যুর পর আত্মা এই পৃথিবীতেই ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। এ বীজ হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির পরলোকবাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বীজ দুইটি পদার্থে নির্ম্মিত। প্রথমটি এই যে, পরলোক ঠিক পাপপুণ্যের ফলময়, মানসিক প্রকৃতির ফল। দ্বিতীয়টি এই যে, পরলোক অপরের অনুমতি, অনুগ্রহ বা ব্যবস্থার ফল নয়, নিজের কর্ম্মের ফল, সুতরাং নিজের চেষ্টাধীন। আধুনিক উন্নত জর্ম্মাণি এই বীজটি অমূল্য বলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছেন এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে ইহাকে অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পরলোকবাদের প্রকৃত তথ্য এই বীজেতেই

আছে। আজ জর্ম্মণি যেমন এই পরম তথ্যবিশিষ্ট বীজটি অঙ্কুরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কাল হউক, পরশ্ব হউক, পৃথিবীর অপর সমস্ত সভ্য এবং শিক্ষিত জাতিকে তেমনি চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত তথ্য থাকিলেও একটি তথ্য এ বীজে নাই। দেখিলাম যে, এ পর্য্যন্ত মানুষ পরলোক অর্থে এক বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝিয়াছে। হিন্দুও তাহাই বুঝিয়াছে। হিন্দুর পরলোকও নির্দ্দিষ্ট পরলোক,—হয় পৃথিবী, নয় নরক, নয় বৈকুণ্ঠ। কিন্তু আমি এই নির্দ্দিষ্ট পরলোকের অর্থ বুঝিতে পারি না। মানুষ মরিয়া কেন যে পৃথিবীতেই থাকিবে, অথবা নরকেই থাকিবে, অথবা বৈকুণ্ঠেই থাকিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মৃত্যুর পর পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া একস্থানে একভাবে বিশ্রাম বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এ কথা আমাকে নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, একাবস্থায় অবস্থান জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি বস্তু মাত্রেরই নিত্য নিয়মিত ধর্ম্ম। জগতে চির কারাবাসী বা চির পেন্সন-ভোগীর স্থান নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মানুষ মরিয়া হয় চিরকাল নরকে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, নয় স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করিবে? মিসরবাসী, পেরুনিবাসী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই এই কথা বলে। বলে বলুক। আমার পবিত্র পিতৃপুরুষ এ কথা বলেন না। খ্রীষ্টান মুসলমান অপেক্ষা তিনি বিশ্ব রহস্য বেশী বুঝিতেন। অতএব তিনি বলেন যে, মানুষের জন্মের পর জন্ম, তারপর আবার জন্ম, এইরূপ অসংখ্য জন্ম—অবস্থার পর অবস্থা, তার পর অপর অবস্থা, এইরূপ অসংখ্য অবস্থা। কিন্তু এই অসংখ্য জন্ম, এই অসংখ্য অবস্থা এই পৃথিবী-সম্বন্ধ কেন? এটি ত হিন্দুর মতন কথা হয় নাই। মানুষ পৃথিবীতে থাকে বলিয়া মরিলে কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রে বাস করিতে পারে না? মানুষের সহিত কি অপর কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা নক্ষত্রের সম্পর্ক নাই? কেন, হিন্দুই ত বলিয়াছেন, আছে? তিনিই ত ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই ত বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে থাকিয়া কোন মানুষ মঙ্গলের দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ বৃহস্পতির দ্বারা শাসিত, কোন মানুষ শনির দ্বারা শাসিত। যদি পৃথিবীতে আমার ধাতু, আমার প্রকৃতি মঙ্গলের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া আমার মঙ্গলে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। যদি পৃথিবীতে তোমার ধাতু, তোমার প্রকৃতি বৃহস্পতির দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, তবে মরিয়া পৃথিবীতে না জন্মিয়া তোমার বৃহস্পতিতে জন্ম হওয়াই ত সম্ভব। এখানে ত দেখিতে পাই, যে যাহার দ্বারা শাসিত হয়, তাহাকে লইয়া অথবা তাহার কাছে থাকাই তাহার স্বভাবমূলক প্রকৃতি। শস্য জলের দ্বারা শাসিত হয়। জলকে

বিশ্বমণ্ডলে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিকে পৃথক্ করিয়া ভাবা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, সকল গ্রহ নক্ষত্র এক একটি সম্পূর্ণ পদার্থ। অতএব এক গ্রহ নক্ষত্রের পদার্থ অপর গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারে না। ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক এ কথা স্বীকার করিতে পারেন। কেন না, তিনি জড়স্বরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু মহাদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক এ কথা মানেন না। তিনি ধ্যানবলে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া অসীম বিশ্বরাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া, দেখিতে পান যে, প্রকৃত সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডল লইয়া—সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত *whole*। যেমন প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট, তেমনি প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রও সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের সম্পূর্ণতা একটি বিশালতর সম্পূর্ণতার অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত। সেই বিশালতর সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের সম্পূর্ণতা। সেই বিশালতম সম্পূর্ণতার উপরে বা সম্মুখে দাঁড়াইলে পৃথক গ্রহ, পৃথক নক্ষত্র, পৃথক পৃথিবী—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বোধ হয় যেন, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত পৃথিবী সেই অসীম অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতায়, সেই প্রকৃত একে মিশিয়া রহিয়াছে।

তবে বলি, যদি সম্পূর্ণতাই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ কেমন করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? না,—সম্পূর্ণ হইতে হইলে মানুষকে সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অসীম সম্পূর্ণতার সাহায্য লইতে হইবে। মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এমন কোন কথা নাই। মানুষ মরিয়া কোন্ গ্রহে, কোন্ নক্ষত্রে, কোন্ সৌরজগতে যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। মিল্টনের স্বর্গ বড়ই সুন্দর, বড়ই উচ্চ স্থান। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে মিল্টনের স্বর্গ অপেক্ষা, দান্তের স্বর্গ অপেক্ষা, মোহম্মদের স্বর্গ অপেক্ষা কত বেশী সুন্দর, পবিত্র এবং উচ্চ স্থান আছে কে বলিতে পারে? মানুষ মরিয়া ক্রমান্বয়ে কত উন্নত এবং পবিত্র গ্রহ নক্ষত্রে উঠিতে থাকিবে, কল্পনাও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতার, পবিত্রতার, সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মযাজকের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের এবং ধর্ম্মসংস্কারকের স্বর্গ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ইউরোপে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সে স্বর্গের জন্য ইহজন্মে এত কষ্ট করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কল্পনাতীত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে এ কথা বলিবার যো নাই। তুমি যতই কেন উন্নতি এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী হও না, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার আশা মিটাইতে পারিবে না, এ কথা তুমি মনেও আনিতে পারিবে না।

বিশ্বমণ্ডলে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, তন্মধ্যে কোনটিকে পৃথক্ করিয়া ভাবা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, সকল গ্রহ নক্ষত্র এক একটি সম্পূর্ণ পদার্থ। অতএব এক গ্রহ নক্ষত্রের পদার্থ অপর গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারে না। ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক এ কথা স্বীকার করিতে পারেন। কেন না, তিনি জড়স্বরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু মহাদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক এ কথা মানেন না। তিনি ধ্যানবলে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া অসীম বিশ্বরাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া, দেখিতে পান যে, প্রকৃত সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডল লইয়া—সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই প্রকৃত *whole*। যেমন প্রত্যেক পরমাণু সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট, তেমনি প্রত্যেক গ্রহ নক্ষত্রও সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট। কিন্তু দার্শনিকের চক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের সম্পূর্ণতা একটি বিশালতর সম্পূর্ণতার অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত। সেই বিশালতর সম্পূর্ণতা সমস্ত বিশ্বমণ্ডলের সম্পূর্ণতা। সেই বিশালতম সম্পূর্ণতার উপরে বা সম্মুখে দাঁড়াইলে পৃথক গ্রহ, পৃথক নক্ষত্র, পৃথক পৃথিবী—কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বোধ হয় যেন, সমস্ত গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র, সমস্ত পৃথিবী সেই অসীম অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতায়, সেই প্রকৃত একে মিশিয়া রহিয়াছে।

তবে বলি, যদি সম্পূর্ণতাই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিয়া মানুষ কেমন করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে? না,—সম্পূর্ণ হইতে হইলে মানুষকে সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অসীম সম্পূর্ণতার সাহায্য লইতে হইবে। মানুষ মরিয়া যে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এমন কোন কথা নাই। মানুষ মরিয়া কোন্ গ্রহে, কোন্ নক্ষত্রে, কোন্ সৌরজগতে যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। মিল্টনের স্বর্গ বড়ই সুন্দর, বড়ই উচ্চ স্থান। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে মিল্টনের স্বর্গ অপেক্ষা, দাঁতের স্বর্গ অপেক্ষা, মোহম্মদের স্বর্গ অপেক্ষা কত বেশী সুন্দর, পবিত্র এবং উচ্চ স্থান আছে কে বলিতে পারে? মানুষ মরিয়া ক্রমান্বয়ে কত উন্নত এবং পবিত্র গ্রহ নক্ষত্রে উঠিতে থাকিবে, কল্পনাও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতার, পবিত্রতার, সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মযাজকের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের এবং ধর্ম্মসংস্কারকের স্বর্গ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ইউরোপে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সে স্বর্গের জন্য ইহজন্মে এত কষ্ট করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কল্পনাতীত ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে এ কথা বলিবার যো নাই। তুমি যতই কেন উন্নতি এবং পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষী হও না, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল তোমার আশা মিটাইতে পারিবে না, এ কথা তুমি মনেও আনিতে পারিবে না।

আবার ভাবিয়া দেখ, যিনি নির্দ্দিষ্ট স্বর্গের অভিলাষী তাঁহার ধর্ম্মচর্য্যাও নির্দ্দিষ্ট, তাঁহার চেষ্টার সীমা আছে। কিন্তু অসীম, অনির্দ্দিষ্ট, কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডল যাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্য, তাহার ধর্ম্মচর্য্যার সীমা নাই, তাহার ধর্ম্মপথের শেষ নাই, তাহার উর্দ্ধগতি অনন্ত, তাহার নৈতিক চেষ্টা বিপুলতম অপেক্ষা বিপুল। যাহার পরলোক অনির্দ্দিষ্ট তাহার উন্নতির নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব ক্ষুদ্র স্বর্গের কথা ছাড়িয়া বিশাল বিশ্বমণ্ডলের কথা মনে কর। মরিয়া এমন গ্রহ নক্ষত্রে যাইতে পারি, যেখানকার প্রেম, পবিত্রতা এবং উন্নতি পৃথিবীর প্রেম, পবিত্রতা এবং উন্নতি অপেক্ষা এত বেশী যে, কল্পনায়ও তাহার ধারণা হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে কত প্রেমিক, কত পবিত্র এবং কত উন্নত হইলে তবে সেই কল্পনাতীত স্থানের উপযুক্ত হইবে? অতএব দেবাসুরের সম্মিলিত বল ও নিষ্ঠা লইয়া শিক্ষালাভ, ধর্ম্মচর্য্যা এবং জগতের প্রীতির কার্য্য কর। সেই কার্য্যে আজ যত বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করিলে, কাল তাহার দ্বিগুণ বল ও নিষ্ঠা প্রয়োগ কর, পরশ্ব তাহার চতুর্গুণ প্রয়োগ কর। এইরূপ দিন দিন বল ও নিষ্ঠা বাড়াইয়া যাও, তবে সিদ্ধ হইবে। তবে কল্পনাতীত বিশ্বমণ্ডলের কল্পনাতীত উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিতে স্বত্ববান হইবে। আজ পৃথিবীতে বিপুল চেষ্টায় বিপুল উন্নতি লাভ করিয়া বৃহস্পতি গ্রহে চলিয়া গেলে, কাল বৃহস্পতি গ্রহে আরো বিপুল চেষ্টায় আরো উন্নতি লাভ করিয়া বুধগ্রহে চলিয়া গেলে। এইরূপ উঠিতে উঠিতে এবং বাড়িতে বাড়িতে কোথায় চলিয়া গেলে এবং কি হইয়া গেলে আমি মর্ত্ত্যবাসী কেমন করিয়া তাহার ঠিকানা করিব? বুঝি বা সেই প্রাচীন অদ্বৈতবাদী মহাযোগীর ন্যায় শেষে সেই মহাশক্তির মহাপ্রাণে মিশিয়া অসীম শক্তি ধরিয়া অনন্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে! আমার পরলোকবাদ আমার পূর্ব্বপুরুষকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল না। আমার পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র পদে কোটি কোটি প্রণাম!

এখন আর একবার জিজ্ঞাসা করি, পরলোক যে কেহ কখন দেখিল না, তাহা কি মানুষের দুরদৃষ্ট না শুভাদৃষ্ট? উপরে যেরূপ লেখা হইয়াছে, তাহাতেই এ কথার মীমাংসা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরলোকের সহিত অনির্দ্দিষ্ট পরলোকের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পরলোক অপেক্ষা অনির্দ্দিষ্ট পরলোক মনুষ্য জাতির উন্নতির অনুকূল। এবং মনুষ্য জাতির ইতিহাস এবং প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও এই মহাতথ্যটি পাওয়া যায় যে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত নয়, অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান নয়, অথবা যাহা কল্পনার সহিত বেশী মিশ্‌ খায়, তাহার দ্বারা মনুষ্য জাতির যত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষীভূত অথবা প্রত্যক্ষীভূতের ন্যায় প্রতীয়মান অথবা যাহা কল্পনার সহিত মিশ খায় না, তাহার দ্বারা তত উন্নতি হয় নাই এবং হইতে পারে না। স্থপতি-

কার্য্য (Architecture) অপেক্ষা ভাস্করকার্য্যে (Sculpture এ) কল্পনার বেশী সংযোগ হয় অর্থাৎ বেশী ideality থাকে। সেই জন্য স্থপতি কার্য্য অপেক্ষা ভাস্কর কার্য্যের প্রভুত্ব মনের উপর বেশী। চিত্র অপেক্ষা কাব্যে ideality বেশী থাকে। সেই জন্য মনের উপর চিত্র অপেক্ষা কাব্যের বেশী প্রভুত্ব। অনেক বাঙ্গালীর ঘরে দেবোপমা স্ত্রীরত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে সে সকল স্ত্রীর চরিত্র অনুসরণ না করিয়া, কল্পনাসম্ভূত কল্পনাময়ী সীতা সাবিত্রীর অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেবতা অপেক্ষা মূর্ত্তিহীন দেবতার পূজা করিয়া মানুষের বেশী উন্নতি হইয়াছে। কোলাহলপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী জীবন্ত রাজধানী অপেক্ষা মানুষ কালের কালিমা-মিশ্রিত নিস্তব্ধ ভগ্নাবশেষে বেশী সুখ, সম্পদ, গৌরব ও মহত্ব দেখিয়া থাকে। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অতীত কাল মানুষের মনকে বেশী মুগ্ধ করে। দৃষ্টি অপেক্ষা স্মৃতি মানুষের বেশী গুরুতর মন্ত্র। জীবন্ত সেক্সপীয়রকে কেহই জানিত না, কেহই মানিত না। কালগর্ভশায়ী সেক্সপীয়র মানসিক জগতের মহাদেব। মনুষ্যের উন্নতিশাস্ত্রের এই একটি প্রধান সূত্র। যাহাতে ideality নাই, তাহা মানুষের উন্নতির কম অনুকূল। যাহাতে ideality আছে তাহা মানুষের উন্নতির বিশেষ অনুকূল *। কেন এরূপ হয় এ প্রবন্ধ তাহা বুঝাইবার স্থান নয়। এ স্থানে কেবল মাত্র তথ্যটি মনে করা আবশ্যক। এবং করিয়া বুঝা আবশ্যক যে, আমি যে পরলোকবাদ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে যত ideality আছে, পূর্ব্বকাল হইতে যে সকল পরলোকবাদ সাধারণভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার শতাংশের একাংশও ideality নাই। যদি মানব-প্রকৃতি এবং মনুষ্যের উন্নতি-পদ্ধতি কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে বোধ হয়, সাহস করিয়া পাঠককে আমার পরলোকবাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

---

* এখানে ideality এবং মনুষ্য জাতির উন্নতির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তৎসম্বন্ধে এত গুলি কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। শুনিয়াছি একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী গ্রন্থকার কাব্যে এবং উপন্যাসে ideal character-এর আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। আরো অনেকের সেই মত। তাঁহারা আমার কথাগুলি পড়িয়া সে আবশ্যকতা বুঝুন, আর নাই বুঝুন, আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বিনোদমালা। গীতিকাব্য। কলিকাতা, চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্র।

প্রণয় গীতিকাব্যের একমাত্র উপাদান না হউক, একটি প্রধান উপাদান বটে। কিন্তু বাঙ্গালার কাব্যনবীশগণ আজিকালি যে প্রণয় লইয়া মাতিয়াছেন, তাহা প্রণয়ই নহে। যে ভালবাসায় উন্মত্ত হইয়া এক জন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,

"Devotion wafts the mind above
But heaven itself descends in love."

কয়জন কবি প্রণয়কে সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন? আজিকালি গীতিকাব্যে প্রণয়ের যে চিত্র দেখা যায়, তাহা সচরাচর রূপতৃষ্ণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সে তৃষ্ণা কেবল চক্ষের, অন্তরের নহে। সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহা অন্তর্হিত হয়। ভারতচন্দ্র এবং Reynold প্রভৃতি তাহার প্রণয়ী; Petrarch একজন যথার্থ প্রণয়ী ছিলেন; Laurar জন্য তাঁহার মর্ম্মভেদী রোদন এখনও সমস্ত ইতালিকে কাঁদাইতেছে; রাধাও যথার্থ প্রণয়িণী ছিলেন; তাঁহার প্রতি কথায় বাঙ্গালা এখনও নিঃশব্দে রোদন করিতেছে; যথার্থ প্রণয়ে রূপতৃষ্ণা আছে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন প্রকারের; তাহাতে নারকী-ভাব কিছুই নাই, রাধার রূপতৃষ্ণা কিরূপ দেখুন :—

"জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

পুনশ্চ :—

"নবরে নব, নিতুই নব, যখনই হেরি তখনই নব।"

আবার কৃষ্ণের রূপ-লালসা রাধিকার দ্বারা তাঁহার সখীর নিকট এইরূপে ব্যক্ত হইতেছে :—

"সাজায়ে কাচায়ে, বসন পরায়ে,
আদরে লইয়া কোরে।
দীপ লয়ে হাতে, মুখ নিরখিতে,
তিতিল নয়ন লোরে।"

এই প্রকার রূপলালসা সমুদ্র বিশেষ। ইহার একেবারে অন্ত নাই। যতই দেখি, ততই তৃষ্ণার যুগপৎ বৃদ্ধি হয়। দেখাতেই আশা, দেখাতেই ভোগ, দেখাতেই যা কিছু সব, তার অধিক প্রণয়-জগতে কিছুই নাই; কিন্তু এখনকার কাব্যে প্রণয়ের এ পবিত্র চিত্র প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, এখনকার বাঙ্গালা কবিদিগের অন্তর্জগতে দৃষ্টি কম; তাঁহাদের কবিতা অনেক পরিমাণে বাহ্য প্রকৃতিগত; সুতরাং তাহাতে প্রণয়ের গাঢ়তা ও পবিত্রতা অল্প থাকে। এই কারণে বিনোদমালায় প্রণয়ের চিত্র স্থানে স্থানে নরকবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রণেতা শব্দবিন্যাস-কুশলী বটেন, তাঁহার ছন্দেরও কতকটা পারিপাট্য আছে, এবং তাঁহার কিছু ক্ষমতাও আছে। তিনি বিশুদ্ধ ও প্রীতিপ্রদ কবিতা লিখিলে সকলে আহ্লাদের সহিত পাঠ করিতে পারে।

বনফুল। কাব্য। কলিকাতা আলবার্ট প্রেস।

ইহার উৎসর্গ-পত্র ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনও তাহাই। গ্রন্থকার অবশ্যই বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিয়াছেন, তবে এ সকল ইংরেজীতে লেখার প্রয়োজন কি? আমাদের ইচ্ছা ছিল, সমগ্র বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করি, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ পারিলাম না।

গ্রন্থকর্তা বিজ্ঞাপনের একস্থানে এইরূপ লিখিতেছেন:—They (his poems) have been invariably remarked to be harsher than a crow's song and to be as full of sentiments as the discourse of a boor turned mad" কিন্তু তথাপি গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি দশ জনের কথায় কাণ না দিয়া ভাল করেন নাই। পুস্তক হইতে আমরা নিম্নে একটী কবিতা সমগ্র উদ্ধৃত করিলাম।

"হের।—হের প্রভু, হের প্রভু! আসিছে সে দূরে!
হেম।—দেবগণ গ্রহগণ রক্ষা কর মোরে!

ব্রহ্মদৈত্য হও কিম্বা পিশাচ দুর্মতি!
স্বর্গের মলয় আন, নরকের বায়ু;
মঙ্গল ঘটাও কিম্বা বিপদ প্রচুর,
আসিতেছ তুমি হেন জিজ্ঞাস্য আকারে,
আলাপিব তোমা আমি, সম্বোধিব নামে—
হেম, মহারাজ, আর্য্য, রাজনীয়, দেন,
উত্তর ও আমার ও ও; দিও না সংশয়ে
বিদরিতে হৃদি মম; কিন্তু বল কেন,

প্রেতকৃত মন্ত্রপূত মৃত দেহ তব
ভেদেছে পিঞ্জর তার, কেন সে কবর,
যথায় তোমাকে মোরা সুখে নিবেশিত
দেখিলাম; খুলিয়াছে প্রস্তর-অধর,
দূর অপসৃপ্য; তোমা উদ্গারিতে পুনঃ?
কি অর্থ ইহার? এ যে খাসি মৃত তুমি,
পুনরায় পূর্ণ-বর্ম্মে ভ্রম এইরূপে
চন্দ্রমার বিকিরণ; ভীতিয়া রজনী?"

কাব্যামোদী ব্যক্তি মাত্রকেই বলিতে হইবে না যে, ইহা Hamlet হইতে অনুবাদিত। কিন্তু গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দেন নাই। অনুবাদ যে কত সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ইহাতে Hamlet-এর সে করুণ ভাব একটুকুও নাই—যেন তাহার ভেঙ্গান। "জিজ্ঞাস্য আকারে" কি, তাহা পাঠকেরা অবশ্যই বুঝিয়াছেন; ইহা questionable shapeএর বাঙ্গালা!!! "দেন, উত্তর ও আমায় ও ও" ইহা "O! answer me" কথা কয়টীর অনুবাদ! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

Hamletএর এই করুণ-রসের পর এক্ষণে একটু বীররস হউক। শিবজীর উত্তেজনা বাক্য শুনুন:—

"আমাদের পানে, চাহি শিবাগণে চরণে দলন, করিছে কখন,
মৃদু মৃদু করে হাস। হায় আর কি বলিব।
আরক্ত লোচনে করে ক্ষণে ক্ষণে একটা গর্জ্জনে যত আছে বনে
প্রভুতার পরকাশ॥ চল আজি তাড়াইব॥"

এই বার দুই চারি ছত্র হিঁয়ালী হউক: হিয়ালী—কারণ আমরা শিবজীর নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ গ্রহণে কিছুমাত্র সমর্থ হই নাই:—

'মৃণাল পেলব যুনীর গৌরব বিপক্ষে বিজনে চন্দ্রমণিগণে
অয়স যুবা শরীর। চন্দ্রিমা হেন গলায়॥
কুচভরে নত হয় নারী যত বীরথর দৃষ্টি, করি অগ্নিবৃষ্টি
গিরিঘাতে বীর স্থির॥ সংগ্রামে বৈরির দেহে।"
বামা বিলোচনে সুধা বরিষণে আতঙ্কে তাহায় আতসি মালায়
প্রণয়ের জড়তায়। মার্ত্তণ্ডের প্রায় দহে॥"

যাদব নন্দিনী কাব্য। গ্রন্থকারের নাম নাই; ইহার বিষয় মহাভারতীয় "সুভদ্রাহরণ"। এই কাব্যঘটিত আখ্যায়িকা বর্ণনে গ্রন্থকার সফলকাম হন নাই। তিনি চরিত্রচিত্রনেও ভাল পটু নহেন—সকল স্থানে চরিত্রের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। তাঁহার গ্রন্থের পাত্র ও পাত্রীগণ মহাভারতের। কিন্তু তিনি তাহাদের মহাভারতের আদর্শে ঠিক চিত্রিত না করিয়া যে যে স্থানে একটু নূতন বর্ণ ফলাইতে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানই কুচিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার বলরামের চরিত্রে বিস্তর বালকত্ব আছে; আবার বলদেব মধুপানাসক্ত বলিয়া দ্বারকার সেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে গ্রন্থকার অনেকটা আধুনিক মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নেসার ঝোঁকে ভার্য্যার নিকট মাথামুণ্ড কি গাহিতেছেন:—

"প্রণয়িনি, এ অধীনে পান কর তুনয়নে, পিয়ে ওই মুখ-শশী তুষিব ও জীবনে।

কি প্রেমালাপ! "প্রিয়ে তুমি আমায় খেয়ে ফেল," অথবা "আমি তোমায় খেয়ে ফেলি" বলিলে পরস্পরের প্রণয়ের গভীরতা ব্যক্ত হওয়া দূরে থাকুক, ভয়েই প্রাণ উড়িয়া যায়। গ্রন্থকার Ben Jonson-এর রচনা হইতে উপরের কবিতাটি অনুবাদ করিয়াছেন; সে ইংরাজী অংশটুকু এই:—

"Drink to me only with thine eyes
And I will pledge with mine."

"Drink to me with thine eyes," বলিলে ইংরাজীতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গালায় "পান কর দুনয়নে" বলিলে কি সেই ভাব ব্যক্ত হইল? এই প্রকার ফিরিঙ্গী বাঙ্গলায় অনুবাদ করা আজিকালি অনুবাদ-নবীশদিগের এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাদের মাতৃভাষা ও বৈদেশিক ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা এই প্রকার অর্থহীন অনুবাদের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। অনুবাদ কাহাকে বলে, কেমন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়, এ সকল ভাল বুঝিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। অনুবাদ করিতে হইলে ভাষা এবং অনুবাদ্য বিষয়ে সম্যকরূপ জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। অনুবাদ যত সোজা কাজ বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহা তত সোজা নহে।

পুস্তকখানির গুণের মধ্যে এই যে ইহার ভাষাটি অতিশয় প্রাঞ্জল, তদ্ভিন্ন ভস্মাচ্ছাদিত হীরকবৎ ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বেরও বিকাশ আছে।

সুখধাম বিনাশ। কাব্য। প্রথম খণ্ড। মহাকবি জন্ মিল্‌টন্ কৃত Paradise Lost-এর অনুবাদ। শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্র।

অনুবাদ কেমন হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা আরম্ভ হইতেই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:—

"কিরূপে প্রথমে পাপ করিল মানব, আস্বাদিল বৃক্ষফল—নিবারিত, তাঁরা,
সাংঘাতিক রস যার আনিল জগতে মৃত্যু, দুঃখ রাশি রাশি, সুখ-ধাম-নাশ
সহ গাও দেবি! গাও ত্রিদিব-বাসিনী। তদবধি, যবে পুনঃ মহাত্মা মানব
তারিবে, মানবে, মিলাইবে স্বর্গ ভূমি— চির সুখময়,—"

পদ্য-কুসুমাবলী। বালকদিগের সৌকর্য্যার্থে ইংরাজী পদ্যসমূহের অনুবাদ। প্রথম খণ্ড। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্র।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, বালকেরা বিদ্যালয়ে ইংরাজী গ্রন্থে যে সকল কবিতা পড়ে, তাহার সরল বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ তৎসহ পড়িলে ইংরাজী কবিতাগুলির অর্থ তাহাদের সহজে বোধগম্য হয়, তদ্ব্যতীত বাঙ্গলা পদ্য পাঠেরও

ফল হয়। এই সুবিধার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে তিন জন ইংরাজ কবির রচনার (প্রত্যেকের এক একটি করিয়া) তিনটী অনুবাদ আছে। আমরা এ তিনটি অনুবাদেরই একটু একটু নমুনা নিম্নে দেখাইতেছি।

Goldsmith-এর Deserted Village হইতে :—

"তার মনে অন্য আশা কখন ছিল না, মমতা অনিচ্ছু হীনে উদ্ধার কল্পনা।
ইতরে তাঁহার বাটী সকলে জানিত, নিবারিত দুষ্প্রবৃত্তি, কষ্টে উদ্ধারিত।"

Grey-র Elegy হইতে :—

"তথাচ অখ্যাতি হতে, শবে সদা নিবারিতে অস্থায়ি-স্মারক তারা করিত নির্ম্মাণ,
কোথাও পদ্য রচনা, কোথা বা প্রস্তর খানা দুঃখ নীরে ভাসাইত পথিকের মন।"

Cowper লিখিত Alexander Selkirk সম্বন্ধীয় কবিতা হইতে :—

"ঈশ্বর প্রসাদ সব-স্থানে বিরাজিত উৎসাহ বৰ্দ্ধিত আশা তাহার কৃপায়।
অতি দুঃখে সুখ-চন্দ্র হয় যে উদিত সকলের ভাগ্যমত সন্তোষ জন্মায়।"

পাঠকগণ দেখিবেন, অনুবাদের বাঙ্গালা কিছুই বুঝা গেল না। বালকদিগের সুবিধার জন্য বই খানি লেখা হইয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধেরাও ইহার অনেক বুঝিতে পারিবেন না।

দুখ-সঙ্গিনী। গীতিকাব্য। কলিকাতা, ভারতযন্ত্র।

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহার পদবিন্যাস বড় মধুর, এমন কি বোধ হয় এখনকার অনেক সুকবি অপেক্ষা দুখ-সঙ্গিনী-লেখক মধুর শব্দ যোজনায় সমধিক সুনিপুণ। কিন্তু গীতি কাব্যের যাহা প্রাণ—অন্তঃপ্রকৃতি বা বাহ্যপ্রকৃতির নিগূঢ় ভাব বর্ণন—তাহা ইহাতে আশানুরূপ নাই। ইহা পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ বিশ্বাস হইয়াছে যে, লেখক যদি কেবল শব্দ-বিন্যাস ও গ্রন্থের অন্যান্য পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রকৃতিগত গূঢ়ভাবগুলি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একজন সুকবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তবে লেখক ভবিষ্যতে প্রণয়ের বিশুদ্ধতার প্রতি অপেক্ষাকৃত একটু দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা এই পুস্তক হইতে দুই এক স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন সরসে তুই কেন আজি নলিনী—
ফুটিলে ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরি
　মলিন বসন খানি
　সেই সুকোমল পানি
আবার পড়িল মনে নয়ন সফরী।"
"সখিরে!
ভুলিতে কি পারি আর—

আমার অদৃষ্ট ফেরে, চির অলক্ষার ঘরে
প্রশান্ত শীতল জ্যোতি অয়স্কান্ত মণি,
সেই ভাল বাসা প্রাণ অমৃতের খনি।
এই কিরে প্রেমময়ি ছিল মম কপালে,
প্রণয়ের পারাবার, উচ্ছ্বসিত অনিবার,
সেই প্রাণ বিনোদিনি! শুকাইলে অকালে
কেনরে নিদয় বিধি, হরিয়া হৃদয় নিধি,
হরিয়া সুখের রাশি অভাগারে কাঁদালে?"

পূর্ব্বকালে যে সকল রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তত্তাবতের একটী সবিবরণ তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। অমরবিবেক, মানসোল্লাস * হেমকোষ ও তট্টীকা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ রমণীদিগের শিরোভূষণ বা মস্তকাভরণগুলির বর্ণনা করা যাইতেছে।

শিরোলঙ্কার।

[গর্ভক—ললামক—বালপাশ্য—পারিতথ্য—হংসতিলক—দণ্ডক—চূড়ামণ্ডন—চূড়িকা ও লম্বন]

গর্ভক বা প্রভ্রষ্টক "গর্ভকঃ কেশমধ্যগম্।" বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য কেশের মধ্যে এক প্রকার কাঁটা প্রবেশ করাইয়া থাকে, তাহার নাম গর্ভক।

ললামক—"শিখালম্বিপুরোন্যস্তং ললামকম্।" চুল বাঁধিয়া তাহার মূলদেশে আবদ্ধ অথচ সম্মুখভাগে বিন্যস্ত অর্থাৎ ঝুলিতে থাকে, এরূপ অলঙ্কারকে ললামক বলা যায়।

বালপাশ্য—"প্রথমং বালবন্ধনং" চুলে যে পাশাকৃতি রত্নালঙ্কার জড়ান হয়, তাহার নাম বালপাশ্য।

পারিতথ্য—

"সীমন্তভূষণং তদ্বৎ পারিতথ্যমুদাহৃতম্।"

---

* এই মানসোল্লাস গ্রন্থ চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর কৃত। এই সোমরাজ কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তক দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু ভোজরাজ স্বকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে "প্রোক্তং সোম মহীভৃতা" বলিয়া এক সোম রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোম আর মানসোল্লাস গ্রন্থকার সোম যদি এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে মানসোল্লাস গ্রন্থকার ভোজরাজের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী। ভোজরাজ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

তদ্রূপ প্রকারের সীমন্তভূষণের নাম পারিতথ্য। ইহার ভাষা নাম "শিঁথি"।

হংসতিলক—

"অশ্বত্থপত্রসংকাশং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্। মাণিক্যবজ্রখচিতমায়তৈর্মৌক্তিকৈর্যুতম্॥
তত্র মুক্তাফলৈঃ পার্শ্বৈঃ···বিরাজিতম্। তাভ্যাং বহির্ম্মরালাভং নানারত্নৈঃ প্রকল্পয়েৎ॥
তদূর্দ্ধং বজ্রমাণিক্য মৌক্তিকৈঃ কৃতবন্ধনম্। তদিদং হংসতিলকং যোষিৎসীমন্তভূষণম্॥"

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, মণিমুক্তাখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত শিরোভূষণের নাম হংসতিলক।

দণ্ডক—

"ক্বণৎকাঞ্চনপট্টেন পিনদ্ধং বলয়াকৃতি। মুক্তাজালস্তদূর্দ্ধে চ কৃতং দণ্ডকমুচ্যতে॥"

শব্দায়মান স্বর্ণপত্রে পিনদ্ধ অর্থাৎ (গাথা), ঊর্দ্ধভাগে মুক্তাজালে বিজড়িত, এরূপ বলয়াকৃতি শিরোভূষণকে দণ্ডক নাম দেওয়া হয়। (অদ্যাপি হিন্দুস্থানে ইহার ব্যবহার আছে, পরন্তু তাহার তদ্দেশীয় ভাষা নাম জ্ঞাত নহি)।

চূড়ামণ্ডন—

"ক্রমশোবর্দ্ধমানং তৎ চূড়ামণ্ডনমুত্তমম্। কেতকীদলসংকাশং ক্বণৎকাঞ্চনকল্পিতম্।
দণ্ডকস্যোর্দ্ধভাগস্য ভূষণং তদুদাহৃতম্॥"

সেই দণ্ডকের উপরিভাগের শোভার্থ চূড়ামণ্ডন নামক অত্যুত্তম অলঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে। উহা সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহার আকার কেতকী-পুষ্পের দলের ন্যায়।

চূড়িকা—

"সৌবর্ণৈঃ কল্পিতং পদ্মং নানারত্নবিরাজিতম্। চূড়িকা পুরভাগস্য ভূষণং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সুবর্ণের দ্বারা পদ্ম বা তৎসদৃশ পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া নানা প্রকার রত্নের দ্বারা খচিত করিলে তাহা চূড়িকা নাম প্রাপ্ত হয়। এই চূড়িকা মস্তকের পরভাগের ভূষণ।

লম্বন—

"সৌবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ কৢপ্তং মুক্তাসরসমন্বিতম্। বৃহন্মাণিক্যনীলৈশ্চ লম্বনং চূড়িভূষণম্॥"

ছোট ছোট সোনার ফুল, তাহাতে ছোট ছোট মুক্তাহার আবদ্ধ, এবং মধ্য স্থানটী মাণিক্য বা ইন্দ্রনীলযুক্ত। ইহাব নাম লম্বন (ঝুলিতে থাকে বলিয়া লম্বন) এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত চূড়িকার ভূষণ অর্থাৎ ইহা চূড়িকায় ঝুলান থাকে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা এই সাত প্রকার শিরোভূষণ ধারণ করিত। এক্ষণে ইহা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয় নাই, কেবল আকার প্রকারে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কর্ণাভরণ।

[মুক্তাকণ্টক—দ্বিরাজিক—ত্রিরাজিক—স্বর্ণমধ্য—বজ্রগর্ভ—ভূরিমণ্ডন—কুণ্ডল—কর্ণপূর,—কর্ণিকা—শৃঙ্খল—কর্ণেন্দু]

মুক্তাকণ্টক—

"কেবলৈর্মৌক্তিকৈরেব তুল্য পংক্তি নিবেশিতম্। মুক্তাকণ্টকসংজ্ঞন্তং কর্ণভূষণমুত্তমম্॥"

কেবল মুক্তার দ্বারা মুক্তাকণ্টক নামক উত্তম কর্ণাভরণ প্রস্তুত হয়। উহা ঠিক্ সমান মুক্তার পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ মাত্র।

দ্বিরাজিক—

"বলয়দ্বয়বিন্যস্তমুক্তাফলবিরাজিতম্। মধ্যে নীলেন সংযুক্তং দ্বিরাজিক মুদাহৃতম্॥"

সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয়াকৃতি দুই বেষ্টনের দুই পার্শ্বে মুক্তার মধ্যে নীলমণি। এরূপ কর্ণভূষার নাম দ্বিরাজিক। (এক্ষণে ইহা হিন্দুস্থানে "বীর বউলী" নামে খ্যাত)।

ত্রিরাজিক—

"এবং ত্রিরাজিকং প্রোক্তং পূর্ণমধ্যঞ্চ মৌক্তিকৈঃ।"

তদ্রূপ কর্ণাভরণের মধ্যভাগ মুক্তাপূর্ণ হইলে তাহা ত্রিরাজিক নামে উক্ত হয়।

স্বর্ণমধ্য—

"তৎ স্বর্ণমধ্যমাখ্যাতং মুক্তাফলবিভূষণম্।"

সেই কর্ণাভরণ যদি স্বর্ণমধ্য হয়, তবে তাহার নাম স্বর্ণমধ্য।

বজ্রগর্ভ—

"মৌক্তিকানি বহিঃ পঙ্‌ক্ত্যোস্তন্মধ্যে লকং ততঃ। বজ্রানি চ ততোপান্ত-বজ্রগর্ভমিতীরিতম্॥"

দুই পাশে দুই দুই মুক্তা পঙ্‌ক্তি, মধ্যস্থলে হীরক, তাহাতে রত্নলোলক ঝুলান, এরূপ কর্ণাভরণের নাম বজ্রগর্ভ। ইহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে "চৌদানী" ব্যবহার হইতেছে।

ভূরিমণ্ডন—

"এবং বহিঃস্থ মুক্তং যৎ মধ্যং বজ্রৈশ্চ পূরিতম্। মধ্যে মাণিক্যসংযুক্তং ভূরিমণ্ডনমুচ্যতে।"

পার্শ্বে মুক্তা, মধ্যে হীরক, তন্মধ্যে মাণিক্য অর্থাৎ পান্না এরূপ কর্ণাভরণের নাম ভূরিমণ্ডন।

কুণ্ডল—

"সোপানক্রমবিন্যস্তং বজ্রপঙ্‌ক্তিবিরাজিতম্।
মধ্যৈর্বেষ্টিতঃ কান্তং কুণ্ডলং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥"

সোপান পরিপাটীর অনুরূপ ক্রমে গঠিত, হীরকের পঙ্‌ক্তির দ্বারা খচিত, ৬ কি ৮ নেমি অর্থাৎ চক্র প্রান্তাকার দ্বারা সুদৃশ্য, এরূপ কর্ণাভরণকে আলঙ্কারিকেরা কুণ্ডল বলিয়া থাকেন।

কর্ণপুর—

"পুষ্পাকৃতিঃ কর্ণভূষা কর্ণপূরং প্রচক্ষ্যতে।"

পুষ্পাকৃতি কর্ণাভরণের নাম কর্ণপূর।

"চাঁপা" "ঝুমকা" প্রভৃতি কর্ণাভরণ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কর্ণিকা—

"কর্ণিকা তাড়পত্রস্যাৎ।"

তাড়পত্র নামক কর্ণভূষণ, আর কর্ণিকা একই পদার্থ। হিন্দুস্থানে "তানবড়্' নামে প্রসিদ্ধ।

শৃঙ্খল—

"শোধিতেন সুবর্ণেন রুচিরেনাতিকান্তিনা।
শৃঙ্খলাঃ বিবিধাঃ কার্য্যা স্তাটঙ্ককটকানি চ॥"

অতি বিশুদ্ধ সুকান্তি সুবর্ণের দ্বারা নানাবিধ শৃঙ্খল, তাডঙ্ক ও কটক প্রস্তুত করিবেক।

কর্ণেন্দু—

"কর্ণেন্দুঃ কর্ণপৃষ্ঠগা।"

কর্ণের পৃষ্ঠদিকে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, তাহার নাম কর্ণেন্দু ও বালিকা।

ললাট ভূষণ।

ললাটিকা—

"পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা।"

পত্রপাশ্যা ও ললাটিকা এই দুই সাধারণ নাম। ফল, নানাপ্রকার ললাটভূষণ হইয়া থাকে।

কণ্ঠভূষণ।*

[ললম্বিকা—প্রালম্বিকা—উরঃসূত্রিকা—মুক্তাবলী—দেবচ্ছন্দ—গুচ্ছ—গুচ্ছার্দ্ধ গোস্তন—অর্দ্ধহার—মানবক—একাবলী—নক্ষত্রমালা—সরিকা—বজ্রসঙ্কলিকা]

---

*মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা আছে, কিন্তু নাসিকাভরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তদ্দেশে নাসিকাভরণ ব্যবহারের প্রথা ছিল না, থাকিলে অবশ্যই কোন না কোন প্রকার উল্লেখ থাকিত।

ললন্তিকা—

"আনাভিলম্বিতা ভূষা লম্বনঞ্চ ললন্তিকা।"

নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত সাধারণ কণ্ঠভূষার নাম লম্বন ও ললন্তিকা।

প্রালম্বিকা—

"স্বর্ণৈঃ প্রালম্বিকা—"

তাদৃশ সোণার হার প্রালম্বিকা নামে উক্ত হয়।

উরঃসূত্রিকা—

"উরঃসূত্রিকা মৌক্তিকৈঃ কৃতা।"

উক্ত ললন্তিকা যদি মুক্তা ব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উরঃসূত্রিকা বলা যায়।

মুক্তাবলী—ইহা মুক্তাহারের সাধারণ নাম। পরন্তু রচনা বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—

দেবচ্ছন্দ—

"দেবচ্ছন্দোঽসৌ শতযষ্টিকা।"

শতলতার মুক্তাহারের নাম দেবচ্ছন্দ। (লতা অর্থাৎ লহর)।

গুচ্ছ—

"দ্বাত্রিংশৎ যষ্টিকো গুচ্ছঃ।"

৩২ লহর মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ।

গুচ্ছার্দ্ধ—

"চতুর্ব্বিংশতিযষ্টিকো গুচ্ছার্দ্ধঃ।"

২৪ লহর মুক্তাহার গুচ্ছার্দ্ধ নামে খ্যাত।

গোস্তন—

"চতুর্যষ্টিকো গোস্তনঃ।"

৪ লহর মুক্তাহার গোস্তন নামধেয়।

অর্দ্ধহার—

"দ্বাদশযষ্টিকোঽর্দ্ধহারঃ।"

১২ লহর মুক্তাহার অর্দ্ধহার নামে খ্যাত।

মানবক—

"বিংশতি যষ্টিকো মানবকঃ।

২০ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক।

একাবলী—

"একাবল্যেকযষ্টিকা।"

১ লহর মুক্তাহারের নাম একাবলী।

নক্ষত্রমালা—

"সৈব নক্ষত্রমালাস্যাৎ সপ্তবিংশতি মৌক্তিকৈঃ।"

ঐ একাবলী মালা যদি ২৭টী স্থূল মুক্তার দ্বারা রচিত হয়, (কণ্ঠ আঁটা হয়), তবে তাহার নাম নক্ষত্রমালা।

মানোসোল্লাস গ্রন্থে মুক্তাহার রচনা সম্বন্ধে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—

"স্থূলমুক্তাফলৈঃ কার্য্যাকণ্ঠেম্বেকাবলী বরা।
মধ্যে মুক্তাফলৈঃ কুর্য্যাৎ ভ্রামরং সুবিচক্ষণম্॥"

বড় বড় মুক্তার দ্বারা উৎকৃষ্ট একাবলী মালা প্রস্তুত করিবেক এবং মধ্যমাকার মুক্তার দ্বারা ভ্রমর নামক কণ্ঠী প্রস্তুত করিবেক।

"তথা পঞ্চসরং কুর্য্যাৎ নবসপ্তসরং তথা।
উপান্তে নীলমাণিক্য মিশ্রিতং সুমনোহরম্॥
কাঞ্চনীভির্ম্মৃণালাভিঃ পংক্তিস্থাভিঃ সুশোভিতান্।
ক্রমেশো হীয়মানাংশ্চ সরান্ কুর্য্যান্মনোরমান্॥
গুটিকৃত মৃণালাভির্হারে সর্ব্বান্ সমান্ সমান্।
নীলমাণিক্যসংযুক্তান্ পূর্ব্বং হি পরিকল্পয়েৎ॥
নীলৈর্ম্মুক্তা তথা মুক্তা মধ্যে সিদ্ধাস্তিকাযুতাঃ
নীললবনিকা খ্যাতা হরিন্মাণিক্যজাস্তথা॥
নীলমাণিক্যসংযুক্তা, মুক্তাঃ পূর্ব্বং ক্রমেণ চ।
কৃতা বর্ণসরো নাম দর্শনীয়ো মনোহরঃ॥
এত এব সরাহীনা মৃণালাভিঃ সুসংহিতা॥
আনাভি লম্বিতা ভূষা ব্রহ্মসূত্রমিতীরিতা॥"

একাবলীর ন্যায় ৫। ৭ ও ৯ সংখ্যক সর অর্থাৎ লহর বা লতা গ্রন্থন করিবেক। তাহার উপান্ত্য স্থানে মনোহর নীলমাণিক্য সংযুক্ত করিবেক। পংক্তিগুলি সুবর্ণময় মৃণালিকা দ্বারা সুশোভিত করিবেক। সর বা লহরগুলি ক্রমে ছোট ও সুদৃশ্য করা আবশ্যক। ইহার যতগুলি সর অর্থাৎ লহর থাকিবেক, সমস্তগুলিতে গুটিকাকৃতি মৃণালিকা ও নীলম্ সকল সংযুক্ত বা গ্রথিত করিবেক। মধ্যে সিদ্ধান্তিকা অর্থাৎ "ধুক্‌ধুকী" যোগ করিবেক। এরূপ কণ্ঠভূষার নাম নীললবনিকা।

হরিন্মণি ও নীলমণির সংযোগে পূর্ব্বোক্ত পরিপাটি ক্রমে বর্ণসর নামক কণ্ঠভূষা কৃত হইয়া থাকে। এই বর্ণসর বা কণ্ঠী দেখিতে অতীব মনোহর। পূর্ব্বোক্ত নীললবনিকায় লহর না করিয়া যদি কেবল মৃণালিকার দ্বারা সংহত অর্থাৎ "লপেট্ গাঁথা" হয়, তবে তাহা বর্ণসর নাম প্রাপ্ত হয়। যে কোন কণ্ঠভূষা হউক, নাভি পর্য্যন্ত লম্বিত হইলে তাহা ব্রহ্মসূত্র নামে খ্যাত হয়।

সরিকা—

"নবভির্দশভির্বাপি স্থূলমুক্তাফলৈঃ কৃতা।
কণ্ঠপ্রমাণরচিতা সরিকাগলভূষণম্॥"

৯ কি ১০টী বৃহৎ মুক্তার দ্বারা কণ্ঠপরিমাণ অর্থাৎ গলায় আঁটিয়া থাকে এরূপ পরিমাণের মুক্তাহার সরিকা নামে খ্যাত।

বজ্রসংকলিকা—

"তস্যা বহিশ্চ সংলগ্না লম্বনী নীলনির্ম্মিতা।
... ... বজ্রসংকলিকা শুভা।"

সেই সরিকার বহির্ভাগে নীলকান্ত নির্ম্মিত লম্বনী অর্থাৎ "ধোপ্না" সংযোজিত থাকিলে তাহাকে বজ্রসংকলিকা বলা যায়।

উরোভূষণ।

[পদক ও বন্ধুক।]

পদক—

"সুবর্ণোপরিবিন্যস্তরত্নরাজিসমন্বিতম্।
হরিন্মাণিক্য নীলেন। .. ...
মধ্যদেশ নিবিষ্টেন মণিনা পরিশোভিতম্।
পদকং রুচিরং রম্যং বক্ষঃস্থলবিভূষণম্॥"

সুবর্ণের পত্রাকৃতি আকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা রত্নের কারুকার্য্য করিবেক। হরিদ্বর্ণ, রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ মণির দ্বারা প্রান্ত ভাগ সমস্ত চিত্রিত করিবেক এবং মধ্যে কোন এক উজ্জ্বল মণি সন্নিবিষ্ট করিবেক। এরূপ বক্ষঃস্থল ভূষণের নাম পদক এবং উহা দেখিতে রমণীয়।

বন্ধুক—

"নানারত্নবিচিত্রঞ্চ মধ্যনায়কসংযুতম্।
সুরত্নৈর্লম্বিতং রম্যং পদং বন্ধুরং বিদুঃ॥"

উক্ত পদক যদি লম্বিত অর্থাৎ রতন রজ্জু র দ্বারা বক্ষে ঝুলাইবার উপযুক্ত হয়, তবে তাহার নাম বন্ধুক। এই দুই প্রকার পদক প্রায় স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতির ধারণীয়।

বাহুভূষণ।

[কেয়ুর—অঙ্গদ—পঞ্চকা—কটক—বলয়—কঙ্কণ]

কেয়ুর—

"সিংহবক্ত্রসমাকারং নানারত্নবিচিত্রতম্
সুসূক্ষ্মৈর্লম্বনৈর্যুক্তং কেয়ূরং বাহুভূষণম্ ॥"

রত্নবিচিত্রিত সিংহমুখাকৃতি লম্বনযুক্ত বাহুভূষণের নাম কেয়ুর। কনুয়ের উপরিভাগে যে "তাবিজ" ও "বাজু" পরিধান করে, তাহাই পূর্ব্বকালের কেয়ুর। ইহার হিন্দুস্থানী নাম "বাহু বট" ও "বাজুবন্দ"। "থাপ্না" থাকিলে তাহা অঙ্গদ নামে উক্ত হয়। এই অঙ্গদ আর এখনকার "বাঘ্মুখো" অনন্ত প্রায় সমান। পূর্ব্বে ইহার গাত্রে মুক্তা জড়িত করা হইত। যথা—

"সুবর্ণমণিবিন্যস্ত মুক্তাজালকমঙ্গদম্।"

পঞ্চকা—

"পঞ্চকা প্রতি সংযুক্তং বাহুসন্ধিবিভূষণম্।"

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী রত্ন বা গুলিকা সংযুক্ত করিয়া গাঁথিলে তাহা পঞ্চকা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহা বাহুসন্ধি বা করসন্ধির আভরণ। ইহার হিন্দুস্থানীয় নাম "পোচা" আর বাঙ্গালা নাম "পৌইচা"।

কটক—

সুবর্ণোপরি বিন্যস্ত নানারত্নবিরাজিতম্।
হস্তস্য কটকং রম্যং স্বপ্রভাপরিশোভিতম্ ॥"

সুবর্ণময় মৃণালাকৃতির উপর নানা রত্ন খচিত করিলে তাহা কটক নামে উক্ত হয়। ইহা অতি সুরম্য ও প্রভা পরিশোভিত অর্থাৎ "ঝকঝকে"। এইরূপ অলঙ্কার এক্ষণে "ডায়মন্ কাটা" বলয় নামে ব্যবহৃত হইতেছে।

অঙ্গদ ও বলয়—

"সিংহবক্ত্রসমাকারৌ   কুঙ্কুকৌ কীলকৌ কার্য্যৌ
স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতৌ।   ভুজভূষণকৌ বরৌ।
মুক্তাস্তবকসংযুক্তৌ   নামতো বাহুবলয়ৌ
নীলমাণিক্যলম্বনৌ ॥   পুংসিতা বজদাভিধৌ ॥"

সোণার "বাঘ্মুখো" বলয়, তদ্গাত্রে মুক্তা জড়িত, নীলমের লম্বন এবং কীলিত অর্থাৎ "খিল্‌ওয়ালা" এই শ্রেষ্ঠ বাহুভূষণ স্ত্রীহস্তে বলয়, আর পুরুষের হস্তে অঙ্গদ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চূড়—

"কাঞ্চনীভিঃ শলাকাভিঃ
সূক্ষ্মাভির্বিনির্ম্মিতৌ।
মণিবন্ধমিতাদূর্দ্ধং
বলয়ৈর্ব হিতঃ ক্রমাৎ॥
প্রাদেশমা একং দৈর্ঘ্যং
বিস্তারে বাহুবেধনম্।
দ্বিধা বিভজ্য কর্ত্তব্যং
গ্রথিতং কীলকেন তু॥
অতীব রমণীয়ং তৎ
চূড়মিত্যভিধীয়তে॥"

সূক্ষ্ম-স্বর্ণ-শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, প্রাদেশ পরিমাণ দীর্ঘ, বাহুর পরিমাণ বিস্তার, দুই থাকে বিভক্ত, কীলক দ্বারা গ্রথিত অর্থাৎ আবদ্ধ, এই সুন্দর বাহুভূষণের নাম চূড় এবং ইহা বলয়ের উপরে পরিতে হয়। এই চূড় এক্ষণে অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অর্দ্ধচূড়—

"অনেনৈব প্রকারেণ তদর্দ্ধেন বিনির্ম্মিতম্।
অর্দ্ধচূড়মিতি খ্যাতং স্ত্রীণাং প্রিয়তমং সদা॥"

ঐ প্রকার সোণার তারের দ্বারা উহার অর্দ্ধেক পরিমাণে নির্ম্মিত হইলে তাহা অর্দ্ধচূড় নামে খ্যাত হয় এবং ইহা স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই ভাল বাসে। এতদ্ভিন্ন কঙ্কণ, বলয়, পারিহাস্ত ও আবাপ নামক কর-ভূষণ ছিল। এক্ষণে তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রকার কর-ভূষণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অঙ্গুরীয় বা অঙ্গুলী-ভূষণ।

[দ্বিহীরক—বজ্র—রবিমণ্ডল—নন্দ্যাবর্ত্ত—নবরত্ন, বজ্রবেষ্টিত—ত্রিহীরক—শুক্তি-মুদ্রিকা—অঙ্গুলী-মুদ্রিকা—মুদ্রা—মুদ্রিকা]

দ্বিহীরক—

"বজ্র দ্বিতীয় মধ্যস্থং হরিন্মণিক্য নীলকম্।
দ্বিহীরকমিতি খ্যাত মঙ্গুলীয়কমুত্তমম্॥"

অনেক প্রকার অঙ্গুরীয় আছে, তন্মধ্যে দ্বিহীরক নামক অঙ্গুরীয়ের লক্ষণ এই যে, দুই দিকে দুই খানি হীরা, মধ্যে হরিণ্মণি বা নীলমণি। এই দ্বিহীরক অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্র—

"ত্রিকোণবিনিবিষ্টৈশ্চ পবিভিঃ পরিশোভিতম্।
মধ্যে রত্নসমাযুক্তং অস্তে বজ্রমিতীরিতম্॥"

ত্রিকোণাকার, মধ্যভাগে হীরক, পার্শ্বত্রয়ে অন্যান্য রত্ন। এইরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম বজ্র।

রবিমণ্ডল—

"বৃত্তাকারৈর্বিনিবিষ্টৈঃ কুলিশৈরপিবেষ্টিতম্।
মধ্যে চ মণিনা যুক্তং রবিমণ্ডলমীরিতম্ ॥"

গোলাকার, চারিদিকে হীরকখণ্ডে খচিত, মধ্যভাগে মণি,—এরূপ অঙ্গুরীয়ের নাম রবিমণ্ডল।

নন্দ্যাবর্ত্ত—

ঋজ্বায়তচতুষ্কোণ ক্রমোন্নত নিবেশিভিঃ।
বজ্রমধ্যগমাণিক্যং নন্দ্যাবর্ত্তাঙ্গুলীয়কম্ ॥"

সরল, দীর্ঘ অথচ ক্রমোন্নত। এরূপ চতুষ্কোণাকার গঠনের মধ্যে বৃহৎ হীরক বা মাণিক্য থাকিলে তাহা নন্দ্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হয়।

নবগ্রহ বা নবরত্ন—

"মাণিক্যেন সুরঙ্গেন মৌক্তিকেন সুশোভিনা।
প্রবালেনাপি রম্যেন তথা মরকতেন চ ॥
পুষ্পরাগেন বজ্রেণ নীলেন পরিশোভিনা।
গোমেদকেন রত্নেন বৈদূর্য্যেনাভিনির্ম্মিতম্ ॥
রত্নৈর্নবগ্রহচ্ছায়ৈর্নবভিঃ পরিকল্পিতম্।
নবগ্রহমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥"

সুরাগ মাণিক্য, সুন্দর মুক্তা, রমণীয় প্রবাল, সুন্দর মরকত, শোভান্বিত পুষ্পরাগ, হীরক, ইন্দ্রনীল ও বৈদূর্য্য—নবগ্রহের এই নবরত্নের দ্বারা মনোহররূপে নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক নবগ্রহ নামে খ্যাত। এই অঙ্গুরীয়ক অতি উত্তম।

বজ্রবেষ্টিত—

"অঙ্গুলিবেষ্টকং বজ্রৈর্বেষ্টিতং বজ্রবেষ্টিতম্। অন্য রত্নৈশ্চ যদ্যেব তদ্বদ্বেষ্টক মুচ্যতে ॥"

হীরকের বেষ্টিত বেষ্টক (বেড়) বজ্রবেষ্টক এবং অন্য রত্নের দ্বারা বেষ্টিত হইলে সেই সেই রত্নের নামানুরূপ বেষ্টিত নাম প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ মুক্তাবেষ্টিত, পদ্মরাগবেষ্টিত ইত্যাদি।

ত্রিহীরক—

"হীরয়োরুভয়োর্মধ্যে কীলিতং হীরমুত্তমম্।
ত্রিহীরকমিতি খ্যাতমঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥"

দুই পার্শ্বে দুখানি ছোট হীরা ও মধ্যে একখানি উত্তম বড় হীরা যদি কীলিত করিয়া অর্থাৎ তারের দ্বারা বন্ধন করিয়া অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করা হয়, তবে তাহার নাম ত্রিহীরক। ইহা অতি উত্তম।

শুক্তি মুদ্রিকা—

"যত্তু নাগফণাকারং বহুরত্নবিভূষিতম্।
অঙ্গুলীবলয়ে বজ্রৈর্বেষ্টিতে শুক্তি-মুদ্রিকা॥"

যাহা ফণিফণার আকারে গঠিত ও বহুরত্নে বিভূষিত এবং যাহার বলয়-ভাগ হীরকে বেষ্টিত, তাদৃশ অঙ্গুরীয়ের নাম শুক্তি-মুদ্রিকা।

মুদ্রা, মুদ্রিকা, অঙ্গুলিমুদ্রা—

"সাক্ষরাঽঙ্গুলিমুদ্রাস্যাৎ।"

সেই সেই প্রকারের অঙ্গুরী যদি অক্ষরযুক্ত অর্থাৎ নামখোদিত হয়, তবে তাহার তিন নাম। মুদ্রা, মুদ্রিকা ও অঙ্গুলি মুদ্রা।

"অন্যৈশ্চ বিবিধৈরত্নৈঃ সন্নিবেশ বিশেষতঃ।
নানারূপাভিধানৈশ্চ কল্পিতা মুদ্রিকাঃ শুভাঃ॥"

অন্যান্য বিবিধ রত্নের দ্বারা বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজান বা গঠনের দ্বারা নানাপ্রকারের ও নানা নামের মুদ্রিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কটিভূষণ।

[কাঞ্চী—মেখলা—রসনা—কলাপ—কাঞ্চীদাম—শৃঙ্খল]

কাঞ্চী—

"একযষ্টি ভবেৎকাঞ্চী—।"

এক "লহর" হারাকৃতি অথবা রজ্জুর আকৃতি কটিভূষণের নাম কাঞ্চী। এক্ষণে ইহা "গোট নামে খ্যাত।

মেখলা—

"মেখলাত্বষ্ট যষ্টিকা।"

আট্ লহর কাঞ্চীর নাম মেখলা। এখনকার "চন্দ্রহার" আর পূর্ব্ব-কালের "মেখলা" প্রায় একাকার।

রসনা—

"রসনা ষোড়শ জ্ঞেয়া।"

১৬ লহর হইলে তাহার নাম রসনা।

কলাপ—

"কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ।"

২৫ লহর হইলে কলাপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ২৫ লহরের চন্দ্রহার ব্যবহার করা এক্ষণকার রমণীর দুঃসাধ্য।

কাঞ্চীদাম—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং জঘনভোগবেষ্টিতম্। সৌবর্ণরত্নরচিত * * লম্বনৈর্যুতম্॥
হেমঘর্ঘরঘণ্টাভির্নির্ম্মিতং রবসংযুতম্। কাঞ্চীদামেতি বিখ্যাতং কটিভূষণমুত্তমম্॥"

৪ আঙ্গুল বিস্তৃত, সুবর্ণ ও অন্যান্য রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত, লম্বনযুক্ত, সুবর্ণ ঘণ্টিকাযুক্ত, শব্দায়মান ও জঘনদ্বয়ের বেষ্টনকারী, এরূপ কটিভূষণের নাম কাঞ্চীদাম। ইহা এক্ষণে বালক বালিকার ব্যবহার্য্য "কোমরপাট্টা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শৃঙ্খল—

"পুংস্কট্যাং শৃঙ্খলং———"

পুরুষের কটিভূষণের নাম শৃঙ্খল। ইহাব গঠনও প্রায় শৃঙ্খল অর্থাৎ "শিকলীর" ন্যায়।

পাদভূষণ।

পাদচূড়—

"হস্তচূড়কবং * * জঙ্ঘাকাণ্ডপ্রমাণকৌ।
নানারত্নৈশ্চ রচিতৌ বিখ্যাতৌ পাদচূড়কৌ॥"

হস্তচূড়ের ন্যায় কাঞ্চনী শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত, জঙ্ঘাদণ্ডের পরিমাণানুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, নানারত্নে খচিত,—এরূপ পদভূষণ পাদচূড় নামে খ্যাত।

পাদকটক—

"সুবর্ণরচিতৌ কার্য্যৌ ত্রিভাগৌ কৃতখণ্ডনৌ।
সন্ধিদেশেষু সংশ্লিষ্টৌ কীলকেন চ কীলিতৌ॥
চতুরস্রৌ ষড়স্রৌ বা তথাষ্টাস্রৌ চ কারয়েৎ।
সৌবর্ণৈর্বুদ্বুদৈরম্যোঃ পঙ্ক্তিস্থৈর্বা বিরাজিতৌ॥
শ্লক্ষ্ণৌ বা কুঙ্কিসংযুক্তৌ নাদবন্তাবথাপি বা।
রত্নৈর্বা বিবিধৈর্যুক্তৌ কটকৌ পাদভূষণৌ॥"

সুবর্ণরচিত, ভাগত্রয়যুক্ত অর্থাৎ "তে-থাকা" অথচ খণ্ডিত। সন্ধিস্থান কীলক দ্বারা আবদ্ধ, চতুষ্কোণ ষট্‌কোণ অথবা আট্‌কোণ, অর্থাৎ "আট্‌পোলে" অথবা সুবর্ণবুদ্বুদের পঙক্তি সমূহ দ্বারা সুশোভিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দকারী সুন্দব সুদৃশ্য কুঙ্কিকাযুক্ত,—এরূপ পাদাভরণের নাম পাদকটক। হিন্দুস্থানে ইহা "পৈজন্" ও বঙ্গদেশে "পাইজোর নামে বিখ্যাত।

পাদপদ্ম—

"ত্রিপঙ্ক্তিশৃঙ্খলাযুক্তৌ নানারত্নশতৈঃ কৃতৌ। কীলকা ইব সন্ধিতৌ পাদপদ্মাবিতীরিতৌ॥

৩।৫টী শৃঙ্খলযুক্ত (অঙ্গুলিতে বাঁধিবার জন্য) বহুবিধ বহুরত্নের দ্বারা গঠিত, কীলকের ন্যায় সজ্জিত—এরূপ পদভূষণের নাম পাদপদ্ম। ইহা এক্ষণে "চরণচাপ" ও "চরণপদ্ম" নামে বিখ্যাত।

কিঙ্কিণী—

"কিঙ্কিণ্যঃ স্বর্ণরচিতা গুণাগুম্ফিতবিগ্রহাঃ। নাদবত্যঃ সুরম্যাস্তাঃ পাদঘর্ঘরিকাভিধাঃ॥"

স্বর্ণের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল সূত্রের দ্বারা গ্রথিত, এরূপ শব্দায়মান পদালঙ্কারের নাম কিঙ্কিণী ও পাদঘর্ঘরিকা অর্থাৎ পায়ের "ঘাঘ্‌রা" ও "ঘুংঘুর" নামে খ্যাত।

পাদকণ্টক—

"তাদৃগ্রূপসমাকারা নানারত্নৈর্বিনির্ম্মিতাঃ।
ধ্বনিহীনাঃ সুশোভাঢ্যাঃ কণ্টকাঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

ঠিক সেইরূপ আকারের রত্ননির্ম্মিত ঘুংঘুর যদি ধ্বনিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পাদকণ্টক বলা যায়।

মুদ্রিকা—

"আয়তাশ্চ সুবক্রাশ্চ কণ্টকা রত্ননির্ম্মিতাঃ
স্থূলাশ্চ ধ্বনিসংযুক্তাঃ কথিতা মুদ্রিকা বরাঃ॥"

আয়ত ও সুবক্র রত্ননির্ম্মিত কণ্টক যদি মোটা ও শব্দকারী হয়, তবে তাহাকে মুদ্রিকা নাম দেওয়া যায়। এক্ষণকার "কড়াইদার মল" আর এই মুদ্রিকা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী।*

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানী পুরুষদিগকেও এই সকলের কোন কোনটীকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ধারণ করিতে দেখা যায়। পুরুষের জন্য শেখর, মুকুল, শিরবেষ্টন (শির পেঁচ্) এবং কিরীট ও মুকুট—এই কএক প্রকার শিরোভূষণ নির্দ্দিষ্ট আছে মাত্র।

শ্রীরামদাস সেন।

* পদে সুবর্ণ কি অন্য কোন রত্ন ধারণ করিতে নাই, এ সংস্কার কেবল দাক্ষিণাত্য বাসীদিগের নাই। অদ্যাপি মাড়বারিরা নির্ভয়ে স্বর্ণনির্ম্মিত পাদভূষণ ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে হীরকাদি বিন্যস্ত করিতে সংকুচিত হয় না। এই মনোল্লাস রচয়িতা সোমরাজ একজন দাক্ষিণাত্যবাসী রাজা। সেই জন্যই তিনি স্বর্ণরত্নাদির পদাভরণ রচনা করিতে বলিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

যে বুড়া মরিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রফুল্ল কিছুই পায় নাই, সুতরাং প্রফুল্ল কিছুই বুঝিতে পারে নাই যে, সে এত ধন কোথায় পাইল। কিন্তু আমরা তাহার পরিচয় জানি। এস্থলে সে বুড়ার কিছু পরিচয় দিতে হইল।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে সচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনীতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া তৎপাদপদ্মনিকর সেবন পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয়ে মন দিল।—দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব; বিষয় কর্ম্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি যুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাব মহলে সে সম্বাদ পৌঁছিল। একজন হাবসী খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজি, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান্? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিনে কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজি বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারও সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল।

বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে, হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নীচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে, মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরও খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এই রকম পুরাতন বাড়ীতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে আরও টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুরঙ্গ, মাটির নীচে অনেক চোরকুঠারি বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নীচের চোরকুঠারীতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কি চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল মোহর। ইঁন্দুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল যে, আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও। বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজি বুঝিলেন, বৈষ্ণবী এক দিন ছুটি পাইয়াছে, শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে বার ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্ব্বকালে উত্তরবাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কি জানি যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্ব্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভাল। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা

মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইলেন। পাঠান সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তার পর আর তাঁহাকে মনুষ্য-লোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কি হইল কেহ জানে না। তিনি আর কখন দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল, তার পর প্রফুল্ল পাইল। কার ধন কে খায়।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরে এ ধনের কথা কিছু জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনও খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মত বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল।

তার পব, বড় ডাকাইতের ভয় হইল। বাবাজী হাট হইতে নিত্য ডাকাতের গল্প শুনিয়া আসিত, আরও দেখিত যে, এই বনে ডাকাতেব মত লোক সর্ব্ব ক্ষণ যায়; বোধ হয় এ বনে ডাকাতদেব একটা আড্ডা থাকিবে। সে কথা বাস্তবিক সত্য। ডাকাতেরাও দেখিত যে, বৈবাগী সপ্তাহে সপ্তাহে বন হইতে হাটে যায়, হাট করিয়া বনে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা সন্ধান লইতে লাগিল। ভাঙ্গা বাড়ী দেখিয়া গেল। জানিল যে, এই খানে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাস করে, কিছু কাজ কর্ম্ম করে না, অথচ সচ্ছন্দে দিনপাত করে। বুঝিল ইহাদের কিছু আছে।

অতএব এক দিন তাহারা জন কতক জুটিয়া সেখানে ডাকাইতি করিতে আসিল। ভাঁড়ের টাকা গুলি লুটিয়া লইল। তার পর "আর কি আছে দে," বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দকে বাঁধিয়া মশাল দিয়া পোড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণগোবিন্দ কিছুই দিল না বরং অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমার আর কিছুই নাই। মারিয়া ফেল—ফেল, কিন্তু আর কিছু পাইবে না। বরং আমায় ছাড়িয়া দিলে কিছু পাইবে। আমাব টাকা আছে সত্য, কিন্তু টাকা এখানে নাই। আমি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতাম, শেঠের বাড়ী আমার টাকা গচ্ছিত আছে। বছর বছর সেখানে গিয়া আমি সুদ নিয়া আসি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যখন আমি সুদ আনিব, তোমরা আসিলে তোমাদের কিছু দিব। সব দিব না। সব যদি নাও, তবে আমি এ দেশ থেকে পালাইব; আর পাইবে না। আর যা ইচ্ছাক্রমে দিব, তাহা যদি লইয়া সন্তুষ্ট হও, তবে বছর বছর আসিও, বছর বছর দিব।"

ডাকাতেরা দেখিল এ বন্দবস্ত মন্দ নয়। আপাততঃ আর কিছু ত পাওয়া যায় না—তাহারা স্বীকৃত হইয়া বুড়াকে ছাড়িয়া দিল। বুড়া একটা দিন অবধারিত করিয়া দিল। ডাকাইতেরা চলিয়া গেল।

বুড়া দুই চারি দিন কায়ক্লেশে কাটাইয়া শেষে ঘড়া হইতে কিছু মোহর বাহির করিয়া একটা ভাঙ্গা হাঁড়িতে পুরিয়া তাহাতে কাদা মাখাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখাইল, বলিল, "কৃষ্ণ দয়া করিয়াছেন, আবাব কিছু পাইয়াছি।" তাহা খরচ করিয়া দিন চালাইতে লাগিল। ডাকাতেরা অবধারিত তারিখে আসিলে তাহাদের কিছু দিল।

এরূপে দুই চারি বৎসর গেল। ডাকাতেরা তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। সেও ডাকাতদিগকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। এমন কি কোন ডাকাতের ঘরে খাবার না থাকিলে, সে আসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের কাছে টাকাটা সিকেটা ধার লইয়া যাইত। ডাকাতেরা সাধ্য হইলেই ঋণ পরিশোধ করিত—কেন না নহিলে আবার চাহিলে পাইবে না। এইরূপ কবিতে করিতে কৃষ্ণগোবিন্দ তাহাদের দলেব মহাজন দাঁড়াইয়া গেল। শেষে সে দলমধ্যে একজন গণ্য হইল। তাহাকে কোন ডাকাইতিতে যাইতে হইত না; সে কেবল অসময়ে টাকা যোগাইত। তাহার আসল ফেরৎ পাইত, কিন্তু সুদ পাইত না। কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে সকল ডাকাইতিব লাভের এক অংশ পাইত। তাহাতেই তাহার দিনপাত হইতে লাগিল; রাজা নীলাম্বরের ধন আর ছুঁইতে হইল না। সেই ডাকাতের দল—আজ প্রফুল্লেব সম্মুখে উপস্থিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ডাকাইতেরা প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিল "আ মোলো! এটা কে? তুই এখানে কেন? বুড়ো কোথায়?"

প্রফুল্ল সকল সাহস জমা করিয়া বলিল, "তিনি মরিয়াছেন।"

"আঁঃ; এমন বুড়ো মরেছে, কে মার্‌লে? আমরা থাকতে বুড়ো মরে!

প্র। তিনি জ্বরবিকারে মরেছেন।

ডা। কবে জ্বর হলো? মিছে কথা! তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস্।

প্র। উঠানে তাঁকে গোর দিয়াছি—গিয়া একজন না হয় দেখিয়া আইস।

দুই চারি জন ডাকাত দেখিতে ছুটিল। অপরেরা প্রফুল্লকে ধমক চমক করিতে লাগিল।

ডাকাইতেরা বলিতে লাগিল "তার বৈষ্ণবী কোথায়? তুই কে?"

প্র। বৈষ্ণবী, তাঁর যা কিছু ছিল, তাহা লইয়া পলাইযাছে।

ডা। আ মোলো! এত বড় স্পর্দ্ধা! কোথা পালিয়েছে বল্‌ত?

প্র। তা জানি না।

ডা। তুই কে? তুই এখানে কেন?

প্র। আমি বাবাজীর পুষ্যি মেয়ে।

ডা। পুষ্যি মেয়ে! কই বাবাজীর ত পুষ্যি মুষ্যি ছিল না—কখন শুনি নাই।

প্র। বৈষ্ণবীর ভয়ে তিনি প্রকাশ করিতেন না। আমাকে একঘর কুটুম্বের বাড়ী লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ডা। তা এখন বুঝি টাকা লুট্‌তে এসেছিস্?

প্র। ব্যামো শুনে এসেছি।

ডা। তুই আবার ব্যামো শুন্‌লি কার কাছে?

প্র। বৈষ্ণবী হাটে গল্প করেছিল তাইতে শুনেছি।

ডা। বটে? তুই এসে পেলি কি?

প্র। কিছু না। সব বৈষ্ণবী নিয়ে গেছে বলেছি ত।

ডা। কেন, মুর্শিদাবাদের টাকা? সে কে পাবে?

প্র। সে সব মিছা কথা।

প্রফুল্ল জানে না কোন্ টাকার কথা হইতেছে সুতরাং আন্দাজি আন্দাজি উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু বড় বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সাহস।

ডাকাইতেরা বলিল "মিছে কথা! তুই কি আমাদের ফাঁকি দিতে চাস্? আমরা যে কত বার টাকা ধার নিয়ে গিয়েছি।"

প্র। সে নিয়ে গিয়েছ ঘরের টাকা।

ডা। সে কি? বুড়া আমাদের ফাঁকি দিত? তা, ঘরের টাকা সব বৈষ্ণবী মাগী নিয়ে গিয়েছে। আমরা আর ধার পাব না?

প্র। পাবে না কেন?

ডা। কোথা পাইব? কে দিবে?

প্র। আমি দিব।

ডা। তুই? তুই কোথায় পাবি? তবে তুই বুড়ার টাকা পেয়েছিস্।

প্র। না, টাকা কিছু পাই নাই। কিন্তু বুড়োর টাকাও বড় ছিল না। তাঁর বিদ্যা ছিল, আমি সেই বিদ্যা পেয়েছি।

ডা। বিদ্যাটা কি?

প্র। তা তোমাদের বলবো কেন?

ডা। বল্‌বিনে? কেটে ফেলব।

প্র। ফেল, ফেল। আমি যাব, কিন্তু তোমাদের টাকা ধার দিবে কে?

ডা। আচ্ছা, নাই কাট্‌লেম। বিদ্যাটা কি, শুনবার ক্ষতি কি?

প্র। তোমরা কারও সাক্ষাতে বলবে না?

ডা। না—বল।

প্র। তিনি সোণা তৈয়ার করিতে জান্‌তেন। আমাকে তাই শিখিয়ে গিয়াছেন। তোমাদের তাই তৈয়ার করিয়া দিতেন।

ডা। হাঁ হাঁ বটে। বাবাজি বাজারে মোহর ভাঙ্গাইত শুনিয়াছি। তা বিদ্যাটা তুমি শিখিয়াছ মা?

প্র। এক রকম শিখিয়াছি। আজ আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; আমার হাতে সোণা হয়।

ডা। আমাদের শিখাইবে?

প্র। তা যদি শেখ, তা আমার কাছে যেমন শিখিবে, আমাকে অমনি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ বিদ্যা পরকে দিয়া আর বাঁচিতে নাই। তাও না হয়, আমি রাজি হইলাম; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কাকে শিখাইব? এ বিদ্যা ছয় কাণ হইলে ফলে না। তাই একজনকে বৈ আর শিখাইতে পারিব না—কাকে শিখাইব?

ডাকাইতেরা সকলেই বলিল "আমাকে! আমাকে! আমাকে! আমাকে!" ডাকাইত মহলে বড় গোল বাধিয়া গেল। ঝগড়া হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই। এ মন্ত্র সকলের কোষ্ঠিতে ফলে না। বাবাজি বৈষ্ণবীকে এ বিদ্যা শিখাইতেন, কিন্তু তার কোষ্ঠিতে মিলিল না। তাকে এ বিদ্যা না দেওয়াতেই সে রাগ করিয়া টাকা কড়ি চুরি করিয়া পলাইয়া গেল। কাল তোমাদিগের কোষ্ঠী লইয়া আসিবে, আর একজন দৈবজ্ঞ লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে দিয়া বাছাই করাইব।

ডাকাতেরা মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল; কোষ্ঠী ত কারও নাই। প্রফুল্ল বলিল, "কোষ্ঠী নহিলে হইবে না! আমারও মৃত্যু হইবে, তোমাদের হাতেও ফলিবে না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া ডাকাতেরা বলিল, "তা, মা, তোমার বিদ্যা তোমাতেই থাক্। আমাদের টাকা পাইলেই হইল। আমাদের বার্ষিকটা দেবে ত?"

প্র। দেব।

ডা। আর সময়ে অসময়ে ধার ধোর?

প্র। দেব।

ডা। তোমার মালের ভাগ তোমাকে ঠিক আনিয়া দিব।

প্র। আমি ভাগ চাই না। আমার কুলাইবে। বাবাজির সাহস ছিল না। এতে ভূত প্রেতের দৌরাত্ম আছে, তাই তিনি কম সোণা করিতেন। আমার সে ভয় নাই, আমি বেশী করিয়া সোণা করিব। আমি ভাগ নিব না।

ডাকাতেরা। (সকলে একত্রে) জয় হউক মায়ি! জয় হউক! সুদ নেবে না?

প্র। না।

ডাকাইতেরা। জয় হউক মায়ি। আজ পরীক্ষা করিয়াছিলে?

"হাঁ। যা করিয়াছি, তাহা তোমরা লইয়া যাও।" এই বলিয়া প্রফুল্ল যে শত স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা ডাকাইতদের দিলেন।

পাইয়া ডাকাতেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইল। কেহ প্রফুল্লকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কেহ "মার জয় হউক" বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ বলিল, "আজ হইতে তুমি আমাদের মা, আমরা তোমার ছেলে।" সকলেই প্রফুল্লের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। তার পর যে দস্যু কথোপকথনের প্রধান ভার লইয়াছিল, সে বলিল, "মা! তুমি কোথায় থাকিবে? কোথায় তোমার দেখা পাইব?"

প্র। আমি এইখানেই থাকিব।

ডা। তুমি ছেলে মানুষ, একা এ বনের ভিতর ভাঙ্গা বড়ীতে থাকিবে?

প্র। তোমরা থাকিতে আমার ভয় কি?

ডা। তা নিশ্চিন্ত থেকো মা! আমরা বেঁচে থাকিতে তোমার পায়ে কাঁটাও ফুট্‌বে না।

প্র। আমার কোন ভয় নাই। আমি অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানি।

ডা। তা বেশ মা। আর আমাদের যা হুকুম কর্‌বে তাই কর্‌বো।

প্র। তা করতে হবে। তা নইলে এখানে আমার থাকা হবে না।

ডা। তা কি করবো এখন, আজ্ঞা কর।

প্র। কাল আমার চারি জন দাসী এনে দেবে, আর আট জন পুরুষ মানুষ চাকর দেবে। তারা জল তুলিবে, কাঠ কাট্‌বে, বাজার কর্‌বে, আর আর কাজ কর্‌বে। তোমাদের বিশ্বাস হয়, এমন লোক এনো। আমি মনের মত মাহিয়ানা দিব।

ডা। তা সব কাল দিব। আমাদেরই ঘরের মেয়েছেলে পাঠাইয়া দিব। তোমার চাকরি কর্‌বে তার ক্ষতি কি?

প্র। আর চারিজন দরওয়ান।

ডা। অন্য দরওয়ানে কাজ নাই মা। আমরাই তোমার দরওয়ানী করব, আমাদের কিছু কিছু দিও। আর কি চাই?

প্র। আর আমার বাজার হাট, বাসন কোষণ, কাপড় চোপড়, ঘর কন্নার জিনিষ সব কিনিয়া দিতে হবে। এই বাড়ী মেরামত করে দিতে হবে।

ডা। সে সব আমরা পার্‌ব না। তার জন্য পাঠক ঠাকুরকে পাঠিয়ে দেব।

প্র। পাঠক ঠাকুর কে?

ডা। জান না? আমাদের দলপতি।

প্র। হাঁ হাঁ, বাবাজির কাছে তার নাম শুনেছি। তা পাঠিয়ে দিও।

ডাকাতেরা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। প্রফুল্ল দ্বার বন্ধ করিয়া আবার শুইল। কিন্তু আর নিদ্রা হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন, বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ফুলমণি নাপিতানী মহাশয়ার কথাটা বলিয়া রাখি। তাঁহার ন্যায় সাধুচরিত্রা সুন্দরীর হঠাৎ অবমাননা করিতে পারি না।

ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায়, বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িণীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে

"ওগো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো! ঐ এলো গো!" কাঁটা বনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদর খানা একটা কাঁটা বনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশান স্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, "ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়ে মানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি ক'রে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে!" শুনিয়া দুর্লভ চন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভ চন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরো বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল "ও অধঃপেতে—ও পোড়ার মুখো—ও আঁটকুড়ির পুত,—ও হাবাতে—ও ড্যাক্‌রা—ও বিটলে!"—ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদন কালে দুর্লভের বংশাবলীর প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই ডাকাতেরা ত কেহ আসিল না? কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডাকাত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো—তুই এখন্ এলি?"

ফুলমণি বলিল, "কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম?"

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? বামুনদের বাড়ী শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

ফুল। তুই চোকের মাতা খেয়েছিস্ তার কি হবে? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিসনে?"

অলকমণি বলিল, "সে কি বোন্? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুনদের বাড়ী গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখলাম না— কাকেও দেখলাম না। হাঁ লা—প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা?

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর! দিদি চুপ্! ও কথা মুখে আনিস্ না।"

অল। (সভয়ে) কেন কি হয়েছে?

ফুল। সে কথা বল্‌তে নেই।

অল। কেন লো?

ফুল। আমরা ছোট লোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কি, বোন্?

অল। সে কি? প্রফুল্ল কি করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে!

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কি? কি বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারও সাক্ষাতে বলিস্‌নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণ পরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া, দাঁত কপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহার কালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এ সকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্ আমার মাথা খাস্।"

দিদি বলিলেন, "না গো! একথা কি বলা যায়?" কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখনই চাল ধুইবার ছলে ধুচুনী হাতে পল্লী পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ একথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া প্রফুল্লের শ্বশুর শাশুড়ীর কানে পর্য্যন্ত গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেলা প্রহরেকের মধ্যে ভবানী পাঠক, প্রফুল্লের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল দেখিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন—চোগোঁপ্পাওয়ালা শির-উঠা পাকান-শরীর ডাকাতের সর্দ্দার; এলো কি না গোঁপ-কামান ফোঁটাকাটা নধর-শরীর ভট্‌চায্যি বামুন। প্রফুল্ল কিছু বিস্মিত হইল। পরিচয় পাইয়া বলিল,

"আপনি কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?"

ভবানী। তুমি ডাকিতেছিলে না?

প্রফুল্ল। কাল রাত্রে যাহাবা আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, তাহাদিগের দলপতিকে পাঠাইয়া দিবে—কিন্তু আপনি কে?

ভবানী। আমিই ডাকাতের দলপতি—তোমার কি প্রয়োজন আছে বল?

প্রফুল্ল কিছুই বলিতে পারিল না। গত রাত্রের ভীষণ ব্যাপারে সে বহুসংখ্যক দস্যু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইযাও তাহাদের চীৎকারেও চুপ করে নাই—সাহস করিয়া কথা কহিয়াছিল, কিন্তু ইহার সম্মুখে পারিল না। দুর্দ্দশা দেখিয়া ভবানী বলিল,

"তোমাব ঘব বাড়ী, জিনিষ পত্র, দাস দাসী চাই?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ভবানী বলিল,

"তোমাব এ সকল চাই আমি শুনিয়াছি। কিন্তু কেন? তোমার টাকা আছে বুঝিয়াছি, সে টাকা কয়দিন থাকিবে?"

প্র। এমন কথা কেন বলিতেছেন?

ভ। বনবাসীদিগকে দেখিয়াছ ত? তাহারা তোমার টাকা কয়দিন রাখিবে?

প্র। আমার টাকা এখানে নাই।

ভ। এ কথা আমার কাছে বলা বৃথা—আমি তোমার দেওয়া পুরাণ মোহরগুলি দেখিয়াছি। বোধ হয়, তুমি এই পুরাণ বাড়ীতেই টাকা পাইয়াছ—এই খানে টাকা আছে।

প্র। যদি এখানে আমার টাকা থাকে—তোমরা কি তাহা কড়িয়া লইবে?

(প্রফুল্লের মুখ বিষণ্ণ।)

ভ। আমি কাড়িয়া লইব না। কে লইবে তাও আমি জানি না।—কিন্তু তুমি নিঃসহায় বালিকা—এ বনের ভিতর, টাকা দূরে থাক, জাতিকুল কিছুই রাখিতে পারিবে না।

প্রফুল্ল প্রায় কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু যে সাহসের গুণে এত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিল, সেই সাহসের উপর ভর করিয়া কহিল, "নিঃসহায় কিসে? আপনাকে আমি সহায় ধরিয়াছি।"

ভ। আমি তোমার সহায় হইলে তোমার সে সকল ভয় নাই বটে, কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনিলে আমি কি প্রকারে তোমার সাহায্য করিব?

প্র। আপনার কি কথা শুনিতে হইবে?

(প্রফুল্ল বড় ভীত হইয়াছে।)

ভ। আমি যাহা বলিব, তাহাই শুনিতে হইবে। আমি শপথ করিতেছি, আমি তোমাকে কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিব না। যদি কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিই, তুমি আমার কথা শুনিও না। তাহা ভিন্ন আর যাহা বলিব, শুনিতে হইবে।

প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। ভবানী পাঠক বলিল,

"কাঁদ কেন মা?"

প্রফুল্ল চোখের জল মুছিল। বলিল, "আপনি আমাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিব।"

ভ। উভয়ে শপথ করিতে হইবে। কিন্তু সে পরে হইবে। আগে তোমার মঙ্গলার্থ, তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার উচিত। তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি—এ ধন তুমি গ্রহণ করিও না।

প্র। কেন?

ভ। তুমি অনাথা—এ ধন রক্ষা করিবে কি প্রকারে? ধনের জন্য সর্ব্বস্ব খোয়াইবে?

প্র। সেই জন্য আপনাদের সাহায্য খুঁজিতেছি। বৈরাগী এত দিন রক্ষা করিয়াছিল কি প্রকারে?

ভ। বৈরাগীর কথা স্বতন্ত্র। তুমি সুন্দরী যুবতী অনাথা—তুমি এ ধন লইয়া হয় বিপদে পড়িবে, নয়, পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইবে।

প্র। ধনে পাপ?

ভ। হাঁ—যদি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণে না অর্পণ কর।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে?

ভ। সর্ব্বস্ব। যদি এ ধন গ্রহণ কর, তবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।

প্র। সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিব—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কে? কোথায়? তিনি কি প্রকারে আমার এ ধন গ্রহণ করিবেন?

ভ। তুমি লেখাপড়া জান ?

প্র। না।

ভ। তবে আজি তুমি লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ কর।

প্র। কে শিখাইবে ?

ভ। আমি।

প্র। লেখা পড়া শিখিব কেন ?

ভ। আমি তোমাকে দুই এক খানা গ্রন্থ পড়াইব ?

প্র। তাহাতে কি হইবে ?

ভ। শ্রীকৃষ্ণের ধন কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয় তাহাই শিখিবে।

প্র। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে দিব—আমার ত কিছু নাই, আমি খাইব কি ?

ভ। আমার বাড়ী দেখাইয়া দিব, প্রত্যহ তুমি সেখানে ভিক্ষা করিও যাহা ভিক্ষা পাইবে, তাহাই খাইবে।

প্র। আপনার ধন থাকিতে ভিক্ষা করিয়া খাইব ?

ভ। প্রফুল্ল মনে তুমি যদি এই ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না কর, তবে তিনি গ্রহণ করিবেন না। তিনি গ্রহণ না করিলে আমার দলের ডাকাইতেরা উহা বেবাক গ্রহণ করিবে।

প্র। শ্রীকৃষ্ণ কে ? ঠাকুর ত মন্দিরে দেখি—তিনি ধন গ্রহণ করিবেন কি প্রকারে ? তাঁর কি কিছু নাই ?

ভ। তিনি জগদীশ্বর—সব তাঁর।

প্র। তবে তাঁর আমার ধনে প্রয়োজন কি ?

ভ। লেখাপড়া শেখ—বুঝাইব। এখন কেবল এইমাত্র মনে থাকে যেন তুমি আমার মা। আমি তোমার ছেলে। আমি তোমাকে ভাল পরামর্শ বৈ মন্দ পরামর্শ দিব না।

প্র। আপনি কি সত্যসত্য ডাকাতি করিয়া থাকেন ?

ভ। সত্যসত্যই। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

প্র। কবে সে কথা বলিবেন ?

ভ। যে দিন তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।

(উপন্যাস অসম্পূর্ণ)

বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল ইহা যথাসাধ্য বুঝাইবার জন্য আমরা সিরাজ উদ্দৌলাকে উপলক্ষ্য করিয়াছি। তিনি তৎকালে কেবল নবাব ছিলেন বলিয়া যে, তাঁহার পরিচয় দিতেছি এমত নহে, তাঁহার পরিচয়ে আর সকল মুসলমানের পরিচয় হইবে ভাবিয়া আমরা তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেছি। অন্য সকল মুসলমান প্রায় প্রত্যেকেই এক একটী সিরাজ উদ্দৌলা ছিলেন। যে সকল দোষ সিরাজ উদ্দৌলায় ছিল, অন্য মুসলমানদেরও সেই সকল দোষ ছিল। অন্য মুসলমানেরা অন্যরূপ হইলে রাজ্য কখন যাইত না। সাধারণের চরিত্রগুণে রাজ্য হয়, সাধারণের চরিত্র-দোষে রাজ্য যায়। রাজারা উপলক্ষমাত্র। ওয়াসিংটন সাহেব মারকিন দেশ স্বাধীন করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার মূল হেতু তৎকালে মারকিনেরা সকলেই এক একটী ওয়াসিংটন ছিলেন। শিবজী মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে যে সক্ষম হইযাছিলেন, তাহারও হেতু সেই। তিনি আধুনিক উড়িয়াদের ন্যায় কোন জাতি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কখন মহারাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিতেন না।

সিরাজ উদ্দৌলার দোষে রাজ্য যায় নাই। মুসলমানদের চরিত্র দোষে গিয়াছিল। সে সময়ে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অন্য কেহ নবাব থাকিলেও সাধারণের চরিত্রদোষে রাজ্য যাইত। সাধারণ-চরিত্রের দোষগুণ সমাজ হইতে উদ্ভূত হয়। সমাজ যখন যেরূপ থাকে, লোকের চরিত্র তখন সেইরূপ হয়। সমাজ আমাদের প্রকৃত শিক্ষক। পাঠশালায় বা কালেজে আমরা যাহা শিখি, তাহাতে আমাদের দর্শন বৃদ্ধি হইতে পারে, বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে চরিত্র পরিশোধিত এবং পরিস্ফুটিত হইতে পারে কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে এখন বিস্তর লোক কালেজের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কল কৌশল অনেক বুঝিয়াছেন, দ্রব্যগুণ পদার্থগুণ বিলক্ষণ শিখিয়াছেন, কিন্তু স্বভাব সম্বন্ধে চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহারা অন্যাপেক্ষা যে, বিশেষ উন্নত হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। যে সকল ভদ্র সন্তান কখন কালেজে

যান নাই, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ, কালেজের এম. এ. বি., এরাও সেইরূপ ; প্রভেদ ত বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

না বলিয়া না কহিয়া সমাজ সকলকেই শিক্ষা দেয়। সকলেই তাহা অজ্ঞানত গ্রহণ করে। কালেজের শিক্ষা কেহ পায়, কেহ পায় না। কিন্তু সমাজের শিক্ষায় কেহ বঞ্চিত হয় না। সকলকেই তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইচ্ছা করিলেও কেহ সে শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেখানে না বলিয়া শিক্ষাদান, আর, না জানিয়া শিক্ষাগ্রহণ, সেখানে অব্যাহতি কোথায় ?

আর এক কথা। সমাজের শিক্ষা সকলেই সমান অংশে পাইয়া থাকেন ; তাহাই তাহাদের চরিত্র একই প্রকার হইয়া পড়ে, তবে প্রকৃতি অনুসারে কিছু ইতর বিশেষ হয় মাত্র, নতুবা মোটের উপর সমান। পাঞ্জাবিরা রণপ্রিয়, মারওয়ারিরা ধনপ্রিয়, অমুকদেশীরা সত্যপ্রিয় ইত্যাদি যে প্রবাদ আমরা নিত্য শুনি, তাহার এই কারণ।

এই সমান শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক। ইহাদ্বারা জাতিবন্ধন দৃঢ় হয়। যত দিন ইউরোপে সমান শিক্ষা ছিল, তত দিন তথায় বিশেষ একতা দৃষ্ট হইত। এখন ইংলণ্ড বল, জার্ম্মনি বল, যে দেশ বল, আর কোন দেশে পূর্ব্বমত জাতিবন্ধন নাই। কালেজি শিক্ষায় তাহার অন্যথা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। কালেজি শিক্ষার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সমান শিক্ষা ছিল, জমিদার ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও দরিদ্র সকলের একরূপ প্রকৃতি, একরূপ প্রবৃত্তি, একরূপ রুচি, একরূপ জ্ঞান, একরূপ সমস্ত ছিল। তাহাই তাঁহাদের সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, আনন্দ, উৎসব একই কারণে জন্মিত। তখন বাঙ্গালিরা কেবল সমাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। এখন বাঙ্গালায় কালেজি শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কার্য্যকে সকলে দোষিতেন, বা যে উৎসবে সকলে মাতিতেন, কালেজি শিক্ষিতেরা হয়ত এখন সে দোষ অগ্রাহ্য করেন, সে উৎসবে উদাসীন থাকেন, এরূপ বৈষম্য এখন সকল দেশেই আরম্ভ হইয়াছে, এক সময় জর্ম্মণি দেশে ইহা অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সমাজ হইতে লোকের শিক্ষা, লোক হইতে সমাজের শিক্ষা। জল হইতে মেঘ, মেঘ হইতে আবার জল. বীজাঙ্কুরবৎ, বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না ; অঙ্কুর না হইলে বীজ হয় না।

সমাজ ভাল হইলে লোক যেমন ভাল হয়, সেইরূপ আবার লোক ভাল হইলে সমাজও ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু লোক মন্দ হইলে সমাজ কোনক্রমে ভাল হয় না। লোক হইতে সমাজ। সুতরাং যেরূপ লোক; সেইরূপ সমাজ। কতক-

গুলি পয়সা একত্রিত হইলে, তাহা গোল স্তম্ভাকারে বা চক্রাকারে থাকিবে, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট স্তূপাকারে কখন থাকিবে না, কেহ চেষ্টা করিয়া তাহাদের সেরূপ আকারে সাজাইতে পারিবেন না। পয়সার কোণ নাই সুতরাং তাহার স্তূপ কোণবিশিষ্ট হইবে না; যাহাতে যে গুণ নাই, তাহার সমষ্টিতে সে গুণ জন্মিতে পারে না। লোকেতে যে গুণ নাই, তাহাদের সমাজে সে গুণ কোথা হইতে আসিবে ?

আর এক কথা। প্রকৃতি সতত প্রবর্দ্ধক। এ জগতে যাহা কিছু আরম্ভ হয়, তাহাই বৃদ্ধি পায়। যখন পীড়া একবার আরম্ভ হয়, তখন তাহা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; যখন পীড়া আবার একটু হ্রাস পায়, তখন সেই হ্রাসই বৃদ্ধি পায়। যখন কোন দেহ জন্মে, তখন তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়। যখন সেই দেহ জীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন সেই জীর্ণতাই বাড়িতে থাকে। সকল বিষয়েই বৃদ্ধিই নিয়ম, সুতরাং সমাজসম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যখন সমাজ একবার উন্নত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রমে সেই উন্নতি বৃদ্ধি পায়। যখন সমাজ আবার অবনত হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অবনতি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বহু পূর্ব্ব হইতে মুসলমান সমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ক্রমে তাহা বাড়িয়া আসিতেছিল।

আমরা বলিয়াছি যে, সমাজ-শিক্ষা এক পক্ষে বড় মঙ্গলদায়ক; তৎকালে বলা হয় নাই যে, সমাজ শিক্ষা আর এক পক্ষে বড় অনিষ্টকারক। যখন সমাজ মন্দ হইয়া পড়ে, তখন তাহার শিক্ষাও মন্দ হয়। সেই মন্দ শিক্ষা সকলে সমান অংশে পাইলে সমাজ অধঃপাতে যায়। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য কেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল বুঝিতে গেলে এই সকল সমাজের নিয়ম মোটামুটি স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহাই এই গুলির উল্লেখ করিলাম। আর গুটি কতকের উল্লেখ পরে আবশ্যকমত করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুর্সিদকুলি খাঁ যখন বাঙ্গালায় নবাব, এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা, তখন দীনহীন একজন বৃদ্ধ মুসলমান দিল্লী হইতে কটকে আসিয়া সুজার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। পরিচয় লইয়া সুজা জানিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহার দূরসম্বন্ধী। অতএব তাঁহাকে যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। বৃদ্ধের দুই পুত্র ছিল, কনিষ্ঠ মহম্মদ আলি—তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সুজাউদ্দীন অনুগ্রহ করিয়া সেই কনিষ্ঠ পুত্রকে একশত টাকা বেতনের একটা চাকুরী দিলেন।

কিছু দিন পরে মহম্মদ আলি আপনার জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদকে সপরিবারে কটকে আনাইলেন এবং চেষ্টা করিয়া ৫০ টাকা বেতনের এক চাকুরী তাঁহাকে দেওয়াইলেন। হাজি আহাম্মদের তিন পুত্র ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও এক একটী চাকুরী জুটিল। জ্যেষ্ঠ নওয়াজস মহম্মদের ৩০ টাকা, মধ্যম সইয়াদ আহাম্মদের ২০ টাকা এবং কনিষ্ঠ জইনদ্দীনের ১৫ টাকা বেতন ধার্য্য হইল। কষ্ট ঘুচিল।

মহম্মদ আলি নানা কৌশলে প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। প্রভুও ক্রমে বিশেষ সদয় হইলেন। মহম্মদ আলির পরামর্শ অনুসারে তিনি সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময় মুরসিদকুলি খাঁর সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। সুজার পুত্র সরফরাজ খাঁ তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র, সুতরাং সরফরাজ নবাব হইবেন স্থির হইল। কিন্তু সুজা তাহাতে আহ্লাদিত হইতে পারিলেন না, তিনি থাকিতে তাঁহার পুত্র নবাব হইবে ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। সুজা অবিলম্বে দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপঢৌকন দিলেন। পুত্র নবাবী না পায়, তাহা তিনি নিজে পান, এই তাঁহার প্রার্থনা। দিল্লীর বাদসা যাঁহাকে নবাবী সনদ দিতেন, তাঁহার দাবী লোকের নিকট ন্যায্য বোধ হইত; এই জন্য সুজা পূর্ব্বাহ্ণে তথাকার সনদ আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। নতুবা যাহার সামর্থ্য ও সাহস আছে, তাহার এ সনদের প্রয়োজন হইত না। "জোর যার মুলুক তার" এই তখন সাধারণ নীতি ছিল।

মুরসিদকুলি খাঁর পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং সুজা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সসৈন্যে মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন মুরসিদকুলিখাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, কাজেই তিনি চেহল সেতুন নামক রাজপুরী প্রবেশ করিয়া একায়েক সিংহাসনে বসিলেন, কেহ কোন আপত্তি করিল না। তাঁহার পুত্র সরফরাজ পিতাকে তাড়াইবার নিমিত্ত যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী তাঁহাকে নিরস্ত করেন। এই ঘটনা বাঙ্গালা ১১৩১ সালে ঘটে।

সুজাউদ্দীন নবাব হইয়া পুত্রের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই, এই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা। মুসলমানদের মধ্যে যিনি যখন পিতা কিম্বা পুত্রের নবাবী বা বাদশাহী কাড়িয়া লইয়াছেন, তিনি তাহাকে হত্যা বা কারাবদ্ধ করিয়াছেন। সুজাউদ্দীনের আরও এইরূপ অনেক প্রশংসা আছে, তাহার এস্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক।

তিনি নবাবী গ্রহণ করিলে পর দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল যে আলি দৌরান—তথাকার উজির—আপনার নামে বাঙ্গালার নবাবী রাখিয়াছেন এবং সুজাউদ্দীনকে তাঁহার নায়েব স্বরূপ নবাবী কার্য্যের ভার দিয়াছেন। সুজা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে তাঁহার সনদ আসিল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রিয়পাত্র মির্জা আলি মহাম্মদের নিমিত্ত খিলাত অর্থাৎ নূতন বস্ত্র এবং নূতন একটি নাম পৌছিল। নামটী আলিবর্দ্দি খাঁ। এই নামে মির্জ্জামহম্মদ আলি সাধারণতঃ পরিচিত। মুসলমানেরা নূতন বস্ত্র পাইলে বড় সন্তুষ্ট হইতেন, প্রায় সকলেই আপনাকে তাহাতে সম্মানিত মনে করিতেন। এক্ষণকার প্রথা স্বতন্ত্র হইয়াছে, বস্ত্র বক্‌সিস লইতে এখন সকলেই অপমানিত মনে করেন। তবে যাঁহারা রাজা মহারাজা হইবার প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; সাবেক প্রথা রক্ষার্থ রাজপ্রসাদ স্বরূপে নূতন বস্ত্র তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয়।

আলিবর্দ্দির পুত্রসন্তান হয় নাই, কেবল মাত্র তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। আবার এদিকে তাঁহার ভ্রাতা হাজির তিনটী পুত্র জন্মিয়াছিল। খোদা যেন কেবল ইহাদের বিবাহের নিমিত্ত এইরূপ একপক্ষে পুত্র একপক্ষে কন্যা বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বিবাহও শীঘ্র সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আলিবর্দ্দি ও হাজি আহাম্মদ পরস্পর সহোদর ছিলেন, এবার আবার বৈবাহিক হইলেন। সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বাঁধনের উপর বাঁধন আবশ্যক হইত।

চারি পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১১৩৬ সালে, বেহারের গবর্ণরি খালি হইল। সুজাউদ্দীনের স্ত্রী জিন্নৎ বেগম পরামর্শ দিলেন যে, আলিবর্দ্দিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। সুজা আপনার সভাসদের মত গ্রহণ করিয়া আলিবর্দ্দিকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সম্বাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া আলিবর্দ্দি খাঁর নিমিত্ত আবার নূতন বস্ত্র ও আবার একটী নূতন নাম পাঠাইয়া দিলেন। আলিবর্দ্দির এ দুইয়ের কোনটীর অসংস্থান ছিল না, বস্ত্র নিশ্চয়ই তাঁহার যথেষ্ট ছিল এবং নামও তাঁহার দুই তিনটী জন্মিয়াছিল তথাপি এ সকল আবার পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। ইহার উপর আবার আর এক সম্মান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। তাঁহার পশ্চাতে নাগরা পিটাইবার হুকুম হইয়াছিল। পশ্চাতে কি অগ্রে নাগরা পিটাইলে মুসলমানদের তখন সম্মান বৃদ্ধি হইত।

এইরূপ নানা সম্মানে সম্মানিত হইয়া আলিবর্দ্দি খাঁ পাটনায় পৌঁছিলেন। সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা ও জামাতা গেলেন। কিছু দিন পরে সেই কনিষ্ঠ কন্যা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। আলিবর্দ্দির এই প্রথম দৌহিত্র জন্মিল, সুতরাং তাঁহার আহ্লাদের আর সীমা থাকিল না, তিনি আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সন্তানটী অবশ্য ভাগ্যধর হইবে। গণকেরাও তাহাই বলিল। আলিবর্দ্দি আরও আহ্লাদিত হইলেন। তিনি মনে বুঝিলেন যে, এই ভাগ্যধর ব্যক্তি তাঁহার "গরিব খানায়" জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া খোদা তাঁহাকে প্রদেশপতি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি শিশুটীকে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দি মনে মনে জানিতেন যে, তিনি নিজে বড় ভাগ্যবান্ এবং হয়ত ভাবিতেন যে, তাঁহার এই সৌভাগ্য মহম্মদ নামের গুণে হইয়াছে। অতএব শিশুটীর নাম মহাম্মদ রাখিলেন। তাঁহার নিজের নাম মহম্মদ আলি ছিল, শিশুরও নাম মহম্মদ আলি হইল। এই নাম করণেই লোকে কতকটা বুঝিল যে আলিবর্দ্দির ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন হইয়া গেল। একদিন আলিবর্দ্দি স্বয়ং সকলকে বলিলেন যে, এই দৌহিত্রকে তিনি পোষ্য পুত্র লইবেন এবং ভবিষ্যতে ইহাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া যাইবেন। সুতরাং শিশুর প্রতি দুই এক জনের ঈর্ষ্যা জন্মিল। আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ভাবিলেন আমি থাকিতে আমার কনিষ্ঠা একা ভাগ্যধরী হইল—তাঁহার পুত্র সর্ব্বস্ব পাইবে, আর আমার পুত্র হইলে সে কিছুই পাইবে না; মধ্যমা কন্যা সেইরূপ ভাবিয়া মনে মনে বালকটীর অশুভাকাঙ্ক্ষিণী হইলেন! শিশুর শত্রু সচরাচর জুটে না, কিন্তু এই অভাগার জন্মমাত্রেই তাহা জুটিয়াছিল। অনেকে বুঝিয়া থাকিবেন এই অভাগাই সিরাজউদ্দৌলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাঁহারা মনে করেন সদ্‌গ্রন্থ পড়াইয়া বালককে সচ্চরিত্রতা শিখাইবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। গ্রন্থে যতই সদুপদেশ থাকুক বালকের তাহা অগ্রাহ্য। তাহারা সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিবে, সদুপদেশ মুখস্থ রাখিবে। কিন্তু কার্য্যে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইবে। বালকেরা চরিত্র দেখিয়া চরিত্র শিখে—পড়িয়া নহে, শুনিয়াও নহে। যাহাকে সর্ব্বদা দেখে, যাহাকে ভালবাসে, বালকেরা তাহার অনুকরণ করে—আচারে ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে তাহার অনুকরণ করে। অনুকরণ আমাদের প্রথম শিক্ষা। বালকেরা সর্ব্বাগ্রে মাতা পিতাকে নিকটে পায়, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাদের অনুকরণ করে। অনুকরণ প্রবৃত্তি বালকদের না থাকিলেও

আর এক কারণে চতুস্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদের ন্যায় তাহাদের স্বভাব হইয়া পড়ে। বালকেরা যে সকল মনোবৃত্তির পরিচালনা সর্ব্বদা দেখে, সেই সকল বৃত্তি তাহাদের মনে আপনা আপনি উদ্দীপ্ত হয়। যেমন দেহ সম্বন্ধে অনেকে বলেন, হাই দেখিলে হাই আইসে, হাসি দেখিলে হাসি আইসে, সেইরূপ আবার মনসম্বন্ধেও আছে। শোক দেখিলে শোক আইসে, স্নেহ দেখিলে স্নেহ আইসে, রাগ দেখিলে রাগ আইসে। যে গুলি সর্ব্বদা বালকদের সম্মুখে পরিচালিত হয়, সেই গুলি বালকের অন্তরে সুতরাং সর্ব্বদা আইসে, যে বৃত্তি সর্ব্বদা পরিচালিত হয় সে বৃত্তি ক্রমেই পরিপুষ্টতা লাভ করে। এই জন্য নিষ্ঠুরপরিবেষ্টিত বালক নিষ্ঠুর হয়, প্রেমিকপরিবেষ্টিত বালক প্রেমিক হয়। এই জন্য আত্মীয়দেব চরিত্র অনুসারে বালকের চরিত্র হয় এবং এইরূপে সমাজের চরিত্র অনুসারে লোকের চরিত্র হয়।

বুদ্ধিমানেবা বালকদের সম্মুখে অতি সাবধানে চলেন। গুরুজনের সম্মুখে লোকে যেমন দুষ্কার্য্য পরিহার করে, বুদ্ধিমানেবা সেইরূপ বালকের সম্মুখে দুষ্কার্য্য ও দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে চেষ্টা করেন। নির্ব্বোধেরা বালকদিগকে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের সাক্ষাতে অনায়াসে আপন আপন দুষ্প্রবৃত্তি দর্শায়। তাহার পর পরিণামে সন্তানের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিলে তাহারা কেবল সন্তানেব দোষ দেয়, সন্তান শাসন করিতে চেষ্টা করে। তাহারা বুঝে না যে, প্রথমে আপনাদের শাসন আবশ্যক ছিল। যে সকল দুষ্কার্য্য বালকেরা পিতাকে বা অন্য আত্মীয়কে করিতে দেখে নাই, কেবল মাত্র করিতে শুনিয়াছে, সে সকল দুষ্কার্য্যও তাহাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা করে।

সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র বুঝিতে গেলে তিনি কি কি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার আত্মীয়দের চরিত্র কিরূপ ছিল তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। সিরাজউদ্দৌলাকে আলিবর্দ্দি প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সুতরাং সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহা অনুভব করিতে গেলে প্রথমে সেই আলিবর্দ্দির চরিত্র আলোচনা করা আবশ্যক।

আলিবর্দ্দি যখন বেহারের গবর্ণর হন, তখন বিতিয়া, ভোজপুর ও অন্যান্য স্থানের রাজারা একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা নবাবকে কর দিতেন না। কর চাহিলে তাঁহারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেন। তাঁহাদের সৈন্যেরা বলিষ্ঠ ছিল এবং তাঁহারা স্বয়ংও যোদ্ধা ছিলেন, সুতরাং আলিবর্দ্দি ইহা দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইলেন। শেষ আবদুল করিম নামে একজন সুদক্ষ আফগান সৈনিককে পাইয়া আলিবর্দ্দির ব্যস্ততা গেল। অনেক কথা বার্ত্তা ও পরামর্শের

পর, আবছুল করিম খাঁ বিদ্রোহী রাজাদের শাসন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে কৃতকার্য্য হইয়া পাটনায় ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দে আলিবর্দ্দি তাঁহাকে ক্রোড় দিয়া পুনঃ পুনঃ আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তাহার পর একদিন কোন বিশেষ পরামর্শের ছলে আবছুল করিমকে আপনার গৃহের এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। মুসলমানের কেহ কাহাকে আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া যাইতে পারিত না, লইয়া যাইতে চাহিলে বিপদ আশঙ্কা হইত। কিন্তু আবছুল করিম সে আশঙ্কা কিছু না করিয়া আলিবর্দ্দির সঙ্গে গেলেন। তথায় যাইবামাত্র তাঁহার পৃষ্ঠে তরবারির দুই তিন চোট পড়িল। আঘাত মাত্রেই অবছুল করিম পড়িয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্থূল দেহ প্রযুক্ত তাহা হঠাৎ পারিলেন না। এই অবসরে আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আলিবর্দ্দি বলেন যে, আবছুল করিম বড় বিয়াদব হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে হত্যা না করিলে আর চলিল না। কিন্তু প্রকৃত কারণ স্বার্থপরতা। আলিবর্দ্দি বুঝিয়াছিলেন যে, আবছুল করিম বড় উপযুক্ত, ইহার সন্ধান পাইলে নবাব যত্নপূর্ব্বক ইহাকে আপনার নিকটে রাখিবেন, সকল কার্য্য ইহার দ্বারা পাইবেন তাহা হইলে আলিবর্দ্দির যে প্রতিপত্তি ছিল তাহা আর না থাকিবাব সম্ভাবনা। সুতরাং সে সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্নে রহিত নিমিত্ত আবছুলকে হত্যা করা হইয়াছিল।

আর একটি ঘটনা বলি। ১১৪৫ সালে (1739) নবাব সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসিলেন। সুজা উদ্দীনের সময় যে ব্যক্তি যে পদস্থ ছিলেন, সরফরাজ খাঁ তাঁহাদের প্রত্যেককে সেই পদে রাখিলেন, কাহাকেও বরখাস্ত বা বদলি করিলেন না। তাঁহার মোসাহেবেরা সুতরাং বড় ক্ষুন্ন হইল। কেহ কোন চাকরি পাইল না দেখিয়া তাহারা নবাবকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সরফরাজ খাঁ যখন দেখিলেন যে কেবল অর্থ বা আদরে তাহাদের আর রাখা যায় না, তখন তিনি একে একে পূর্ব্ব কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া আপনার ইয়ারদের সেই সকল পদ দিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে আলিবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদের কার্য্য গেল। সরফরাজ খাঁ মনে করিয়াছিলেন তাঁহার পিতার নিকট হাজি আহাম্মদ নানা বিষয়ে ঋণী ছিলেন। সুতরাং কস্মিনকালে তিনি কৃতঘ্ন হইতে পারিবেন না। কিন্তু পদচ্যুত হইবা মাত্র হাজি আহাম্মদ সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে গোপনে দল বাঁধিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সরফরাজ খাঁ তাহা কিছুই সন্দেহ না করিয়া আপনার নবাবী উপভোগ করিতে লাগিলেন। সুখের নিমিত্ত নবাবী। অতএব যাহাতে সুখ হয়, সরফরাজ খাঁ তাহাই করিতে লাগিলেন। কখন যুবাপরিবেষ্টিত হইয়া যুবতীর নৃত্য দেখেন,

কখন সুন্দরীর সঙ্গীতে উন্মত্ত হইয়া "পেয়ালা পেয়ালা" সরাব খান। হাজি আহাম্মদ এই সময় আলিবর্দ্দিকে পত্র লিখিলেন যে, সরফরাজ খাঁ "আয়েস" লইয়া মাতিয়াছেন, রাজকার্য্যে তাঁহার মনযোগ নাই অতএব এই এক সময়। আলিবর্দ্দি পূর্ব্বেই ইহা বুঝিয়াছিলেন, সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া আপনি নবাব হইবেন, এ সাধ তাঁহার মনে মনে ছিল; কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। দিল্লীর দরবারে লোক পাঠাইয়াছিলেন। বেহার অঞ্চলের দুই এক জন রাজাকে শাসন করিবার ছলে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমত সময়ে হাজি আহাম্মদের পত্র আসিল, কিন্তু আলিবর্দ্দি তাহার কোন উত্তর দিলেন না। হাজি আহাম্মদ আর এক সুর ধরিলেন। তিনি আলিবর্দ্দিকে আবার লিখিলেন যে সে দিবস জগৎ শেঠের পুত্রবধূকে সরফরাজ খাঁ আপনার অন্দরে লইয়া গিয়াছিলেন, এবার আমাদের পরিবারের উপর হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন; সম্প্রতি ধরিয়াছেন যে আমাদের ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন। তিনি বিলক্ষণ জানেন যে আমাদের ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া এ চেষ্টা কেবল আমাদেব কুলে কলঙ্ক ঘটাইবার নিমিত্ত।

এবার আলিবর্দ্দি আক্ষেপপূর্ণ এক পত্র সরফরাজকে লিখিলেন। তদুত্তরে সরফরাজ জানাইলেন যে "আমাব কোন দোষ নাই, তোমাদের সহিত আত্মীয়তা দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় আমি এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কন্যাটা যে বাক্‌দত্তা তাহা আমি জানিতাম না।"

আলিবর্দ্দি এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি একবার ওজর পাইয়াছেন আর তাহা ছাড়িতে পারিলেন না। অতএব সসৈন্যে মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন। সরফরাজ খাঁ এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। আলিবর্দ্দি দূতের দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সরফরাজ খাঁ সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলেন, আত্মীয়তার অনুরোধে আলিবর্দ্দিকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আলিবর্দ্দি নিমন্ত্রণ আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। সরফরাজ খাঁর শিবিরে এখানে সেখানে আহারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র মহোৎসব পড়িয়া গেল। সকলে অন্যমনস্কে আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল, এমত সময় আলিবর্দ্দি সসৈন্যে অন্ধকারে হঠাৎ আসিয়া শিবির আক্রমণ করিল, ভয়ে সকলে কে কোথায় পলাইতে লাগিল। সরফরাজ খাঁ একা যুদ্ধে বাহির হইলেন, এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেগে বিশ্বাসঘাতকের দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দি পূর্ব্বাহ্ণে ষড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিবার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন হইল না। একটী গুলিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া আলিবর্দ্দি নবাব হইলেন, কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না, কেহ তাঁহাকে অশ্রদ্ধাও করিল না। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা মুসলমানের চক্ষে দোষ বলিয়া গণ্য হইল না। তখন মুসলমানেরা সকলেই স্বার্থপর; যে গতিকে হউক আপন আপন ইষ্টসাধন করিতে পারিলেই প্রশংসাভাজন হইতেন। আলিবর্দ্দি দীনহীন অবস্থা হইতে ক্রমে নবাব হইলেন সুতরাং স্বার্থপর দলে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। তিনি অদ্বিতীয় লোক বলিয়া সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিতে লাগিল।

সরফবাজ খাঁর গৃহ লুঠ কবিয়া আলিবর্দ্দি বিস্তর অর্থ পাইলেন। তাহার মধ্যে এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা তিনি দিল্লীর বাদসাকে নজর পাঠাইলেন। বাদসা সেই টাকা পাইয়া আলিবর্দ্দিকে সনদ দিলেন কিন্তু বলিলেন "আরও টাকা পাঠাইবে, সরফরাজ খাঁর বিস্তর টাকা ছিল, মুর্সিদ-কুলি খাঁ বহুকালাবধি দৌহিত্রেব নিমিত্ত টাকা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিল।" আলিবর্দ্দি আবার টাকা পাঠাইলেন। তাহার পর আলিবর্দ্দি আপনার নবাবী গৌরব দেখাইবার নিমিত্ত এবং তাহা দেখাইয়া নিজে সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত সুজা উদ্দীনেব কন্যাকে আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার দাসী * করিয়া দিলেন।

আলিবর্দ্দীর নীচ প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আর একটী পরিচয় দিই, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। আলিবর্দী যখন নবাব তখন বর্গিদের বড় দৌরাত্ম্য হয়। তাহাবা চৌট চাহে, আলিবর্দ্দী তাহা দিতে অসম্মত হন এই জন্য বিবাদ। বিরাটপতি রঘুজি আপনার সৈন্যাধক্ষ ভাস্কর পণ্ডিতকে এই জন্য পাঠান। ভাস্কর পণ্ডিত এক একবার বহুসংখ্যক সেনা আনিয়া আলিবর্দ্দীকে নানা স্থানে পরাভব করেন, নানা প্রদেশ দখল করেন। একবার বিংশতি সহস্র সেনা লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত কাটওয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। আলিবর্দ্দী ভাবিলেন এবার বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন আর উপায় নাই, অতএব আপনার কর্ম্মচারিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি চৌট দিতে প্রস্তুত আছেন; তবে কত দিতে হইবে, কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা সাক্ষাৎ ভিন্ন মীমাংসা হইবে না। ভাস্কর পণ্ডিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করিলেন এবং পর দিবস প্রাতে পাঁচ সাতজন প্রধান কর্ম্মচারি সমভিব্যাহারে আলিবর্দ্দীর শিবিরে

---

*. দুই একজন ইতিহাসলেখক বলেন যে সুজার কন্যা দাসীভাবে রক্ষিতা হন নাই; তিনি সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা ছিলেন। বৃথা কথা। আলিবর্দ্দিব জামাতা সুজার কন্যাটীকে দাসী মনে করিতেন না সত্য, কিন্তু তাহা কেবল সেই দাসীর গুণে।

গিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিবর্দ্দী অগ্রসর হইয়া মহা সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার ফাঁদের মধ্যে লইয়া গেলেন, তথায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার নাম ভাস্কর পণ্ডিত ? সে বীর পুরুষকে দেখিয়া আমি চক্ষু সার্থক করি" ; এই কথায় ভাস্কর পণ্ডিতকে একজন দেখাইয়া দিল। অমনি ইঙ্গিতমাত্র পটের পার্শ্ব হইতে শত শত অস্ত্রধারী নিমেষ মধ্যে বহির্গত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

এই বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর চরিত্র দেখিয়া সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র গঠন হইয়াছিল।

এখন যেমন এ দেশে প্রায় দশ হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হইয়া যায়, বোধ হয় প্রাচীন ভারতে সেরূপ হইত না। পূর্ব্বকালে উপনয়নের পর সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পত্নীগ্রহণ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার রীতি ছিল। মনুর ব্যবস্থা এই :—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ (৩অ ১ ও ২)

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত গুরুকুলে ছত্রিশ বৎসর এবং আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অর্দ্ধকাল কিম্বা তাহার এক-চতুর্থাংশ কাল বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদ শাখা শিক্ষা করিয়া, তিনটি, দুইটি বা একটি ভিন্ন বেদশাখা শিক্ষা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

অতি উত্তম ব্যবস্থা। ব্রতাবলম্বীর ন্যায় নিষ্ঠাবান্ হইয়া বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি উন্নত শাস্ত্র সকলের মর্ম্মগ্রহণ করত জ্ঞানবান্ ও বিদ্যানুরাগী হইয়া বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ করিবার আগে ধন সঞ্চয় কর, আর নাই কর জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এ নিয়ম এখন প্রচলিত নাই; সুতরাং এখন দশ বল, এগার বল, বার বল, সকল বয়সেই পুরুষের বিবাহ হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালে তাহা হইতে পারিত না। এখনকার ন্যায় তখন বিবাহ সখের খেলা ছিল না, মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ছিল। কাজেই শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিবাহ করিতে বয়স বেশী হইত। মনু বলেন :—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মেসীদতি সত্বর ॥ (৯অ-৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুরদর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা সামান্যতঃ উদাহরণ মাত্র। ফলে, পুরুষের বয়স কন্যার বয়সাপেক্ষা প্রায় তিন গুণ হওয়া চাই। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে কন্যার পিতৃকুলের উপর নীচে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। কি জন্য তাঁহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স এবং কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। সে তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পারিবারিক প্রণালী এখানকার পারিবারিক প্রণালীর মত নয়। এখানে যাহাকে একান্নবর্ত্তী পরিবার বলে, ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলণ্ডে শুধু পতিপত্নী লইয়া পরিবার। এখানে পিতা, মাতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, ভাই, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, প্রভৃতি লইয়া পরিবার। কাজেই ইংলণ্ডে পত্নীর একমাত্র সম্বন্ধ, পতির সহিত। এখানে যতগুলি লোক লইয়া পরিবার, পত্নীর ততগুলি সম্বন্ধ, বা ততগুলি লোকের সহিত সম্বন্ধ। যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অল্প; যাহার অনেক লোকের সহিত সম্বন্ধ তাহার কার্য্য এবং কর্ত্তব্যের সংখ্যা অধিক। অতএব যাহার একটি লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় কম এবং যাহার অধিক লোকের সহিত সম্বন্ধ, তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। এই দুইটি শিক্ষার প্রকৃতিও এক নয়। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে প্রেমের বলে অনেক কর্ত্তব্য সহজেই শিখে ও সম্পন্ন করে। যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ সে প্রেমের সহায়তা পায় না, তাহাকে কেবল পারিবারিক প্রণালীর অনুরোধে অনেক কর্ত্তব্য কষ্ট করিয়া শিখিতে এবং সম্পন্ন করিতে হয়। অল্প বয়স হইতে পতির পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায়

না। এ শিক্ষা লাভ না করিয়া অধিক বয়সে পতির পরিবারে আগমন করিলে, বয়োধর্ম্ম বশতঃ শুধু পতির প্রতি স্ত্রীর এতই অনুরাগ হয় যে, অপরের প্রতি পারিবারিক নিয়মানুসারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে সে নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়ে। আরো এক কথা। যাহার শুধু পতির সহিত সম্বন্ধ, সে শুধু পতির মনের মত হইলেই চলে। কিন্তু যাহার অপরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকে অনেকের মনের মত হওয়া চাই। কিঞ্চিৎ রূপ, কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য, কিঞ্চিৎ হাবভাব থাকিলে পত্নী পতির মনের মত হইতে পারে; কিন্তু অপরের মনের মত হইতে হইলে, সে সব গুণ কার্য্যকর হয় না, অপরের দ্বারা গঠিত বা শিক্ষিত হইলেই ভাল হয়। সে রকম শিক্ষা অল্প বয়সে যত কার্য্যকর হয়, বেশী বয়সে তত হওয়া অসম্ভব। ফল কথা, যাহাকে অনেকের মনের মত হইতে হইবে, অনেকের তাহাকে মনের মত করিয়া লওয়াই প্রকৃত পদ্ধতি। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সহিত পত্নীর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া সেই সম্বন্ধ যাহাতে সুখের সম্বন্ধ হয়, এইরূপ কামনা করিতেন। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি দেখিতে পাওয়া যায়:—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব
ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।

বর কন্যাকে বলিতেছেন;—শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূজনে সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী হও, দেবর সকলে সম্রাজ্ঞী হও।

এ কথাব তাৎপর্য্য এই যে, সম্রাজ্ঞী যেমন প্রজাবর্গের সেবা করিয়া তাহাদিগকে সুখে রাখেন, কন্যা তেমনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা, দেবর প্রভৃতির সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুখে রাখুন।

বিবাহ প্রক্রিয়ায় ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বর নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইবে;—

ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলোভূয়াসম্।

হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি যেমন অচল, আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, পত্নীর পতির পরিবারের সকলের সহিত সুখ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কেন না, তাহা না হইলে তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর প্রভৃতি কাহারো প্রীতি-প্রদায়িনী এবং পতিকুলে অচলা হইতে পারেন না।

ইংরাজ-পত্নীর যেমন একটি মাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দু-পত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে কেমন করিয়া শৈশব বিবাহের নিন্দা করি ?

হিন্দুপত্নীর যে সকল সম্বন্ধের কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া তাহার আর একটি সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ পত্নী মাত্রেরই আছে ; কেন না তাহা পতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু বোধ হয় যে, পতির সহিত হিন্দুপত্নীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয়। অন্যদেশে পত্নী পতির সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক না,তাহাতে পার্থক্যের ভাব এককালীন বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লোকসাধারণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্যমূলক পৃথক পৃথক স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান হইয়া থাকেন। ইংরাজ পতি এবং পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিল প্রভৃতি দার্শনিক-দিগের গ্রন্থে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় ; এবং মহাকবি শেলির *Revolt of Islam* নামক কাব্যে এবং কতিপয় গদ্যে রচিত প্রবন্ধে এই কথার সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এ দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্নীকে একটি ব্যক্তি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন। মনু বলেন :—

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা। (৯ অ-৪৫)

পুরুষ বলিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জায়া, আত্মা ও অপত্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভর্ত্তা ও ভার্য্যা এই দুয়ের নামই পুরুষ।

হিন্দু-বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সেই একত্ব সাধন। যথা—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।

বর কন্যাকে বলিতেছেন :—বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় পবিত্র করুন। জল সকল, প্রাণবায়ু, * প্রজাপতি, উপদেষ্ট্রী দেবতা, ইহাঁরা আমাদের উভয়ের হৃদয় একীভাবে সংযুক্ত করুন।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তেঽস্ত মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি নিযুনক্তু মহ্যম।

তুমি আমার কার্য্যে হৃদয় সমর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হউক, একতান মনে আমার বাক্য সেবা কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্তই নিযুক্ত করুন।

বর বিবাহ সমাপনে অন্ন ভোজনকালে বধূকে কহিতেছেন :—

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে॥

অর্থাৎ—যাহা মহারত্ন আত্মা স্বরূপ, যাহা প্রাণের বন্ধনস্বরূপ, সত্য যাহার গ্রন্থি স্বরূপ, সেই স্বর্গীয় অন্নরূপ পাশে তোমার চিত্ত, বুদ্ধি ও অন্তরাত্মাকে বন্ধন করিলাম।

আর একটি মন্ত্রে বর কন্যাকে বলিতেছেন :—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার হৃদয় হউক, এই যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হৃদয় হউক।

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা শুধু হৃদয়ের মিশ্রণে পরিতৃপ্ত নন। তাঁহারা সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন মিশ্রণের অভিলাষী। সেই জন্য বর কন্যাকে বলিতেছেন ;—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভির-
স্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক।

সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয় তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ

* ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থে হলায়ুধ মাতরিশ্ শব্দের প্রাণবায়ু অর্থ করিয়াছেন।

করি। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিয়া যায়, দেহ দগ্ধ হইলে যেমন পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২, আর ২ নাই—১ হইয়া গিয়াছে। যে ১, ২ হইয়াছিল, সেই ২ আবার ১ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ম্ভূ নিজ দেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দুইখণ্ড মিলিয়া এবং মিশিয়া আবার সেই এক স্বয়ম্ভূ প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে*। হিন্দুধর্ম্মে স্বয়ম্ভূ ও যা, মুক্তিও তা। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যও মুক্তি। তাই হিন্দু বিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি হয়। স্ত্রী এবং পুরুষের মুক্তি অথবা পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এই বিবাহ-নিষ্পন্ন অপূর্ব্ব একত্বমূলক। তাঁহারা বলেন, স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন †।" পত্নীর ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে। (৫ অ ১৫৫)

স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই ; স্ত্রী কেবল পতি-শুশ্রূষা করিয়াই সুরলোকধন্যা হয়েন।

এবং পতির ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ;—

(১) পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু।

অর্থাৎ ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা অর্থাৎ মহাগুরু।

(২) দারাঃ পরা গতিঃ।

অর্থাৎ, ভার্য্যা পতির পরম গতি।

(৩) এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যা মিহলোকে পরত্র চ।

---

* "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সে দুই শরীর এক হইয়া যায়"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারত মহিলা নামক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠা।

† ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ, ভার্য্যা শুধু ইহকালের জন্য নয়, ইহকাল ও পরকালের জন্য ; এই কারণেই বিবাহের বিধি হইয়াছে।

(৪) রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্ত মবেক্ষ্য হি।

অর্থাৎ মনুষ্যের রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম ভার্য্যারই আয়ত্ত।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্র মতে পতি এবং পত্নী, উভয়ে মিলিয়া একটি ব্যক্তি—উভয়ের এক দেহ, এক চিত্ত, এক হৃদয়, এক উদ্দেশ্য, এক কর্ম্ম, এক স্বর্গ, এক নরক। আবার বলি, পতি পত্নীর এমন সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন একত্ব আর কোন জাতি কল্পনাও করে নাই। একত্বের ন্যায় অপূর্ব্ব কবিত্ব জগতে কমই আছে। সঙ্গীতময় বিশ্বমণ্ডল যেমন কবিত্ব এও তেমনি কবিত্ব। ভারতে বলিয়া এ কবিত্ব মানুষের জীবন প্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে কদাচিৎ কখন কোন ক্ষণজন্মা কবির কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষায় থাকে, যথা শেলি :—

We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, oh! wherefore two?
One passion in twin-hearts, which grows and grew,
Till like two meteors of expanding flame,
Those spheres instinct with it become the same.
Touch, mingle, are transfigured ; ever still
Burning, yet ever inconsumable :
In one another's substance finding food,
Like flames too pure and light and unimbued
To nourish their bright lives with baser prey.
Which point to Heaven and cannot pass away :
One hope within two wills one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation. (Epipsychidion)

এ খুব চমৎকার একত্ব বটে। কিন্তু হিন্দু-দম্পতির একত্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কবির একত্ব শুধু হৃদয়ের, হিন্দু-দম্পতির একত্ব হৃদয়ের এবং কর্ম্মের। কবির একত্ব শুধু অন্তর্জগৎ লইয়া, হিন্দু দম্পতির একত্ব অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ দুই লইয়া। কবির একত্বের সঙ্গীত নির্জ্জন নীরব স্থানে ভিন্ন শুনিতে পাওয়া যায় না, গোলমালে সে সঙ্গীত ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু-দম্পতির একত্বের সঙ্গীত পৃথিবীর সুপ্রশস্ত কোলাহলময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একতানে বাঁধিয়া ফেলে। কবির একত্ব poetic; হিন্দু দম্পতির একত্ব cosmic; কবির একত্ব lyric; হিন্দু দম্পতির একত্ব dramatic। নাটকে গীত থাকে, কিন্তু গীতে নাটক থাকে না। হিন্দু দম্পতির একত্বই উৎকৃষ্ট একত্ব।

কিন্তু পত্নীকে পতিতে এত মিশাইয়া দিতে হইলে পতির পত্নীকে গড়িয়া লওয়া আবশ্যক। পতি নিজে যেমন, তাঁহার পত্নীকে তেমনি করিয়া লওয়া চাই। তিনি নিজে যে প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহার পত্নীকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী করিয়া তোলা চাই। পত্নী পতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য গোড়ায় ভিন্ন হয় না। পরকে সর্ব্ব রকমে আপনার করিতে হইলে, পরের সর্ব্বস্ব আপনার হাতে রাখা চাই, পরের দেহ বল, মন বল, হৃদয় বল, আত্মা বল, সকলই আপনার হাতে রাখা চাই। কিন্তু পরের বয়োধিক্য হইলে তাহার সর্ব্বস্ব আপনার হাতে পাওয়া যায় না। সন্তানকে আপনার মনের মত করিতে হইলে, তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা তাহার শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। মনের মত চেলা করিতে হইলে, মহান্ত বালক দেখিয়া চেলা নিযুক্ত করেন। পশুশাবক যেমন পোষ মানে, বড় পশু তেমন পোষ মানে না। রাম সীতাকে বনে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া ভাবিতেছেন :—

> শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াম্ সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
> ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥
>
> (উত্তরচরিত)

বাল্যকাল হইতে প্রিয়াকে পোষণ করিয়াছি; এমনি প্রণয় যে আমার হৃদয়ের যে ভাব তাঁহার হৃদয়েরও সেই ভাব, কোন ভেদ নাই। তাঁহাকে আজ কি না ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে দিতেছি, যেন কসাই হইয়া গৃহপালিতা পক্ষিণীটিকে বধ করিতেছি।

ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়ে হাড়ে মিশিতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের

মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশী, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা কি অমূলক, অর্থহীন, না অনিষ্টকর? ব্যবস্থা যে অমূলক বা অর্থহীন নয়, তাহা এক রকম বুঝাইলাম। অনিষ্টকর কি না, তাহাই এখন বুঝাইব।

স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশিয়া যদি চিরকালের জন্য একটি ব্যক্তি হইতে হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থা হইতে স্ত্রীকে পুরুষেব শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অতএব বিবাহের বয়স সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা অনিষ্টকর কি না, এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে একত্ব সম্পাদিত হয়, তাহা ভাল কি মন্দ? দুইটি ব্যক্তিকে যদি একটি কর্ম্ম করিতে হয়, তবে তাহারা এক-মন এক-প্রাণ হইলেই কর্ম্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক জনেব কম অনুবাগ বা কম যত্ন হইলে কর্ম্মটিও সুসম্পন্ন হয় না এবং দুই জনের মধ্যে কেহই কর্ম্ম করিয়া সুখ বা তৃপ্তি লাভ করে না। অতএব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে পতি এবং পত্নীর এক-মন এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, স্ত্রী এবং পুরুষ, এই দুই লইয়া মনুষ্য। স্ত্রী ঋক্, পুরুষ সাম; স্ত্রী পৃথিবী, পুরুষ স্বর্গ*। পৃথিবী এবং স্বর্গ একত্র হইলে তবে একটি পূর্ণজগৎ হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সঙ্গীতময় মিলন না হইলে মনুষ্য হয় না। স্ত্রী, পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রয়োজনীয়। কাজেই পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অসম্পূর্ণ এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ। যদি দুই জনকে সম্পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে দুইজনে মিশিয়া এক হওয়া আবশ্যক। মিশ্রণে যেমন অভাব মোচন হয়, আর কিছুতে তেমন হয় না। অমিষ্ট দ্রব্যকে সুমিষ্ট করিতে হইলে অমিষ্ট দ্রব্যেব সহিত মিষ্ট দ্রব্য মিশাইয়া ফেলিতে হয়। মিষ্ট দ্রব্য যত কম মিশান হয়, অমিষ্ট দ্রব্য তত কম মিষ্ট হয়। অতএব স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ, মনুষ্যত্ব-সাধক। তাই বলি যদি ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা জীবন পবিত্র করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষে মিশিয়া ধর্ম্মচর্য্যা না করিলে ধর্ম্মচর্য্যা অঙ্গহীন এবং এক রকম অসম্ভব হয়। দুইটি হৃদয়রূপ দুইটি নদী মিলিয়া একটি ধারায় অনন্তে মিশিতে না পারিলে মানুষের জীবনরূপ আহুতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং সঙ্গীতময় হয় না। যুক্তহস্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে দেবার্চ্চনা করিয়া কি আশ্ মিটে? হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এই মিশ্রণ এবং একীকরণ। সে উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং গূঢ় তথ্যমূলক, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যা এবং ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাইয়া এক করিলে, দুই জনের যে সকল

---

* সামাহমস্মি ঋক্, ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং।

পৃথক্ পৃথক্ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে, তাহার স্বাধীন এবং সম্যক স্ফুর্ত্তি হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্য? শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? যদি স্বাধীন স্ফুর্ত্তিলাভ কবিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফুর্ত্তি লইয়া কি হইবে? যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পবিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয়? এবং মানুষ কি তাহা করে না? সামাজিক জীবনের অর্থই ত তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অপবেব সাহায্যে আপনাব কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যাযসঙ্গত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে দুই জনের যে সকল পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত কবিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। একই কর্ম্ম দুই জনে দুই রকমে করিতেছেন। শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তৃতীয় উত্তর এই যে, একমনে একপ্রাণে এক উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইলে কি পতি, কি পত্নী, কাহারো পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিবার বেশী অভিরুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাঢ় প্রণয়স্থলে সে টুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না।

যাঁহারা ইংরাজি সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরো দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে হিন্দু, পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান। বিবাহকালে বর কন্যাকে এই মন্ত্র পড়াইয়া অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া থাকেন;—

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।

হে অরুন্ধতি ! আমি যেন তোমার ন্যায় অবরুদ্ধ অর্থাৎ পতিতে লগ্ন হইয়া থাকি ।

তাহার পর বর কন্যাকে দর্শন এবং বারংবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন :—

ওঁ ধ্রুবাদ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী,
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ,
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতাইমে,
ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্ ।

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব, এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি পতিপত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু ইংরাজদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয় । তাঁহারা যে পতিপত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক, তা নয় । কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীব বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা কবিয়া থাকেন । হিন্দু বলেন, পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক, কাল যদি কোন অপ্রণয়ের কাবণ হয়, পরশ্ব তাহা অদৃশ্য হউক, মোট কথা, পতি এবং পত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউন । * ইংরাজ বলেন,—পতি এবং পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়,

* বিবাহান্তে বর, অগ্নি ও সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিবে :—

(১) ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা ।

হে সর্ব্বদোষহর অগ্নি ! তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) পতি-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর ।

(২) ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি । যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা ।

হে সর্ব্বদোষহর সূর্য্য । তুমি দেবলোকের দোষ বিনষ্ট করিয়া থাক, এই জন্য আমি শরণার্থী তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহার (এই কন্যার) গৃহধর্ম্ম-বিরোধক অঙ্গ বিনষ্ট কর ।

তবে পরস্পরই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্য বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান। ইংরাজ পতিপত্নীর বিরোধ বাড়াইয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরাজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরাজের মধ্যে এই প্রভেদটি অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটি তাৎপর্য্য আছে। একটি তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে, তখন তাঁহার পতি তাঁহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মনের মত করিয়া লইতে পারেন, এবং সেই জন্য যত দিন যায়, ততই তিনি পতিতে মিশিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজ রমণীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম, এবং সেই জন্য তাঁহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ তাঁহাতে থাকিলে, পতি তাহা নষ্ট করিতে অক্ষম হন; এবং যত দিন যায়, কারণটি কাজেই তত প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদ বশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্য নীতি ও প্রণালীর এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটি তাৎপর্য্য এই। অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতি কর্ত্তৃক প্রয়োজন মত শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইংরাজ এ কথা বুঝেন। কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না—অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না? এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরাজ অল্প বয়সে স্ত্রীর বিবাহ দেন না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচি সম্বন্ধে এবং অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষা লাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটি হওয়া উচিত নয়। সেটি হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে না, স্বাধীন মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ যখন মিলিত হইবে তখন তাহারা পরস্পরে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। কোন একটি কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না। আপনিই প্রধান এই ভাবিয়া মিলিত হইবে। আত্মপ্রিয়তা ইংরাজি বিবাহ প্রণালীর মূল সূত্র। তাই ইংরাজ, বিবাহের গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত যত্নবান। হিন্দুর বিবাহ মহৎ উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া, হিন্দু বিবাহ-গ্রন্থি আঁটিয়া রাখিতে চান; ইংরাজের বিবাহ

মহৎ উদ্দেশ্যহীন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতামূলক বলিয়া, ইংরাজ বিবাহ-গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত তৎপর। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল, না জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটিকে বড় করা ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে তবে এমন হইতে পারে যে, তোমার সুখ হইল, আর কাহারো কিছু হইল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার, তবে তুমিও সুখী হইবে এবং অপরেও সুখী হইবে। এ জগতে একলা থাকিবার যো নাই; পশু একলা থাকিতে পারে, মানুষ পারে না। যদি পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হইল তবে জীবনটা পাঁচ জনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিলেই, এ জগতে এ জীবনের কার্য্যটা এক রকম হইল না? কিন্তু সেই মহৎ কার্য্য সাধনার্থ যদি স্ত্রী পুরুষের মিলন আবশ্যক হয়, তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না ভাবিয়া সেই মহৎ কার্য্যটিকে বড় ভাবিয়া স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না? যদি বল স্ত্রীপুরুষে মিলিত হয় হউক: কিন্তু যে মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল, সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যে, যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যোদ্দেশে মিলিলে মিলনটা যত মহৎ এবং মনুষ্যত্বসূচক হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে মিলিলে তত হয় না। একথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে যদি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে বা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহাব বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ, বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ; যিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

আরো এক কথা। ইংরাজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য? না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া বা স্বার্থসাধনার্থ স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু জগতের এবং মনুষ্যজীবনের মহৎকার্য্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থ সাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয়, সে ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকার্য্য সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারো কোন কথা কহিবার যো নাই। মহৎকার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও তাহা ত দূষণীয় দান নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি।

ইংরাজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করেন না, হিন্দু করেন। ইংরাজ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দু জগৎকে লইয়া ব্যস্ত। ইংরাজ আপনার জন্য সমাজে থাকেন, হিন্দু সমাজের জন্য সমাজে থাকেন। বল দেখি ইংরাজ-মানুষ বেশীমানুষ, না হিন্দু-মানুষ বেশী মানুষ? বল দেখি ইংরাজ হইবে না হিন্দু হইবে? বল দেখি ইংরাজের মতে বিবাহ করিবে না হিন্দুর মতে বিবাহ করিবে?

এখন বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরাজি প্রভৃতি বিবাহ প্রণালীতে দাম্পত্য-গ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দু বিবাহে স্ত্রী-পুরুষেব যে মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়, তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পতি এবং পত্নীর হৃদয়-স্বরূপ দুইটি সুর মিলিয়া একতানে না বাজিলে জগৎ কেমন করিয়া সঙ্গীত সুধা পান করত শোকতাপ ভুলিয়া যাইবে! কিন্তু যদি দুইটি হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয়, তাহা হইলে একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? তবেই ত বোধ হয় যে হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষেব বেশী বয়সে এবং স্ত্রীর শৈশবকালে বিবাহ হওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি উত্তম এবং উৎকৃষ্ট বাবস্থা।

তুমি বলিবে যে, এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা, এখন চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার ত এখনও এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ এখনও অল্প বয়সে হইবে না? আর, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া একলা একলা থাকেন বা থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও বলি যে, অল্প বয়সে, কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী: একান্নবর্ত্তী পরিবারের পতি অনেক সময় পত্নীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না। এবং অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্নীকে পতির শিক্ষার বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া তাঁহার চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাকে পাঁচ রকমের পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে পত্নীকে নিজের মতন করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জগতে মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন পুরুষের মহৎ, প্রীতিকর, এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কায আর কি আছে? এবং তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করা মহা পাপ!

বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি-হস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এ কথার অর্থ এই যে, পতি শিশুপত্নীর সহিত অযথা ব্যবহার করিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু চরক শুশ্রুতের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর বেনজমিন ব্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহার জন্য নয়। সে পশু, বালিকা-রূপ পবিত্র কুসুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহারই প্রাপ্য। যিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণত বয়স্ক, উন্নতমনাঃ মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, তাঁহার পত্নী চিরকালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাঁহার সন্তান সন্ততি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প। তাই বলি, যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে বিদ্যা দান করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দিও, কিন্তু অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিও না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহ্যশাসনে নাই। চোর বার বার জেলে যায়, তবু চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উন্নতি। এখন এ দেশে আধ্যাত্মিকতা নাই বলিয়াই বাল্য বিবাহের অপব্যবহার হয়। এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই, বিবাহের সহিত ধর্ম্মের অর্থাৎ বিশ্বের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই বিবাহের ফল কদর্য্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম্ম প্রকৃত সৌন্দর্য্যহীন। নৈতিক উন্নতি কর, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য স্থির কর, করিয়া লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক, দেখিবে এদেশ আর এদেশ নাই, দেশ ধর্ম্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুর ঘরে জগতের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে, সপত্নীক হিন্দু পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বীরপুরুষ হইয়াছে এবং জগতের সৌন্দর্য্যের ছটায় ডুবিয়া রহিয়াছে, দেশে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই—সকলই উন্নত, সকলই পবিত্র, সকলই বিরোচিত, সকলই সঙ্গীতময়।

রাজস্থান। রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত। শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি সংখ্যার চারি আনা মাত্র।

টড্ সাহেব এই ইতিহাস ইংরাজিতে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতদের অসাধারণ বীরত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "there is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopyli and scarcely a city that has not produced its Leonidas.

দাম্ভিক ইংরেজরা এই ইতিহাস পড়িয়া বুঝিয়াছেন যে, তাহাদের দাম্ভিকতা সর্ব্বত্র খাটে না। ভারতবর্ষীয়ের বীরত্ব এখন হ্রাস পাইয়াছে, আবার এক দিন উদ্দীপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই এখন এই ইতিহাস পাঠ করা উচিত। অঘোর বাবু সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই ইতিহাস পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি অতি অল্প মূল্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের অনুবাদও সুন্দর হইতেছে। আমরা মূল গ্রন্থের সহিত স্থানে স্থানে মিলাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, গ্রন্থখানি অনুবাদিত বলিয়া জানিতে পারা যায় না; যেন কোন মূল গ্রন্থ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা এক প্রকার সাহস করিয়া বলিতে পারি যে অনুবাদিত অন্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ বঙ্গ ভাষা হইতে শীঘ্র লোপ পাইবে না। আমরা আশীর্ব্বাদ করি অঘোর বাবুর মনস্কাম সিদ্ধ হউক—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ পঠিত হউক।

গ্রন্থাবলী। গদ্য ও পদ্য শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ৯৭নং কালেজ ষ্ট্রিট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা।

রাজকৃষ্ণ বাবু কবি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনেকেরই আগ্রহ। তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ অল্প মূল্যে পাঠের এত অধিক সামগ্রী আর কখন বঙ্গ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর। অর্থাৎ ইউরোপবাসিদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় ও নানা দেশ বর্ণন বিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত বি, এল, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। এবার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিপাটি হইয়াছে; প্রকাশক বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন

১২৭৯ হইতে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

নয় খণ্ডে সম্পূর্ণ

সম্পূর্ণ সূচী

খণ্ড অনুসারে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত

প্রকাশক

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী

কলিকাতা

বঙ্গদর্শন

নয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী

প্রথম খণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ খণ্ড

বিষয় | | **পৃষ্ঠা**

সপ্তম খণ্ড

বিষয়			পৃষ্ঠা

অষ্টম খণ্ড

নবম খণ্ড